নবম ভাগ। { বৈশাখ ১৩১২ সাল } ১ম সংখ্যা।

মঙ্গলাচরণ।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।
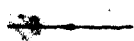
জন্মাদ্যস্য যতোহন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্
তেনে ব্রহ্মহৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ।
তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি॥

"এই" শব্দ বাচ্য বিশ্ব জন্ম যাঁহা হ'তে
স্থিতি ভঙ্গ, অন্বয়াদি (১) ভাবেতে যাঁহাতে
রয়েছে গ্রথিত (২);—তিনি কি "প্রকৃতি" তবে,—
যাঁ'রে সাংখ্যকার করেন নির্ণয় এবে

(১) অন্বয় ও ব্যতিরেক, অনুলোম ও বিলোম Involution ও Evolution.

(২) ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণাইব।—(গীতা ৭।৭)

"প্রধান প্রকৃতি" বলি? (৩) তা'ত কভু নয়;
প্রকৃতি ত গুণময়ী (নহে জ্ঞানময়)
অজ্ঞানস্বরূপ;—পুরুষ সহিত খেলে
অন্ধ যেন খঞ্জ সনে। মহাজনে বলে
তিনি অভিজ্ঞ সতত,—জ্ঞান নয়নেতে
না পড়ে নিমিষ তাঁর। সদা স্বজ্যোতিতে
স্বপ্রকাশ, লোকচক্ষু সবিতার মত,
অন্য জ্যোতি যাঁরে নাহি করে প্রকটিত;
মনোবুদ্ধি যথা চলিবারে নাহি পারে। (৪)
তবে কি স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা?—শ্রুতি (৫) স্মৃতি (৬) যাঁরে
ভূতপতি অভিধায়ে করেছে বর্ণিত?
কভু নহে। ব্রহ্মা হৃদে করি প্রকাশিত
"পূর্ব্ব জ্ঞান" বেদ (৭) সুরি যাহাতে মোহিত,
সৃষ্টির কারণ যিনি; যাঁহার ঈক্ষণে
ভূতেন্দ্রিয়দেবরূপ অনৃত সৃজনে
সত্য ভাব প্রকাশিত—সলিল কাঁচেতে
জলবুদ্ধি মরুভূমে, যাঁহার সত্বাতে
বিনিময় ভাবে সদা সত্যরূপে ভাতি।
ভাবিত হইয়া সেই ভাবে নিশাপতি
স্তব্ধ হ'য়ে রন, যাঁর লীলা দেখিবারে
গতিধর্ম্ম ত্যজি। সদা পাইতে যাঁহারে

---

(৩) অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং * * * (সাংখ্যকারিকা ১।)

(৪) যত্র বাচঃ নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ—উপনিষদ।

(৫) হিরণ্যগর্ভসমবর্ত্ততাগ্রে ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ।—
শ্বেতাশ্বেতরোপনিষৎ।

(৬) মনুসংহিতা।

(৭) যো ব্রহ্মাণং বিদধাতিপূর্ব্বকং, যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ—
(শ্বেতাশ্বেতর।)

পাষাণাদি দ্রব হয়ে ধায় যাঁর পানে
আপন স্বভাব ভুলি। মুরলী নিঃস্বনে
যমুনা উজান বহে বারিধর্ম্ম ত্যজে।
যাঁর জ্যোতি বরনীয় "ভর্গ" সদা রাজে
স্বপ্রকাশ, নাশি কুহক অজ্ঞান আর।
কিবা নামে তবে, পূর্ণ সারাৎসার!
তোমা স্মরি? তুমি ঋত সদা নির্ব্বিকার,
পুরুষ-প্রকৃতি-পর, তম-নদী-পার। (৮)
বুদ্ধি পদ্মে প্রকাশিত, "সত্য" "পর" তুমি
জীব শিব দোঁহে এক, আমার ও যে আমি।

আমাদের নবম বৎসর।

শ্রীগুরুচরণ স্মরণ করিয়া আমরা আমাদের গত বৎসরের কর্ম্মফল ঈশ্বরোদ্দেশে শ্রীগুরুকরকমলে সমর্পণ করিলাম। ওঁ

"ঋষি কুথুমী" আমাদের গুরু। বেদরূপ কল্পবৃক্ষের সামবেদান্তর্গত যে শাখা "কৌথুমী শাখা" নামে খ্যাত, ঋষি কুথুমী সেই শাখার প্রণেতা; এবং ঐ শাখা এখনও তাঁহারই রক্ষণে সংরক্ষিত। আজকাল যাঁহারা সামবেদী, তাঁহারা সকলেই ঐ শাখা অবলম্বী; সামবেদের অন্য শাখা এখন প্রচলিত নাই। ঋষি কুথুমী তন্নামীয় শাখা অবলম্বী সকলেরই গুরু। তিনি নূতন ঋষি নহেন; বহু প্রাচীনকালে, ধর্ম্ম সংস্থাপন জন্য তিনি বেদের স্বনামখ্যাত শাখা প্রণয়ন করেন, এবং ঐ শাখা সজীব রাখিবার জন্য, এখনও নির্ম্মাণকায় ধারণ করিয়া আছেন। যিনি তাঁহার কৃপার পাত্র হন, নির্ম্মাণকায়াবলম্বনে তিনি তাঁহাকে দেখা দেন ও সৎ পন্থার আকর্ষণ করিয়া লইয়া যান। তাঁহাকে নমস্কার।

---

(৮) আদিত্য বর্ণং তমসপরস্তাৎ—(গীতা ৯।৮)

"নমো পুরস্তদথ পৃষ্ঠতস্তে নমোঽস্তু তে সর্ব্বত এব সর্ব্ব।"

ঋষি কুথুমীর নাম প্রথমে শ্রীমতী ব্ল্যাভাট্স্কির নিকট শুনি এবং ঐ নামই লেখককে ধর্ম্মপথে আকর্ষণ করিয়াছিল, অধিক কি ধর্ম্ম সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ যাহা কিছু বুঝি, তাহা ঐ নাম অবলম্বনে।

১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে পূজনীয়া শ্রীমতী ব্ল্যাভাট্স্কির সহিত এলাহাবাদে দেখা করিয়াছিলাম; ঐ সময়ে ঋষি কুথুমী সম্বন্ধে তাঁহাকে প্রশ্ন করি। উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন যে, তিব্বতে 'কুথুম্পা' নামে যে ধর্ম্ম সম্প্রদায় আছে, সেই মঠের যিনি কর্ত্তা, তাঁহার নাম কুথুমী। ঋষি কুথুমী বহু প্রাচীন ঋষি; হিন্দুদের বেদে ও পুরাণে তাঁহার নাম আছে, একথাও তিনি ঐ সময়ে বলিয়াছিলেন। ঋষি কুথুমী পাঞ্জাবে জন্মিয়াছিলেন, তিনি প্রথমে শিখ সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন, এবং পরে কুথুম্পা মঠের অধিপতি হয়েন, এই কথাও শ্রীমতী ব্ল্যাভাট্স্কির নিকট শুনিয়াছিলাম।

প্রাচীন ঋষি কুথুমীর সহিত, কুথুম্পা মঠাধিপতির কি সম্বন্ধ, একথা কিন্তু সে সময়ে বুঝিতে পারি নাই। কয়েক বৎসর পরে গুরু কৃপায় উহা বুঝিয়াছি। জীবের মঙ্গলের জন্য, ধর্ম্ম রক্ষার জন্য, নিজের স্থাপিত সম্প্রদায়ের রক্ষার জন্য, অব্যক্ত সৎ পদার্থের সহিত ব্যক্ত ব্রহ্মাণ্ডের সম্বন্ধ সংরক্ষণ জন্য, প্রাচীন ঋষি কুথুমী নির্ম্মাণকায় আশ্রয় করিয়া আছেন। 'কুথুম্পা' সম্প্রদায়ের মধ্যে যিনি নিজের সূক্ষ্ম শরীর বা কারণাত্মা সেই নির্ম্মাণকায়াতে সর্ব্বতোভাবে লয় করিতে পারেন, তিনি ঐ সম্প্রদায়ের অধিপতি হইবার উপযুক্ত হন। তাঁহাকে, 'তিনি' বলাও ঠিক নহে। যাহা লইয়া 'তুমি' 'আমি', তাহাই তাঁহার নাই। এক সময়ে যিনি অধিপতি থাকেন, দ্বিতীয় ব্যক্তি ঐরূপ উপযুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত, তিনি কায়া ত্যাগ করেন না। সেই জন্য যিনি কুথুম্পা সম্প্রদায়ের মঠাধিপতি হন, তাঁহার সূক্ষ্ম শরীর প্রাচীন ঋষি কুথুমীর নির্ম্মাণকায় মধ্যে লয় হইয়া যাওয়ায়, তিনি এবং ইনি এক হইয়া যান।

শ্রীমতী ব্ল্যাভাট্স্কির নিকট শিখিয়াছি যে তিব্বতে ও জগতে এক আসুরিক সম্প্রদায় আছে উহাদের নাম 'দুগ্-পা'; ইঁহাদের কর্ম্মকাণ্ড সমস্ত আসুরিক। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় যাহাকে আসুরিক সম্পদ্ বলা হইয়াছে, এই সম্প্রদায় সেই সকল সম্পদ্ লাভে অভিলাষী। দম্ভ ইঁহাদের কর্ম্মের প্রেরক; পরিচ্ছিন্ন

অহং জ্ঞানই ইঁহাদের আত্মা। ইঁহারা এক প্রকার শক্তি লাভ করেন, তাহার নাম তামিস্রা। যে মনুষ্য এই তামিস্রা শক্তির ঘূর্ণীপাক মধ্যে পড়েন, তিনি ধর্ম্ম হারাইয়া, কাম, ক্রোধ, লোভ বশে পড়িয়া, শেষে প্রণষ্ট হন। এই তামিস্রা শক্তির হাত হইতে জীবকে রক্ষা করাই কুথুম্‌পা সম্প্রদায়ের প্রধান কার্য্য। 'দুগ্‌-পা' দলের অধিপতি মূর্ত্তিমান দম্ভ; তামিস্রা শক্তি এই দম্ভের কন্যা। 'কুথুম্‌পা' দলের অধিপতি মূর্ত্তিমান প্রেম; বিদ্যা ও প্রীতি শক্তি ইঁহার কন্যা।

আমাদের পুরাণে কথিত আছে, যে দুর্গ নামে এক অসুরকে দমন করেন বলিয়া ভগবতী দুর্গা নামে অভিহিতা। গীতায়ও ভগবান বলিয়াছেন,—

"মচ্চিত্তঃ সর্ব্বদুর্গানি মৎপ্রসাদাৎ তরিষ্যসি।"

এই দুর্গ অসুরের, আসুরিক পন্থাই 'দুগ-পা' সম্প্রদায়ের পন্থা; এবং ভগবতী যে সিংহবাহনে দুর্গ অসুর দমন করেন, 'কুথুম্‌পা' সম্প্রদায়ের অধিপতি, কুথুমী সিংহই সেই সিংহ। ভগবানের সচ্চিদানন্দময়ী শক্তি বা দৈবী প্রকৃতির অঙ্গভূত ঋষিরাই ধর্ম্মের রক্ষক। তাঁহারাই ভগবতীর প্রকাশের উপাধি বা বাহন। গীতায়ও উক্ত আছে,—

"মহাত্মনস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ।

স্বপ্নলব্ধ গুটিকতক কথা এই স্থানে বলিতে ইচ্ছা করি। ঋষি কুথুমীর নির্ম্মাণকায়ের একটি অচ্ছাদকরূপ আছে; সেটি সিংহরূপ। বৌদ্ধ বা মহাযান পন্থাবলম্বীরা "নমো সিংহায়" বলিয়া, এই সিংহের উপাসনা করেন। শ্রীগুরুদেবের নির্ম্মাণকায় স্মরণ করিয়া তাঁহার চরণ সরোজে নমস্কার করিতে শিখিলেই তিনি প্রীতিশক্তি দান করিবেন। এই প্রীতিশক্তির প্রেরণায় যে কর্ম্ম করা যায়, তাহাই কুশলমূল কর্ম্ম। এই প্রীতিশক্তির রূপ আছে। হৃদয়াকাশে শ্বেতপদ্ম এবং তন্মধ্যে একটি উজ্জ্বল মণি এবং ঐ মণির মধ্যে একটি ধ্বনি ইহাই প্রীতিশক্তির রূপ।

আজ আমাদের নবম বৎসরের প্রথমদিনে, শ্রীবাসন্তী দুর্গা পূজায়, মহাষ্টমী তিথিতে, শ্রীরামচন্দ্রের জন্মদিন রামনবমী তিথিতে, ঋষি কুথুমীর নির্ম্মাণকায় রহস্য সাধারণের নিকট প্রকাশ করিলাম। আমাদের এই কর্ম্ম সর্ব্বমঙ্গলার ইচ্ছায় জগতের মঙ্গলজনক হউক। আজি এই শুভদিনে

আমরা শ্রীরামচন্দ্রকে নমস্কার করি; তিনি রাবণ বধ জন্য যে সিংহবাহিনী-শক্তির প্রকট করিয়াছিলেন, তাঁহার এবং সেই দৈবীশক্তির চরণে আমরা নমস্কার করি। দুর্গ নামক অসুরকে দলন করিয়া, যিনি দুর্গা নামে আখ্যাতা, যিনি কল্পের প্রারম্ভে তমঃ অভিধেয়, মধু ও কৈটভ অসুরদ্বয়কে হত করিয়া, স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মার সৃষ্টি বিষয়ে সহায়তা করেন, সেই পরম বৈষ্ণবী শক্তিকে আমরা স্মরণ করি। তিনি আমাদিগকে তামিস্রা শক্তির আক্রমণ হইতে রক্ষা করুন।

"নমস্তে শরণ্যে শিবে সানুকম্পে
নমস্তে জগদ্ব্যাপীকে বিশ্বরূপে
নমস্তে জগদ্বন্দ্য পদারবিন্দে
নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে
* * * *
* * * *
অনাথস্য দীনস্য তৃষ্ণাতুরস্য
ভয়ার্ত্তস্য ভীতস্য বদ্ধস্য জন্তোঃ
ত্বমেকা গতির্দ্দেবি নিস্তারদাত্রি
নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে।"

যে ঋষিসংঘ দেবী দুর্গার বাহন, সেই মহাসিংহসংঘকে নমস্কার করি॥ আমরা গুরুদেব (কুথুমীসিংহকে) নমস্কার করিয়া বিদ্যা ও প্রীতিশক্তি প্রার্থনা করি।

ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্ত্তিং
দ্বন্দাতীতং গগনসদৃশং তত্ত্বমস্যাদিলক্ষম্
একং নিত্যং বিমলমচলং সর্ব্বধীসাক্ষীভূতং
ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদ্গুরুং তন্নমামি॥

আনন্দমানন্দকরং প্রসন্নং, জ্ঞানস্বরূপংনিজবোধযুক্তং
যোগীন্দ্রমীড্যং ভবরোগবৈদ্যং, শ্রীমদ্গুরুং নিত্যমহম্ নমামি॥ ওঁ হরিঃ ওঁ।

হরি শব্দের এক অর্থ সিংহ।

তোমরা সব হরি বল হরি বল হরি বল ভাই
প্রীতিশক্তি পেতে গেলে সর্ব্বত্যাগী হওয়া চাই। ওঁ

শ্রীকৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়।

শুকাষ্টকং ।

(১)

ভেদাভেদৌ সপদিগলিতৌ পুণ্যপাপে বিশীর্ণে ।
মায়ামোহৌ ক্ষয়মুপগতৌ নষ্টসন্দেহবৃত্তেঃ ॥
শব্দাতীতং ত্রিগুণরহিতং প্রাপ্য তত্ত্বাববোধং ।
নিস্ত্রৈগুণ্যে পথিবিচরতঃ কো বিধিঃ কো নিষেধঃ ॥

সহসা ঘুচেছে যাঁর ভেদাভেদ জ্ঞান ।
যাঁর চক্ষে পাপ পুণ্য সকলি সমান ॥
অবিদ্যা অজ্ঞান যাঁর হইয়াছে ক্ষয় ।
লভিয়া পরম তত্ত্ব মিটেছে সংশয় ॥
সত্ত্ব রজঃ তমোতীত বাক্য অগোচর ।
চিনেছেন যিনি, সেই পূর্ণ পরাৎপর ॥
ত্রিগুণ অতীত মার্গে করেন ভ্রমণ ।
তাঁর পক্ষে কিবা বিধি কিবা নিবারণ ॥

(২)

যদাত্মানং সকলবপুষামেকমন্তর্বহিঃস্থং ।
দৃষ্ট্বা পূর্ণং খমিব সততং সর্ব্বভাণ্ডস্থমেকং ॥
নান্যৎকার্য্যং কিমপি চ ততঃ কারণাৎ ভিন্নরূপং ।
নিস্ত্রৈগুণ্যে পথিবিচরতঃ কো বিধিঃ কো নিষেধঃ ॥

অথবা নিখিল ব্যাপী অনন্ত গগন ।
পাত্রগত হলে ভিন্ন দেখায় যেমন ॥
তেমনি এ বিশ্ব মাঝে অন্তরে বাহিরে ।
হেরি পূর্ণ পরমাত্মা সকল শরীরে ॥
কিছুই তাঁ হোতে ভিন্ন নাহি ত্রিভুবনে ।
বিচারি এরূপ যিনি আপনার মনে ॥
ত্রিগুণ অতীত মার্গে করেন ভ্রমণ ।
তাঁর পক্ষে কিবা বিধি কিবা নিবারণ ॥

(৩)

হেম্নঃ কার্য্যং হুতবহগতং হেমমেবেতি যদ্বৎ।
ক্ষীরে ক্ষীরং সমরসতয়া তোয়মেবাম্বুমধ্যে॥
এবং সর্ব্বং সমরসতয়া ত্বং পদং তৎপদার্থে।
নিস্ত্রৈগুণ্যে পথিবিচরতঃ কো বিধিঃ কো নিষেধঃ॥

যেমন সুবর্ণময় বিবিধ ভূষণ।
দ্রব হোলে একরূপ করয়ে ধারণ॥
ক্ষীরে ক্ষীরে মিশে যথা সামরসগুণে।
কিম্বা যথা মিশে নীর সলিলের সনে॥
জগত প্রপঞ্চ এই সেইরূপ জানি।
"তত্ত্বমসি" মহাবাক্য মর্ম্ম বুঝি যিনি॥
ত্রিগুণ অতীত মার্গে করেন ভ্রমণ।
তাঁর পক্ষে কিবা বিধি কিবা নিবারণ॥

(৪)

যস্মিন্ বিশ্বং সকলভুবনং সামরস্যৈকভূতং।
উর্ব্বীহ্যাপোঽনলমনিলখং জীবমেবং ক্রমেণ॥
যৎ ক্ষীরাব্ধৌ সমরসতয়া সৈন্ধবৈকত্বভূতং।
নিস্ত্রৈগুণ্যে পথিবিচরতঃ কো বিধিঃ কো নিষেধঃ॥

ক্ষিতি, বারি, বহ্নি, বায়ু, বিশাল গগন।
যাঁতে মিশে পরিশেষে জীবের জীবন॥
সপ্তলোক আদি এই নিখিল সংসার।
সামরসগুণে যাঁতে হয় একাকার॥
লবণাম্বু নিধি মাঝে সৈন্ধবের প্রায়।
অভিন্নতা হেতু যাহা অস্তিত্ব হারায়॥
হেন নিস্ত্রৈগুণ্য মার্গে যাঁহার বিহার।
বিধি কিম্বা প্রতিষেধ কিবা বল তাঁর॥

(৫)

যদ্বন্নদ্যোর্ণবে সমরসাঃ সাগরত্বং হ্যবাপ্তাঃ।
তদ্বজ্জীবা লয়পরিগতাঃ সামরস্যৈকভূতাঃ॥

ভেদাতীতং পরিলয়গতং সচ্চিদানন্দরূপং।
নিস্ত্রৈগুণ্যে পথিবিচরতঃ কো বিধিঃ কো নিষেধঃ॥
ভিন্ন ভিন্ন প্রবাহিণী প্রবেশি সাগরে।
সামরসগুণে যথা এক রূপ ধরে॥
তেমতি বিবিধ জীব দেহ অবসানে।
মিলিত হইয়া সবে অভিন্নতা গুণে॥
যথায় অদ্বৈত পূর্ণ পরম আত্মায়।
অভিন্ন সচ্চিদানন্দস্বরূপে মিশায়॥
সেই নিস্ত্রৈগুণ্য পথে বিহার যাঁহার।
বিধি কিম্বা প্রতিষেধ বল কি তাঁহার॥

(ক্রমশঃ)

শ্রীগোবিন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

মহিম্ন স্তব।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

ধ্রুবং কশ্চিৎ সর্ব্বং সকলমপরস্ত্বধ্রুবমিদং,
পরো ধ্রৌব্যাধ্রৌব্যে জগতি গদতি ব্যস্তবিষয়ে।
সমস্তেঽপ্যেতস্মিন্ পুরমথন ! তৈর্ব্বিস্মিত ইব,
স্তুবন্ জিহ্রেমি ত্বাং ন খলু ননু ধৃষ্টা মুখরতা॥৯॥

নমু কথং বিষয় মৃগতৃষ্ণেতি বিষয়স্যাধ্রুবত্বং কথয়সীত্যাশঙ্ক্যাহ। ধ্রুবমিতি। কশ্চিদৃষিঃ গৌতমাদিঃ জগতি সর্ব্বং ক্ষিত্যপ্তেজোমরুদ্ব্যোমাত্মাকং নিখিলং ইদং প্রত্যক্ষং বস্তু ধ্রুবং নিত্যং গদতি বদতি ক্ষিত্যপ্তেজোমরুদ্ব্যোম্নাং নিত্যত্বন্তু তত্তৎপরমাণূনাং নিত্যত্বাৎ তেষাঞ্চ প্রকারভেদেনাবস্থানান্নামতো ভেদঃ, নচ নাম মাত্র বিভেদাৎ পরমার্থতো ভেদ ইতি বোদ্ধব্যং, অপরস্তু কপিলাদি ব্যাসাদিশ্চার্ব্বাকাদিশ্চ সকলং সর্ব্বমিদং অধ্রুবং অনিত্যং গদতীত্যমুৎকর্ষঃ। পরঃ কণাদাদিঃ ধ্রৌব্যঞ্চ অধ্রৌব্যঞ্চেতি তে তথোক্তে ব্যস্তঃ বিভিন্নঃ বিষয়ঃ

আশ্রয়ঃ যয়োস্তে তথোক্তে গদতি। কস্যচিদ্বিষয়স্য পরমাণুলক্ষণস্য পৃথিব্যাদিকস্য ধ্রৌব্যং কস্যচিদ্বা দ্ব্যণুকাদিলক্ষণস্যাবয়ববতঃ অধ্রৌব্যং কথয়তীত্যর্থঃ। হে পুরমথন! এতস্মিন্নপি প্রত্যক্ষীভূতেঽপি অস্মিন্ সমস্তে বস্তুনি তৈঃ তাদৃশৈঃ জ্ঞাননিধীনামপি পরস্পরবিরোধিভির্বচনৈরিত্যর্থঃ বিস্মিত ইব স্থিতোঽহং ত্বাং ইন্দ্রিয়াস্তগোচরমজ্ঞেয়ং ত্বামিত্যর্থঃ স্তুবন্ প্রশংসনজিহ্রেমি লজ্জে। প্রত্যক্ষ-বিষয়েঽপি জ্ঞাননিধীনামপি পরস্পর বিরোধদর্শনাৎ কিংবা সত্যং কিংবাঽসত্যমিতি নির্ণেতুমক্ষমঃ সন্নহম্ মুগ্ধইব সঞ্জাতঃ। শ্রুতাবপি নো "সদসত্তৎ পরং যৎ মিত্যাদিনা ত্বমেব নসৎ নবাঽসৎ ইত্যুক্তং ইতি তত্রাপি বিরোধদর্শনাৎ সর্ব্বথা মূঢ়োঽহং সঞ্জাতঃ এবমজ্ঞানঃ কথমহং অজ্ঞেয়ং ত্বাং স্তৌমীতি লজ্জে ইতি ভাবঃ। অথ লজ্জসে চেদ্বিরম এতস্মাস্তুতেরিত্যাহ ন খল্বিতি। নম্বু খলু মুখরতা বাকচাপল্যং ন দৃষ্টা ন প্রগল্‌ভা ন দমনীয়েত্যর্থঃ। অবশোঽহংত্বদ্গুণৈঃ প্রণোদিত এতচ্ছাপল্যং করোমীত্যজ্ঞস্যাবশ্যবশো মে দোষঃ ক্ষন্তব্য এবেতিভাবঃ। নম্বু অত্র অনুনয় সূচকামন্ত্রণে খলু চানুনয়ে। প্রশ্নাবধারণা মুজ্ঞঽননয়া মন্ত্রণে নম্বু ইতি নিষেধ বাক্যালঙ্কার জিজ্ঞাসানুনয়ে খলু ইতিচামরঃ।

[পূর্ব্বশ্লোকে বিষয়মৃগতৃষ্ণা এই পদ প্রয়োগ করায় বিষয়ের অবাস্তবত্ব বলা হইয়াছে। এক্ষণে প্রত্যক্ষীভূত এই বিষয় সকলকে অবাস্তবই বা কেন বলি এই আশঙ্কা মনে হওয়ায় তদ্বিষয়গণের সহিত ঈশ্বরের স্তব করিতেছেন।]

কেহ বলেন জগতে পৃথিব্যাদি সকলই নিত্য, কেহ বলেন সকলই অনিত্য। আবার কেহ বা বলেন ইহারা নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব ভেদে দ্বিবিধ। হে ভবনাশন! এই সমস্ত প্রত্যক্ষ স্থূল বিষয়েও মুনিগণের এইরূপ বিরুদ্ধ মত দেখিয়া বিস্মিত স্তব্ধ ও বিমূঢ় হইয়া আমি তোমার স্তব করিতে লজ্জিত হইতেছি। কিন্তু হায় কেমনই মনের গতি, স্তব না করিয়াও ক্ষান্ত থাকিতে পারিতেছি না। প্রভু আমার এ বাক্ চাপল্য ক্ষমা কর। ৯।

তবৈশ্বর্য্যং যত্নাদ্ যদুপরি বিরিঞ্চির্হরিরধঃ
পরিচ্ছেত্তুং যাতাবনলমনল স্কন্ধবপুষঃ।
ততোভক্তিশ্রদ্ধাভর গুরুগৃণদ্ভ্যাং গিরিশ যৎ
স্বয়ং তস্থেতাভ্যাংতব কিমনুবৃত্তি র্নফলতি॥ ১০।

অথাজ্ঞেয়ত্বস্য তব স্তুতাবশক্তস্য মে বাকচাপল্যং বিফলমেবেতি চেৎ,

ন ; কর্ম্মহি ফলেন ফলতি ইতি ন্যায়াৎ নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্ দুর্গতিং তাত গচ্ছতীতি, নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো নবিদ্যতে, স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াদিতি চ ভগবদুক্তেরশক্তাবপি যত্নমাত্রেণৈব ফলমিতি পরোক্তামুপনিষৎকথামবলম্ব্যাহ। তবেতি। কথা চাত্র কদাচিদীশ্বরাভি-মানিনাং পরস্পরবিবাদমানানাং ব্রহ্মাবিষ্ণুরুদ্রাণামভিমানহরণার্থং সহসা মহাভৈরব ওমিত্যাকারঃ শব্দো জগদাপূরয়ন্ প্রাদুর্বভূব। অথতে সবিস্ময়াঃ কুতোঽয়ং মহাঞ্ছব্দ ইতি নির্ণেতুম্ শব্দানুসারেণ বিধিরূর্দ্ধং হরিরধো হরশ্চ মধ্যে পরিভ্রমন্তঃ পরিশ্রান্তাঃ কিমপি নিশ্চেতুমসমর্থাঃ প্রত্যাগতাঃ বিস্মিতাশ্চ পরস্পরং অবলোকয়ন্তঃ পরমং বিষাদং জগ্মুঃ। অথ শতসহস্রার্চ্চির্জ্জ্বলদ্বহ্নিরূপেণ ব্রহ্মতেষামাবির্বভূব। বোধয়ামাসচতাংস্তদেবৈকং সদ্ যদোমিতি শব্দঃ সূচয়তি তচ্চাহমেকমেবসৃষ্টিস্থিতিলয়কারণং ব্রহ্ম, যদুৎপন্না এব যূয়ং মচ্ছক্ত্যাসৃষ্ট্যাদিষু প্রবর্ত্তধ্বে, নাত্র বঃ কশ্চিদপি কর্ত্তৃত্বাবসর ইতি। ওঙ্কারার্থ নির্ণয়েস্মৃতি, তন্ত্রাদিরপি অকারো বিষ্ণুরুদ্দিষ্ট উকারস্তু মহেশ্বর, মকারেণোচ্যতে ব্রহ্মা প্রণবেণ ত্রয়োমতা ইতি। গোরক্ষসংহিতায়ামপি, ইচ্ছাক্রিয়া তথা জ্ঞানং গৌরীব্রাহ্মী চ বৈষ্ণবী। ত্রিধাশক্তিঃস্থিতা লোকে তৎপরা শক্তিরোমিতি। তচ্চ ওঁমিতি শব্দে মূলাপ্রকৃতি গুণত্রয়সাম্যরূপা গুণত্রয়স্য অপ্রকাশাবস্থাবা। তদেব তুরীয়ং ব্রহ্ম প্রণবপ্রতিপাদ্যমিতি লক্ষ্যতে তস্যৈব সৃষ্টিস্থিতিবিলয়কর্ত্তৃকারণত্বাৎ বিধিহরিহরাণাস্তু তুরীয়ব্রহ্মণোঽংশত্বং তুরীয় ব্রহ্মৈব তমোরজঃ সত্ত্বরূপাভিস্তি সৃভিগৌরীব্রাহ্মীবৈষ্ণবীত্যপরাক্ষভিরিচ্ছাক্রিয়াজ্ঞানময়ীভিস্তিসৃভিঃ শক্তিভি বিভক্তং সৎ বিশ্বমাবৃত্য সর্ব্ব ভূতেষু ওতঃপ্রোতং বর্ত্ততে। যদ্যপি সর্ব্বাণ্যেব ভূতানি তচ্ছক্তিবিজৃম্ভিতানি তথাপিতেষু যৎ যৎ বিভূতিমচ্ছ্রীমদূর্জ্জিতং বা দৃশ্যতে তত্তদীয়াংশত্রয়েতি তস্যাংশিকজ্ঞানেন সাধারণৈঃ পরমেশ্বরঃ পূজ্যতে ; তচ্চ ভগবদ্গীতায়াং দশমাধ্যায়ে দ্রষ্টব্যং। অতএব ব্রহ্মাংশ বিশেষেষু ব্রহ্মণোদর্শনাত্ত স্যাংশিক জ্ঞানং পূজা চ। পূর্ণব্রহ্মণঃ পূর্ণদর্শনাসম্ভবাৎ ব্রহ্মণোঽংশাদি কথনং শব্দাভাবাদপরিহার্য্যত্বাৎ উপনিষদাদৌ ত্রিরূপমূলস্য ত্রিরূপাদন্ততমস্য তুরীয়স্য ব্রহ্মণঃ ত্রিরূপাভিন্নত্বকল্পনয়োক্তিঃ ; অত্রতু তমঃ প্রকৃতিকস্য তৃতীয়স্য হররূপস্য তুরীয় ব্রহ্মণোঽ ভেদকল্পনয়োক্তিরিতি ভেদঃ। তেন হি শঙ্করস্য ওঙ্কার প্রতিপাদ্য ব্রহ্মনিরূপণে গতির্ণোক্তা। কুমার সম্ভবেঽপি "সহি দেবঃ

পরং জ্যোতিস্তমঃপারে ব্যবস্থিতং। পরিচ্ছিন্ন প্রভাবর্দ্ধির্নময়া নচ বিষ্ণুণা॥”
ইতি ব্রহ্মাবিষ্ণুদ্বিতীয়াতিরিক্তস্য তৃতীয়স্য তমঃপ্রধানস্য হরস্যতমোগুণাতি-
রিক্তস্য তৃতীয়স্য তমঃপ্রধানস্য হরস্য তমোগুণাতীত্বোপলক্ষণেন নিস্ত্রৈগুণ্য
সূচনাৎ জ্যোতিঃ স্বরূপস্থ কথনাচ্চ পরমাত্মনোঽভিন্নত্বং সূচিতমিতি ; তত্রাপি
বিষ্ণুব্রহ্মণোরেব হরসমীপগমনমুক্তম্। তমাআসীত্তমসা গূঢ়মগ্রে প্রকেতমিতি
ব্রহ্ম, বা ইদমগ্র আসীদেক দেব যোবেত্যাদিষু চ শ্রুতিষু অজ্ঞেয়তত্বস্য সর্ব্বকারণ
কারণস্য অনাদ্যনন্তরূপস্য ব্রহ্মণঃস্তমোভূতত্ব সূচনাৎ, তথা মন্বাদাবপি আসী
দিদং তমোভূত অপ্রজ্ঞাতম্ মলক্ষণমিত্যাদি বচনেন তস্য তমোভূতত্ব দর্শনাৎ
তমঃপ্রধানস্য ত্রিরূপাদেকতমস্যৈবেশ্বরস্য তুরীয়ব্রহ্মণোঽভেদগ্রহণমিতি
মন্যামহে। বস্তুতস্ত বিধিহরিহরাণামপি যত্রলয় স্তস্যৈব সর্ব্ব কারণকারণত্বং
তমোভূতত্বঞ্চ। সূত্রোক্ত তমস্ত্বঞ্চ ন উদ্রিক্ততমস্ত্বং নবাজ্যোতিরণ্যত্বং কিন্তু
জ্ঞানবিষয়ান্যত্বং কিমপ্যজ্ঞেয়তত্বং তদিত্যর্থঃ। তথা চ শ্রুত্যান্তরং “না সদাসী
ন্নোসদাসীত্তদানীম” অস্যৈবার্থো বিষ্ণু পুরাণবচনে স্পষ্টীকৃতঃ তথাহি “নাহো
নরাত্রি র্ণ নভোনং ভূমির্নাসীত্তমোজ্যোতিবভূন্নচান্যৎ। শ্রোত্রাদিবুদ্ধ্যানুপলভ্য-
মেকং প্রাধানিকং ব্রহ্মপুমাংস্তদাসীৎ॥” প্রধানমেব প্রাধানিকং তচ্চ ব্রহ্ম তচ্চ
পুমানিতিশব্দত্রয় প্রতিপাদ্যং ত্রিগুণমূলত্বাদিতিভাবঃ। অনেন কবিনাপি
কেবলাত্মনস্তস্যৈব নিস্ত্রৈগুণ্যস্য শিবস্য বিধিহরিহরেভ্যঃ প্রাকৃতনত্বম মূল
কত্বঞ্চ “বহুল রজসে বিশ্বোৎপত্তাবিত্যাদিকে ত্রিংশত্তমেশ্লোকে স্পষ্টমেবোক্তম্,
মহাকবি কালিদাসেনাপি স্থলান্তরে তিসৃভিস্ত্বমবস্থাভি মহিমানমুদীরয়ন্।
প্রলয়স্থিতিসর্গানামেকঃ কারণতাং গতঃ॥ ইত্যত্র অবস্থাত্রয়স্য সাম্যাবস্থ
ত্রিগুণস্যৈবাশ্রয়রূপস্যৈকস্যৈব শিবপদবাচ্যত্বমুক্তম্। তবেতি হে গিরিশ
গৃণাত্যাত্মানমিতি গিরিঃ শব্দঃ। গৃধাতোঃ কিঃ। সোঽস্ত্যস্য আশ্রিতত্বরূপে-
ণেতি শঃপ্রত্যয়ঃ তৎসংবুদ্ধৌ। যদ্বা “সদার্দ্ধবাহুর্যোধীরো মুক্তকেশো দিগম্বরঃ।
সর্ব্বত্র সমভাবেন ভাবয়েদ্ যো নরোত্তমঃ। ইষ্টদেবীধিয়া নারীংস গিরিঃ
পরিকীর্ত্তিত ইত্যুক্ত লক্ষণানাং গির্য্যুপাধীনাং শং মঙ্গলং যস্মাৎ স গিরিশঃ তৎ
সংবোধনে। পক্ষান্তরেতু ছাদিতার্থে গিরৌ কৈলাসাখ্যেশেতে বর্ত্ততে ইতি
তৎ সংবোধনে। হে মহাদেব অনলস্কন্ধবপুষঃ অগ্নিস্তোমমূর্ত্তেঃ [স্কন্ধঃ কাণ্ডে
নৃপে বূহে সমূহেঽংসে তথা বুধি। পগি গ্রন্থ পরিচ্ছেদে ছন্দোভেদ বিভাগয়োঃ॥

ইতি কোষঃ] তব ঐশ্বর্য্য মহিমানং যত্নাৎ যত্নমালম্ব্য (যবর্থে পঞ্চমী) পরিচ্ছেত্তুং পরিমাতুং এতাবদিতী যত্তয়া নির্ণেতুমিত্যর্থঃ ; বিরিঞ্চিঃ বিরেচতি বিসৃজতি বিশ্বমিতি তথোক্তঃ ব্রহ্মা উপরি, হরিশ্চ হরতি বিভর্ত্তি বিশ্বমিতি তথোক্তঃ বিষ্ণুঃ যদ্ অধো যাতৌ, ততঃ তদনন্তরং ত্বদৈশ্বর্য্যপরিচ্ছেদেগমনরূপ যত্ন বৈফল্য দর্শনানন্তরমিত্যর্থঃ। ভক্তিশ্রদ্ধয়োর্ভরেণ আতিশয্যেন গুরু যথা স্যাত্তথা অনলং অগ্নিরূপেনাবিভূ্র্তং ত্বামিত্যর্থঃ গৃনদ্ভ্যাং স্তবদ্ভ্যাং তাভ্যাং ব্রহ্মহরিভ্যাং ব্রহ্মহরীমনুগ্রহীতুমিত্যর্থঃ ক্রিয়ার্থোপদস্যেত্যাদিনা চতুর্থী, যৎস্বয়ং আত্মনোতস্থে চকাশে স্বয়েতি শেষঃ তয়োর্দ্দশনপথবর্ত্তিনা বভুবে ইত্যর্থঃ। যদিতি পদং পূর্ব্বার্দ্ধেযাতাবিত্যস্যা ক্রিয়ায়াঃ পরার্দ্ধে চ যৎ পদং তস্থে ইতি ক্রিয়ায়াঃ বিশেষণং। সা তব অনুবৃত্তিঃত্বৎকর্ম্মকমনুগমনং অনুসন্ধিৎসেতি যাবৎ কিং নফলতি ফলং কিং ন প্রসূতে, অপিতু প্রসূতএব। তব যত্তাভ্যামাত্মপ্রকাশস্তদেবতয়োবনুবৃত্তিফলং নান্যদিতিভাবঃ। তেনৈবতয়োঃ স্রষ্টৃত্বং পালকত্বঞ্চেতি তাৎপর্য্যার্থঃ। আদৌযৎতয়োরনুমানং ততশ্চ যত্তবোপস্থানং তেনৈবানুমীয়তে তদেবানুযানং তৎপূর্ব্ববর্ত্তিকারণং ত্বচ্চোপস্থানং পরবর্ত্তি ফলমিতি অতএব তদনু যানমেব তবোপস্থানরূপং ফলংপ্রসূতে ইত্যেষোঽর্থঃ। যত্তদোঃ সম্বন্ধেনৈবস্ফুট অবগম্যতে অত্রাভাসমান সাধ্য সাধনয়ো জ্ঞানাদনুমানালঙ্কারঃ। যদুক্তং সাধ্য সাধনয়োর্জ্ঞানমনুমানং নিগদ্যতে। ১০।

[যদি এমন আশঙ্কা করা যায় যে তোমার স্তব করার চেষ্টা কেবল বাক্‌চাপল্য প্রকাশ মাত্র, ইহা অসাধ্য হওয়ায় ঈদৃশ চেষ্টায় কোন ফল নাই; তাহার উত্তর স্বরূপ এই কবিতা বলিতেছেন।]

হে অনন্তাগ্নিরূপী * সর্ব্বব্যাপী মহাদেব তোমার মহিমার অন্ত পাইতে যত্ন পূর্ব্বক ব্রহ্মা যে উপরিভাগে ও বিষ্ণু যে অধোভাগে প্রধাবিত হইয়া ছিলেন ও তৎপরে ব্যর্থ প্রয়াস হইয়া ভক্তি ভরে তোমার স্তব আরম্ভ করিলে তুমি যে স্বয়ং তাহাদের নিকট আবিভূ্র্ত হইলে, সে কি তাহাদের সেই অনুসন্ধান চেষ্টায় ফল নয়? ১০

---

* অনন্তাগ্নিরূপী। এস্থলে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও রুদ্র যে পরমেশ্বর নন্, তিনি যে তাঁহাদের মূল অদ্বিতীয় অনির্ব্বচনীয় এক পদার্থ ইহাই

ব্রহ্মতত্ত্ব ও সংসার মুক্তি।

বর্ত্তমান সময়ে জগতে ব্রহ্মতত্ত্ব ও সংসার মুক্তি নিরূপণ প্রয়োজন এবং সংসার মুক্তির বিঘ্নস্বরূপ পরস্পর অনৈক্য বিবিধ ধর্ম্মমত দৃষ্ট হওয়াতে সর্ব্ববাদী সম্মত বিশুদ্ধ ব্রহ্মতত্ত্ব ও সংসার মুক্তি নিরূপিত হইতেছে।

ঈশ্বর বা ব্রহ্মস্বরূপ গোচর হইলেই জীবের মুক্তাবস্থা প্রাপ্তি বা সংসার মুক্তি হয়; অথবা ঈশ্বরস্বরূপ জানাই মুক্তির উদ্দেশ্য। যাহার তত্ত্ব না জানা যায় তাহার স্বরূপ উদ্দেশ হইতে পারে না। ঘটনা হইতে ঘটনাকারীর উদ্দেশ করা

প্রতিপাদনের নিমিত্ত শ্রুতিতে একটী গল্প আছে। এই কথায় ব্রহ্ম অনন্তঅগ্নিরূপে আবির্ভূত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে এই হেতু এই সংবোধন।

গল্প এই! ব্রহ্মা বিষ্ণু ও রুদ্র ইঁহারা প্রত্যেকেই আপনাকে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া বিবাদে প্রবৃত্ত হইলে সহসা ওম্ ওম্ ইত্যাকার একটী মহাভীষণ অত্যাশ্চার্য্য শব্দ জগৎ ব্যাপিয়া উত্থিত হইতে লাগিল। তচ্ছ্রবণে তিন জনেই বিস্মিত হইয়া ইহা কি, কোথা হইতে আসিতেছে ইহা জানিবার নিমিত্ত ব্রহ্মা উর্দ্ধে হরি নিম্নেও রুদ্র মধ্যোদেশে নিরন্তর ভ্রমন ও যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও ইহার আদি অন্ত কিছুই পাইলেন না। তখন তিন জনেই শ্রান্ত ক্লান্ত, বিস্মিত ও নিরস্ত হইয়া পরস্পর মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন। এমন সময় ব্রহ্ম হঠাৎ তাঁহাদিগের সম্মুখে অগ্নিস্তোমরূপে আবির্ভূত হইয়া কহিলেন তোমরা বৃথা কেন বিবাদ ও বিষাদ করিতেছ? ঐ ওম্ ওম্ শব্দের অন্ত নাই; উহা যাঁহাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছে তিনিই সৎ ও সৃষ্টি স্থিতি লয়ের একমাত্র অদ্বিতীয় কারণ পরব্রহ্ম; সেই ব্রহ্মই আমি। তোমারা আমা হইতে উৎপন্ন হইয়া আমারই শক্তিতে সৃষ্টি স্থিতি লয় করিতেছ; তোমাদের স্বতন্ত্র কোন কর্ত্তৃত্ব নাই। এ দিকে ওঁ এই একমাত্র শব্দ স্বসম্পূর্ণ হইলেও ইহাতেই অ উ ম এই পৃথক্ তিনবর্ণের স্থিতি যেমন তৎলক্ষণীয় সেইরূপ একমাত্র ব্রহ্মে ত্রিশক্তিরূপ ব্রহ্মা বিষ্ণু ও রুদ্র লক্ষণীয় ইহাই কথিত হয়। ওম্ যেমন বিভিন্ন হইলে অ উ ম হয় তেমনই ব্রহ্ম ভিন্ন হইয়া ব্রহ্মা বিষ্ণু ও রুদ্র হন। ফলতঃ একই ব্রহ্ম তিন প্রকারে আবির্ভূত

যায়; কার্য্য বিচার দ্বারা কৃতীর মহিমাতত্ত্ব নির্ণয় হইতে পারে। ঈশ্বরের কার্য্যরূপ সমস্ত বিশ্ব সংসার। অতএব বিশ্বরূপ সৃষ্টি তত্ত্ব সম্যক্ জ্ঞাত হইতে পারিলে ঈশ্বর বা ব্রহ্মতত্ত্ব জানা যাইতে পারে বলিয়া মুক্তি সাধনার্থ সৃষ্টিলীলাতত্ত্ব সম্যক্ জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক হইতেছে।

বিশ্ব সংসারের ঘটনাবলীকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। এক লৌকিক যাহা বিশ্বসংসারস্থ জীব দ্বারা সাধিত হয়; যেমন ঘট পট বিবিধ যন্ত্র কৌশলাদি। দ্বিতীয় ঐশ্বরিক যাহা জীব দ্বারা সিদ্ধ হয় না; যেমন জীব দেহের কার্য্যাদি, গ্রহ নক্ষত্রের গতিবিধি ইত্যাদি। পরন্তু এক সময়ে যাহা লৌকিক বলিয়া গণ্য হয়, অন্য সময়ে সময়ের পরিবর্ত্তনে তাহাই ঐশ্বরিক অলৌকিক বলিয়া খ্যাত হয়। যেমন সত্যাদি যুগের ঋষ্যাদিগণের স্বর্গাদি দেবলোকে গতিবিধি

হন। সৃষ্টিকার্য্যে তাঁহাকে ব্রহ্মা, পালন কার্য্যে বিষ্ণু ও সংহার কার্য্যে রুদ্র বলিয়া থাকে। যাহাকে কার্য্য বলা যাইতেছে তাহাই তাঁহার ভিন্ন ভিন্ন রূপের আবির্ভাব। "অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম স্বভাবোঽধ্যাত্ম উচ্যতে।

ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্ম্মসংজ্ঞিতঃ॥ গীতা।

যাহা সর্ব্বদা সমভাব, যাহার ক্ষতি বৃদ্ধি বিকাশ নাই, সেই নিত্যধাম ব্রহ্ম, অনন্ত অপরিমেয় যে আত্মভাব তাহাই তাঁহার স্বভাব বা শক্তি। আর হইয়াছে হইতেছে ও হইবে ইত্যাকার অর্থাৎ ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানরূপে যে তাহার আবির্ভাব তাহাই তাঁহার কর্ম্ম বলিয়া কথিত হয়।

আমি ঈশ্বর হইতে অভিন্ন ও ঈশ্বর সকল কার্য্যের কারণ অতএব আমার অস্তিত্ব বা কারণত্ব নাই এমন মনে করিতে হইবে না। ঈশ্বর হইতে অভিন্ন হইলেও আমরা তদংশরূপে ভিন্ন ও আংশিক কার্য্যে আমার উপযোগিতা আছে। সেই উপযোগিতাই আমার কর্ত্তৃত্ব।

ঈশ্বর এই কর্ত্তৃত্বের মূল বলিয়া তিনি আমার পরম সহায়। আমার চেষ্টা হইলেই আমি সে সাহায্য পাইব। কিন্তু আমার কার্য্য যেন ঈশ্বরের কার্য্যের অনুগামী হয়, ইহা দেখা কর্ত্তব্য। ঈশ্বরের কার্য্য ও নিজের কার্য্য অভিন্ন ভাবিয়া কার্য্যকরিতে হইবে। যেন নিজের কার্য্যকে স্বতন্ত্র ভাবিয়া নিজ ফল ভোগে ইচ্ছা না হয়, বা স্বকীয় ফলভোগ হইবেনা দেখিয়া যেন কার্য্যে অপ্রবৃত্তি না হয়। কেননা সে অংশে তোমার কর্ত্তৃত্ব আছে।

ইত্যাদি ঘটনা বর্ত্তমান কলিতে অলৌকিক বলিয়া বোধ হইতেছে। আবার এক সময়ে যাহা অলৌকিক বলিয়া স্বীকার করা যায় অন্ত সময়ে তাহাই লৌকিক বলিয়া গণ্য হয়। যেমন বর্ত্তমান সময়ের তারবিহীন বার্ত্তাবহ যন্ত্র, শ্বেতবর্ণ পুষ্পবৃক্ষে রক্তবর্ণ পুষ্পোৎপাদন ইত্যাদি।

এই বিচার দ্বারা জানা যাইতেছে জীবের ক্ষমতার শেষ সীমা নির্দ্দেশ হয় নাই, জীব এখনও আপন উন্নতির চরম বা শেষ সীমায় পৌঁছিতে পারে নাই। এই প্রকার লৌকিক ও ঐশ্বরিক ঘটনার সীমা নির্দ্দেশ অসম্ভব বোধ হইলেও একটা সীমা নির্দ্দেশ হইতে পারে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যাহা বিশ্ব সংসারস্থ কোন না কোন জীব দ্বারা সাধিত হয়, তাহাকে লৌকিক এবং সংসারস্থ কোন জীবদ্বারা যাহা সিদ্ধ হয় না তাহাকে অলৌকিক বা ঐশ্বরিক কার্য্য কহে। জীবের ক্ষমতা নিশ্চিত বা অনিশ্চিত থাকুক একথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে যে সময়ে বিশ্বসংসারস্থ কোন জীবই যাহা জানে না ও যে ঘটনা সংঘটন করিতে পারে না, তৎকালে তদ্রূপ ঘটনা দৃষ্ট হইলে তাহাকে অলৌকিক বা ঐশ্বরিক বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। সাক্ষ্য ব্যতীত লোকের অদৃশ্য ঘটনার উল্লেখ করা অযৌক্তিক বিষয়ে লোক প্রকাশ্য ঘটনা দ্বারা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। যথা নায়েগ্রা জল প্রপাতের নিকটস্থ রেল কর্ম্মচারীগণের মৃত এঞ্জিন চালকগণ দ্বারা শূণ্য মার্গে এঞ্জিন বা রেল গাড়ী চালনা দর্শন। ঐরূপ ঘটনা বর্ত্তমান জগজ্জীবের কাহারও সাধ্যায়ত্ব না থাকাতে বা ঐ ঘটনা কোন জগজ্জীবের দ্বারা কৃত প্রমাণ না হওয়াতে ঐ ঘটনা অলৌকিক বা ঐশ্বরিক বলিয়া স্বীকার করিতে হয়।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে জগজ্জীবের চরম অবস্থা কি, জীবের ক্ষমতার ব্যাপ্তি কত দূর, জগজ্জীব তাহা এখনও ঠিক নির্দ্দেশ করিতে বা বুঝিতে পারে নাই। এখনও জীবের চরম উন্নতি হয় নাই। কেহ যদি সৃষ্টির মূলদেশে গতি করিতে পারে, তবে যে তাহার পূর্ণ জ্ঞান বিজ্ঞান লাভ হইতে পারে এ কথা বলাই বাহুল্য। এরূপ হইলেই জীবের পূর্ণ বিকাশ বা চরম উন্নতি স্বীকার করা যায়। এরূপ ঘটনা হইলে জীবের মুক্তি হইতে পারে। জীবের পূর্ণ বিকাশ হইল না, অথচ তাহার মুক্তাবস্থা স্বীকার করিতে হইবে, এ কথা বাতুলের উক্তি। বাতুল ভিন্ন এরূপ কথা জ্ঞানীজনের গ্রাহ্য হইতে পারে না। ঈশ্বরস্বরূপের

সহিত জীবস্বরূপের সাক্ষাৎ মিলনই মুক্তি শব্দের অর্থ। বিশ্বস্রষ্টা ঈশ্বর নিয়তই বিশ্বমূলে মূলাধার থাকিয়া স্বীয় নিত্য আনন্দস্বরূপে বিরাজ করেন। সৃষ্টি লীলাস্থলে সৃষ্টি মধ্যে কেহই তাহার স্বরূপ নির্দ্দেশ বা গোচর করিতে পারে না। অতএব সংসার মুক্তি বা ঈশ্বর প্রাপ্তির জন্য জীবকে সৃষ্টিলীলা জগতের মূলদেশে যাইতে হয়। তথায় যোগাবস্থা প্রাপ্ত হইলে ঈশ্বর সহ মিলন হইতে পারে। এজন্য সৃষ্টিরূপ সংসারলীলা তত্ত্ব সর্ব্বতোভাবে বিচার ও পর্য্যবেক্ষণ আবশ্যক হইতেছে।

জীব সর্ব্বক্ষণ একভাবে এক অবস্থায় থাকিতে পারে না। জীবের ঐ বিভিন্নাবস্থাকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়; যথা—নিদ্রা স্বপ্ন ও জাগ্রত। যে অবস্থায় জীব আত্মবোধের সহিত বিশ্বতত্ত্ব বিস্মৃত হয়, তাহাকে নিদ্রাবস্থা কহে। যে অবস্থায় অস্ফুট অব্যক্ত ক্ষণিক ভাবে বিশ্বকাণ্ড বোধ করে তাহাকে স্বপ্নাবস্থা কহে। এই অবস্থা নিদ্রা ও জাগ্রতের মধ্যবর্ত্তী এবং জাগ্রতের পূর্ব্ব লক্ষণ। গাঢ় নিদ্রার হ্রাস হইলে এই স্বপ্নাবস্থা ঘটে। যে অবস্থায় জীব আত্মবোধের সহিত (সজ্ঞানে) সমস্ত বিশ্বকার্য্য ও বিশ্বঘটনাবলী সবিচারে সম্যক্‌রূপে প্রত্যক্ষ করিতে পারে তাহাকে জাগ্রতাবস্থা কহে।

জীবদেহ স্থূল ও সূক্ষ্ম ভেদে দুইরূপ হয়। স্থূল দেহ ত্যাগ হইলে জীব সূক্ষ্ম দেহাশ্রয় করে। নির্দ্দিষ্ট সময় ঐ সূক্ষ্ম দেহ মাত্রে থাকিয়া কর্ম্মানুরূপে পুনঃ স্থূল দেহাশ্রয় করে। ইহাই জীবের দেহ ত্যাগ বা মৃত্যু এবং দেহান্তর গ্রহণ বা পুনর্জ্জন্ম। ঐ সূক্ষ্ম দেহকেই অব্যক্ত ও লিঙ্গ দেহও কহিয়া থাকে। যেরূপ জীব দেহের স্থূল ও সূক্ষ্ম ভেদে দুইরূপ হয়, সেইরূপ যাবতীয় স্থাবর জঙ্গমবিশিষ্ট সমস্ত স্থূল জগতেরও সূক্ষ্ম বা অব্যক্তরূপ আছে। ভূতযোনি বা ভূতাবেশ, দৈব ঘটনা, প্রভৃতি দ্বারা সূক্ষ্ম বা অব্যক্ত জগতের অস্তিত্ব প্রমাণ হয়।

স্থূলের পূর্ব্বাবস্থা সূক্ষ্ম; সূক্ষ্ম হইতে ক্রমশঃ স্থূল প্রকাশ পায়। স্থূল নষ্ট হইলে সূক্ষ্ম থাকিতে পারে, কিন্তু সূক্ষ্ম (বীজ) নষ্ট হইলে স্থূল বিনাশের পর আর উৎপত্তি হইতে পারে না। সমস্ত স্থূল জগৎ একেবারে নষ্ট হইয়া সূক্ষ্মে প্রবিষ্ট হইলে শাস্ত্রে তাহাকে মহা প্রলয় বলে। বাস্তবিক এই মহা প্রলয় শব্দে জগৎ পদার্থের একেবারে বিনাশ বুঝায় না; ব্যক্ত অব্যক্ত হয় মাত্র।

কথিত মহাপ্রলয়ে বীজরূপ ঐ অব্যক্ত বা সূক্ষ্মজগৎ থাকে বলিয়া (নিশ্চয়ই পরিবর্ত্তিত ভাবে) পুনরায় স্থূল জগৎ ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হয়। এইরূপেই যুগ, মন্বন্তর, কল্পাদি হইয়া আসিতেছে। এই তত্ত্ব হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে সূক্ষ্ম বা অব্যক্ত জগতই মূল জগৎ।

এই অব্যক্ত মূল জগতে সৃষ্টি লীলার সমস্তই প্রকটরূপে বর্ত্তমান। বীজরূপ এই অব্যক্ত জগৎ, গোলক বা ব্রজ নামে কথিত আছে। উহাই অবস্থা ভেদে স্বর্গ, কৈলাশাদি নামে কথিত হয়। ঐ সূক্ষ্ম জগতে কৃষ্ণাদি দেব, গন্ধর্ব্ব, নর-রাক্ষস, যোগী, ঋষি সকলকেই দেখিতে পাওয়া যায়।

এই তত্ত্ব হইতে জানা যাইতেছে এবং স্বীকার করিতে হয় যে, যে অবস্থায় অব্যক্ত মূল জগৎতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইতে পারা যায়, তাহাকেই জাগ্রতাবস্থা বলা যায়। মূল জগৎতত্ত্ব গোচর করিতে না পারায় স্বীকার করিতে হয়, বিশ্ব সংসারস্থ সকলেই নিদ্রিত আছে। পূর্ব্বোক্ত মৃত ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক এঞ্জিন চালনাদি ঘটনা যে অন্ত জগতে, বা উহা যে অব্যক্ত মূল জগতের ঘটনা তাহা সকলেরই স্বীকার্য্য। ঐ মূল জাগতিক ঘটনা ক্ষণিক ও অসম্পূর্ণরূপে গোচর হওয়াতে ঐ ঘটনাদৃষ্ট অবস্থাকে স্বপ্নাবস্থা স্বীকার করিতে হয়। স্বপ্নাবস্থা নিদ্রাভঙ্গের পূর্ব্ব লক্ষণ। অতএব ইহা দ্বারা বুঝা যাইতেছে জগজ্জীবের জাগ্রতাবস্থা নিকটবর্ত্তী হইয়াছে; জীবের নিদ্রা ভাঙ্গিবার সময় নিকটে আসিয়াছে, শীঘ্রই জগজ্জীব নিদ্রা ত্যাগ করিয়া মূল জগতে পৌছিবে শীঘ্রই জীবের পূর্ণ বিকাশ বা উন্নতির চরমাবস্থা প্রাপ্ত হইবে।

তখন জীব স্বতঃই ধ্যান পরায়ণ হয়, বিশ্বসংসার মহা যোগভাব অবলম্বন করে জীব হৃদয়ে সংসার বৈরাগ্যের উদয় হয়। জাগ্রতাবস্থায় স্বপ্নদর্শন, গোলক বা অন্ত জগতের মহাবিভূতি জীবের গোচর ও কল্পিত বিষয়ের বিস্মৃতি ও অকল্পিত বিষয়ের স্মৃতি হইতে থাকে। মনুষ্যের জাতি বর্ণ সাম্প্রদায়িক বন্ধন ছাড়িয়া যায় সকলেই ব্রহ্মতত্ত্ব নিরূপণে মনোযোগ করে।

যে ব্রহ্মস্বরূপ মহাশক্তি হইতে নিখিল চরাচর বিশ্বসংসার উৎপত্তি হইয়াছে, যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া এই অনন্তরূপ বিশ্বমণ্ডল বর্ত্তমান রহিয়াছে, যাঁহার আশ্রয় বিহনে ক্ষণকালও কেহ বাঁচিয়া থাকিতে পারে না, যাঁহার পূজা প্রণতি কৃপা প্রসন্নতা ব্যতীত কেহই সংসার কারাগারের কঠিন কর্ম্মশৃঙ্খল ছিন্ন

করিতে বা ত্রিতাপময় ভবসংসার মুক্ত হইতে পারে না, যাঁহার কৃপা ইচ্ছা ভিন্ন ত্রিভুবন বিশ্বসংসার মধ্যে কাহারও মায়া ভ্রান্তি বা মোহ নিদ্রা ত্যাগ হইতে পারে না, যাঁহাকে হিন্দু শাস্ত্রে মহামায়া, যোগমায়া, চিচ্ছক্তি, স্বরূপশক্তি ইত্যাদি শব্দে এবং নিদ্রা ও চৈতন্যরূপিনী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে, বর্ত্তমান সময়ের অদ্ভুত অচিন্তনীয় ঘটনাবলী সেই অচিন্ত্যারূপিনী যোগমায়া শক্তির আবির্ভাব প্রভাবের চিহ্ন। সংসারস্থ জীবের প্রার্থনায় মহাশক্তি যোগমায়া জীব নিস্তারার্থ ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞান হীন জীবকে আপন স্বরূপতত্ত্বমহিমা জানাইবার জন্য জগজ্জীবের মোহনিদ্রা ভাঙ্গিয়া নিখিল চরাচর বিশ্বসংসারকে জাগ্রত করিতেছে। তাই আজ জগতে "ব্রহ্মতত্ত্ব ও সংসার মুক্তি" নিরূপণের সূচণা হইতেছে।

এই তত্ত্ব হইতে দুইটী সংবাদ পাওয়া যাইতেছে, ১ম। যোগমায়ার ইচ্ছা প্রভাব ব্যতীত কেহই গোলক ব্রজে পৌছিতে পারে না। পূর্ব্বেও দ্বাপর যুগে দেখা গিয়াছে যোগমায়াশ্রয় ব্যতীত ব্রজলীলা সংঘটন হয় নাই; ২য়। অন্যান্য যুগে যাহাই ঘটিয়া থাকুক না কেন, বর্ত্তমান যুগে বিনা যোগ ধ্যানে ও যোগমায়ার প্রসাদে সংসারমুক্তিপ্রার্থী জীব দেহ ধারণ করিয়াই অব্যক্ত মূল জগৎ গোলকে পৌছিতে পারিবে, এ স্থানে বুঝিয়া লওয়া উচিত সংসার মুক্তির প্রার্থনা সময়ে তাহাদের যোগ ধ্যানের কার্য্য শেষ হইয়াছে। (ক্রমশঃ)

শ্রীঅম্বিকাচরণ চক্রবর্ত্তী।

বিরোধী-সম্প্রদায় উৎপত্তির উপযোগিতা।

"কানুর পিরিতি চন্দনের রীতি
ঘসিতে সৌরভময়।
ঘসিয়া আনিয়া হিয়ায় লইতে
দহন দ্বিগুণ হয়॥" —চণ্ডীদাস।

স্মরণাতীত কাল হইতে পৃথিবীর নানা স্থানে কত কত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের যে উৎপত্তি হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না; পুরাবৃত্ত আংশিকরূপেমাত্র তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতে পারে। তত্ত্বজ্ঞানের বিমল জ্যোতিঃ দেশে

দেশে, কালে কালে, বিভিন্ন আধারে, ও বিভিন্ন আকারে—দেশ, কাল ও পাত্রের উপযোগী নানা উপাধিতে মণ্ডিত হইয়া—প্রকাশিত হইয়া থাকে। সচ্চিদানন্দময়ী বিশ্বজননী অধিকার অনুসারে তাঁহার তত্ত্বজ্ঞানরূপ অমৃতময় প্রসাদ মানবসমাজরূপ শিশুকে প্রয়োজনানুরূপ বিতরণ করিয়া থাকেন। তত্ত্বজ্ঞানের অভেদ দৃষ্টিতে দেখিলে জগতে নিয়ত একই অবিচ্ছিন্ন ইচ্ছা—ব্যষ্টিগতভাবে সময়ে সময়ে পরিচ্ছন্ন ভাবে লক্ষিত হইলেও—সমষ্টিগতভাবে অনন্ত ও প্রশান্তরূপে বিরাজিত রহিয়াছে। এই অনন্ত ইচ্ছার ব্যষ্টিগতভাবই ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে আমাদের জ্ঞান-গোচর হইয়া থাকে। সমষ্টিগত ভাব কেবল আত্মজ্ঞানের আলোকে দেখিতে পাওয়া যায়।

পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা যায়, সময় সময় প্রচলিত ধর্ম্মবিশ্বাসের বিরুদ্ধে এরূপ এক একটী সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় হয় যে, যাহারা শাস্ত্রীয় প্রমাণ কিম্বা ধর্ম্মসমাজে প্রচারিত চিরন্তন রীতিনীতি সমস্তই অগ্রাহ্য করিতে চাহে। ভারতে হিন্দু ধর্ম্মের ও ইউরোপে খ্রীষ্টীয়ধর্ম্মের প্রতিকূলে অতি প্রাচীনকাল হইতে আবহমানকাল পর্য্যন্ত এইরূপ বিরোধী-সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় ইতিহাসে বিশেষ প্রসিদ্ধ। ভারতে কত ধর্ম্মমত, কত সম্প্রদায়, কত পন্থী, কত ধর্ম্ম সমাজের অভ্যুদয় হইয়াছে, তাহার সংখ্যা করা সুকঠিন। ইউরোপেও খ্রীষ্টধর্ম্মের মধ্যে প্রায় ২০০শত সম্প্রদায়ের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপ বিরোধী-সম্প্রদায়ের উৎপত্তির প্রাক্কালে প্রচলিত প্রাচীন ধর্ম্মসমাজ অনেক পরিমাণে মলিন ও নিস্তেজ হইয়া যায়, ধর্ম্মের প্রাণহীন বাহ্যিক আড়ম্বর সম্পন্ন করাই লোকের একমাত্র লক্ষ্য হইয়া উঠে; তখন অভ্যন্তরের "সাঁশের" পরিবর্ত্তে লোকে বাহিরের "খোসার" দিকেই সম্পূর্ণরূপে আকৃষ্ট হয়। যে অন্তর্নিহিত প্রাণশক্তি নিয়ন্ত্রীরূপে সমাজের প্রত্যেক নরনারীর হৃদয় স্পর্শ করিয়া,—প্রত্যেকের অন্তরের উচ্ছৃঙ্খলিত অদম্য আকাঙ্ক্ষাকে সুমধুর একতানে নিয়মিত করিয়া—মানবের চরম লক্ষ্য পথে পরিচালিত করিত, যাহার প্রভাবে প্রত্যেক নরনারী স্বেচ্ছাক্রমে সেই শক্তির আনুগত্যে আত্মসমর্পণ করিতে সমুৎসুক হইত, তখন তাহা অবসাদগ্রস্থ ও ক্ষীণশক্তিতে পরিণত হইয়া যায় এবং স্বকীয় পরিচালনী ক্ষমতা হইতে বিচ্যুত হইয়া যায়। এইরূপে যখন এই দুঃসময়ে সেই প্রাচীন ধর্ম্মসমাজের নেতৃগণ স্বীয় স্বীয় পবিত্র দায়িত্ব বিস্মৃত ও

ব্যক্তিগত মলিন স্বার্থে অভিভূত হইয়া সেই উন্নত আদর্শ-পথ হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া যায়—ব্যক্তিগত কর্ত্তব্যের পবিত্র ব্রত সম্পাদনে উদাসীন হইয়া ঐহিক প্রভুত্বের বাহ্য মোহে আকৃষ্ট হয়, তখনই এইরূপ বিরোধি-সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হয়। বহুকাল হইতে সমাজ-শরীরে ধীরে ধীরে যে আবর্জ্জনারাশি সঞ্চিত হইয়া উহাকে অলক্ষিতে জর্জ্জরিত করিতে থাকে, বিরোধী-সম্প্রদায়ের অভ্যুদয়-রূপ প্রবল প্রভঞ্জন-সমাগমে, তাহা বিশোধিত হইতে আরম্ভ হয়। মঙ্গল-স্বরূপিণী জগজ্জননী তাঁহার মলিন পঙ্কিল মানব-সমাজ-শিশুকে এইরূপে পরিষ্কৃত করিয়া তাঁহার অমৃতময় অভয় ক্রোড়ের দিকে আকর্ষণ করেন।

অন্যান্য বিধানের ন্যায় এই বিরুদ্ধনীতি-প্রবর্ত্তন বিধানেরও উহার অনুবর্ত্তন-প্রণালীর প্রকার ভেদে শুভ ও অশুভ এই দুই প্রকার ফল দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার শুভফল এই যে, ইহাদ্বারা অন্ধবিশ্বাসের আবরণ অপসারিত হয় ও মানসিক অবসাদের অবমান হয়; সঙ্ঘর্ষণে সঙ্ঘর্ষণে সত্যের মহিমা উজ্জ্বলরূপে দীপ্তি পাইতে থাকে। অবসন্ন সমাজদেহে একপ্রাণতার উৎসাহ প্রতিষ্ঠিত হয়। জনমণ্ডলী গড্ডালিকা প্রবাহের ন্যায় গতানুগতিকভাবে আর না ছুটিয়া প্রত্যেক বিষয়ই সন্দেহ করিয়া—প্রতিবাদ করিয়া—উহার কার্য্য-কারণ নির্দ্ধারণের জন্য দৃঢ় চেষ্টা হইয়া,—জগতে অভিনব স্বাধীন চিন্তার স্রোতঃ প্রবর্ত্তন করে। তাহার ফলে আধুনিক জড়বিজ্ঞানের এতদূর শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে, এবং আমরা বাক্য ও চিন্তার স্বাধীনতা সম্ভোগে উত্তরাধিকারী হইয়াছি। আবার পক্ষান্তরে ইহার অশুভ ফল এই যে, ইহা বহুকাল পরীক্ষিত প্রাচীন নিগূঢ় তত্ত্বজ্ঞানগত ভিত্তির পরিবর্ত্তে প্রত্যক্ষপ্রমাণজনিত লৌকিক-বিশ্বাসের উপরই অধিকতররূপে বিন্যস্ত হয়। বক্তিগত অভিজ্ঞতার ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ গণ্ডীতে বিজড়িত হইয়া অতি দুর্দ্দমনীয় আত্মাভিমানের পরিপুষ্টি সম্পাদিত হয়; সুদূর ভবিষ্যৎ লক্ষে প্রখর স্থির অন্তর্দৃষ্টির অভাবে নিজকে পূর্ব্বশাস্ত্রানুমত প্রকৃষ্ট পদ্ধতি ক্রমে সংযত করিতে না পারিয়া, কেবল ঐহিক সুখপ্রদ বিষয়রাশিতে আকৃষ্ট হয়। বর্ত্তমান সময়ে লোকের মন সাধারণতঃ পার্থিব ভোগবিলাসের আকর্ষণে এতদূর মুগ্ধ, যে ঐহিক জীবনের উপরে আরও যে উন্নত ও অভিনব জীবন আছে, তাহা অধিকাংশ লোকের মনে অতি অস্পষ্ট কল্পনার ন্যায়ই অবস্থিতি করিতেছে।

এই ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কার-প্রণালী নানা ভাবে সম্পাদিত হয়। একপ্রকার সংস্কার, ধর্ম্ম শাস্ত্রের সাহায্যে জাতীয় ভাবের ভিতর দিয়া ধীর গতিতে অনুষ্ঠিত হয়। আর অন্য প্রকারে, কয়েকটী নির্দ্দিষ্ট মত ও বিশ্বাস মানিয়া লইয়া ধর্ম্ম সমাজ ও রাজনীতি ক্ষেত্রে সহসা ঘোর বিপ্লব উপস্থিত করা হইয়া থাকে। এই শেষোক্ত প্রকার সংস্কার সাধনের সময় প্রায়ই অসার জিনিসের সঙ্গে বহুমূল্য দ্রব্যও পরিত্যক্ত হইয়া থাকে ;—খাদ ফেলিতে যাইয়া সুবর্ণও ফেলিয়া দেওয়া হয়। ইহার ফলে জনমণ্ডলীর অন্তঃকরণ ঘোর অসন্তোষ ও নৈরাশ্যে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। রাজনৈতিক, আত্মম্ভরিতা, সামাজিক উচ্ছৃঙ্খলতা ও ধর্ম্মনৈতিক যথেচ্ছাচারিতা পূর্ণরূপে রাজত্ব করিতে থাকে। বর্ত্তমান সময়ে ধর্ম্মজগতে জড়বাদ (Materialism), সন্দেহবাদ (Scepticism) প্রভৃতি আবির্ভূত হইয়া এক কুসংস্কারের পরিবর্ত্তে অন্য কুসংস্কার প্রতিষ্ঠিত করিতেছে। ফরাসী বিপ্লবের নিকৃষ্ট ও স্থূল একতা ভাব তীব্র হলাহলের ন্যায় পৃথিবীময়ব্যাপ্ত হইয়া অলক্ষিতে জনমণ্ডলীর হৃদয় আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। তাহার ফলে লোকের মন সর্ব্বদা বহির্ম্মুখে ঘুরিয়া ঘুরিয়া অতি তরল ও চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে ; লোকে আধ্যাত্মিক গভীর বিষয়ে মন নিবিষ্ট করিতে পারিতেছে না। লোকে শাস্ত্রীয় প্রমাণের পরিবর্ত্তে বৈজ্ঞানিক প্রমাণের উপরই অধিকতর আস্থা সংস্থাপন করিতেছে। জড়বিজ্ঞান যে সব বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে অক্ষম সে সব বিষয়েও জড়বিজ্ঞানের স্থূল প্রণালী সকলের প্রয়োগ হইতেছে। স্থূল পঞ্চ ইন্দ্রিয়ই সত্যের নিয়ন্তা ও পরিমাণ বলিয়া গণ্য হওয়াতে সূক্ষ্ম পঞ্চেন্দ্রিয় ও মন-বুদ্ধ্যাদির স্বতন্ত্র প্রয়োগ লোকে ভুলিয়া যাইতেছে। পুরাণাদি চিত্তশুদ্ধিকর পবিত্র শাস্ত্রীয় গ্রন্থ পাঠের পরিবর্ত্তে লঘুচিত্ত স্থূলদেহাভিমানী নরনারী সাময়িক ইন্দ্রিয়গণ তৃপ্তিকর কুরুচিসম্পন্ন উপন্যাসাদির ন্যায় তরল সাহিত্যপাঠে মন ঢালিয়া দিতেছে। এতাদৃশ শোচনী অবস্থায়ও আমাদের নিরাশ হইবার প্রয়োজন নাই ; যেহেতু মঙ্গলময়ী জগজ্জননীর নিভৃত কক্ষে যে তত্ত্বামৃত এতদিন গোপনে ছিল, তাহা আজ প্রকাণ্ড কোলাহলে বিতরিত করিবার জন্যই এই বিপ্লব উপস্থিত হইতেছে।

এই বিপ্লবকারিণী শক্তি দ্বারা সেই প্রাচীন ধর্ম্মসমাজের অনন্ত জীবনীশক্তি বহির্ম্মুখে আঘাত প্রাপ্ত হইয়া উহাতে বাধা দিবার জন্য নিজের মধ্যে উপযুক্ত

শক্তি সঞ্চয়ে সচেষ্ট হয়। এইরূপে উভয়ে পরস্পরকে দমন করিবার জন্য ও কালে পরস্পরের সহিত সম্মিলিত হইবার জন্য, বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন মূর্ত্তিতে দীর্ঘকালব্যাপী নিদারুণ দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়; এই যুদ্ধে কখনও বা নবীনের জয় ও প্রাচীনের পরাজয়; কখনও বা প্রাচীনের জয় ও নবীনের পরাজয় হইতে থাকে; অবশেষে উভয়ের অন্তরে প্রতিষ্ঠিত উভয়ের জীবনীশক্তিরূপা শিবশক্তি আবির্ভূতা হইয়া উভয়কে অতি অলৌকিকরূপে পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক বিশ্বের অশেষ মঙ্গলকর মধুর সম্মিলন সম্পাদন দ্বারা উভয়কে অদ্বৈত সম্বন্ধে আবদ্ধ করেন। এই কালব্যাপী যুদ্ধে তুচ্ছ, ক্ষুদ্র, ও অশুভ বস্তুর বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে মহৎ, উন্নত ও শুভ দ্রব্যও বিনষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু এই ক্ষেত্রে যে যে শুভ মঙ্গলকর বস্তু বিনষ্ট হইয়া থাকে, তাহা লঙ্কাসমরেনিহত অসংখ্য বানরসৈন্যের ন্যায় যুদ্ধাবসানে অচিরে পুনর্জ্জীবন লাভ করিয়া বিজয় উৎসবে প্রবৃত্ত হয়; আর ইহাদ্বারা অপহৃতা বৈদেহীর ন্যায়, অভিজ্ঞতা লাভের সহিত প্রনষ্ট গৌরবের যে পুনরুদ্ধার সাধন করা হয়, তাহা সর্ব্বাংশেই অতুলনীয়।

কি সূত্র অবলম্বন করিয়া বিজয়শ্রী এই বিরোধী সম্প্রদায়ের উৎকর্ষ সম্পাদন পূর্ব্বক উহাকে বরণ করিতে পারে, তাহা আমাদের বিশেষ প্রণিধানের যোগ্য। কেননা ইহাতে আমাদের নিরাশ হৃদয়ে আশার সঞ্চার হয়। আমরা দেখিতে পাই, বর্ত্তমান সংস্কারকদিগের যুক্তিই প্রধান অবলম্বন। কিন্তু এই যুক্তি সাধারণতঃ এই নশ্বর পার্থিব স্থূল দেহাভিমান বিজিম্ভৃত, স্থূলমস্তিষ্কঘটিত নির্দ্দিষ্ট সসীম জ্ঞানের দ্বারা নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। প্রকৃত পক্ষে, পরমাত্মার যে চিন্ময় প্রতিবিম্ব আমাদের আত্মার মূলে বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহাই সত্য নির্ণয়ে একমাত্র সক্ষম। নতুবা সতত বাসনা দ্বারা চাঞ্চল্যমান ও একমাত্র স্থূল বিষয় সংগ্রহে লিপ্ত মানসিক সংকীর্ণ জ্ঞান কখনও সত্যের বিচারক হইতে পারে না। যাহা হউক, এই স্থূল জগতে বাসনা ও কুসংস্কার বর্জ্জিত স্থূলমস্তিষ্কলব্ধ যুক্তি অসম্পূর্ণ হইলেও কিয়ৎ পরিমাণে বিশ্বস্ত পরিচালক হইতে পারে; ইহা অন্ধ বিশ্বাস অপেক্ষা সহস্র সহস্র গুণে শ্রেষ্ঠ। যদিও যুক্তি সাধারণতঃ জ্ঞানকে তাহার অভিজ্ঞতায় নির্দ্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করাইয়া উন্নততর জ্ঞানে

উপস্থিত করিতে পারে না, কিন্তু প্রকৃত তত্বান্বেষীর নিকট এই যুক্তি তাহার সত্যনির্ণয়ের যথার্থপক্ষে দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া দেয়। তাহার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এই যুক্তির গতিও ক্রমে ক্রমে দোষ মুক্ত হইয়া স্থূল বাহ্য জগৎ হইতে সূক্ষ্ম অন্ত জগতের দিকে প্রসারিত হইতে থাকে। এই বিশুদ্ধ যুক্তিদ্বারাই সূক্ষ্ম জগতের অস্তিত্বে স্থির বিশ্বাস হয়, অতিন্দ্রিয় বিষয়ে নিশ্চয়াত্মক জ্ঞানজন্মে, ও ক্রমে এই অতীন্দ্রিয় জ্ঞানসিদ্ধ পিথাগোরস্‌, বুদ্ধ, খ্রীষ্ট, মহম্মদ প্রভৃতি মহাপুরুষগণের উপর প্রবল শ্রদ্ধার উৎপত্তি হয়। বর্ত্তমান মানবমণ্ডলীতে এই তুরীয় চৈতন্যের সংবেদন-শক্তি সাধারণতঃ অতি ক্ষুদ্র অঙ্কুরাকারে বর্ত্তমান রহিয়াছে, কিন্তু লোকের ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ইহারও ক্রমবিকাশ হইবে। এই আধ্যাত্মিক আলোকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গ এখনও সময় সময় সহসা প্রকাশিত হইয়া থাকে। কিন্তু এই আলোকপ্রাপ্তির সংকট সময় অতি ধীর ও প্রশান্তভাবে অবলম্বন পূর্ব্বক তাহা সংযত ও আত্মস্থ করিতে চেষ্টা না করিলে, উন্মার্গগামী হইয়া পড়িবার বিলক্ষণ আশঙ্কা আছে; তাহার ফলেই ব্যক্তিতে অভিমানকে অবলম্বন করিয়া ভিন্ন ভিন্ন নূতন দলের সৃষ্টি হইয়া থাকে। যখন লোকে এই আলোককে আত্মস্থ করিতে কৃতকার্য্য হয়, তখন তাহার নিকট নূতন জ্ঞান জ্যোতিঃ প্রকাশিত হইয়া পড়ে, তখন সে বুঝিতে পারে যে, জড়বিজ্ঞানের প্রমাণ দ্বারা কেবল আধ্যাত্মিক সত্য লাভের সহায়তাই হয়। আর ইহাও উপলব্ধি করিতে পারা যায় যে, কেবল প্রতিবাদ দ্বারা কখনও কোন ধর্ম্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকিতে পারে না। কারণ প্রতিবাদ কেবল মাত্র নিবৃত্তি মূলক। ইহা দ্বারা বস্তু বিশেষকে ভাঙ্গা যাইতে পারে। কিন্তু যেমন প্রস্তর খণ্ড দ্বারা মানবের উদর পূর্ত্তি হয় না সেইরূপ "নেতি" "নেতি" দ্বারা বা কেবল প্রতিবাদ বা অস্বীকার দ্বারা আধ্যাত্মিক জীবন গঠিত হয় না। শুষ্ক প্রতিবাদে প্রাণে অতৃপ্তি আসে মাত্র। সত্য মিথ্যা পদার্থ নহে বন্ধ্যাপুত্রের ন্যায় অলীক নহে। যখন এইরূপ অতৃপ্তি আসিয়া হৃদয় আকুলিত করে জীবনগত বিশ্বাস ও ভক্তি লাভের জন্য প্রাণ তখন ব্যাকুল হইয়া উঠে, তখনই প্রকৃত আত্মোপলব্ধি ও আত্মত্যাগের বাসনা জন্মে। তখন সেই সত্য পদার্থকে সর্ব্বভাবে ও সমস্ত বস্তুতে অন্বীত দেখিতে পাইয়া সকল

ধর্ম্মের সকল সমাজ সম্প্রদায়ের মূলে অধিষ্ঠিত একই দৈবী প্রকৃতিকে দেখিতে সক্ষম হইয়া নামরূপের প্রবল প্রতাপ হইতে চিত্ত মুক্ত হয় এবং প্রকৃত উদারতা ও বিমল শান্তিতে হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইয়া যায়, বিশ্বজনীন ভ্রাতৃভাবে হৃদয় গলিয়া একাকার হইয়া যায়।

আমি কয়জন ?

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

দ্বিতীয় ঘটনা।—আন্‌সেল বুর্ণের কথা।

আমেরিকার রোড দ্বীপের রেবারেণ্ড আন্‌সেল বুর্ণের ঘটনা ও রেবারেণ্ড হান্নার ঘটনার প্রভেদ এই যে হান্নার দ্বিতীয় ব্যক্তিত্ব যেমন প্রথম ব্যক্তিত্বের অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছিল, আন্‌সেল বুর্ণের তাহা হয় নাই। আন্‌সেল বুর্ণের দ্বিতীয় ব্যক্তিত্ব সুষুপ্তি চৈতন্যের মধ্যে নিমজ্জিত থাকে এবং তথা হইতে সম্মোহন ক্রিয়া প্রয়োগে তাহার কথাবার্ত্তা শুনা যায়। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের ১৭ই জানুয়ারী রেবারেণ্ড আন্‌সেল বুর্ণ একখণ্ড ভূমির মূল্য দিবার অভিপ্রায়ে প্রভিডেন্‌স নগরের কোনও ব্যাঙ্ক হইতে ৫৫১ ডলার (ডলার আমেরিকার মুদ্রা আমাদের দেশের ৩ টাকা) উঠাইয়া লয়েন। কয়েকটী ঋণ শোধ করিয়া একখানি অশ্বযানে আরোহণ করেন। সেই সময় হইতে ১৪ই মার্চ্চ পর্য্যন্ত তাঁহার কি হইল কেহই জানিতে পারে নাই; তিনি নিজেও জানিতেন না তাহার কি হইয়াছে। এখন জানা গিয়াছে যে যানারোহণের পর আন্‌সেল বুর্ণের শরীরাধিকারী পুরুষ অন্তর্হিত হয়েন এবং তৎপরিবর্ত্তে উক্ত শরীরে এ. জে ব্রাউন নামধেয় দ্বিতীয় এক ব্যক্তির আবির্ভাব হয়। ব্রাউন, বুর্ণের শরীর লইয়া পেনসিলভানিয়া প্রদেশের নরিসটাউন নামক নগরে গমন করেন, এবং তথায় গিয়া "বুর্ণ" শরীরের পরিচ্ছদাভ্যন্তরে যে অর্থ ছিল তদ্দ্বারা চিনির ব্যবসা আরম্ভ করেন। ১৪ই মার্চ্চ প্রাতঃকালে বুর্ণের শরীর নিদ্রোত্থিত হইলে দেখা গেল যে ব্রাউন আর সে শরীরে নাই; শরীরের পূর্ব্বাধিকারী অর্থাৎ বুর্ণ নিজে তাহা অধিকার করিয়াছেন। বুর্ণ জাগিয়া বুঝিতে পরিলেন না যে কিরূপে তিনি নরিসটাউনে আসিয়াছেন; তাঁহার বোধ হইতে লাগিল যে তখনও

জানুয়ারী মাস এবং তিনি কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে ব্যাঙ্ক হইতে টাকা লইয়া আসিয়াছেন। চিনির ব্যবসায়ের কথা তিনি কিছুই জানেন না। ব্রাউনের অধিকার কালে তাঁহার শরীরের প্রায় ১০ সের মাংস কমিয়াছে। প্রথমতঃ লোকে তাঁহাকে উন্মাদ মনে করিতে লাগিল; পরে তাঁহাকে তাঁহার স্বজনগণের নিকট পাঠাইয়া দিল। এই ঘটনার তিন বৎসর পরে বুর্ণকে সম্মোহন নিদ্রাভিভূত করা হইলে, বুর্ণের স্থানে ব্রাউনের আবির্ভাব হইল। ব্রাউন বলিল সে বুর্ণের বৃত্তান্ত কিছুই জানে না, বুর্ণ-পত্নীকেও কখন দেখে নাই। গাড়ী উঠিবার পূর্ব্বের ঘটনা এবং শর্করা ভাণ্ডার পরিত্যাগের বিষয় সে কিছুই জানেনা। সে বলিল, "আমি আবদ্ধ হইয়াছি—দুই দিকের কোনও দিক দিয়া পথ পাইতেছি না।" ইহার তাৎপর্য্য এই যে তাহার স্মৃতি একদিকে অশ্বযানে আরোহণ ও অপরদিকে শর্করা ব্যাবসায় এই দুই সীমায় অন্তর্নিবিষ্ট। আন্সেল বুর্ণ এখনও ব্রাউনের বিষয় বিন্দুমাত্র অবগত নহেন। এক্ষণে ব্রাউন যদিও বুর্ণ চরিত্রের উপরিভাগে বা জাগ্রদবস্থায় কখনও প্রকাশ পাইতে পারে না, কিন্তু তথাপি সেই চরিত্রের অন্তস্তন দেশ আশ্রয় করিয়া আছে। সম্মোহনকারীর সাহায্যে সে তথা হইতে মধ্যে মধ্যে বাহিরে প্রকাশিত হইতে পারে।

তৃতীয় ঘটনা—ডাক্তার অস্‌বর্ণের টিন ব্যবসায়ী।

১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের চিকিৎসা ও ব্যবস্থাবিষয়িনী পত্রিকায় (Medico Legal Journal) ডাক্তার অস্‌বর্ণ কতকটা উক্ত প্রকারের এক ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। নভেম্বর মাসের কোনও রবিবার অপরাহ্ণ কালে প্রৌঢ় বয়স্ক সঙ্গতিপন্ন একজন সীসক ও টিন ব্যবসায়ী বায়ু সেবনার্থ বহির্গত হয়। যেমন বহির্গমন অমনি নিরুদ্দেশ; দুই বৎসরকাল তাহার আর কোনও সন্ধান পাওয়া গেল না। দুই বৎসর পরে আমেরিকায় যুক্তরাজ্যের সুদূর কোনও দক্ষিণ প্রদেশে একটি টিনের দোকানে একজন শ্রমজীবী সহসা তাহার বস্ত্রাদি দূরে নিক্ষেপ করিল; পরে যেন সুপ্তোত্থিত হইয়া দেখিল যে সে অপরিচিত স্থানে অপরিচিত নাম গ্রহণ করিয়া কর্ম্ম করিতেছে। বস্তুতঃ দুই বৎসর পূর্ব্বে যে সীসক ব্যবসায়ী অন্তর্হিত হইয়াছিল এ ব্যক্তি সেই। অদ্যাপি কেহই জানেনা কোন্ বুদ্ধি শক্তির প্রভাবে যে এই দুই বর্ষ কাল চালিত হইয়াছিল। তাহার শরীরের প্রকৃত অধিকারীকে বিতাড়িত করিয়া যে পুরুষ তাহার দেহ আশ্রয় করিয়াছিল, সে এখনও

অজ্ঞাত। উক্ত ব্যক্তির এই দুই বর্ষের স্মৃতি একেবারেই লুপ্ত। সম্মোহনাবেশ সাহায্যে—পরদেহাশ্রয়কারী ব্যক্তির অনুসন্ধান জন্য কোনও চেষ্টা হইয়াছে এরূপ বোধ হয় না।

চতুর্থ ঘটনা—ডাক্তার ডানাবর্ণিত মিঃ এম্।

১৮৯৪ অব্দের মনোবিজ্ঞান সমালোচন পত্রে (Psychological Review) ডাক্তার ডানা বাষ্পনির্গমনহেতু রুদ্ধশ্বাস অষ্টাবিংশতিবর্ষ বয়স্ক মিঃ এম নামক এক রোগীর ইতিবৃত্ত বর্ণন করিয়াছেন। যখন উক্ত রোগীর সংজ্ঞা হয়, তখন তাঁহার স্মৃতি লুপ্ত এবং মিঃ হান্নার মত শিশুদশায় উপনীত। তিনি কাহাকেও চিনিতে পারিলেন না, কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। স্মৃতির ভাণ্ডার লুপ্ত হইলে ও স্মৃতি শক্তিটী কিন্তু অসামান্য ছিল। তিনি দুই মাস ধরিয়া অস্পষ্টভাবে পড়িতে শিখিলেন। পূর্ব্বের কেবল একটিমাত্র ভাব তাঁহার মনে জাগরূক ছিল—সেটী তাঁহার প্রণয়পাত্রীর প্রতি আসক্তি। কিন্তু হান্নারই মত তখন তাঁহার স্ত্রী পুরুষের ভেদ নির্ণায়ক জ্ঞান ছিল না। শ্বাসরোধের পূর্ব্বাবস্থা অপেক্ষা এক্ষণে তাঁহার হস্ত প্রয়োগের নিপুণতা বাড়িয়াছিল। তাঁহাকে দেখিলে মনে হইত যে একটি নূতন জীব নূতন জগতে নূতন করিয়া শিখিবার জন্য শক্তিশালীমস্তিষ্ক লইয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন। তিন মাসের পর একদিন তিনি তাঁহার প্রণয়পাত্রীকে দেখিতে গেলেন। তাঁহার আর আরোগ্যের সম্ভাবনা নাই ভাবিয়া প্রণয়িনী কাঁদিয়া ফেলিল। সেই রাত্রে তিনি অনুভব করিলেন যেন তাঁহার মস্তক কণ্টকিত ও স্পন্দহীন। নিদ্রার অবসানে জাগরিত হইলে দেখা গেল যে এই তিন মাস ধরিয়া যে শিশু মানব তাঁহার দেহ আয়ত্ত করিয়াছিল সে আর নাই এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে তিন মাসের সযত্ন সঞ্চিত স্মৃতি ও অপগত। এ ক্ষেত্রেও মিঃ হান্নার মত, যদিও দ্বিতীয় ব্যক্তির অর্জ্জিত জ্ঞান ভাণ্ডার প্রথম ব্যক্তির জ্ঞান হইতে অনেক ন্যূন ছিল, তথাপি উভয়ের চরিত্র মূলতঃ এক ছিল বলিয়া বোধ হয়।

পঞ্চম ঘটনা—দুষ্টা সালী।

এক দেহের দুই বিভিন্ন অধিকারীর চরিত্রে সামঞ্জস্য যে সব সময় থাকে না, 'তাহা বোষ্টন নগরের ডাক্তার মর্টন প্রিন্স বর্ণিত একটী ঘটনা হইতে

প্রমাণিত হইবে। নিউ ইংলণ্ড নামক উপনিবেশ বাসিনী, সুশিক্ষিতা ধীর-স্বভাবা, ধর্ম্মবুদ্ধিপ্রবণা স্নায়ুরোগগ্রস্তা এক তরুণী মহিলা ডাক্তার মর্টনের পরীক্ষার পাত্রী। ডাক্তার মর্টন তাঁহাকে সম্মোহনবিদ্যা প্রভাবে নিদ্রাচ্ছন্ন করিলে তাঁহার স্বপ্নচারিণীর (somnumbulic state) দশা উপস্থিত হইল। এই অবস্থাতে কুমারী বী (ইহাই মহিলাটির সংক্ষিপ্ত নাম) নেত্রোন্মীলনের জন্য অবিরত চক্ষু ঘর্ষণ করিতে লাগিলেন। অবশেষে তিনি এ বিষয়ে সফলকাম হইলেন। যখন তাঁহার চক্ষু খুলিয়া গেল বোধ হইল তাঁহার দেহ সম্পূর্ণ অপরিচিত এক ব্যক্তিত্বের আয়ত্ত হইয়াছে। এই নূতন ব্যক্তিত্ব নিজেকে "সালী" বলিয়া পরিচয় দিল। চক্ষুরুন্মিলনের সঙ্গে সঙ্গেই ইহার আবির্ভাব ;

নবনীত ও কঠিনের মধ্যে যাদৃশ পার্থক্য, কুমারী বী-র মূল চরিত্র ও নবাবির্ভূতা সালীর চরিত্রে তাদৃশ পার্থক্য। কুমারী বী ধার্ম্মিকা, স্বল্পভাষিণী তুচ্ছ বিষয়ের ও ঔচিত্যানুচিত্যনির্ণয়ে যত্নবতী, অধ্যয়নরতা এবং চিররুগ্না। যখন কুমারীর শরীরে সালীর আবির্ভাব হয় তখন সে দেহ নীরোগ থাকে এবং তখন সে দেহে ক্লান্তি বা কষ্ট অনুভূত হয় না। শালী ধর্ম্মভাববর্জ্জিতা, রঙ্গপ্রিয়া এবং পরের উৎপীড়নে সদাই তৎপরা; সালী পুস্তক দেখিতে পারে না, এবং আরও বিস্ময়ের বিষয় এই যে যাঁহার দেহ সে আশ্রেয় করিয়া থাকে সেই কুমারী বী-কে সে ঘৃণা করে। পূর্ণ এক বৎসর কিন্তু যখনই কুমারী ক্লান্ত বা অবসন্ন হইতেন। তখনই সালী আসিয়া তাঁহার দেহ অধিকার করিত। কখনও কখনও কয়েক মুহূর্ত্ত অবস্থান করিতে, কখনও বা কয়েকদিন থাকিয়া যাইত। কুমারী বী, সালীর কথা কিছু জানিতেন না, সালী কিন্তু কুমারীর সকল কথাই জানিত। কুমারীর উপর নানাপ্রকার নির্য্যাতন করিতে পাইলে সালী বড় আনন্দ অনুভব করিত। কুমারীর দোষ দেখাইয়া, কুমারীকে অপ্রীতিকর বাক্য বলিয়া, কুমারীর হস্ত দিয়াই সালী কুমারীকে পত্র লিখিত। সালী তাঁহাকে কেদারার উপর বসাইয়া অগ্নিস্থানাচ্ছদক প্রস্তরের উপর পদদ্বয় স্থাপন করাইত। সে তাঁহাকে মিথ্যা বলাইত ; তাঁহার ডাক টিকিট অপহরণ করিত; তাঁহার পরিচ্ছদ কোটরে উর্ণনাভ এবং সর্প রাখিয়া দিত; পল্লীগ্রামাঞ্চলে প্রায় তিন ক্রোশ অন্তরে তাঁহাকে লইয়া গিয়া নিঃসম্বল অবস্থায় নগরে প্রত্যা-বর্ত্তন করিতে বাধ্য করিত। সালী কখনও কখনও অতিদূরে গমন করিয়া ভীত

হইয়া ডাক্তার মর্টন প্রিন্সকে ডাকিয়া পাঠাইত। কুমারীর মনে যে সকল ভাবের উদয় হয়, সালী যে কেবলমাত্র সেই ভাবগুলি জানিতে পারে এমন নয় পরন্তু তত্তৎভাবগুলিকে নিয়মিত করিতে পারে এবং বী-র হস্ত, পদ ও জিহ্বা সে কতক পরিমাণে নিজের আয়ত্ত করিতে পারে। কুমারীর কল্পনা সমক্ষে সালী ভাবাত্মক ও অভাবাত্মক উভয়বিধ মায়া সৃজন করিতে পারে, এবং রঙ্গ করিবার অভিপ্রায়ে সর্ব্বদা এরূপ করিয়া থাকে ক্রমশঃ)

পাগলের প্রলাপ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(৪৩)

উপসর্গ ভেদে একই ধাতুর ভিন্ন ভিন্ন অর্থ হইয়া থাকে, যেমন "আ" উপসর্গের সহিত "হৃ" ধাতুর অর্থ "আহার"; "প্র" উপসর্গের সহিত তাহার অর্থ "প্রহার" এবং "সম্" উপসর্গের সহিত তাহার অর্থ "সংহার" করা হয়। সেই রূপ উপাদান কারণের বিভিন্নতাবশতঃ একই ব্রহ্ম ভিন্ন ভিন্নরূপে প্রতীয়মান হন। কুকুর দেহে ভগবান্ কুকুরত্ব, শূকর দেহে শূকরত্ব, মনুষ্যদেহে মনুষ্যত্ব ও দেব দেহে দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। রাম ব্রহ্ম, শ্যাম ব্রহ্ম, কুকুর ব্রহ্ম, শৃগাল ব্রহ্ম বস্তুতঃ একই, কেবল উপসর্গ ভেদে প্রকৃতি ও প্রবৃত্তির তারতম্য জানিবে।

(৪৪)

টাকা, পয়সা, সিকি, দুয়ানি, গিনি, মোহর সকল মুদ্রারই সম্মুখে রাজার মুখ দেখিতে পাইবে, পরন্তু তাহাদের পশ্চাদ্ভাগে প্রত্যেকের যথাযথ মূল্য লেখা আছে জানিও। সেইরূপ সকল মানুষেরই বহিরাকৃতি মানুষের মত কিন্তু তাহাদের প্রত্যেকের প্রকৃত মূল্য জানিতে হইলে উল্টা পিঠ দেখিতে হইবে ইহা নিশ্চয় জানিও।

(৪৫)

আওতায় বৃক্ষের পুষ্টি বৃদ্ধি হয় না, তাহার স্বাভাবিক বর্দ্ধন পোষণের জন্য

উত্তাপেরও আবশ্যকতা হয়; অনাবৃষ্টিতেও যেমন শস্য শুকাইয়া যায়, বহু বৃষ্টিতেও তেমনি আবার তাহা হাজিয়া যায়। তাই, দয়াময়ী মা আমাদের প্রাণের প্রকৃতি স্ফূর্ত্তি, পরিপুষ্টি ও উন্নতির জন্য তাহা ক্রমান্বয়ে সুখ শান্তি ও শোকসন্তাপে রক্ষা করেন। অবিরাম তাঁহার করুণাবারি বর্ষণে পাছে আমাদের প্রাণ হাজিয়া যায়, তাই মাঝে মাঝে মা আমাদের দুঃখ তাপ দিয়া থাকেন। ইহা তাঁহার অসীম দয়ারই নিদর্শন বলিয়া জানিও।

(৪৬)

প্রত্যহ প্রাতঃকালে শয্যাত্যাগ করিয়া যেমন দেহের মল নিঃসারণে যত্নবান্ হও, সেইরূপ ভাই, মনের মলাপসারণেও যত্ন করিও। দেখিবে চিরদিন শান্তি সুখে অতিবাহিত হইবে। কোষ্ঠশুদ্ধি না হইলে যেমন দেহের বিবিধ ব্যাধি উৎপন্ন হয়, মনের কোষ্ঠ পরিষ্কার না হইলেও তদ্রূপ নানাবিধ মনের ব্যাধি আসিয়া উপস্থিত হয়।

(৪৭)

ত্রিজগৎ খুঁজিয়া আইস, অভিধানের "স" এর কোটার একটী স্থান ভিন্ন যদি আর কোথাও "সুখ" দেখিতে পাও ত আমার কাণ মলিয়া দিও।

(৪৮)

প্রেমের অভিব্যক্তিই প্রেমের বেশ্যাবৃত্তি। প্রকৃত প্রেমের স্ফুরণ হয় না। যে তোমাকে তাহার ভালবাসা টের পাইতে দেয়, নিশ্চয় জানিও সে তোমায় ভালবাসে না। ভালবাসা মনের অচিন্তনীয় অব্যক্ত বৃত্তি, তাহার বিকাশই তাহার ব্যভিচার। হৃদয়ের নিভৃত প্রদেশে যে না তাহা সযতনে সন্তর্পণেও সঙ্গোপনে পোষণ করিতে পারে, তাহার প্রেম করা বিড়ম্বনা মাত্র। হৃদয় ফাটিয়া যখন প্রেম প্রবাহ স্বতঃই দিগ্‌দিগন্তে প্রধাবিত হইবে তখন সেই স্রোতে ভাসিয়া যাইও তথাপি মুখ ফুটিয়া কখনও প্রেমের পরিচয় দিও না।

(৪৯)

কোন বিষয়ে লক্ষ স্থির করিয়া তৎপ্রাপ্ত্যর্থে নিয়মিত উদ্যম চেষ্টাকেই লোকে সাধনা বলে। আমি বলি ভাই! দয়াময়ের চরণে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিয়া নিশ্চেষ্ট থাকাই সাধনার চরম।

(৫০)

হৃদয় পরিপক্ক হইলে মুখ দিয়া মিষ্ট কথা বাহির হয়, নতুবা শুধু মিষ্টান্ন ভোজন করিলেই মুখ মিষ্ট হয় না।

(৫১)

একটী circleএর যে কোন pointএ ছেদ কর তাহার দুইটী pole হইবে, তাহা সোজা করিয়া ধরিলে তাহার একটী সর্ব্বোচ্চ ও অপরটী সর্ব্বনীচে হইবে; পরন্তু দুইটী opposite poleই একটী pointএর রূপান্তর মাত্র। সেইরূপ সৃষ্টির সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও সর্ব্বাধম দুই বস্তুই একের রূপান্তর মাত্র। উৎকর্ষাপকর্ষের চরম সীমা চিরদিনই এক।

(৫২)

এখানকার আদালতে মক্কেলের সংখ্যা অপেক্ষা উকিলের সংখ্যা অনেক অধিক; কিন্তু ভাই! ধর্ম্মের এজলাসে একটীও উকিল মোক্তার নাই, সেখানে সকলকেই স্বয়ং জবাব দিতে হয়, ইহা বুঝিয়া চলিও।

(৫৩)

মানবের স্বাধীনতাও "স্বস্থ অধীনতা"; তাহার কপালে স্বতন্ত্রতা ভগবান্ কখনও লেখেন নাই। "পরাধীন" বলিলে কোন এক নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তির অধীন বুঝায়, পরন্তু "স্বাধীন" বলিলে নিজেরই পাঁচ দশ পঁচিশের অধীন বুঝায়।

(৫৪)

পাপী তাপীর অনুতাপ উষ্মা ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া দয়াময়ের শীতল চরণ সংস্পর্শে দ্রবীভূত হইয়া পৃথিবীতে পতিতপাবনী নাম ধারণ করিয়াছে। নতুবা মহাদেবের সঙ্গীত শ্রবণে যে ভগবানের পা ঘামিয়াছিল ইহা আমার বিশ্বাস হয় না।

(৫৫)

পাঠশালার গুরুমহাশয়ের নিকট হাতে খড়ি হইলে যে কালেজের অধ্যাপকদিগের নিকট আর উচ্চ সাহিত্য পড়িতে নাই, এমন কথা ত কোথাও শুনি নাই। কুলগুরু মহাপণ্ডিত না হইলেও তাঁহার নিকট অধ্যাত্মবিদ্যার বর্ণপরিচয় হইতে আপত্তি কি তাহা ত বুঝিতে পারি না;

আত্মতত্ত্বের নিগূঢ় রহস্য না হয় ছাই-ভস্ম-মাখা নাক-কাণ-টেপা সাধু সন্ন্যাসীর নিকট বুঝিতে যাইও। বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের পথ মুটে মজুর পাঁচ বছরের ছেলে যাহাকে জিজ্ঞাসা করিবে সেই বলিয়া দিতে পারে, তাহার জন্য মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতের আবশ্যক কি?

(৫৬)

পাপী সন্তানের কুকর্ম্মরাশি দেখিয়া মা আমার লজ্জায় যে জিভ্ কাটিয়াছেন তাহা আর এ পর্য্যন্ত তিনি গুড়াইতে পারিলেন না। সন্তানের পাপের নিবৃত্তি নাই, মাও চিরদিন জিভ্ বাহির করিয়া রহিলেন।

(৫৭)

জীবন-জ্যামিতির প্রথম প্রতিপাদ্য প্রতিজ্ঞাই হইতেছে "একটী নির্দ্দিষ্ট সীমাবদ্ধ সরলরেখার উপর একটী সমত্রিবাহু ত্রিকোণ অঙ্কিত করিতে হইবে"; অর্থাৎ সরল সীমাবদ্ধ প্রাণে ত্রিগুণের সাম্য প্রতিপাদন করিতে হইবে। এই ত্রিকোণের মধ্যস্থিতবিন্দুতেই প্রাণের অধিষ্ঠাতৃদেবতাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে।

(৫৮)

সৃষ্টির প্রথমে এক পাগল ছিল এবং প্রলয়ের পরেও এক পাগল থাকিবে; সেই পাগলই প্রকৃত পাগল, আর যত দেখ সব নকল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীগোবিন্‌লাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

কঃ পন্থা?

"মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা।" পথ কি? ইহার উত্তরে আবহমান কাল শুনিয়া আসিতেছি, মহাজনগণ যে পথে গিয়াছেন সেইটীই প্রশস্ত পথ। এই দুইটী বাক্যের প্রকৃত অর্থ গ্রহণ করিতে হইলে কি কি বিষয়ের অবতারণা করিতে হইবে তাহা আমাদের প্রথম আলোচ্য বিষয় হইতেছে।

জীব কি? ঈশ্বর কি? ও এতদুভয়ের মধ্যে সম্বন্ধ কি? তাহা কথঞ্চিৎ হৃদয় মধ্যে ধারণা করিতে না পারিলে পথ কি তাহা বুঝিতে পারা যাইবে না।

কেন না 'পথ কি ?' বলিলেই বুঝিতে হইবে কোন এক ব্যক্তি এক স্থান হইতে অন্য স্থান যাইবে, কোন না কোন একটা উদ্দেশ্য সাধন জন্যও যাইবে ; তবে কোন পথ অবলম্বন করিয়া যাইবে তাহাই বিবেচ্য। অতএব কে যাইবে, কোথায় যাইবে, কেন যাইবে, তাহা অগ্রে স্থিরীকৃত না হইলে, কোন্ পথে যাইবে বা কোন্ পথ অবলম্বন করা তাহার পক্ষে শ্রেয়স্কর, তাহা স্থির করা সহজ নহে। তজ্জন্য, পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে আমি কে এবং ভগবান কি ও তাঁহার সহিত আমার সম্বন্ধ কি, না জানিলে আমার গন্তব্য পথ স্থির করা যাইতে পারে না।

প্রস্তাবিত বিষয়টী এত গুরুতর যে তৎসম্বন্ধে আমার ন্যায় অজ্ঞ ব্যক্তির কোনরূপ বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া নিতান্ত ধৃষ্টতার কার্য্য। ইহা জানিয়াও এই গুরুতর বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবার একমাত্র কারণ প্রাণের উদ্দাম তৃষ্ণা ভিন্ন আর কিছুই নয়। যাহা হউক, আমি যতদূর পারি ; মহাজন বাক্য উদ্ধৃত করিয়া এই পরম সত্যের আলোচনা করিব। আমার কপোলকল্পিত কোন কথারই অবতারণা করিব না।

শ্রীভগবানের শ্রীমুখের বাক্য এই যে :—"মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ"।

আর মহাজন বাক্যেও ইহা পাওয়া যায় যে:—"স সচ্চিদানন্দো জ্ঞানাগম্যো ভক্তি বিষয়ত্বাৎ।" "সচ সত্যোনিত্যোঽনাদিরনন্তঃ দেশকালাপরিচ্ছেদাৎ।" "একঃ পরো নান্যঃ।" "জীবস্তু পরানুগতঃ।" "সোপি অনাদিরনন্তঃ।" "চিদানন্দস্বরূপোঽপি পরতো ভিন্নঃ নিত্য সত্যত্বাভাবাৎ।"

পূর্ব্বোদ্ধৃত ভগবৎ বাক্য ও মহাজন বাক্য দ্বারা ইহা স্পষ্ট জানা যাইতেছে যে ভগবান সচ্চিদানন্দস্বরূপ, সত্য, নিত্য, অনাদি ও অনন্ত, দেশ ও কালের দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন ; তিনিই একমাত্র পরম বস্তু, তাঁহার অপেক্ষা অন্য পর বস্তু আর কিছুই নাই। জীব চিৎকণা মাত্র, সেই পর বস্তুর সম্পূর্ণ অনুগত। যদিও জীব তাঁহার ন্যায় অনাদি, অনন্ত, ও চিদানন্দ স্বরূপ, তথাপি নিত্য সত্যের অভাব বশতঃ জীব পরমেশ্বর হইতে ভিন্ন। এই সনাতন জীব সেই সনাতন পরমেশ্বরের অংশ। জীবেশ্বরে পরমার্থতঃ কোন পার্থক্য না থাকিলেও জীব অবিদ্যার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃ পুনঃ সংসারে যাতায়াত করিতেছে ; কিন্তু তিনি

মায়ার বহির্ভূত,মায়া তাঁহাকে কখনও বশীভূত করিতে পারে না ; তিনি মায়ার ঈশ্বর, প্রভু ও স্বামী ; মায়া তাঁহার নিকট বিলজ্জমানা। যদিও জীব সম্বন্ধে এই অঘটনঘটনপটীয়সী মায়া অনিবার্য্যা, তথাপি ঈশ্বর সম্বন্ধে তিনি একবারেই দাসী। জীব পক্ষে তিনি দুরত্যয়া হইলেও তিনি ভগবানের অনুগতা। একমাত্র ভগবানের আশ্রয় ভিন্ন মায়ার দুর্ভেদ্য শক্তি হইতে পরিত্রাণের অন্য কোন উপায় নাই। ইহা ভগবান্ স্বয়ংই বলিয়াছেন :—

"দৈবী হেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তিতে ॥"

"আমার এই দৈবী এবং ত্রিগুণাত্মিকা মায়া দুস্তরা ইহা প্রসিদ্ধই আছে, কিন্তু অব্যভিচারী ভক্তিক্রমে যে ব্যক্তি আমাকে ভজনা করে, সেই ব্যক্তি এই মায়া হইতেও উত্তীর্ণ হইয়া আমাকে জানিতে পারে।"

"শ্রুতিতেও এই মহৎ বাক্যের প্রমাণ আছে :—"মায়াংতু প্রকৃতিং বিদ্ধি মায়িনন্তু মহেশ্বরম্।" অর্থাৎ প্রকৃতিই মায়া, ভগবান মায়ী।

অতএব প্রতিপন্ন হইল যে ভগবানে ও জীবে প্রকৃত প্রস্তাবে কোন ভেদ না থাকিলেও তিনি অবিদ্যার বশবর্ত্তী নহেন ; কিন্তু জীব অবিদ্যার মোহে ক্রমশঃ সেই পরাৎপর পরম পুরুষ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্থানভ্রষ্ট বশতঃ পুনঃ পুনঃ দুঃখ সঙ্কুল সংসারে যাতায়াত করিতেছে। নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাইবার জীবের আর সামর্থ্য নাই ; অনর্থের পর অনর্থ, মোহের পর মোহ আসিয়া তাহাকে প্রতি মুহূর্ত্ত স্বস্থান হইতে দূরবর্ত্তী করিয়া ফেলিতেছে ; এখন কক্ষভ্রষ্ট গ্রহের ন্যায় অনন্ত শূন্যে ঘূর্ণায়মান হইতেছে। নিজ পিতার আলয় হইতে জীব এক্ষণে অনন্ত যোজনব্যাপী দূরে অবস্থিত। কে তাহাকে পুনরায় সেই শান্তিময় পিতৃ রাজ্যে লইয়া যাইবে ? কি উপায়ে পুনরায় জীব সেই শান্তি নিকেতনে নীত হইবে ? ভীষণ পথ অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে ! নিজের চরণে বল নাই ; হৃদয়ে শক্তি নাই ; পূর্ব্ব পথ আর স্মৃতিতে অঙ্কিত নাই ; কে তাহাকে এই ভীষণ আবর্ত্তময় সংসার স্রোতের প্রবল তরঙ্গ হইতে উত্থিত করিয়া পুনরায় সেই শক্তিময় নিকেতনের পথ প্রদর্শন করাইয়া দিবে ? কে অপার সংসারার্ণবের কর্ণধার হইবে ?

যদি প্রকৃত প্রস্তাবে জীবের এই ব্যাকুলতা জন্মে ; যদি প্রাণের মধ্যে

বাস্তবিকই পথহারা ভ্রান্ত পথিকের ন্যায় আকুলতা জন্মে; যদি সেই পথ অন্বেষণ জন্য প্রকৃতই প্রাণ ফাটিয়া যাইতে থাকে; যদি সেই শান্তি নিকেতনে যাইবার জন্য সংসারের সকল প্রিয়তম বস্তুই বিষবৎ বোধ হয়, তাহা হইলে জীব দেখিতে পাইবে, করুণাময় দয়ারসাগর নানারূপ ধারণ করিয়া পথি মধ্যে দণ্ডায়মান আছেন; প্রতিমুহূর্ত্তেই হস্তপ্রসারণ পূর্ব্বক সম্বোধন করিতেছেন, "এস পান্থ, তোমার জন্য উজ্জ্বল সুবর্ণ প্রদীপ হস্তে করিয়া দাঁড়াইয়া আছি, পথ অতিশয় পরিষ্কার! তবে, মধ্যে মধ্যে যে আবর্ত্ত দেখিতেছ, তাহা দেখিয়া ভীত হইও না। আমার হস্তস্থিত দীপালোকে তোমার অজ্ঞানান্ধকার বিনষ্ট হইবে; তুমি নির্ভয়ে তোমার পূর্ব্ব নিকেতনে আগমন কর "আমি পদে পদে তোমার সঙ্গে যাইতেছি।" তিনি প্রকৃত প্রস্তাবে পথের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত আলোক দেখাইতেছেন, কেবলমাত্র জীবের পথে চলিবার ইচ্ছার অভাব। যে দিন জীব আকুল হইয়া প্রাণ ভরিয়া কাঁদিয়া উঠিবে "কোথায় প্রভো! অজ্ঞানান্ধকারে হৃদয় আচ্ছন্ন! পথ যে দেখিতে পাইনা! কোন পথে গেলে তোমার ঐ আনন্দময় চিদ্‌ঘন মূর্ত্তি নয়ন গোচর হইবে? প্রভো! এই অধমের প্রতি কৃপা কণা বিতরণ পূর্ব্বক একবার হৃদয়ের অন্ধকার রাশি দূরীভূত কর; একবার পাপচক্ষে তোমার প্রেমাঞ্জন লেপন কর; আমি তোমার ঐ মোহন মূর্ত্তি দৃষ্টি গোচর করিয়া মনুষ্য জন্ম সার্থক করি"—সেই দিন সেই মুহূর্ত্তেই, জীব দেখিতে পাইবে, তাহার সম্মুখেই বিস্তৃত রাজপথ বর্ত্তমান; অগ্রেই সেই চিদানন্দ মূর্ত্তি গুরুরূপে দণ্ডায়মান! একহস্তে সুবর্ণ প্রদীপ, ও অন্য হস্তে অভয়। তখন জীব আনন্দে আত্ম হারা হইয়া, সেই গুরুরূপী ভগবান্‌কে সাদরে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত পূর্ব্বক, পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া ভক্তিভরে বলিতে থাকিবে :—

"অখণ্ড মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মিলীতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥"

যে পথটীর বিষয় উল্লেখ করিলাম সেই পথটী কি, তাহাই আমাদের আলোচ্য

বিষয়। গন্তব্যস্থানে যাইবার অনেকগুলি পথ আছে ; তন্মধ্যে কোনটি সুদূর বিস্তৃত, কোনটী নিকটবর্ত্তী, কোনটী অতিশয় দুষ্কর, ও কোনটী বা নিতান্ত সুগম। তবে অজ্ঞানাবৃত জীব কোন্‌টী ধরিয়া চলিবে? শাস্ত্র বলেন এই :—"মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা" অর্থাৎ মহাজন যে পথে গিয়াছেন, সেইটীই পথ। বাক্যটী বড়ই দুরূহ! হিন্দু শাস্ত্র আলোড়ন করিলে দেখা যায় যে মহাজন ভূরি ভূরি! তবে কোন মহাজনের গন্তব্য পথে বিচরণ করিতে হইবে? ইহার মীমাংসা কি? এই জটীল শাস্ত্রের আবর্ত্ত হইতে জীবকে উদ্ধার করিবার জন্য পরম কারুণিক শ্রীভগবান স্বয়ং কখন কখন এই ভবমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, ও তাঁহার শ্রীমুখের মধুর আশ্বাসময়ী বাণী দ্বারা অতি জটিল শাস্ত্রার্থ সকল পরিষ্কার করিয়া দেন। এমত অবস্থায় আমাদের মহাজন বাক্য সম্বন্ধে কোনরূপ সন্ধিহান হইবার কোন কারণ নাই। যখন শ্রীহরির শ্রীমুখের বাক্যই আমাদের সম্মুখে অবস্থিত তখন আমাদের অন্য বাক্যের অপেক্ষা করিবার কোন আবশ্যক নাই। তবে আমাদের ভগবদ্বাক্যে শ্রদ্ধা চাই, এক্ষণে আসুন দেখা যাউক জীবের প্রকৃষ্ট পথ সম্বন্ধে শ্রীভগবান কি বলিয়াছেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে উল্লেখ আছে যে যখন শ্রীভগবান তাঁহার কার্য্য শেষ করিয়া, লীলান্তে বৈকুণ্ঠধামে যাইবার জন্য উদ্যত, তখন তাঁহার একান্ত ভক্ত উদ্ধব চরণে লুণ্ঠিত হইয়া মনোবেদনা জ্ঞাপন করিলে, ভগবান হরি আপন প্রিয় ভক্তের প্রতি কৃপা বশতঃ তাঁহাকে সংসারে থাকিবার জন্য অনুরোধ করেন ও জীবের উদ্ধারের নিমিত্ত উদ্ধবকে ভাগবৎ ধর্ম্ম উপদেশ দেন। উল্লিখিত উপদেশ মধ্যে জীবের শ্রেয়স্কর পথ কি তাহা শ্রীভগবান্ একদেশ স্কন্ধের চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে বিশদরূপে দেখাইয়াছেন। আমাদের মত মোহান্ধ জীবের পক্ষে তাহার শ্রীমুখের বাণী অমৃত তুল্য। আসুন ভগবান কি বলেন দেখা যাউক—উদ্ধব জিজ্ঞাসা করিলেন :—

"বদন্তি কৃষ্ণ শ্রেয়াংসি বহুনি ব্রহ্মবাদিনঃ।
তেষাং বিকল্প প্রাধান্য মুতা হো একমুখ্যতা॥
ভবতোদাহৃতঃ স্বামিন্ ভক্তি যোগোহনপেক্ষিতঃ।
নিরস্য সর্ব্বতঃ সঙ্গং যেন ত্বয্যা বিশেন্মনঃ॥

"হে কৃষ্ণ ব্রহ্মবাদি ঋষিগণ শ্রেয়ঃ সাধন নানা প্রকার বলিয়াছেন—তাহার মধ্যে একটী প্রধান কি সকলেই স্ব স্ব প্রধান, ইহা বলিতে আজ্ঞা হয়। হে স্বামিন্! আপনা কর্ত্তৃক কথিত স্বয়ং প্রধান যে ভক্তিযোগ, যাহার দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ নিরাসপূর্ব্বক আপনাতেই মন প্রবেশ করে, তাহাই প্রধান কি না?"

শ্রীভগবান্, উদ্ধব বাক্যের প্রত্যুত্তরে কি ভাগবৎ ধর্ম্মের ভিন্ন ভিন্ন আকার প্রাপ্তি হইয়াছে তাহা দেখাইয়া বলিতেছেন।ঃ—

"ময্যার্পিতাত্মনঃ সভ্য নিরপেক্ষস্য সর্ব্বতঃ।
ময়াত্মনা সুখং যত্তৎ কুতঃ স্যাদ্বিষয়াত্মনাৎ॥
অকিঞ্চনস্য দান্তস্য শান্তস্য শম চেতসঃ।
ময়াসন্তুষ্টমনসঃ সর্ব্বাঃ সুখময়াঃ দিশঃ॥"

"অন্যান্য পথিকের ফল স্বরূপ লোক সমূহ অনিত্য, কর্ম্মজনিত, দুঃখ মিশ্রিত, মোহময়, ক্ষুদ্র, মন্দ এবং শোক পরিব্যাপ্ত; কিন্তু হে সভ্য! ভক্তির মুখ্য, এই যে যাঁহারা আমাতে আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক নিরপেক্ষ হইয়াছেন, আমার প্রাপ্তির দ্বারা তাঁহাদের সর্ব্বপ্রকার সুখ হয়; বিষয় বাসনা দ্বারা বশীভূত লোকদিগের সে সুখ কোথায়? আমাতে সন্তুষ্টমানস, অকিঞ্চন, শান্ত ও সমচেতা ব্যক্তির সকল দিকই সুখময়রূপে প্রতীত হইয়া থাকে।" ভগবানে অর্পিতাত্মা ভক্ত পুরুষ একমাত্র ভগবান ব্যতীত অন্য ব্রহ্মলোক অথবা ইন্দ্রলোক কিম্বা সার্ব্বভৌম পদ অথবা পাতালের আধিপত্য কিম্বা যোগসিদ্ধি বা নির্ব্বাণ মুক্তি কিছুই ইচ্ছা করেন না। ভক্তি পথের অনুবর্ত্তী ভক্ত পুরুষ সম্বন্ধে পুনরায় বলিতেছেন :—

"নিষ্কিঞ্চনা ময্যনুরক্ত চেতসঃ শান্তা মহান্তোঽখিল জীব বৎসলাঃ।
কামৈরনালব্ধধিয়ো জুষন্তি তে যন্নৈরপেক্ষ্যং ন বিদুঃ সুখং মম॥১॥
নিরপেক্ষং মুনিং শান্তং নির্ব্বৈরং সমদর্শনম্।
অনুব্রজাম্যহং নিত্যং পূয়েয়েতঃঙ্ঘ্রিরেণুভিঃ॥২॥"

আমি নিরপেক্ষ, শান্ত, নির্ব্বৈর ও সমদর্শন মুনিব্যক্তির নিত্য পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়া থাকি, কারণ উক্ত প্রকার ব্যক্তির চরণ ধূলি দ্বারা আপনাকে ও আমার অন্তর্বর্ত্তি ব্রহ্মাণ্ডকে পবিত্র করিয়া থাকি। অকিঞ্চন, আমাতে অনুরক্ত চিত্ত, শান্ত, মহান্, অখিল জীববৎসল, কামনা

দ্বারা অস্পৃষ্টহৃদয়, মদ্ভক্ত ব্যক্তিরা যে সুখ ভোগ করেন তাহা তাঁহারাই জানেন; সেই সুখ নিরপেক্ষ ভক্তগণেরই লভ্য; অন্য লোকগণ তাহা জানিতে পারে না।" উত্তম ভক্ত সম্বন্ধে এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়া, ভগবান অধম বা প্রাকৃত ভক্ত সম্বন্ধে কি বলেন শ্রবণ করুন :—

"বাধ্যমানোঽপি মদ্ভক্তো বিষয়ৈরজিতেন্দ্রিয়ঃ।
প্রায়ঃ প্রগল্ভয়া ভক্ত্যা বিষয়ৈর্নাভিভূয়তে॥
যথাগ্নিঃ সুসমৃদ্ধার্চ্চিঃ করোত্যেধাংসি ভস্মসাৎ।
তথা মদ্বিষয়া ভক্তিরুদ্ধবৈনাংসি কৃৎস্নশঃ।"

"আমার ভক্ত ব্যক্তি অজিতেন্দ্রিয়তা বশতঃ যদি কখন বিষয় ব্যবহারে বাধ্য হয়েন, তথাপি তিনি প্রগল্‌ভ ভক্তি প্রভাবে বিষয়দ্বারা অভিভূত হয়েন না। অগ্নি যেমন কাষ্ঠাদি নিমিত্ত প্রজ্জলিত হইয়া প্রদীপ্ত শিখা দ্বারা কাষ্ঠাদি সকলকে ভস্ম করে, তদ্রূপ মদবিষয়া ভক্তি সমুদায় পাপরাশি বিনষ্ট করিয়া থাকে।"

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅটলবিহারী সিংহ

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

সর্ব্বজনীন ভ্রাতৃভাব সাধনাকল্পে আমরা পন্থায় প্রকাশের জন্য কোন নির্দ্দিষ্ট বিষয় সম্বন্ধে লিখিত প্রবন্ধের জন্য একটী স্বর্ণ পদক (Gold medal) উপহার দিব। বর্ত্তমান বর্ষের প্রবন্ধের বিষয় "হিন্দুধর্ম্মের সর্ব্বজনীনতা" প্রবন্ধে হিন্দুধর্ম্মের আচার দর্শন, অনুষ্ঠান ও সাধন এই চারিটী বিভাগের ভিতর দিয়া কিরূপে সর্ব্বজনীনভাব ওতপ্রোতভাবে ও স্তরে স্তরে বিন্যস্ত হইয়া সর্ব্বশেষে সাম্প্রদায়িক ভাব ত্যাগ করিয়া একই মূল তথ্যে উপনীত হওয়া যায়, এবং কিরূপে সর্ব্বশেষে সর্ব্বধর্ম্মের চরম লক্ষ্য করিয়া এক অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দ পদার্থ লাভ করা যায়, ইহাই শাস্ত্র, তন্ত্র, দর্শন, প্রাচ্য, প্রতীচ্য ও আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্যে প্রতিপন্ন করিতে হইবে। হিন্দুধর্ম্মের দার্শনিক অনুষ্ঠানিক প্রভৃতি বিভাগের মূল ভাবগুলির সহিত অন্যান্য ধর্ম্মের ঐক্যতা দেখা যায় তাহাও প্রমাণ করিতে হইবে। প্রবন্ধগুলির মধ্যে কোনটীও যদি মনোনীত

না হয়, তাহা হইলে উপহার প্রদত্ত হইবে না। ১লা আশ্বিনের মধ্যে প্রবন্ধ আমার নিকট পাঠান চাই। প্রবন্ধে কোনও ধর্ম্ম বা সম্প্রদায়ের উপর শ্লেষ থাকিবে না। মনোনীত প্রবন্ধ আমরা নিজ ব্যয়ে ছাপাইয়া বিতরণ করিব; তাহাতে লেখকের কোনও সত্ব থাকিবে না। কার্ত্তিক মাসের পন্থায় ও অন্যান্য সংবাদ পত্রে প্রবন্ধ নির্ব্বাচনের ফল প্রকাশিত হইবে। প্রবন্ধটী যেন আমাদের পন্থার আকারের ৭ ফর্ম্মা (৫৬ পেজের) অধিক না হয়।

"পন্থা" কার্য্যালয়।
২৮।২ ঝামাপুকুর লেন।

শ্রীরাজেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায়,
ম্যানেজার।

বিজ্ঞান, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য।

—October মাসের International Journal of Ethics পত্রিকায় সঙ্গীত সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধে মানবের আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ কিরূপে সঙ্গীত সাহায্যে সাধিত হয় তাহা বর্ণিত হইয়াছে। গীতায় শ্রীভগবান যে সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশের কথা বলিয়াছেন লেখক সেই মত অবলম্বন করিয়া সঙ্গীত সাহায্যে কিরূপে মানবের মানবজীবনের উন্নতি সাধিত হয় তাহা বর্ণনা করিয়াছেন। আমাদের দেশে ও পূর্ব্বকালে কলাবিদ্যার মধ্যে সঙ্গীত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিত, এমন কি মোক্ষেচ্ছু যোগীগণও সঙ্গীতের উপকারিতার প্রমান করিয়াছেন, কিন্তু কালধর্ম্মে এবং আমাদের আধ্যাত্মিক অধঃপতনের সহিত এই বিদ্যা এখন অসৎ লোকের এবং অসৎ সঙ্গের পরিচায়ক হইয়া উঠিয়াছে। সঙ্গীতের আধ্যাত্মিক অনুশীলন ভুলিয়া গিয়া কেবল কামদেহের ব্যবহারে ইহার প্রয়োগ, ইহা অতীব দুঃখের বিষয়।

—আজকাল শিক্ষিত যুবকবৃন্দের নিকট নলচালার কথা বলিলে বড়ই বিপদ। বৈজ্ঞানিক আলোকে আলোকিত, বৈজ্ঞানিক ধর্ম্মের অনুসন্ধানে রত নব্য দল বোধ হয় একেবারে হাসিয়া উঠিবেন। কিন্তু আমেরিকা; অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি স্থানে কূপাদি খননের পূর্ব্বে আজকাল কিরূপ নলের সাহায্যে জল নির্গমনের স্থান নির্দ্দেশ করা হয়, তাহা শুনিলে আমাদের আলোক প্রাপ্ত ভ্রাতারা একেবারে বসিয়া পড়িবেন। নলচালকের হস্তে একটী "V"র মত কাষ্ঠখণ্ড থাকে, ঐটী হাতে করিয়া জমির উপর দিয়া যাইলে যে স্থানের অভ্যন্তরে জলের প্রস্রবণ আছে ঐ স্থানে আসিলেই কাষ্ঠখণ্ডটী আপনা আপনি নড়িয়া উঠিয়া অধোমুখী হয় এই প্রকার ক্ষমতাম্বিত লোককে ইংরাজিতে Dousers বলে। মৃত দার্শনিক Myers সাহেবের পুস্তকে অনেকগুলি বিশ্বাসযোগ্য ঘটনার সন্নিবেশ আছে, তাহার মতে ঐ শক্তি মানবের কূটস্থ চৈতন্যের (Subliminal consciousness) বিকাশ মাত্র। হিন্দুমতে ঐ শক্তি জড়জগতের অতীত মানবের স্থূল বা জাগ্রত অবস্থার বহির্ভূত, দেবচৈতন্য ও মানব সাধন দ্বারা ঐ শক্তি প্রাপ্ত হয়। Devon United Mines Syndicate অর্থাৎ ইংলণ্ড অন্তঃপাতী ডিভন শায়ারের

খনি ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি কিরূপে ঐ প্রকার কাষ্ঠখণ্ড সাহায্যে ভূমির অভ্যন্তরস্থ ধাতুর অস্তিত্ব জানিতে পারেন। এক্ষণে আমাদের দেশে প্রচলিত নলচালা ও বাটীচালা প্রভৃতি গুপ্ত ধনাদি খুজিবার উপায় সকল কি একেবারে অবৈতনিক? বিজ্ঞান সাহায্যে পরিমার্জ্জিত মন এই সকল জাতীয় ব্যাপারে প্রয়োগ করিলে দেশের কি মঙ্গল হয় না? জগদীশ বাবুর মত কতজন এইরূপ চিন্তাশীল ও যথার্থ স্বদেশানুরাগী?

—কালের ধর্ম্ম কে বুঝিতে পারে, যন্ত্রের সাহায্যে অঙ্ক কষা যায় তাহা অনেকে জানেন। সম্প্রতি আমেরিকায় Daily mail পত্রে তত্রস্থ কালিফর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক অধ্যাপক Professor Charles Reiber একটী কলের আবিষ্কারের কথা লেখেন। ইহার সাহায্যে প্রতীচ্য ন্যায়ের প্রশ্ন বা Syllogysm সকলের মীমাংসা করা যায়।

—পূর্ব্বে প্রতীচ্য দার্শনিকেরা এই ন্যায়শাস্ত্রে প্রকটিত বিচার শক্তিকে (Logical Reason) মানবের বিশেষত্ব বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন। কিন্তু এখনও কি তাই করিবেন? প্রকৃতি এবং তাহার বিকৃতিস্বরূপ মন এবং বুদ্ধি যে জড় তাহা কি স্বীকার করিবেন?

সমালোচনা।

নব্যভারত, চৈত্র ১৩১১। এই সংখ্যায় ধীরেন্দ্র নাথ চৌধুরী মহাশয় ভারতের "রাজভক্তি" শীর্ষক প্রবন্ধে "ফেল কড়ি মাখ তেল" রকমের রাজভক্তি প্রকাশ করিয়াছেন। "প্রাচীন ভারতের বাণিজ্য" নামক প্রবন্ধে পুরাকালে বাণিজ্যের বিস্তার বর্ণিত। "স্ত্রী-পুং" ভেদ নামক প্রবন্ধটী মোটামুটি চলন সই। ৺শ্রীধর বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের স্বর্গারোহণ লইয়া কিছু বাড়াবাড়ি হইয়াছে। শ্রীচন্দ্রশেখর মাহাত্ম্য নামক গ্রন্থের সমালোচনাতে উদাসীন শ্রীমদ্বেদানন্দ স্বামী, যাঁহাকে আমরা শ্রীশীতলচন্দ্র বেদান্ত ভূষণ নামে পূর্ব্বে জানিতাম তাঁহার উপর একটু বেশী মাত্রায় কটাক্ষ পাত করা হইয়াছে। হয় ত স্বামীজী পুরোমাত্রা, অথবা সমালোচকের আশানুরূপ সন্ন্যাস জাহীর করিতে পারেন নাই। কিন্তু তা বলিয়া আধুনিক বাবুদের ঘরে বসিয়া লেখনী প্রসূত "জগত দেখ্‌রে চেয়ে যাচ্চি বেয়ে সুখের তরণী" সুরে বাঁধা সন্ন্যাসকে আমরা উচ্চ মনে করিনা। সমালোচকের আর এক ব্যাপারে আমরা বড়ই বিস্মিত আছি। তাঁহার মতে সন্ন্যাসী ও বৈদান্তিক হইলে আর কালী পূজা করা যায় না। এবং প্রেতাদি দর্শন একেবারে নিষিদ্ধ লেখকের মতে ওটা থিয়সফিষ্টদের মৌরসী। সমালোচকের চক্ষে স্থূল জগতের বিভিন্ন বস্তু পড়ে কি? ভিন্ন ভিন্ন লোকে যে ভিন্ন ভিন্ন জীব আছে ও দেবতাদি আছেন, একথা কি অদ্বৈতাচার্য্য শ্রীশঙ্কর অস্বীকার করেন? লেখকের বেদান্ত কেবল কচ্‌কচি মাত্র। তিনি বেদান্ত চর্চ্চা করিবার পূর্ব্বে বুদ্ধি বৃত্তির মার্জ্জন ও ষট্‌সম্পত্তি প্রভৃতি ঔষধের এক আধ দাগ পান করিয়া প্রকৃতিস্থ হইলে, যেন পুনরায় কলম ধরেন এই আমাদের প্রার্থনা।
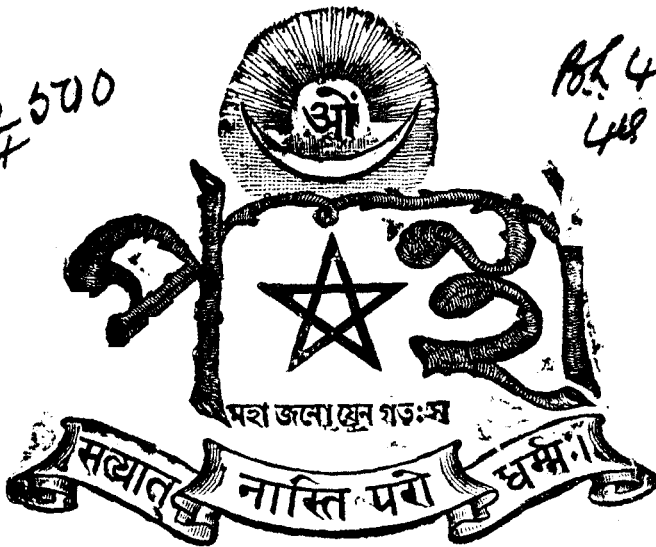
নবম ভাগ। { জ্যৈষ্ঠ ১৩১২ সাল } ২য় সংখ্যা।

মহিম্ন স্তব।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

অযত্নাদাসাদ্য ত্রিভুবনমবৈরব্যতিকরং
দশাস্যো যদ্বাহূনভৃত রণকণ্ডুপরবশান্।
শিরঃ পদ্মশ্রেণীরচিতচরণাম্ভোরুহবলেঃ
স্থিরায়াস্ত্বদ্ভক্তে স্ত্রিপুরহরবিস্ফূর্জ্জিতমিদং ॥ ১১।

অথ মহাত্মনঃ তে হরিহরাদয়ো মদনুবর্ত্তনসমর্থা ইত্যনুবর্তনফলমাহুঃ
:থং পাপাত্মা ত্বং তাদৃশ ফলমাশংসসে ইতি চেৎ, ন পাপাত্মাপি জন ত্বয়িভক্ত্যা
:হ অতুল্যমৈশ্বর্য্যমবাপ্য পরত্রাপি পরংপদংপ্রাপ্তবান্‌ইতি শ্লোকত্রয়েণদর্শয়ন্নাহ।

অযত্নাদিতি। দশ আস্যানি আননানি যস্য স দশাস্যোরাবণঃ যত্নঃ বিনাপি
:ণে সংগ্রামে যা কণ্ডুঃ অতিস্পৃহা তস্যাঃ পরবশান পরতন্ত্রান্ সংগ্রামলোলা
নিত্যার্থঃ বাহূনাসাদ্য প্রাপ্য নাস্তি বৈরস্য বিরোধস্য ব্যতিকরঃ সম্পর্কঃ যস্মিন্‌তৎ
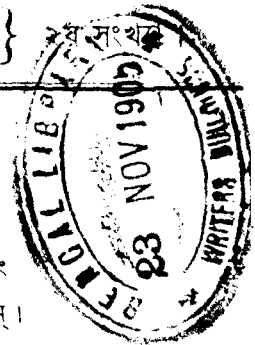
তথোক্তং ত্রিভুবনং অপ্রতিমমৈশ্বর্য্যমিত্যর্থঃ যৎ অভূৎঅধারয়ৎ। হে ত্রিপুরাহর ত্রিপুরাসুরস্থনাশক, পক্ষে, উৎপত্তিস্থিতিমৃত্যুরূপগতিত্রয়নবারক মোক্ষ-প্রদেত্যর্থঃ তদিদং বাহুধারণং, তদনন্তরং তৈরেব বাহুভিঃ ত্রিভুবনংপ্রাপ্তি শ্চেত্যর্থঃ শিরাংসি রাবণস্য স্বমস্তকান্যেব পদ্মানি কমলানি তেষাং শ্রেণীভিঃ পংক্তিভিঃ দশভিঃ শিরোভিরিত্যর্থঃ চরণাম্ভোরুহয়োস্তৎপাদপদ্মযো বলিঃ পূজোপহারঃ যয়া, ময়া ভক্ত্যাস্তৎপাদপদ্মযোঃ দশশিরাংস্যেব বলয়ঃ কৃতা ইত্যর্থঃ, তাদৃশায়াঃস্থিরায়াঃ দৃঢ়ায়াঃ ত্বয়ি ভক্ত্যাঃ ত্বদেক নিষ্ঠায়াভক্তেরিত্যর্থঃ বিস্ফূর্জ্জিতং প্রভাবঃ। রাবণঃ অনন্যপ্রতিদ্বন্দিনো রণদুর্ম্মদান্ বাহূনবাপ্য আয়াসং বিনা এব যৎ শত্রু বিরহিতং ত্রিভুবনং লব্ধবান্ তৎত্বয়ি তস্য দৃঢ় ভক্তরেব ফলমিতি ভাবঃ।

অত্র রামেণ পুনঃ স্তবিনাশাদপায়ো ন অস্মাভিঃ শঙ্কনীয়ঃ যতস্তস্য রাক্ষসস্য বিনাশ কালেঽপি তৎসংবর্দ্ধনার্থমেব বৈকুণ্ঠাদ্বিষ্ণুমূর্ত্তেস্তস্য রামরূপেণাবতরণং প্রবৃত্তিঃ তৎকৃপয়া চেতস্য মোক্ষপদপ্রাপ্তিরিতি। উক্তঞ্চ ভগবদ্গীতায়াং "মাংহি-পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপিস্যুঃপাপযোনয়ঃ। স্ত্রিয়োবৈশ্যাস্তথা শূদ্রা স্তেঽপিযান্তি রাপরাংগতিম্॥ কিংপুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যা ভক্তা রাজর্ষয়স্তথা॥ ইতি॥১১॥

যদি এখন বলেন যে হরিহর প্রভৃতি, পুণ্যাত্মা হওয়ার ফল পাইয়াছিলেন; তুমি পাপাত্মা কি প্রকারে তাদৃশ সুফল পাইবে ইহার উত্তর স্বরূপ এই কবিতায় পাপাত্মাও যে তোমাতে ভক্তি থাকিলে সুফল পাইয়া থাকে তাহার দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন।

হে ত্রিপুরারি, দশানন যে রণলালস বিংশতি বাহু প্রাপ্ত হইয়া অনায়াসে প্রতিদ্বন্দ্বিশূন্য ত্রিভুবনে আধিপত্য লাভ করিয়া ছিল, সে কেবল সে যে দৃঢ় ভক্তিতে স্বীয় মস্তকাবলি তোমার চরণে বলিদান করিয়াছিল, সেই দৃঢ় ভক্তির সুপ্রকাশিত ফল ॥১১॥

অমুষ্যত্বৎসেবা সমধিগতসারংভুজবলং
বলাৎ কৈলাসেঽপি ত্বদধিবসতৌ বিক্রময়তঃ।
অলভ্যা পাতালেঽপ্যলসচলিতাঙ্গুষ্ঠ শিরসি
প্রতিষ্ঠা ত্বয্যাসীদ্ ধ্রুবমুপচিতো মুহ্যতি খলঃ ॥১২॥

অথ স রাবণঃ দুরাত্মেতি কথং নির্ণীয়তে কথংবা স পরমেশ্বরেণ ময়া

তদ্দৌরাত্ম্যমপ্যবজ্ঞায় উচ্ছ্রয়ং প্রাপিত ইতি বদসীত্যাশঙ্ক্য কিমন্যৎ পরমেশ্বরেঽপিত্বয়ি তদীয়দৌরাত্ম্যং কথয়ামীতি বিবৃণোতি।

অমুষ্যেতি। বলাৎ বলমাশ্রিত্য বলদর্পাৎ তব পরমেশ্বরত্বং বিস্মৃত্যেত্যর্থঃ ত্বৎসেবয়া তব আরাধনয়া সমধিগতঃ সম্যক্ প্রাপ্তঃ সারঃ শ্রেষ্ঠতা যস্য তত্তথোক্তং ভুজানাং বাহূনাং বিংশতি সংখ্যকানাং বলং শক্তিং, ত্বদধিবসতৌ ত্বদাবাসভূতেঽপি কৈলাসে, বিক্রময়তঃ তদুৎপাটনবিধৌব্যাপারয়তঃ ইতর্থঃ, অমুষ্য পূর্ব্বোক্তস্য রাবণস্য বলেরিব পাতালেঽপি রসাতলেঽপি অলভ্যা উৎপাটিতকৈলাসগিরিগৌরবার্দ্দুর্লভেত্যর্থঃ প্রতিষ্ঠা স্থিতিঃ অলসং যথা তথা চলিতং অঙ্গুষ্ঠশিরঃ বামপাদাঙ্গুষ্ঠাগ্রভাগঃ যস্য তাদৃশে ত্বয়ি ত্বদ্রূপাশ্রয়ে, পশ্চাত্তু ভক্তোঽয়মিতি অনুকম্পয়া আর্ত্তস্বরমুৎক্রোশতস্তস্য অধোগতি নিরোধার্থং লীলয়া প্রসারিতে তব চরণাঙ্গুষ্ঠাগ্রে আসীৎ। কৈলাস পর্ব্বত ভয়াৎ পাতাল তোঽপ্যধঃ প্রস্থিতস্য তস্য রক্ষার্থ্য শিবঃ পশ্চাৎ পাদাঙ্গুষ্ঠাগ্রেণ সপর্ব্বতংতং ধারয়ামাসেতি পৌরাণিকী প্রবৃত্তি এতেন সম্পাদাদ্যবাপ্তৌ কদাচিদ্বিচলিতেষ্বপি ভক্তেষু স্নিগ্ধেষু পুত্রেষ্বিব নতে প্রশ্রয়হানিরিতি সূচিতং। কথং ভক্তস্য তস্য ত্রৈলোক্য শরণে শিবেঽপ্যেতাদৃশী প্রবৃত্তিরিত্যত আহ। ধ্রুবমিতি। খলঃ নীচপ্রকৃতিকঃ উপচিতঃ সমৃদ্ধঃ সন্ ধ্রুবং নিশ্চিতং মুহ্যতি কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যবিবেকরহিতো ভবতি। অত্র সামান্যেন বিশেষকথনরূপ অর্থান্তর ন্যাসোঽমলঙ্কারঃ। যদুক্তং সামান্যং বা বিশেষোবা তদন্যেন সমর্থ্যতে যত্র সোঽর্থান্তর ন্যাসঃ সাধর্ম্ম্যেণে তরেণেতি। কাব্যপ্রকাশে। ১২।

রাবণ যে দুরাত্মা তাহা কিরূপে স্থির করিলে? এবং তাহার দৌরাত্ম্য সত্বেও যে আমি তাহাকে উন্নত করিয়াছি এরূপ কেন বলিতেছ? এইরূপ বাক্যের আশঙ্কা হওয়ায় বলিতেছেন। প্রভু অন্যের উপর দৌরাত্ম্যের কথা আর কি বলিব? আপনার উপরই তাহার কিরূপ দৌরাত্ম্য হইয়াছিল তাহাই দেখুন।

ঐ রাবণ তোমার আরাধনা করিয়া তোমারই কৃপায় যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভুজবল পাইয়াছিল, তোমার ঈশ্বরত্ব ভুলিয়া সেই ভুজবল তোমারই অধিবাসভূত কৈলাসোৎপাটনে প্রয়োগ করিয়াছিল। অনন্তর মূঢ় যখন সেই উত্তোলিত কৈলাসভারে পাতালেও স্থান না পাইয়া ক্রমেই অধোগামী হইতে লাগিল,

তখন তুমিই আবার লীলা প্রসারিত অঙ্গুষ্ঠাগ্রভাগ দ্বারা পর্ব্বত সহিত তাহাকে ধারণ করিয়া রক্ষা করিয়াছিলে। হে ত্রৈলোক্যশরণ! নির্ব্বোধ খলেরা সম্পদ পাইলে এইরূপই কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞানশূন্য হয়; কিন্তু তুমি কখনও তাহাদের প্রতি পুত্রস্নেহ পরিত্যাগ কর না। ১২।

যদৃদ্ধিং সুত্রাম্ণো বরদ পরমোচ্চৈরপি সতী
মধশ্চক্রে বাণঃ পরিজনবিধেয় ত্রিভুবনঃ।
নতচ্চিত্রং তস্মিন্ বরিবসিতরি তচ্চরণয়ো
র্ন কস্যোন্নত্যৈ ভবতি শিরসস্ত্বয্যবনতিঃ॥ ১৩॥

ভক্তেঃ সাফল্যপ্রদর্শনার্থং দৃষ্টান্তান্তরমুদাহরতি। যদিতি। বরং অভীষ্টংদদাতীতি বরদস্তৎসম্বোধনে হে বরদ অভীষ্টপ্রদ, পরিজনবৎ পোষণার্থি পরিবারবদ্ বিধেয়ং অধীনং আজ্ঞাধীনমিতি যাবৎ ত্রিভুবনং যস্য সতথোক্তো বাণঃ তন্নামকো দৈত্য ভেদঃ সুষ্টুত্রায়ত ইতি সুত্রামা সুপূর্ব্বক ত্রাধাতোর্মনিন্ প্রত্যয়ঃ, পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। তস্য তথোক্তস্য ইন্দ্রস্য। সুত্রামা গোত্রভিদ্বজ্রীত্যমরঃ। পরমোচ্চৈঃ সতীমপি সর্ব্বোৎকর্ষেণবর্ত্তমাণামপি ঋদ্ধিং শ্রিয়ং যদ্ অধশ্চক্রে তিরশ্চকার। ইন্দ্রসম্পদোঽপি স্বসম্পদাধিক্যকরণাৎ তৎ সম্পদস্তিরস্করণম্, তৎইন্দ্রসম্পদধঃকরণম্ তয়োঃ চতুর্ব্বর্গ ফল প্রদয়োঃতব চরণয়োঃ। বরিবসিতরি আরাধয়িতরি। বৃ সেবায়াম্ ইতি বৃধাতো রিবস্থুন্ ইতি বরিবস্ পূজনে, ততো বরিবশ্চিত্রঙঃ ক্যজিতি কর্ত্রর্থে ক্যচ্ তৃচ্ চ তস্মিন বরিবসিতরি ন চিত্রং নাশ্চর্য্যম। বরিবসিতে বরিবসিতমুপসিতঞ্চোপচরিতঞ্চেত্যমরঃ। কুত ইত্যাহ। ত্বয়ি শিরসঃ অবনতিঃ কস্য উন্নত্যৈ শ্রেয়সে ন ভবতি। ত্বদুপাসকস্য সর্ব্বস্থৈবোন্নতির্ভবতীতি ভাবঃ। ১৩।

ভক্তির মাহাত্ম্য প্রদর্শনার্থ পুনরায় দৃষ্টান্তান্তর প্রদর্শন করিতেছেন।

ত্রিভুবনকে পোষণার্থী পরিবারের ন্যায় আজ্ঞাধীন করাতে বাণ রাজা সর্ব্বোৎকৃষ্ট দেবরাজ সম্পৎকেও যে তিরস্কার করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার পক্ষে আশ্চর্য্য নয়। কেন না তিনি তোমার ভক্ত। হে প্রভো তোমার পদে মস্তকের অবনতি, কাহার উন্নতি বিধান না করে? ১৩।

অকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড ক্ষয়চকিত দেবাসুরকৃপা
বিধেয়স্যাসীদ্ যস্ত্রিনয়ন বিষং সংহৃতবতঃ।

সকল্মাষঃ কণ্ঠে তব ন কুরুতে ন শ্রিয়মহো
বিকারোঽপিশ্লাঘ্যোভুবনভয়ভঙ্গব্যসনিনঃ ॥ ১৪ ॥

সম্প্রতি পরমেশ্বরস্য ত্রৈলোক্যশরণত্বং সদসতোঃ সমরাগত্বং বিরুদ্ধ গুণাশ্রয়ত্বং তথাঽন্যস্মিন্ যে দোষাস্তেঽপিতস্মিন্ গুণায়ন্তে ইতি দর্শয়ন্ তস্যা-লৌকিকত্বং প্রতিপাদয়ন্ স্তৌতি।

অকাণ্ডেতি। হে ত্রিনয়ন ত্রীণি নয়নানি সূর্য্যচন্দ্রাগ্নিরূপাণি দর্শন সাধনানি যস্মিন্ স তৎসংবোধনে। সকল্মাষঃ কণ্ঠে ইত্যত্র কণ্ঠে বক্ষ্যমান জীবনহর গরলধারনস্য বিরোধিতে শিরসি জীবনকর চন্দ্রসূর্য্যাগ্নিধারণমিতি সূচনার্থং ত্রিনয়নেতি সংবোধনম্। অয়স্কান্তস্য বিপ্রকর্ষণী চাকর্ষণীচেতি দ্বে বিপরীতে শক্তী ইবেশ্বরস্য সর্জ্জনী সংহরণী চেতি দ্বে শক্তী বর্ণ্যেতে, তেনৈব তস্য কণ্ঠে বিষং মস্তকেচ সুধেতি কথ্যতে। বিষং মোহমৃত্যুকরমিতি কৃষ্ণবর্ণং সুধাহ্লাদ জীবনকরীতিশুক্লা। ভুবনভয়ভঙ্গব্যসনিন ইত্যত্রাপি দেবাসুরয়োঃ সদসতোঃ সমরাগত্বাত্তস্যায়স্কান্তস্যের মধ্যমাবৃত্তির্দর্শিতা। অকাণ্ডে অকালে অপ্রাপ্তকাল ইতি যাবৎ। ব্রহ্মাণ্ডস্য ত্রিভুবনস্য ক্ষয়ে কালসাগরমন্থনাদ্ভূত কালকূটানলজনিতবিশ্বদাহ ইত্যর্থঃ চকিতেষু অতিভীতেষু দেবাসুরেষুপরস্পর বিরোধিষু ভক্তেষ্বভক্তেষু চেত্যর্থঃএতেন পরস্পরবিরুদ্ধপ্রকৃতিকেষ্বপীশ্বরস্য সমরা-গত্বং দর্শিতং। অতএব বিষং প্রজ্বলিতকালকূটানলং সংহৃতবতঃ ভক্ষিতবতঃ আত্ম-স্মাৎকরণেন বিনাশিতবতঃ ইত্যর্থঃ তবকণ্ঠে আকাশরূপেয়ঃ কল্মাষঃ নীলিমা আসীৎ অজায়ৎ যঃ আকাশে নীলিমা দৃশ্যতে স দেবাসুরকৃত কলুষভক্ষণাদ্দেবস্য কণ্ঠে নীলিমেতি কবি প্রৌঢ়োক্তিরিয়ম্। কালকূটশ্চ দেবাসুরকৃতঃ অত্যুৎকটঃ পাপরাশিঃ সচ লক্ষ্ম্যাদিরাজসম্পাদাদিক্রমেণ সর্ব্বৈশ্বর্য্যাধিগমাদনন্তরং সুরাদি বিলাসসুখ সেবনাদ্ভূতঃ আত্মনাশকরঃ পাপরাশিঃ কালকূট শব্দেন কথ্যতে। স কল্মাষঃ কালকূট ভক্ষণ জনিত নীলিমা তব শ্রিয়ং শোভাং ন কুরুতে ইতি ন, অপিতু কুরুত এব। অত্রার্থান্তরং ন্যস্যতি, অহো ইতি। অহো ইত্যব্যয়ং বিস্ময়সূচনার্থং। ভুবনান্যং যদ্ভয়ং তস্য ভঙ্গে হরণে ব্যসনিনঃ ব্যসনং বিকৃতি তৎপ্রাপ্তস্য তব বিকারেঽপি কণ্ঠগতবর্ণ বিপর্য্যয়োঽপি শ্লাঘ্যঃ প্রশংসনীয়ঃ বিকার খলু প্রকৃতেরশোভনঃ পরিণামঃ সতু দুঃসহ এব ভবতি, ত্বয়িতু মঙ্গলো দারকার্য্যজনিতত্বাৎ স পরমশোভাস্পদং শ্লাঘনীয়শ্চেতি ভাবঃ। ১৪।

একণে ঈশ্বর যে ত্রৈলোকাশরণ ও সদসতে সমরাগ ও বিরুদ্ধগুণ সকলের আশ্রয় এবং যাহা অন্যে দোষ তাহা তাঁহাতে গুণ হয় এই সকল বর্ণনা দ্বারা তাঁহার অলৌকিকত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন।

হে ত্রিলোচন, হে অমৃতময়, সুরাসুরগণ আপনাদিগের পাপে উৎপন্ন কালকূটের জ্বালায় অকালে চরাচরবিশ্ব বিনষ্ট হয় দেখিয়া ভয়ে স্তব্ধ হইলে তুমি যে তাঁহাদিগের প্রতি দয়াপরবশ হইয়া তৎকৃত কলুষসম্ভূত সর্ব্বপ্রাণি ভয়ঙ্কর সেই জলন্ত বিষানল পান করিয়া তাহাদিকে রক্ষা করিয়াছিলে তাহাতেই তোমার কণ্ঠ নীলিমা দ্বারা বিকৃত হইয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য্য যে এই বিকারও তোমাতে পরম শোভনীয় হইয়াছে ॥ ১৪ ॥

নিরাকার ব্রহ্ম পক্ষে এই কণ্ঠ আকাশ। আকাশের নীলিমাকে কবি-প্রৌঢ়োক্তি দ্বারা সুরাসুরকৃতপাপভক্ষণ হেতু উৎপন্ন বলা হইয়াছে। এতদ্দ্বারা অর্থ হইতেছে এই যে অর্চ্চনাকারী সুরাসুরের পাপফল স্বয়ং গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে রক্ষা করিয়াছ। সেই জন্যই পবিত্র তেজোময় দেহে ঐ কালিমা ভক্তের এত মনোহর। তাৎপর্য্য এই যে তুমি এরূপ গুণ সম্পন্ন এরূপ দয়াপর না হইলে তোমার কৃষ্ণা প্রকৃতির এই কার্য্যজাত প্রকাশই পাইত না। সকলই উৎসাহিত হইত। (ক্রমশঃ)

কঃ পন্থা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতে পর)

পুনরায় শ্রীমৎ ভগবদ্গীতাতেও শ্রীভগবানের এই মধুমাখা বাণী শুনিতে পাই। নবম অধ্যায়ে শ্রীভগবান বলিতেছেন :—

"অপি চেৎ সুদুরাচারোভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ ব্যবসিতোহি সঃ ॥
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতি জানীহি নাম ভক্তঃ প্রণশ্যতি ॥

"নিরতিশয় দুরাচার ব্যক্তিও যদি অনন্যভক্তি হইয়া আমার ভজনা করেন, তাহা হইলে তিনিও সাধুরূপে পরিগণিত হইবার উপযুক্ত; কেন

না তিনি শ্রেয়স্কর কর্ম্মপরায়ণ। নিরতিশয় দুরাত্মা ব্যক্তিও আমার ভজন পরায়ণ হইলে, অচিরকাল মধ্যে ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া উঠেন, এবং তদনন্তর চিরশান্তি লাভ করিয়া থাকেন। হে কৌন্তেয়! আমার ভক্ত কখনই বিনষ্ট হন না। ইহা তুমি নিশ্চিতরূপে সমর্থন করিতে পার" যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন যে কেবল মাত্র সমীচীন অধ্যবসায় অবলম্বন করিতে দেখিয়া দুরাচার ব্যক্তিকে কেন সাধুরূপে গণ্য করিব? এইরূপ আশঙ্কা নিবারণ জন্য ভগবান বলিতেছেন, যে ব্যক্তি আন্তরিক সম্যক্ ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছে, সে ব্যক্তি তাহারই সামর্থে অল্পকাল মধ্যে তাহার বাহ্য দুরাচারতা পরিত্যাগ করে এবং চিরকালের অধর্ম্মাত্মাও আমার ভজনমহিমাপ্রভাবে অতি অল্পকাল মধ্যে ধর্ম্মানুগতচিত্ত হইয়া উঠে। তিনি অল্পকাল মধ্যে দুরাচারতা পরিত্যাগ করিয়া সদাচারত্ব প্রাপ্ত হন; তদনন্তর তিনি বিষয়-ভোগ-স্পৃহা-নিবৃত্তিরূপা পরমা শান্তি প্রাপ্ত হন। যদি অর্জ্জুন আশঙ্কা করেন যে কোন ভগবৎ ভক্ত যদি আপনার চিরাভ্যস্ত দুরাচারত্ব পরিত্যাগ করিতে না পারিয়া ধর্ম্মাত্মা হইতে না পারে, তাহা হইলে সে কি নষ্ট হইয়া যায়? অর্জ্জুনের এই আশঙ্কা নিরাকরণ জন্য ভগবান তাহাকে উৎসাহিত করিয়া বলিতেছেন যে "তুমি এ বিষয়ে সন্দিহান হইও না; আমার ভক্তের এইরূপ মাহাত্ম্য অবিসংবাদিত; তুমি প্রতিপক্ষগণের নিকট বাহু উত্তোলন পূর্ব্বক সগর্ব্বে বলিতে পার যে বাসুদেবের ভক্ত অতি দুরাচার হইলেও এবং প্রাণ সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় নিপতিত হইলেও কখনই বিনষ্ট হন না, কৃতার্থ ই হইয়া থাকেন।" এই ভগবৎ বাক্যের দৃষ্টান্তস্থল অজামিল, প্রহ্লাদ, ধ্রুব ও গজেন্দ্র আদি। অন্যান্য শাস্ত্রেও ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়, যথাঃ—"ন বাসুদেবভক্তানাং অশুভং বিদ্যতে ক্বচিৎ"।

হায়! আমরা কি দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছি! স্বয়ং ভগবানের শ্রীমুখের বাক্যের প্রতিও আমাদের হতাদর ও অবিশ্বাস!! ইহা অপেক্ষা আমাদের দুর্দ্দশার চরমসীমা আর কি হইতে পারে।

শ্রীমৎ ভাগবৎ হইতে অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। আসুন দেখা যাউক ভক্তিপথ সম্বন্ধে ভগবান পুনরায় কি বলিতেছেন :—

ন সাধয়তি মাং যোগে ন সাঙ্খ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায় স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তি র্মমোর্জ্জিতা॥

ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাম্।
ভক্তিঃ পুণাতি মন্নিষ্ঠা শ্বপাকানপি সম্ভবাৎ॥'

অর্থাৎ:—"হে উদ্ধব! যোগশাস্ত্র অথবা সাঙ্খ্য যোগ কিংবা বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন বা তপস্যা অথবা দান, ইহারা আমাকে তদ্রূপ প্রাপ্ত হয় না, যেমন মদ্‌বিষয়ক দৃঢ়ভক্তি দ্বারা আমাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। শ্রদ্ধা সহকৃত একমাত্র ভক্তি দ্বারা আত্মা ও প্রিয়রূপ আমি সাধুদিগের প্রাপ্য হই। আমাতে নিষ্ঠারূপ যে দৃঢ় ভক্তি তাহা চণ্ডালকেও জাতিদোষ হইতে পবিত্র করে।" তৎপরে ভক্তি সাধন ভিন্ন অন্য সাধন সকল যে ব্যর্থ তাহা স্পষ্টরূপে বুঝাইবার জন্য উদ্ধবকে বলিতেছেন:—

"ধর্ম্ম সত্যদয়াপেতো বিদ্যা বা তপসান্বিতা।
মদ্ভক্ত্যাপেতমাত্মানং নচ সম্যক্ পুণাতিহি॥"

"সত্য, দয়া সহকৃত ধর্ম্ম, বা তপস্যাযুক্ত বিদ্যা, ইহারা মদ্‌ভক্তি বিহীন আত্মাকে সম্যক্ প্রকার পবিত্র করিতে পারে না।" একমাত্র ভক্তি বিনা চিত্তশুদ্ধি হইতে পারে না ইহা দেখাইবার জন্য ভগবান দৃষ্টান্ত স্বরূপ পুনঃ বলিতেছেন:—

যথাগ্নিনা হেম মলং জহাতি ধমাতং পুনঃ স্বং ভজতে চ রূপম।
আত্মাচ কর্ম্মানুশয়ং বিধূয় মদ্‌ভক্তি যোগেন ভজত্যথো মাম্॥

"যেমন সুবর্ণ অগ্নিতেই উত্তপ্ত হইয়া অন্তর্মল পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বীয় শুদ্ধ স্বরূপ প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ আমার ভক্তিযোগ দ্বারাই আত্মা কর্ম্ম বাসনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরে আমাকেই ভজনা করে।"

শ্রুতিতে লেখা আছে "তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি" "ব্রহ্মবিদা প্নোতিপর"—অর্থাৎ ব্রহ্মবেত্তা পরমব্রহ্ম প্রাপ্ত হন" তাহাকে জানিয়া অতি মৃত্যু অতিক্রম করিতে পারে" যদি এই সকল শ্রুতিবাক্যে উদ্ধব এইরূপ আশঙ্কা করেন যে এরূপ শ্রুতি লিখিত জ্ঞানের দ্বারা অবিদ্যা নিবৃত্ত হইলে ভগবানকে প্রাপ্ত হইতে পারে, তবে কি নিমিত্ত ভক্তি যোগেই জীবের পক্ষে প্রশস্ত পথ হইবে? উদ্ধবের এই আশঙ্কা নিরাকরণার্থ ভগবান বলিতেছেন:—

"যথা যথাত্মা পরিমৃজ্যতেঽসৌ মৎপুণ্য গাথা শ্রবণাভিধানৈ।
তথা তথা পশ্যতি বস্তু সূক্ষ্মং চক্ষুর্যথৈবাঞ্জন সম্প্রযুক্তম॥

অর্থাৎ ঃ—"চক্ষু অঞ্জন সংযুক্ত হইলে যেমন সূক্ষ্ম বস্তু দেখিতে পায়, তাহার ন্যায় এই আত্মা আমার পুণ্য কথা শ্রবণ ও কথন দ্বারা পরিশুদ্ধ হইয়া সূক্ষ্ম বস্তু দেখিতে পান।"—

তৎপরে ভগবান জ্ঞানের পরিস্ফুট অর্থ কি তাহা বুঝাইবার জন্য ও শেষ জীবের কর্ত্তব্য কি, তাহার গন্তব্য পথ কি, তাহা স্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম করাইবার জন্য উদ্ধবকে বলিতেছেন ঃ—

"বিষয়ান্ ধ্যায়তশ্চিত্তং বিষয়েষু বিসজ্জতে।
মামনুস্মরতশ্চিত্তং ময্যেব প্রবিলীয়তে॥
তস্মাদসদভিধ্যানং যথা স্বপ্ন মনোরথম্
হিত্বা ময়ি সমাধৎস্ব মনো মদ্ভাবভাবিতম্॥

অর্থাৎ ঃ—জ্ঞান নামক পদার্থ চিত্তের মদাকার পরিণাম বিশেষ, ইহা আমাকে ভজনা করিতে করিতে স্বভাবতঃই হয়, যত্নান্তরের অপেক্ষা করে না; এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই যে, বিষয়ানুধ্যায়ীর চিত্ত যেমন বিষয়েতেই বিলীন হয়, তদ্রূপ আমাকে স্মরকাণরীর চিত্ত আমাতেই লীন হইয়া থাকে। অতএব স্বপ্ন ও মনোরথের ন্যায় অসৎ চিন্তা পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমার ভজনদ্বারা শোধিত অন্তঃকরণ আমাতেই সমাহিত কর।" তৎপরে শ্রীভগবান, ভক্তি পথের বিশেষ কণ্টক কয়েকটী উল্লেখ করিয়া, তাহারা যে সর্ব্বতোভাবে ত্যজ্য তাহা দেখাইবার জন্য বলিতেছেন ঃ—

"স্ত্রীণাং স্ত্রীসঙ্গিনাং সঙ্গং ত্যক্ত্বা দূরত আত্মবান।
ক্ষেমে বিবিক্ত আসীনশ্চিন্তয়েন্মামতন্দ্রিতঃ॥
ন তথাস্য ভবেৎ ক্লেশো বন্ধশ্চান্য প্রসঙ্গতঃ।
যোষিৎ সঙ্গাদ্বথা পুংসো যথা তৎসঙ্গি সঙ্গতঃ॥

অর্থাৎ ঃ—"ধীর ব্যক্তি স্ত্রী সংসর্গ ও স্ত্রী সংযুক্ত ব্যক্তিদিগের সংসর্গ দূর হইতে পরিত্যাগপূর্ব্বক নির্ভয়ে বিজন প্রদেশে উপবেশনপূর্ব্বক অতন্দ্রিতরূপে আমাকে চিন্তা করে। যোষিৎ সংসর্গ বা তৎসংসক্ত ব্যক্তিদিগের সংসর্গে ধীর পুরুষের যেরূপ ক্লেশ হয় ও সংসার বন্ধন সাধিত হয়, অন্য কোন প্রসঙ্গের দ্বারা তদ্রূপ হয় না"—এইরূপে উপসংহার করিয়া ভগবান উদ্ধবের অন্যান্য প্রশ্নের উত্তর প্রদানে প্রবৃত্ত হইলেন।

উল্লিখিত ভগবৎ বাক্য দ্বারা ইহা স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হইল যে কেবল মাত্র ভক্তি সাধনই জীবের পক্ষে শ্রেষ্ঠ সাধন হইতেছে। ইহা ব্যতীত অন্য কোন পথ অবলম্বন পূর্ব্বক শীঘ্র ও সুন্দররূপে সেই পরম পিতার পদাশ্রিত হইবার উপায় নাই। শ্রীমদভাগবৎ গীতায় দ্বাদশ অধ্যায়ে ভগবান এই ভক্তি পথই প্রশস্ত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন—

"ক্লেশোধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাং।
অব্যক্ত্যা হি গতি দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে॥
যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে॥
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসার সাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাং॥"

অর্থাৎ:—যাহারা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে আসক্ত চিত্ত তাহাদিগের অধিকতর ক্লেশ, কারণ দেহাভিমানী ব্যক্তির নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে নিষ্ঠা অতিক্লেশে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কিন্তু যাহারা মৎ পরায়ণ হইয়া, আমাতে সমস্ত কর্ম্মার্পণপূর্ব্বক, আমাকে ধ্যান করত অনন্য ভক্তিযোগে আমাকে উপাসনা করে; সেই সকল মদর্পিতচিত্ত ব্যক্তিগণকে আমি অচিরাৎ এই মৃত্যুযুক্ত সংসার সাগর হইতে উদ্ধার করিয়া থাকি"

এক্ষণে দেখা যাউক শ্রীভগবান শ্রীমৎভগবৎ গীতা শাস্ত্রে, জীবের শ্রেয় পথ সম্বন্ধে বিশেষরূপে কি কি উপদেশ দিয়াছেন:—

(ক্রমশঃ) শ্রীঅটলবিহারী সিংহ, বি, এ,।

চিত্তশুদ্ধি।

হিন্দুধর্ম্মের মূল এবং সার চিত্তশুদ্ধি। যাঁহারা হিন্দুধর্ম্মের অনুরাগী কিম্বা হিন্দুধর্ম্মের যথার্থ মর্ম্মের অনুসন্ধানে ইচ্ছুক তাহাদিগকে এই তত্ত্বের প্রতি বিশেষ মনোযোগ করিবার জন্য অনুরোধ করি। হিন্দুধর্ম্মান্তর্গত আর কোন তত্ত্বই ইহার ন্যায় মর্ম্মগত নহে। নিরাকারের বা সাকারের উপাসনা, বহুদেবে ভক্তি, বা একেশ্বর বাদ, দ্বৈতবাদ বা অদ্বৈতবাদ, কর্ম্মবাদ বা ভক্তিবাদ,

জ্ঞানবাদ, সমস্তই ইহার নিকট অকিঞ্চিৎকর। চিত্তশুদ্ধির অভাবে সকল মতই অশুদ্ধ, চিত্তশুদ্ধ থাকিলে সকল মতই শুদ্ধ। কোন ধর্ম্মই নাই যাহাতে চিত্তশুদ্ধি নাই। যাহার চিত্তশুদ্ধি আছে তাহার আর কোন ধর্ম্মেই প্রয়োজন নাই। ইহা যে কেবল হিন্দুধর্ম্মেরই সার এমত নহে; ইহা সকল ধর্ম্মের সার। ইহা বৌদ্ধধর্ম্মের সার, খৃষ্টধর্ম্মের সার নিরীশ্বর কোমৎ ধর্ম্মের সার, ইস্‌লাম ধর্ম্মেরও সার। যাহার চিত্তশুদ্ধি আছে তিনি শ্রেষ্ঠ হিন্দু, শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ, শ্রেষ্ঠ মুসলমান, শ্রেষ্ঠ খৃষ্টিয়ান, শ্রেষ্ঠ পজিটিভিষ্ট। যাঁহার চিত্তশুদ্ধি নাই তিনি কোন ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে ধার্ম্মিক বলিয়া গণ্য হইতে পারেন না। চিত্তশুদ্ধিই ধর্ম্ম। তবে প্রধানতঃ হিন্দুধর্ম্মেই ইহা প্রধান, যাঁহার চিত্তশুদ্ধি নাই, তিনি হিন্দু নহেন। মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্রের সমস্ত বিধি ও বিধানানুসারে কার্য্য করিলেও তিনি হিন্দু নহেন।

চিত্তশুদ্ধির প্রথম লক্ষণ ইন্দ্রিয়ের সংযম। "ইন্দ্রিয় সংযম" এই বাক্যের দ্বারা এমন বুঝিতে হইবে না যে, ইন্দ্রিয় সকলের একেবারে উচ্ছেদ বা ধ্বংশ করিতে হইবে। কেবল সংযত করিতে হইবে, ইহাই বুঝিতে হইবে। উদাহরণ, ঔদরিকতা একজাতীয় ইন্দ্রিয়পরতা; কিন্তু এ ইন্দ্রিয়ের সংযম বিধিতে এমন বুঝিতে হইবে না যে পেটে কখন খাইবে না, বা কেবল বায়ু ভক্ষণ করিবে, বা কদর্য্য আহার করিয়া থাকিবে। স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য এবং শরীররক্ষার জন্য যে পরিমাণে এবং যে প্রকার আহারের প্রয়োজন তাহা অবশ্য করিতে হইবে, তাহাতে ইন্দ্রিয় সংযমে কোন বিঘ্ন হয় না। ইহা তত কঠিন ব্যাপার নহে। উত্তম আহারাদিও সংযতেন্দ্রিয়ের পক্ষে অবিধেয় নহে, ইহাও বলা যাইতে পারে। যদি তাহাতে তাঁহার স্পৃহা না থাকে।

রাগদ্বেষবিমুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরণ।
আত্মবশ্যৈর্ব্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি ॥ গীতা, ২য় অ,৬৪।

রাগ, দ্বেষ হইতে বিমুক্ত আত্মবশ্য যে ইন্দ্রিয়গণ তদ্দ্বারা বিষয় সকল উপভোগ করিয়া বিধেয়াত্ম ব্যক্তি শান্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

মোট কথা এই যে, ইন্দ্রিয়ের আসক্তির অভাবই ইন্দ্রিয় সংযম। ধর্ম্ম রক্ষার্থে বা আত্মরক্ষার্থে অর্থাৎ ঐশিক নিয়ম রক্ষার্থে যতটুকু ইন্দ্রিয়ের চরিতার্থতা আবশ্যক, তাহার অতিরিক্ত যে ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির ইচ্ছা করে

তাহারই ইন্দ্রিয় সংযত হয় নাই। যে ইহা না করে তাহার হইয়াছে। যাহার ঐ পরিতৃপ্তিতে ইচ্ছা নাই, সুখ নাই, কেবল ধর্ম্মরক্ষা আছে, তাহারই ইন্দ্রিয় সংযত হইয়াছে।

এখন অনেক লোক দেখা যায় যে, ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তিতে একেবারে বিমুখ, কিন্তু মনের কলুষ ক্ষালিত করে নাই। লোকের নিকট প্রতিপত্তির জন্য বা লোক লজ্জায় কিম্বা ঐহিক উন্নতির জন্য অথবা ধর্ম্মের ভানে পীড়িত হইয়া, তাহারা সংযতেন্দ্রিয়ের ন্যায় কার্য্য করে; কিন্তু ভিতরে ইন্দ্রিয়ের দাহ বড় প্রবল। আজন্ম মৃত্যু পর্য্যন্ত তাহারা কখনও স্খলিত পদ না হইলেও তাহারা ইন্দ্রিয় সংযম হইতে অনেক দূরে। যাঁহারা মুহুর্মুহুঃ ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তিতে উদ্যোগী, ও কৃতকার্য্য তাহাদিগের হইতে উক্ত ধর্ম্মাত্মাদের প্রভেদ বড় অল্প। উভয়েই তুল্যরূপে ইহলোকের নরকের অগ্নিতে দগ্ধ। পরিতৃপ্ত কর বা না কর, যখন ভুলেও মনে ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির কথা আসিবে না, যখন ধর্ম্ম রক্ষার্থ বা ধর্ম্মার্থ ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিতে হইলেও তাহা দুঃখের বিষয় ব্যতীত সুখের বিষয় বোধ হইবে না, তখনই ইন্দ্রিয় সংযম হইয়াছে। তদভাবে তপস্যা, যোগ, কঠোর ব্রত সকলই বৃথা। হিন্দু পুরাণে ইতিহাসে ঋষিদিগের সম্বন্ধে এই কথা স্পষ্টীকৃত করিবার জন্য ভূরি ভূরি রহস্যোপন্যাস আছে। স্বর্গ হইতে একজন অপ্সরা আসিল, আর অমনি ঋষি ঠাকুরের যোগভঙ্গ হইল, তিনি অমনি নানাবিধ গোলোযোগ উপস্থিত করণে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সকল উপন্যাস হইতে আমরা এই একটি চমৎকার শিক্ষা প্রাপ্ত হই যে, যোগে বা তপস্যায় ইন্দ্রিয় সংযম হয় না। সংসারধর্ম্মেই, কার্য্যক্ষেত্রেই, ইন্দ্রিয় সংযম লাভ করা যায়।

(ক্রমশঃ)

শ্রীবলাইচাঁদ মল্লিক।

আমি কয়জন ?

ষষ্ঠ ঘটনা—টৌয়ী ও বালক।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

১৮৯৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসের স্নায়বিক ও মানসিক রোগে বিষয়ক পত্রিকায় (Journal of Nervous and Mental Disceas) ডাক্তার অস্‌গুড্ মেসন অনেকটা পূর্ব্বোক্ত ঘটনায় সদৃশ একটী ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। এ ক্ষেত্রে শরীরের পূর্ব্বাধিকারীর স্থানে সময়ে সময়ে অপর দুই ব্যক্তির আবির্ভাব হইত। দ্বিতীয় ও তৃতীয় ব্যক্তি প্রথম ব্যক্তি হইতে কিন্তু সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। কুমারী আল্‌মা আমেরিকা দেশীয় অপর একটী যুবতী। তিনি বিদ্যালয়ে অতিরিক্ত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তিনি যে কেবল সাহিত্যের চর্চ্চা করিতেন এরূপ নহে, ব্যায়াম পটুও ছিলেন। অষ্টাদশ বর্ষ অতিক্রম করিলে, তাঁহার শরীর ভগ্ন হইল ; তিনি দুর্ব্বল ও যন্ত্রণাকাতর রোগীণী হইয়া পড়িলেন। এই সময়ে তাঁহাতে টৌয়ী নামক অপর এক ব্যক্তিত্বের আবেশ হয়। শিক্ষিতা, চিন্তাশীলা, গৌরবান্বিতা, রোগের যন্ত্রণায়কাতরা নারীর স্থানে আমেরিকায় আদীম ভাষা ভাষিণী, সুস্থশরীরা হাস্যমুখী, উল্লাসময়ী এক বালিকার অভ্যুদয় হইল। ইঁহার নাম টৌয়ী। সে তাহার ইচ্ছানুসারে চলিয়া যাইত এবং পুনরায় আসিত। এবং কখনও কখনও যাইবার সময় কুমারী আল্‌মার সংবাদ বলিয়া যাইত। কুমারীও এইরূপে স্বশরীরে আবির্ভূত দ্বিতীয় জীবাত্মার প্রতি আকৃষ্ট ও আসক্ত হইলেন। কিছুকাল পরে কুমারী রোগমুক্তা হইলেন, টৌয়ীও চলিয়া গেল। যখন কুমারী অসুস্থ হইতেন সে সকল এক আধ বার দেখা দিত। অবশেষে কুমারী পরিণীতা হইলেন। টৌয়ীর গতায়াতও ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল ; কিন্তু একরাত্রে সে বলিল যে সে চলিয়া যাইবে এবং তাহার স্থানে অপর এক ব্যক্তি আসিবে। হইলও তাহাই। যুবতী মূর্চ্ছিতা হইলেন ; মূর্চ্ছাপনোদনের পর দেখা গেল তাঁহার শরীর "বালক" নামধেয় অন্য এক ব্যক্তি কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছে। 'বালক' বলিল যে সে যুবতীর বিশেষ সাহায্যার্থ টৌয়ীর স্থানে আসিয়াছে। কয়েক সপ্তাহের কার্য্যকলাপ তাহার

বাক্যের সম্পূর্ণ অনুযায়ী পরিলক্ষিত হইল। ক্রমে এই তৃতীয় ব্যক্তি (স্ত্রীই হউক আর পুরুষই হউক) তাহার নবীন আবাসে নবীন জীবনে অভ্যস্ত হইয়া গেল এবং স্ত্রীর কর্ত্তব্য, মাতার কর্ত্তব্য ও গৃহস্বামিনীর অনুষ্ঠেয় কর্ম্মের সঙ্গে অতি সুচারুভাবে নিজের জীবনকে মিলাইয়া লইল।

যুবতীর স্বাস্থ্য সম্পাদন করিতে যে পরিমাণ সময়ের প্রয়োজন হইত তদপেক্ষা অধিকতর কাল টোয়ী বা বালক তাঁহার শরীরে থাকিত না। একদা বালকের আবির্ভাব হইলে, যুবতী সঙ্গীতশালায় নীত হইয়াছিলেন। তথায় বীথোভেন নামক প্রসিদ্ধ সঙ্গীতবেত্তার একতান সঙ্গীতের আলাপ হইতেছিল। এমন সময় সহসা বালক অন্তর্হিত হইল। এবং যুবতী নিজের স্বাভাবিক স্বরে কথা কহিতে লাগিলেন। কয়েক মিনিট পরে বালকের পুনরাবির্ভাব হইলে, সে বলিল, "বটে, যুবতী তাঁহার প্রিয় সঙ্গীত শুনিতে আসিয়াছেন?" আলুমার পার্শ্বস্থ ব্যক্তি বলিল "হাঁ, তুমি কিরূপে জানিলে?"

বালক—"বাঃ, আমি এখানেই ছিলাম এবং আমিও সঙ্গীত শুনিতেছিলাম।"

অনুচর—"তুমি কোথায় ছিলে?"

বালক—"আমি বাক্সের (Box) সম্মুখে বসিয়াছিলাম। আমি দেখিলাম তুমি যুবতীর সঙ্গে কথা কহিতেছ। সঙ্গীত শ্রবণে তাঁহার কত না আনন্দানুভব হইতেছিল।"

সপ্তম ঘটনা—সৈনিকের কথা।

এই পুস্তকে এরূপ অনেকানেক ঘটনার উল্লেখ আছে। তন্মধ্যে একটী সৈনিকের ব্যাপার উল্লেখযোগ্য। সৈনিকের মধ্যে একাধারে তিন ব্যক্তির সমাবেশ হইত। তাহাদের মধ্যে এরূপ বিপর্য্যয় উপস্থিত হইত, যে তাহারই ফলে সৈনিক পুরুষটী বিভিন্ন ব্যক্তিরূপে দুইবার সেনাদলে প্রবিষ্ট হয় এবং সেনাদল পরিত্যাগের অপরাধে ধৃত হয়। ইহার কারণ এই, সে যে ব্যক্তির আদেশে সেনাদল ত্যাগ করিয়াছিল সে ব্যক্তি জানিত না যে সেই আবার অন্য ব্যক্তিস্বরূপে অন্য নেতার অধীনে অন্য নাম লেখাইয়াছে।

উপরে যে সকল বৃত্তান্ত সঙ্কলিত হইল, তাহা হইতে বুঝা যায় কিরূপ ঘটনাবলীকে ভিত্তি করিয়া গ্রন্থকারদ্বয় তাঁহাদের আপাত নূতন মতবাদ স্থাপন করিয়াছে'।

২। গ্রন্থপ্রণেতৃদ্বয়ের ব্যাখ্যা।

তাঁহাদের মত এই :—সত্তা বলিলে আমরা যাহা বুঝি, তাঁহাদের মতে মানবের মন সেরূপ একটী স্বতন্ত্র সত্তা নহে; ইহাকে জীবাত্মা বা পুরুষ আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে না। ইহা কেবল ক্ষণিক অনুভূতির সমষ্টি মাত্র। স্নায়বিক কোষাণুপুঞ্জে (cells) নিহিত অনুভূতি সকল অতি জটিল ভাবে সংমিশ্রিত। এই জটিল সংমিশ্রণের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র শ্রেণীর বিভাগ হইতেই মানবের উৎপত্তি।

তাঁহারা যে ঠিক জীবাত্মার অস্তিত্ব উড়াইয়া দিয়াছেন—এরূপ বলা যায় না। তাঁহাদের তর্কযুক্তির সার মর্ম্ম তাঁহাদের ভাষায় ব্যক্ত করিলে এইরূপ দাঁড়ায় :—ক্ষণিকচেতনায় শ্রেণী বা বিজ্ঞানের পরম্পরায় সমষ্টি ভিন্ন মন আর কিছু নহে। মন অসংখ্য সংস্কারের সমষ্টিজাত। এই সংস্কারসমষ্টি যথাযোগ্য ভিন্ন ভিন্ন অথবা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র শ্রেণীতে সন্নিবিষ্ট হইলে, আমরা ব্যক্তিগত সত্তা personality বলিলে যাহা বুঝি, তাহা উৎপন্ন হয়। একটী বাজারে সমবেত জনতার যেমন অবিভাজ্য একত্ব বা স্বাধীন অস্তিত্ব সম্ভবে না, আমাদের ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধেও তদ্রূপ। মনে করুন, কোনও পণ্যবীথিকায় সমবেত জনগণ বেলা আটটার সময় মৎস্যাদি ক্রয় বিক্রয় করিতেছে। বেলা দশ টার সময়ও তথায় সেইরূপ জনতা, কিন্তু তাহারা উদ্ভিজ্জ ক্রয় বিক্রয় করিতেছে। জনতা পূর্ব্ববৎ আছে কিন্তু আটটার সময়ে সমবেত প্রত্যেক ব্যক্তি হয় ত গৃহে চলিয়া গিয়াছে এবং প্রত্যেকের স্থানেই হয়ত নূতন লোক সমাগত হইয়াছে। আমাদের ব্যক্তিগত সত্তাও ঠিক এই জনতার মত; ব্যক্তিত্ব সর্ব্বদা বিদ্যমান থাকিতে পারে কিন্তু তাহার উপাদান গুলি বাজারে সমবেত জনগণের মত নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল। যেমন ব্যষ্টি মনুষ্য ব্যতিরেকে সমগ্র মানব জাতির অখণ্ড অস্তিত্ব সিদ্ধ হয় না, তদ্রূপ প্রতি মুহূর্ত্তে সংগৃহীত বিভিন্ন সংস্কার ব্যতীত আমাদের মনোময় সত্তার অখণ্ডত্ব সম্ভবেনা। শারীরবিজ্ঞানের দিক্ হইতে হউক অথবা মনোবিজ্ঞানের দিক্ হইতে হউক যে দিক দিয়া দেখা যায়, অভিব্যক্তির গতি অনেকটা একরূপ বোধ হয়। কোষাণু-পুঞ্জাশ্রিতা শক্তি হইতেই ব্যক্তিত্বের উদ্ভব। এই কোষাণুপুঞ্জ ভিন্ন ভিন্ন সমষ্টিতে বিভক্ত এবং তাহাদের জটিলতা নিয়ত বর্দ্ধনশীল। এই সকল কোষাণুর মধ্যে ক্ষণলব্ধ (moment) চৈতন্যের সংস্কার নিহিত থাকে। কতকগুলি

কোষাণু ক্ষণলব্ধসংস্কারোপেত অপর কতকগুলি কোষাণুর সহিত সূক্ষ্ম সূত্রে সম্বন্ধ হয়। এইরূপ সংস্কারের ফলে স্নায়বিক কোষাণুপুঞ্জের উৎপত্তি হয়। শরীর যন্ত্রে এইরূপ পুঞ্জের রক্ষাবিধান হইলেই সেই সঙ্গে সঙ্গে একটী মানসিক ভাবের উদয় ঘটে। কয়েকটী এইরূপ পুঞ্জ সূক্ষ্মসূত্রে মিলিত হইলে একটী শ্রেণী সৃষ্ট হয়। কয়েকটী শ্রেণীর সমবায়ে উচ্চতর সংঘের সৃষ্টি হয়। কতকগুলি সংঘের মিলনে এক একটী মণ্ডলীর উৎপত্তি হয়, এবং কতকগুলি মণ্ডলী পরস্পর মিলিত হইয়া তদপেক্ষা উচ্চতর ও জটিলতর রাশি উৎপন্ন করে।

এই ক্ষণলব্ধ সংস্কারগুলি একটী কেন্দ্রকে বেষ্টন করিয়া থাকে। রঙ্গমঞ্চে নাটকের অভিনয় উদাহরণ স্বরূপ গ্রহণ করা যাইতে পারে। একজনকে কেন্দ্রীভূত করিয়া যাবতীয় অভিনেতৃবর্গ ক্রীড়া প্রদর্শন করিতেছে—এইরূপ একটী দৃশ্য যদি আমরা অভিনিবেশ সহকারে দেখি, তাহা হইলে এই সমগ্র দৃশ্যটী আমাদের তৎক্ষণলব্ধ সংস্কাররূপে স্নায়বিক কোষাণু পুঞ্জে সঞ্চিত হইবে। জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তে আমরা আমাদের ইন্দ্রিয়ের গোচর বিষয় হইতে এইরূপ ক্ষণিক জ্ঞানপ্রবাহ অর্জ্জন করি। যেমন আলোক রেখা সমপাতে পটের উপর আলোক চিত্র (photo) উৎপন্ন হয়, তদ্রূপ ইন্দ্রিয় সমক্ষে প্রতিভাত শব্দস্পর্শরূপরস-গন্ধযুক্ত বিষয় সমূহের প্রতিকৃতি আমাদের স্মৃতিপটে চিরদিনের জন্য অঙ্কিত হইয়া যায়। এই স্মৃতিশক্তিকে সিনেমাটোগ্রাফ ও ফনোগ্রাফ (Cinematograph, Phonograph) যন্ত্রের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে; কারণ প্রতিক্ষণ ইহাতে দৃষ্টরূপের প্রতিরূপ এবং শ্রুতশব্দের প্রতিশব্দ লিপিবদ্ধ হইতেছে। জন্মের সঙ্গে এই ক্রিয়ার আরম্ভ এবং মরণের সঙ্গে ইহার নিবৃত্তি। যেমন সমুদ্রচারী ক্ষুদ্র জীবপুঞ্জের দেহপিঞ্জরের অবিরত অধোগমন হেতু অতল সমুদ্রের কঠিন তলভাগ নির্ম্মিত হয়, তদ্রূপ বর্ণচিত্রের ও শব্দ-চিত্রের নিয়ত সন্নিবেশে মানবস্মৃতির ভাণ্ডার রচিত হয় এবং এইখানেই ক্ষণলব্ধ জ্ঞান সঞ্চিত থাকে। জাগ্রত চৈতন্যের অন্তস্তলস্থিত তমসাময় অব্যক্ত চৈতন্যক্ষেত্রে (Subliminal consciousness) উক্ত ক্ষণলব্ধ সংস্কার গুলি শুভ অবসরের প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া থাকে। এমন কোনও গুপ্ত বিষয় নাই এমন কোনও দণ্ডার্হ পাপ নাই, যাহা কোনও না কোনও সময়ে, তাহার অন্ধকারময় গুহা (সুপ্ত চৈতন্যক্ষেত্র) হইয়া প্রবুদ্ধ হইয়া

উজ্জ্বল দিবালোকে (জাগ্রত চৈতন্যক্ষেত্রে) আবির্ভূত না হইতে পারে। এই ক্ষণলব্ধ সংস্কার সমূহ স্নায়বিক কোষাণু পুঞ্জের এক বা বহু, ক্ষুদ্র অথবা বৃহৎ সমষ্টির সহিত জড়িত থাকে এবং সময়ক্রমে তাহারা প্রবুদ্ধ, দূরীকৃত অথবা প্রনষ্ট হইতে পারে।

কোনও একটী জাতির জাতিগত সত্তার সহিত যদি ইহার তুলনা করা যায়, তাহা হইলে এই ব্যক্তিগত সত্তার একটী সহজ দৃষ্টান্ত মিলে। ফরাসিস্ প্রজাতন্ত্রের সহিত আমাদের ব্যক্তিত্বসত্তার তুলনা করা যাউক। উক্ত প্রজাতন্ত্রের যে একটী অস্তিত্ব ও শক্তি আছে তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই; কিন্তু এই শক্তির মূল উপাদান কি ? রাজ্যের অন্তর্গত প্রত্যেক স্বতন্ত্র নরনারীই তাহার মূল। কতকগুলি নরনারীর মিলনে একটী পরিবার; কতকগুলি পরিবারের মিলনে একটী নগরতন্ত্র; কতকগুলি নগরতন্ত্রের যোগে একটী বিভাগ; কতকগুলি বিভাগের সম্মিলনে একটী প্রদেশ; কতকগুলি প্রদেশ লইয়া সমগ্র প্রজাতন্ত্র। ঠিক্ সেইরূপ কতগুলি কোষাণুর যোগে একটী পুঞ্জ। কতকগুলি পুঞ্জ মিলিয়া একটী শ্রেণী। কততকগুলি শ্রেণীর সমাহারে একটী মণ্ডলী। কতকগুলি মণ্ডলীর মিলনে একটী মহামণ্ডলী। এইরূপ বৃহৎ মণ্ডলীসমূহের উপর ব্যক্তিত্ব সত্তা। যেমন প্রত্যেক পরিবার হইতে আরম্ভ করিয়া প্রত্যেক প্রদেশ পর্য্যন্ত সকলেই প্রজাতন্ত্রের অধীন, সেইরূপ প্রত্যেক কোষাণুপুঞ্জ হইতে তাহাদের মহামণ্ডলী পর্য্যন্ত সকলেই ব্যক্তিত্ব সত্তার অধীন।

এই দৃষ্টান্ত হইতেই গ্রন্থকর্ত্তৃগণ বহুব্যক্তিত্বের রহস্যোদ্‌ঘাটনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। যতদিন পূর্ব্বোক্ত প্রজাতন্ত্রটা প্রবল এবং পূজার্হ থাকে, ততদিন ফরাসিস্ দেশটা এক এবং অখণ্ড। সেইরূপ যতদিন মনুষ্যের সাধারণ বিচারশক্তি প্রবল থাকে, ততদিন ব্যক্তিগত সত্তাও এক এবং অখণ্ড। কিন্তু যদি বহিরাক্রমণে অথবা অন্তর্বিপ্লবে প্রজাতন্ত্র হীনবল ও তাহার কেন্দ্রীভূত শক্তি নিস্তেজ হইয়া পড়ে, তাহা হইলে তদন্তর্গত নগর সমূহ নগরতন্ত্র অবলম্বন করিয়া এবং কোনও কোনও প্রদেশ প্রাদেশিক খণ্ডরাজ্য স্থাপন করিয়া সমগ্র দেশের শক্তি যথাসাধ্য আত্মসাৎ করিয়া সমগ্র দেশের নামে পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করিবে না।

কখন এক নগর, কখন অপর নগর, কখন এক প্রদেশ, কখন অপর

প্রদেশ সামর্থ ও প্রাধান্য লাভ করিয়া সমগ্র দেশের উপর অধিকার স্থাপনের চেষ্টা করিবে। মনুষ্য সম্বন্ধেও তদ্রূপ। যদি অভিঘাতে, ঔষধ প্রয়োগে অথবা সম্মোহনাবেশে মনুষ্যের কেন্দ্রীভূত চেতনাশক্তি অবসন্ন হইয়া পড়ে, তৎস্থানে তখন বহু ব্যক্তিত্ব সত্তার আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী। কেন্দ্রবর্ত্তিনী চেতনাকে বলে হউক, ছলে হউক, একবার সিংহাসন হইতে বিচ্যুত করিলেই ক্ষণিক-সংজ্ঞার সংঘাতগুলি সেই শূন্য সিংহাসন অধিকার করিতে ধাবিত হইবে; এবং এই সকল সংঘাতের মধ্যে অধিকতর বলশালী কোন একটী অবসন্ন ব্যক্তিত্ব সত্তার স্থানে বসিয়া সমগ্র শরীরকে চালাইতে থাকিবে। এই সকল সংঘাত হীনবল ও চঞ্চল বটে, তাহারা নিরন্তর ভাঙ্গে গড়ে বটে, এবং কিছুক্ষণ নর্ত্তন ক্রিয়ার পর জলবুদ্বুদবৎ বিলীন হয় বটে; কিন্তু কোনও কোনও স্থানে তাহারা বহুদিন স্থায়ী হয় এবং অবশেষে কেন্দ্রীভূত চৈতন্যকে বিতাড়িত করে। এই ব্যক্তিত্ব পুরুভুজ নামক সামুদ্রিক প্রাণীর সহিত উপমিত হইতে পারে। একটী পুরুভুজকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিলে, প্রতিখণ্ড হইতে এক একটী নূতন পুরুভুজের জন্ম হয়। আমাদের মধ্যে ব্যক্তিত্ববোধক একটী মাত্র অহংভাব প্রকট হয় বটে; কিন্তু জাগ্রত চৈতন্যের অন্তরালে অব্যক্তভাবে বহু ব্যক্তিত্ব সত্তার বীজ বা অঙ্কুর নিহিত আছে। জাগ্রত চৈতন্যের ও সুপ্ত চৈতন্যের সন্ধিস্থল অথবা ব্যক্তাব্যক্তের ব্যবধান রেখা (threshold) এক পর্দা সরিয়া গেলে, অব্যক্ত রাজ্য হইতে নূতন নূতন ব্যক্তিত্ব সত্তার আবির্ভাব হয়। এইরূপে একই ক্ষেত্রে একই চরিত্রে বহু ব্যক্তিত্বের বিকাশ হয়।

ইহাই যদি প্রকৃত তথ্য হয়, তাহা হইলে মনুষ্যের নৈতিক দায়িত্ব এবং জীবাত্মার অস্তিত্ব লইয়া গুরুতর ভাবনার কারণ উপস্থিত।

এই সকল গুরুতর বিষয় ছাড়িয়া দিলে, গ্রন্থকারদ্বয়ের যুক্তির মধ্যে অনেক পরিমাণে যে সত্যের আলোক পড়িয়াছে তাহা অস্বীকার করিবার যো নাই। এমন কোন ব্যক্তি আছেন কি যিনি জীবনে একাধিকবার যে কোনও ব্যক্তি নিজ নিজ পূর্ব্ব স্মৃতি একেবারে না হারাইয়াও সময়ে সময়ে নূতনতর জীবে পরিণত হয় তাহা প্রত্যক্ষ করেন নাই? যাহারা সর্ব্বদা নিজ নিজ প্রকৃত অথবা কাল্পনিক দুঃখের অতিচিন্তনে রত, তাহাদের মধ্যেই উক্তরূপ ঘটনা প্রায়ই দৃষ্ট হয়। সাধারণতঃ নীরোগ হৃষ্টচিত্ত লোকের দুঃখ নৈরাশ্য ও নির্যাতনের ইতিবৃত্ত

বা স্মৃতি মন্দিরের এমন গূহ্যতম প্রদেশে যে প্রয়োজনের সময়েও সেই অবসাদক ঘটনার উদ্দেশ্য পাওয়া যায় না; কিন্তু এমনও লোক আছে যাহাদের অতীতের বিষয় চিন্তা করিলেই সমস্ত দুঃখের কাহিনী মনশ্চক্ষুর সম্মুখে আসিয়া পড়ে। এই সকল দুঃখ কাহিনী অন্তস্থল প্রবাহিত চেতনার অতলস্পর্শ গহ্বরে চিরনিমজ্জিত না থাকিয়া কোন সামান্য ঘটনা সাহায্যে স্মৃতি-পথে জাগরূক হয় এবং সেই স্মৃতির অধিকারী পূর্ব্ব সত্তার তিরোধান হইয়া তৎস্থানে একটা কষ্ট-কলহ-বিপত্তিময় সত্তার আবির্ভাব হয়। জীবনের আনন্দ চলিয়া যায়, মনুষ্য জন্ম ব্যর্থ হয়। সুখী ও সন্তুষ্ট ব্যক্তির স্থানে বিকৃত মস্তিষ্ক, উন্মাদোগম, চিরবিষণ্ণ মূর্ত্তি পরিদৃষ্ট হয়। মধ্যাহ্ন সূর্য্য ও তাহার নিকট অন্ধকার মনে হয়, এবং নিজেকে সে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখী ও উৎপীড়িত মনে করে। যতদিন মানসিক বিকৃতি দূরীভূত না হয়, ততদিন এইরূপ অবস্থায় জীবন অতিবাহিত হয়। কিন্তু হঠাৎ কোনও অভিনব ভাব হৃদয়তন্ত্রী স্পর্শ করিলে, সমস্ত দৃশ্য পরিবর্ত্তিত হয়। দুঃখ অত্যাচারের ক্ষণিক বেদনা অসম্বুদ্ধ চেতনার রাজ্যে লুক্কায়িত হয়। ঘৃণা বিদ্বেষের নিষ্করুণ বাণী আর শ্রুত হয় না, সংসার বাসযোগ্য বলিয়া বোধ হয় এবং অপরের জীবনাপেক্ষা নিজের জীবন প্রীতিময়, মধুময় বলিয়া মনে হয়।

বিশেষ বিশেষ ভাব প্রতিনিয়ত অনুধ্যান করিতে করিতে যে তত্তৎভাব দ্বারা আমাদের চিত্ত আবিষ্ট হইতে পারে ইহা বহুদিন হইতে জানা আছে। কিন্তু কিরূপে এই আবেশ ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয় তাহা এই সমালোচ্য চিত্তাকর্ষক অথচ ভীতিজনক পুস্তকের রচয়িতৃদ্বয় দেখাইয়া দিয়াছেন।

(ক্রমশঃ)

বিজ্ঞানবাদ ও বেদান্ত।

এই বিশাল বিস্তীর্ণ বিবিধ বৈচিত্র্যময় জগৎ, যাহা প্রতিক্ষণ আমাদের ইন্দ্রিয়ের গোচর হইতেছে—এই জগৎ সত্য না মিথ্যা, বাস্তবিক না কাল্পনিক? এই বিষয় লইয়া বহুদিন হইতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দার্শনিক সমাজে মতভেদ আছে। এক সম্প্রদায় বলেন যে, জগৎ বিজ্ঞান (idea) মাত্র। রজ্জু-সর্পের

ন্যায়, শুক্তি-রজতের ন্যায়, মরীচি-জলের ন্যায় অলীক। Its essi is percipi—প্রতীতি মাত্রম্ এবৈতৎ ভাতি বিশ্বং চরাচরম্। এই মতকে বিজ্ঞানবাদ (Idealism) বলে। অপর সম্প্রদায় বলেন যে, জগৎ কাল্পনিক অবস্তু নহে—জগতের বাস্তবিক সত্তা আছে। জগতের যখন উপলব্ধি হইতেছে, তখন জগৎ মিথ্যা নহে; সত্য। এই মতকে বাস্তববাদ (Realism) বলে।

এ দেশের বৈদান্তিক সমাজও ঐ দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত। অদ্বৈত বেদান্তীরা বিজ্ঞানবাদী এবং বিশিষ্টাদ্বৈত বেদান্তীরা বাস্তববাদী। শঙ্করাচার্য্য প্রথম সম্প্রদায়ের প্রধান, এবং রামানুজ দ্বিতীয় সম্প্রদায়ের প্রধান। উভয় মতেরই ভিত্তি—বাদরায়ণকৃত ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্ত দর্শন। একই ভিত্তির উপর দুই বিরোধী মতবাদ কিরূপে প্রতিষ্ঠিত হইল,—প্রথম দৃষ্টিতে ইহা বিস্ময়ের বিষয় মনে হইতে পারে। কিন্তু সূত্রের প্রতি দৃষ্টি করিলে সে বিস্ময় দূর হয়। কারণ সূত্র এত সংক্ষিপ্ত ও দুরূহার্থ, কোন্ সূত্র সিদ্ধান্ত কোন সূত্র পূর্ব্বপক্ষ তাহা নিশ্চয় করা এতই কঠিন, যে এ সম্বন্ধে মতভেদ হওয়া বিচিত্র নহে। তবে ব্রহ্মসূত্রে যে ভাবে জগতের প্রসঙ্গ উত্থাপিত ও বিচারিত হইয়াছে, তাহার প্রতি সবিশেষ অনুধাবন করিলে ইহা যে প্রধানতঃ বাস্তববাদের অনুযায়ী, এরূপ মনে করা অসঙ্গত নহে। অতঃপর তাহারই আলোচনা করিতেছি।

মুণ্ডক উপনিষদের একটি মন্ত্র এইরূপ—'যৎ তৎ অদ্রেশ্যম্ অগ্রাহ্যম্ অগোত্রম্ অবর্ণম্ অচক্ষুঃ শ্রোত্রম্ তদ্ অপাণিপাদম্। নিত্যং বিভুং সর্ব্বগতং সুসূক্ষ্মং তদ্ অব্যয়ং যদ্ ভূতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ ॥—১।১।৬ সূত্র।

'ধীরগণ কোন নিত্য বিভু সর্ব্বগত অতি সূক্ষ্ম অব্যয় ভূতযোনিকে দর্শন করেন—যে ভূতযোনি অদৃশ্য, অগ্রাহ্য, অগোত্র, অবর্ণ, অচক্ষুঃ, অশ্রোত্র, অপাণি, অপাদ।'

বাদরায়ণ ব্রহ্মসূত্রের প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদে এই বিষয়ের বিচার উত্থাপন করিয়াছেন। অদৃশ্যাদি গুণকো ধর্ম্মোক্তে।—[১।২।২১ সূত্র।]

'এই যে মুণ্ডকোক্ত ভূতযোনি ইনি কে? ইনি কি সাংখ্যোক্ত প্রধান কিংবা জীব; অথবা ইনি পরমেশ্বর? বাদরায়ণের সিদ্ধান্ত এই যে, ইনি পরমেশ্বর। অর্থাৎ তাঁহার মতে ঈশ্বরই ভূতযোনি।

যোনি অর্থে কারণ। কারণ দ্বিবিধ, উপাদান ও নিমিত্ত; যেমন অলঙ্কারের প্রতি, সুবর্ণ উপাদান কারণ ও স্বর্ণকার নিমিত্ত কারণ; ঘটের প্রতি, মৃত্তিকা উপাদান কারণ এবং কুম্ভকার নিমিত্ত কারণ। ব্রহ্ম জগতের কোন্ কারণ—নিমিত্ত, না উপাদান? বাদরায়ণের সিদ্ধান্ত এই যে তিনি দুইই, নিমিত্তও বটেন এবং উপাদানও বটেন।

ব্রহ্ম যে জগতের নিমিত্ত-কারণ বাদরায়ণ নিম্নোদ্ধৃত সূত্রে তাহার প্রতিপাদন করিয়াছেন;—জগদ্বাচিত্বাৎ—[ব্রহ্মসূত্র, ১।৪।১৬]

ইহার ভাষ্যে শ্রীশঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন:—পরমেশ্বরশ্চ সর্ব্বজগতঃ কর্ত্তা সর্ব্ববেদান্তেষবধারিতঃ।

শঙ্করের মতানুসারী ভারতী তীর্থ লিখিতেছেন:—এতৎ কৃৎস্নম্ জগদ্ যস্য কার্য্যং স এব বেদিতব্য ইতি। কৃৎস্ন জগৎ কর্ত্তৃত্বঞ্চ পরমাত্মনঃ এব।

অর্থাৎ, 'পরমেশ্বর, পরমাত্মাই সমস্ত জগতের কর্ত্তা (নিমিত্ত-কারণ)।

তিনি যে কেবল নিমিত্ত-কারণ তাহা নহেন, উপাদান-কারণও বটেন, ইহা প্রতিপাদন করিবার জন্য বাদরায়ণ একাধিক সূত্র নিয়োজিত করিয়াছেন।

প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুরোধাৎ ইত্যাদি॥ [ব্রহ্মসূত্র, ১।৪।২৩-২৭]

ইহার ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন, :—এবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ। প্রকৃতিশ্চোপাদান কারণং চ ব্রহ্মাভ্যুপগন্তব্যং নিমিত্ত-কারণং চ। ন কেবলং নিমিত্ত কারণমেব।

অর্থাৎ, 'ব্রহ্ম যে কেবল জগতের নিমিত্ত-কারণ তাহা নহে, তিনি নিমিত্ত-কারণ এবং উপাদান-কারণ উভয়ই।'

বাদরায়ণ দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পাদে আকাশ, বায়ু, অগ্নি, অপ্ ও ক্ষিতি এই পঞ্চভূত যে ব্রহ্মকার্য্য—ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন—তাহা প্রতিপাদন করিয়াছেন।

তস্মাদ্ ব্রহ্মকার্য্যং বিয়দিতি সিদ্ধম্। [২।৩।৭ ব্রহ্মসূত্রের শাঙ্করভাষ্য]

২।৩।১৩ সূত্রের ভাষ্যে শঙ্কর বলিতেছেন,—স এব পরমেশ্বরস্তেনতেনাত্মনাবতিষ্ঠমানোঽভিধ্যায়ন্ তং তং বিকারং সৃজতি। সোঽকাময়ত বহুস্যাং প্রজায়েয়। ইতি প্রস্তুত্য সচ্চত্যচ্চাভবৎ।

অর্থাৎ, পরমেশ্বরের যখন সৃষ্টির ইচ্ছা হয়, তখন তিনি সৎ (পুরুষ) ও

তৎ (প্রকৃতি) রূপে সংভিন্ন হন। তিনি অভিধ্যান করিয়া সেই সেই বিকার সৃষ্টি করেন।'

অনুলোম ক্রমে সৃষ্টি ও বিলোম ক্রমে প্রলয় সাধিত হয়, ইহাও বাদরায়ণ উপদেশ করিয়াছেন:—বিপর্য্যয়েণ তু ক্রমোঽত উপপদ্যতে চ॥ [ব্রহ্মসূত্র, ২।৩।১৪]

অর্থাৎ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে অপ্, অপ্, হইতে ক্ষিতি;—ইহাই সৃষ্টির ক্রম।

তস্মাদ্ বা এতস্মাদ্ আকাশঃ সম্ভূতঃ। আকাশাদ্ বায়ু র্বায়োরগ্নি রগ্নে আপঃ অদ্ভ্যশ্চ পৃথিবী উৎপদ্যতে॥

প্রলয়ের ক্রম ইহার ঠিক বিপরীত; প্রলয়ের সময় প্রথমে ক্ষিতি অপ্ তত্ত্বে বিলীন হয়; তাহার পর অপ্ অগ্নি তত্ত্বে, অগ্নি বায়ু তত্ত্বে, বায়ু আকাশ তত্ত্বে বিলীন হয়, এবং সর্ব্বশেষ আকাশ ব্রহ্মে বিলীন হয়।

এ সকল কথার পর বাদরায়ণ কি জগৎকে রজ্জু-সর্পের ন্যায় অলীক, মায়ার বিজৃম্ভণ, বিজ্ঞান মাত্র বলিতে পারেন?

জগৎ যদি অলীক—মায়িক—ইহাই বাদরায়ণের অভিমত হইবে, তবে তিনি ব্রহ্মসূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদে নিম্নোক্ত আপত্তি সমূহের উত্থাপন ও খণ্ডনে এত সূত্র নিয়োজিত করিবেন কেন? বাদরায়ণের বিচার পদ্ধতিএইরূপ;

(ক) জগৎ অচেতন; ব্রহ্ম চেতন। অতএব আপত্তি হইতে পারে যে, চেতন ব্রহ্ম হইতে অচেতন জগতের উৎপত্তি সম্ভবপর নহে। ইহার উত্তরে বাদরায়ণ বলিতেছেন যে, এ ব্যাপ্তির ব্যভিচার দৃষ্ট হয়। চেতন হইতে অচেতনের উৎপত্তির দৃষ্টান্ত বিরল নহে। চেতন পুরুষ হইতে অচেতন কেশ নখের উদ্ভব দেখা যায়। [২।১।৪—১১ নং সূত্র।]

(খ) কুম্ভকার যে ঘট সৃষ্টি করে, তাহা দণ্ড চক্র প্রভৃতি উপকরণের সাহায্যে; ব্রহ্মের যখন উপকরণ নাই, তখন তিনি কিরূপে এই বিচিত্র জগৎ সৃষ্টি করিবেন? এই আপত্তির উত্তরে বাদরায়ণ বলিতেছেন যে, উপকরণ ভিন্নও সৃষ্টি দেখা যায়;—ক্ষীরবদ্ধি। দেবাদিবদপি লোকে। [২।১।২৪—২৫ সূত্র]

ইহাদের ভাষ্যে শ্রীশঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন—'যথা হি লোকে ক্ষীরং জলং বা স্বয়মেব দধি হিমভাবেন পরিণমতে, অপেক্ষ্য বাহ্যং সাধনং তথেহাপি

ভবিষ্যতি। একস্যাপি ব্রহ্মণো বিচিত্রশক্তি যোগাৎ ক্ষীরাদিবদ্ বিচিত্র পরিণাম উপপদ্যতে। যথা লোকে দেবাঃ পিতর ঋষয় ইত্যেবমাদয়ো মহাপ্রভাবাশ্চেতনা অপিসন্তোহনপেক্ষ্যৈব কিঞ্চিদ্ বাহ্যং সাধনম্ ঐশ্বর্য্যবিশেষযোগাদ্ অভিধ্যান মাত্রেন স্বত এব বহূনি নানা সংস্থানানি শারীরাণি প্রাসাদাদীনি রথাদীনিচ নির্ম্মাণা উপলভ্যন্তে * * এবং চেতনমপি ব্রহ্মাহনপেক্ষ্য বাহ্যং সাধনং স্বত এব জগৎ স্রক্ষ্যতি।

'যেমন দুগ্ধ বা জল কোন বাহ্য সাধনের অপেক্ষা না করিয়াই স্বয়ং দধি ও তুষাররূপে পরিণত হয়, ব্রহ্মও সেইরূপ। ব্রহ্ম এক বটেন, কিন্তু তিনি বিবিধ বিচিত্র শক্তিমান্। অতএব তাঁহার বিচিত্র পরিণাম অসঙ্গত নহে। আরও, যেমন দেব পিতৃ ঋষি প্রভৃতি মহাপ্রভাব চেতন (পুরুষ) কোনও বাহ্য সাধনের অপেক্ষা না করিয়া, স্ব স্ব ঐশ্বর্য্য বলে সংকল্প মাত্রেই বহুবিধ শরীর, প্রাসাদ, রথ প্রভৃতি সৃষ্টি করেন, চেতন ব্রহ্মও সেইরূপ কোনরূপ বাহ্য সাধনের অপেক্ষা না করিয়া স্বতঃই জগৎ সৃষ্টি করেন।

(গ) আপত্তি হইতে পারে যে, জগৎ যদি ব্রহ্মের পরিণাম, এবং ব্রহ্ম যখন নিরবয়ব, তখনতো সমস্ত ব্রহ্মই কার্য্যরূপে পরিণত (বিকারগ্রস্ত) হইবেন, অন্যথা তাঁহাকে সাবয়ব বলিতে হয়। কৃৎস্ন প্রসক্তির্নিরবয়বত্ব শব্দ কোপো বা। [২।১।২৬ সূত্র।]

ইহার উত্তরে বাদরায়ণ বলিতেছেন—শ্রুতেশ্চ শব্দমূলত্বাৎ। [২।১।২৭ সূত্র।]

'ন তাবৎ কৃৎস্নপ্রসক্তি রস্তি। কুতঃ। শ্রুতেঃ। চনৈব হি ব্রহ্মণো জগদুৎপত্তিঃ শ্রূয়তে, এবং বিচারব্যতিরেকেনাপ ব্রহ্মণোহবস্থানং শ্রূয়তে। 'পাদোস্য বিশ্ব ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি' ইতিচৈব জাতীয়চাৎঃ--শঙ্কর ভাষ্য।

'যে শ্রুতি ব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপত্তি উপদেশ দিয়াছেন, তিনিই বলিতেছেন যে ব্রহ্ম বিকারগ্রস্ত না হইয়া অবস্থান করেন। 'তাঁহার একাংশে সমস্ত ভূত; অপর তিন অংশ অমৃত; অতএব, ব্রহ্মের বিকারের আশঙ্কা অমূলক।

(ঘ) পুনশ্চ আপত্তি হইতে পারে যে, ব্রহ্ম যখন বিকরণ (নিরাকার), তখন তিনি কিরূপে সৃষ্টি কার্য্য সমাধা করিবেন? বাদরায়ণ উত্তরে নিম্নোক্ত শ্রুতির প্রতি লক্ষ্য করিয়াছেন। বিকরণত্বাদি ইতি চেৎ তদুক্তম [২।৩।৩১।]

অপাণিপাদো জবনোগ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ [শ্বেত ৩।১৯।]

তাঁহার হস্ত নাই অথচ গ্রহণ করেন ; পদ নাই অথচ গমন করেন ; চক্ষু নাই অথচ দর্শন করেন ; কর্ণ নাই অথচ শ্রবণ করেন।

(ঙ) পুনশ্চ আপত্তি হইতে পারে যে, ভগবান যখন আপ্তকাম, কি প্রয়োজনে কোন অভাবের পূরণে তিনি সৃষ্টি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন ? উত্তরে বাদরায়ণ বলিতেছেন :—লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্ [২।১।৩৩ সূত্র।]

"সৃষ্টি তাঁহার লীলা বিলাস মাত্র ; যেমন শিশু প্রয়োজন ভিন্নও ক্রীড়া করে, তাঁহার সৃষ্টিকার্য্যও সেইরূপ।

(চ) পুনশ্চ আপত্তি হইতে পারে যে, জগৎ যখন বৈষম্যের আধার, এখানে যখন কেহ সুখী কেহ দুঃখী, কেহ ধনী কেহ দরিদ্র, তখন এ জগৎ যদি ঈশ্বরের রচনা হয় তবে হয় তিনি পক্ষপাতী, নয় তিনি নিষ্ঠুর। ইহার উত্তরে বাদরায়ণ বলিতেছেন :—বৈষম্য নৈর্ঘৃন্যেন, সাপেক্ষত্বাৎ তথা হি দর্শয়তি। [২।১।৩৪।]

সাপেক্ষাহীশ্বরো বিষমাং সৃষ্টিং নির্মিমীতে। কিং অপেক্ষত ইতি চেৎ। ধর্ম্মাধর্ম্মৌ অপেক্ষত ইতি বদাম :—শঙ্কর ভাষ্য।

ভগবান্ জীবের ধর্ম্মানুসারে সৃষ্টি করেন। যাহার সুকৃত আছে, তাহাকে সুখী করেন ; যে দুস্কৃত তাহাকে দুঃখী করেন। তাঁহার ইহাতে পক্ষপাত বা নিষ্করুণতার প্রসঙ্গ উঠিতে পারে না।

যে বাদরায়ণ এই সকল যুক্তি তর্ক, এই সকল প্রমাণ প্রয়োগের অবতারণা করিয়াছেন, তিনি কিরূপে জগৎ যে বিজ্ঞান মাত্র, অলীক কল্পনা, বলিবেন ? বিশেষতঃ যখন তিনি তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদের আরম্ভেই (১—৬ সূত্রে), স্বপ্ন সৃষ্টি ও জাগ্রত সৃষ্টির ভেদ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সেখানে তিনি স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন যে, স্বপ্ন সৃষ্টিই মায়াময়। মায়ামাত্রন্তু কাৎস্নেনানভিব্যক্ত স্বরূপত্বাৎ—[৩।২।৩ সূত্র।] ইহার ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন—

'স্বপ্নে যে সৃষ্টি, তাহা মায়িক মাত্র। তাহাতে সত্যের গন্ধও নাই। অতএব স্বপ্নদর্শন মায়া মাত্র। সুতরাং যে সৃষ্টি স্বপ্নকে আশ্রয় করিয়া উদ্ভূত হয়, তাহা আকাশাদি সৃষ্টির ন্যায় পারমার্থিক নহে—ইহাও প্রতিপন্ন হইল।' তবে আর জগৎ মিথ্যা কিরূপে বলা যায় ?

জগৎ সত্য কি মিথ্যা এসম্বন্ধে বাদরায়ণ আপন মত অন্যত্র স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। অতএব এ বিষয় লইয়া বিবাদ হওয়া উচিত নহে। বাদরায়ণ বলিতেছেন ঃ—নাভাব উপলব্ধেঃ— [২।২।২৮ সূত্র।]

ইহার ভাষ্যে শঙ্কর বলিতেছেন—'ন খল্বভাবো বাহ্যস্যার্থস্য অধ্যবসাতুং শক্যতে। কস্মাৎ? উপলব্ধে। উপলভ্যতে হি প্রতি প্রত্যয়ং বাহ্যোঽর্থঃ স্তম্ভঃ কুড্যং ঘটঃ পট ইতি।' 'জগতের অভাব—জগৎ নাই—এরূপ নিশ্চয় করা যায় না। কেন? যেহেতু প্রত্যেক চিত্ত বৃত্তিতে বাহ্য বস্তুর উপলব্ধি হইতেছে—স্তম্ভ, ভিত্তি, ঘট পট ইত্যাদি। অন্যত্র বাদরায়ণ বলিতেছেন—ভাবেচোপলব্ধে।— [১।১।৫ সূত্র।] ন ভাবোঽনুপলব্ধে।—[২।২।৩০ সূত্র।] 'যে বস্তু আছে তাহারই উপলব্ধি হয়, যে বস্তু নাই তাহার উপলব্ধি হয় না।' অতএব বাদরায়ণের সিদ্ধান্ত এই যে যখন জগতের উপলব্ধি হইতেছে, তখন জগৎ আছেই। ইহাতে এ কথা বলা হইল না যে, জগৎ যেরূপে প্রতীত হইতেছে, জগৎ বস্তুতঃও সেইরূপ। ফুল বা পর্ব্বত আমরা যেরূপ দেখিতেছি, ফুল বা পর্ব্বত যে বাস্তবিক সেইরূপ—এ কথা কোন দার্শনিকই বলিবেন না; কিন্তু যখন পর্ব্বতের ও ফুলের উপলব্ধি হইতেছে, তখন যে ফুল ও পর্ব্বত বলিয়া কোন কিছু বস্তু আছে, ইহা সুনিশ্চিত।

সত্যবটে, বাদরায়ণ—তদনন্যম্ আরম্ভণ শব্দাদিভ্যঃ [২।১।১৪ সূত্র।] এই সূত্রে জগৎ ও ব্রহ্ম অনন্য (অভিন্ন) এইরূপ উপদেশ করিয়াছেন। এ স্থলে তাঁহার লক্ষ্য নিম্নোদ্ধৃত ছান্দোগ্যশ্রুতি—

যথা সৌম্যেকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ব্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাৎ। বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্; এবং সোম্য স আদেশঃ—'যেমন এক মাত্র মৃৎপিণ্ডকে জানিলে সমস্ত মৃন্ময় পদার্থকে জানা যায়; কারণ বাক্যের আরম্ভ বিকার, নামের প্রভেদ মাত্র—মৃত্তিকা ইহাই সত্য; ব্রহ্ম বিষয়েও সেইরূপ উপদেশ। অর্থাৎ এক ব্রহ্মকে জানিলেই সমস্ত পদার্থ জানা যায়। ইহার দ্বারা জগৎ যে বিজ্ঞানমাত্র, অলীক অবস্তু ইহাত বলা হইল না। এই মাত্র বলা হইল যে, জগতে ও ব্রহ্মে নামরূপের প্রভেদ, উভয়ে স্বরূপতঃ অভিন্ন। যেমন কুণ্ডল বলয় প্রভৃতি স্বর্ণালঙ্কার সকলের মধ্যে আকারের ও সংজ্ঞার প্রভেদ থাকিলেও, রাসায়নিকের দৃষ্টিতে তাহারা স্বর্ণ ভিন্ন আর কিছু নহে,

তাহাদের মধ্যে নাম ও রূপের মাত্র প্রভেদ ; কিন্তু সে প্রভেদ সত্ত্বেও তাহারা স্বর্ণ বই আর কিছু নহে ; সেইরূপ জগৎ বিবিধ বৈচিত্র্যময় হইলেও ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছু নহে। জগৎকে ব্রহ্মের 'প্রকৃতি', ব্রহ্মের প্রকার বা বিধি (aspect) স্বীকার করিলেই এ কথার যথেষ্ট সমর্থন হয় ; তজ্জন্য জগৎকে অলীক বলার প্রয়োজন কি ? প্রধান (matter) ও পুরুষ (spirit বা force) যাহাদের সংযোগে এই জগৎ, সেই প্রধান ও পুরুষ ব্রহ্মেরই পরা ও অপরা প্রকৃতি মাত্র।

যা পরাপর সংভিন্না প্রকৃতি স্তে সিসৃক্ষয়া।

ব্রহ্মের যখন সিসৃক্ষা (সৃষ্টির সংকল্প) হয়, তখন তাঁহার প্রকৃতি পরা ও অপরারূপে, প্রধান ও পুরুষরূপে, সংভিন্ন হয়, কিন্তু তাহা হইলেও ইহারাত ব্রহ্মের প্রকৃতি বা প্রকার (aspect) ভিন্ন আর কিছুই নহে। যে যাহার প্রকার, সে কি তাহা হইতে ভিন্ন হইতে পারে ? তাহাকে তাহা হইতে অনন্য (অভিন্ন) বলাই সঙ্গত। অতএব, জগৎকে ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন বলা কিছু মাত্র অসঙ্গত নহে ; এবং এরূপ বলাতে জগতের মিথ্যাত্ব সূচিত হয় না।

এই ভাবে দেখিলে বাদরায়ণ অন্যত্র যে বলিয়াছেন যে, ব্রহ্ম ভিন্ন:অন্য বস্তু নাই—তথান্য প্রতিষেধাৎ—[৩।২।৩৬ সূত্র।] তাহারও সুন্দর মীমাংসা হয়। জগতে যাহা কিছু আছে, তাহা হয় প্রকৃতি না হয় পুরুষ—যে কিছু পদার্থ এই উভয়ের একের কোটিতে পড়িবেই। সেই প্রকৃতি ও পুরুষ যখন ব্রহ্মেরই প্রকার বা বিধি, তখন এক ব্রহ্ম ভিন্ন আর কি আছে বা থাকিতে পারে ? তিনিই একমেবাদ্বিতীয়ম্। তিনি ব্যতীত 'নানা, কিছু নাই। ইহা দ্বারাও জগতের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদিত হয় না। বিশেষতঃ যখন ইহার পরবর্ত্তী সূত্রেই বাদরায়ণ বলিতেছেন,—অনেন সর্ব্বগতত্বম্ আয়ামশব্দাদিভ্যঃ।—[৩।২।৩৭ সূত্র।] অর্থাৎ ব্রহ্ম সর্ব্বগত শ্রুতি এইরূপ উপদেশ দিয়াছেন। এখন সর্ব্ব (জগৎ) যদি অলীক বিজ্ঞান মাত্র হয়, তবে ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপী হইবেন কিরূপে ? অথচ, শাস্ত্র ভূয়োভূয়ঃ তাঁহাকে সর্ব্বব্যাপী বলিয়াছেন :—আকাশবৎ সর্ব্বগতশ্চ নিত্যঃ। তিনি নিত্য, আকাশের ন্যায় সর্ব্বব্যাপী। নিত্যঃ সর্ব্বগত স্থাণুরচলোয়ং সনাতনঃ। 'তিনি নিত্য, তিনি সনাতন ; তিনি স্থাণু, অচল ও সর্ব্বগত।'

শ্রীহীরেন্দ্র নাথ দত্ত।

সনাতন ধৰ্ম্ম।

তৃতীয় প্রস্তাব।

একমেবাদ্বিতীয়ং।

সর্ব্বশাস্ত্র তারস্বরে ঘোষণা করিতেছেন "একমেবাদ্বিতীয়ং"।

সেই পরমতত্ত্ব, অনন্ত, অদ্বয়, অব্যয়, সর্ব্ব, তৎ, নির্ব্বিশেষ, নির্গুণ, নাম রূপের অতীত, নির্গুণব্রহ্ম। ঋগ্বেদ বলিতেছেন—

"না সদাসীন্নোসদাসীৎ ... ...

আনীদবাতস্বধয়াতদেকং তস্মাদ্ধান্যপরঃ কিঞ্চণম॥" (ঋক ১০।১২৯।১২)

তখন সদসৎ কিছুই ছিল না। ... ... কেবল তৎপদার্থ স্বকীয় প্রকৃতিতে বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি অসৎ হইতে স্বতন্ত্র।"

তৎসম্বন্ধে কিছুই বিশেষ করিয়া বলিবার উপায় নাই, কারণ তিনিই সর্ব্ব। তাহাতেই সমুদায় বিদ্যমান রহিয়াছে। ন সৎ তৎ নাসদুচ্যতে।" তাহাকে সৎ বা অসৎ কোনও নামেই বিশেষিত করিতে পারা যায় না। শ্বেতাশ্বত রোপনিষৎ বলিতেছেন—

"যদা তমস্তন্নদিবা ন রাত্রির্ন সন্নচাসচ্ছিব এব কেবলঃ।" (শ্বেত ৪।১৩)

"তখন অন্ধকার ছিল না, রাত্রি ছিল না, দিবাও ছিল না, সৎ অসৎ কিছুই ছিল না কেবল শিব ছিলেন।" আবার ঐ উপনিষৎ বলিতেছেন—

"দ্বে অক্ষরে ব্রহ্মপরেত্বনন্তে বিদ্যেববিদ্যে নিহিতে যত্র গূঢ়ে।" (শ্বেত ৫।১)

অনন্ত অক্ষর ব্রহ্মে বিদ্যা ও অবিদ্যা দুই গূঢ়ভাবে বর্ত্তমান আছে।" তৎ সম্বন্ধে "অস্তীতি" মাত্র নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

এক অচিন্ত্য ধ্বনি মাত্র তৎসূচক, তাহা নাম ও সংখ্যার সীমাতীত। সেই ধ্বনিই প্রণব বা শব্দব্রহ্ম। নাচিকেতা যমকে সর্ব্বগুহ্যতমতত্ত্ব প্রকাশ করিতে অনুরোধ করিতেছিলেন; তাহাতে যম তাঁহাকে উপযুক্ত অধিকারী বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। নাচিকেতা বলিয়াছিলেন—

"অন্যত্র ধর্ম্মাদন্যত্রাধর্ম্মাদন্যত্রাস্মাৎকৃতাকৃতাৎ।
অন্যত্র ভূতাচ্চ ভব্যাচ্চ যত্তৎ পশ্যসি তদ্বদ॥ (কঠ ২।৬।১২)

"ধর্ম্ম অধর্ম্ম কার্য্যাকার্য্য ও ভূতভব্য ব্যতীত যে তত্ত্ব আপনি প্রত্যক্ষ করিতেছেন তাহা আমাকে বলুন।" যম বলিলেন—

সর্ব্বে বেদা যৎপদ মামনন্তি, তপাংসি সর্ব্বাণি চ যদ্বদন্তি।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি, তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীমি॥
ওঁ ইত্যেতৎ। এতৎ হ্যেবাক্ষরং ব্রহ্ম এতদেবাক্ষরং পরং।
(কঠ ১।২।১৪, ১৫, ১৬)

সর্ব্ববেদ যাহা করিছে ঘোষণা, সর্ব্ব তপ যাহা করিছে প্রচার।
যাহার উদ্দেশে ব্রহ্মচর্য্য করে, সেই পদ কহি নিকটে তোমার॥
ওঁ এই পদ সেই গুহ্যতত্ত্ব শব্দব্রহ্ম ইহা জানিহ নিশ্চয়।
ইহার সমান আর কিছুই নাই অনন্ত অমেয় অচিন্ত্য অব্যয়॥

সেই এক, অসৎ হইয়াও সৎ, তিনি জ্ঞানেন্দ্রিয় কর্ম্মেন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার দ্বারা প্রত্যক্ষীভূত হইবার নহেন, সুতরাং তিনি অসৎ। কিন্তু তথাপি শুদ্ধ জ্ঞানের চক্ষে তিনি নিত্য সৎ, ভক্তির চক্ষে তিনি প্রত্যক্ষ, সুতরাং সৎ। তিনি এই বিশ্ব এবং অসংখ্য অনন্ত বিশ্বে অনুস্যূতভাবে নিত্য বিদ্যমান, সুতরাং স্থাবরাস্থাবর সমুদায় পদার্থের কিছুই এক ক্ষণের জন্যও তাহা ছাড়া নাই, এইজন্য জগতের সকল ধর্ম্মশাস্ত্র, সকল আস্তিক বিজ্ঞান ও দর্শন তাহার অস্তিত্ব স্বীকার করিতেছে, তাহাকে বিশ্বসংসারের নিত্যতত্ত্ব বলিয়া স্বীকার করিতেছে। তাঁহার বিষয়ে অনন্তশাস্ত্র অনন্তভাবে বিতর্ক করিয়াছে, করিতেছেও করিবে; কারণ তাঁহার অস্তিত্বে বিশ্বাস করিবার প্রয়োজন; অশেষ শাস্ত্র তাহাতে অশেষ নামে অভিহিত করিয়াছে। কিন্তু তিনি চিরদিনই নামরূপের অতীত। এই সমস্তই তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। তিনি সর্ব্ব, নিগুর্ণ, পূর্ণ, শূন্য, গতি, স্থিতি, সত্য, কারণ। এই সমস্ত উপাধিই তাহার পক্ষে অসত্য নয়। কিন্তু কোনটা পূর্ণরূপে তাহার স্বরূপের দ্যোতক নহে। প্রাজ্ঞ মহর্ষিগণ "নেতি নেতি" বাক্য দ্বারা বিলোম ক্রমে তাঁহার স্বরূপ হৃদ্গত করিতে যত্ন করিয়াছেন।

সেই পরম পদার্থ নিত্যসিন্নিহিত ও অন্তরঙ্গ হইলে বাক্যযোগে তাহাকে জানিতে গেলে, তিনি গভীর আবরণে আবৃত হয়েন। "পরমাত্মা" নামটি দ্বারা যেন তাহার স্বরূপ কতকটা প্রাণে অনুভূত হয়। মাণ্ডুক্যোপনিষৎ বলিতেছেন—

"অয়মাত্মা ব্রহ্ম" এই আত্মাই ব্রহ্ম। এই তত্ত্ব ভূয়োভূয়ঃ সকল শাস্ত্রে কীর্ত্তিত হইয়াছে। যেমন একখণ্ড মৃত্তিকা দেখিয়া তাবৎ মৃত্তিকার স্বরূপ বুঝিতে পারা যায়—যেমন একটু স্বর্ণ দেখিলেই স্বর্ণ কি তাহা উপলব্ধি হয়, একটু লৌহ দেখিলেই লৌহের স্বরূপ আয়ত্ত হয়, নাম ভেদে কিছু আসে যায় না, সেইরূপ আত্মজ্ঞান দ্বারাই সেই পরমাত্মার উপলব্ধি হইয়া থাকে। তাহাকে জানিলেই সকল জানা হয়। কারণ—সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" (ছান্দোগ্য ৩।১৪।১।)

চরাচর বিশ্বের সকলই ব্রহ্ম। কেন না "তজ্জলানিতি" (তত্র জায়তে লীয়তে অনিতি = তজ্জলানিতি) এই বিশ্ব তাঁহা হইতে উৎপন্ন হইতেছে, তাঁহাতেই লীন হইতেছে এবং তাহাতেই বর্ত্তমান রহিয়াছে।" আমরা চারিদিকে যাহা কিছু দেখিতেছি তাহা সেই এক পূর্ণতত্ত্বের প্রতিবিম্ব মাত্র। সেই জন্য উপনিষৎ বলিতেছেন—"এষ ম আত্মান্তর্হৃদয় এতদ্‌ব্রহ্ম"—(ছান্দোগ্য ৩।১৪।৪) আমার হৃদয়ান্তঃস্থিত এই আত্মাই সেই ব্রহ্ম। অল্প বয়স্ক যুবকের এই দার্শনিক তত্ত্বের রহস্য ভেদ করিবার জন্য চেষ্টার প্রয়োজন নাই, বিতর্কদ্বারা সিদ্ধান্ত করিবার জন্য যত্ন করিবারও প্রয়োজন নাই। কেবল এই সমুদায় শ্রুতিবাক্য সত্য এবং প্রজ্ঞা সম্পন্ন মহাযোগীগণ ইহা এক বাক্যে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন, ইহা জানিয়া রাখিলেই যথেষ্ট হইবেক। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে তিনি অবশ্যই এই রহস্য উত্তরোত্তর অধিকতর পরিস্ফুট ভাবে বুঝিতে সমর্থ হইবেন সন্দেহ নাই। সেই অদ্বয় তত্ত্বই এই ব্রহ্মাণ্ডের আধার, ব্রহ্মাণ্ডের হৃদয়, সকলের অন্তর্যামী—এই কথাটি হৃদয়ে ধারণ করিয়া রাখিলেই আপাততঃ যথেষ্ট হইবে। কারণ সেই তত্ত্ব চিরদিনই জ্ঞানগোচর হইবার আগেই, প্রাণ গোচর হইয়া থাকে।

সেই বিদ্যাই পরাবিদ্যা, যাহা দ্বারা সেই অক্ষর পুরুষ হৃদগত হইয়া থাকেন। সেই বিদ্যা কেবল পবিত্রতা, গুরুভক্তি, প্রাণযজ্ঞ ও জ্ঞান যোগ দ্বারা লব্ধ হইয়া থাকে। কঠোপনিষৎ বলিতেছেন—

নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো নাসমাহিতঃ।
নাশান্তমানসো বাপি প্রজ্ঞানেনৈ নমাপ্নুয়াৎ (কঠ ১।২।২৪)

যে ব্যক্তি অসৎ পথ ত্যাগ করে নাই, শান্ত ভাব অবলম্বন করে নাই—তাহার প্রজ্ঞান দ্বারা তাঁহাকে লাভ করিবার সম্ভাবনা নাই।"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যো, নচ প্রমাদাৎ তপসো বাপ্যলিঙ্গাৎ।

এতৈরুপায়ৈর্যততে যস্ত বিদ্বাংস্তস্যৈব আত্মা বিশতে ব্রহ্মধাম ॥" (মুণ্ডক ৩।২।৪)

যে ব্যক্তি বলহীন এই আত্মা তাহার লভ্য নহেন, প্রমাদ ও অলিঙ্গ তপস্যা দ্বারাও তাহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। যে জ্ঞানী, কথিত উপায়ে সাধনা করেন, তাঁহার আত্মাই ব্রহ্মধামে প্রবেশ করেন। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা বলিতেছেন—

"লভন্তে ব্রহ্মনির্ব্বাণং ঋষয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ।

ছিন্নদ্বৈধা যতাত্মানঃ সর্ব্বভূতহিতেরতাঃ॥" (গীতা ৫।২৫)

ক্ষীণকল্মষ ঋষিগণ সংশয়শূন্য যতাত্মা ও সর্ব্বভূতহিতরত হইয়া, ব্রহ্ম নির্ব্বাণ লাভ করেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ ব্যক্তিই "শান্তিমৃস্থতি" বলিয়াছেন। প্রশ্নোপনিষদে দেখিতে পাওয়া যায়—

"এতদ্বৈ সত্যকাম পরঞ্চাপরঞ্চ ব্রহ্ম যদোঙ্কারঃ।" (৫।২)

"হে সত্যকাম, নিশ্চয় এই ওঙ্কারই সেই পরব্রহ্ম ও অপর ব্রহ্ম।" বৃহদারণ্যকে দেখিতে পাওয়া যায়— "দ্বে বাব ব্রহ্মণো রূপে, মূর্ত্তঞ্চৈবামূর্ত্তঞ্চ মর্ত্ত্যঞ্চামৃতঞ্চ স্থিতঞ্চ যদ্য সক ত্যস্থ॥"—(বৃহ, ২।৩।১) সেই ব্রহ্মে দ্বিবিধাবস্থাই আছে, তিনি মূর্ত্ত এবং অমূর্ত্ত, মর্ত্ত্য এবং অমৃত, স্থির ও চঞ্চল, সান্ত ও অনন্ত, সৎ ও তদতীত॥

ব্রহ্মের ওরূপ, সসীম বর্ত্তমান অবস্থা, অনন্ত অসীম ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র নহে, ইহা তাহারি একদেশের সগুণ অবস্থা মাত্র। ঋগ্বেদ হইতে পূর্ব্বোদ্ধৃত ঋকে এই কথাই বলা আছে। "তপসস্তন্মাহনা জায়তৈকম্।" তপস্যার মহতী শক্তিবশে সেই একের উৎপত্তি হইয়াছিল।"

"বি যস্তস্তম্ভষড়িমা রজাংস্যজস্য রূপে কিমিপ দেকম্॥"

সেই এক কে? যিনি অজ হইয়াও এই ছয় লোকের প্রতিষ্ঠাপক। তাহার নাম "একম্" কারণ যাহার মধ্যে তিনি প্রকট, তাহা সংখ্যাতীত। তিনি সেই সমুদায়ে অনুস্যূত থাকায় তিনি সর্ব্ব, একও নন বহুও নন। মনু বলিয়াছেন—

"আসীদিদং তমোভুতং অপ্রজ্ঞাতমলক্ষণং।

অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং প্রসুপ্তমিব সর্ব্বতঃ॥

ততঃ স্বয়ম্ভূর্ভগবান ব্যক্তো ব্যঞ্জয়ন্নিদম্।

মহাভূতাদিবৃত্তৌজাঃ প্রাদুরাসীত্তমোনুদঃ ॥
যোঽসাবতীন্দ্রিয়গ্রাহ্যঃ সূক্ষ্মোঽব্যক্তঃ সনাতনঃ।
সর্ব্বভূতময়োঽচিন্ত্যঃ স এব স্বয়মুদ্বভৌ ॥

*   *   *   *

যত্তৎ-কারণমব্যক্তং নিত্যং সদসদাত্মকম্।
তদ্বিসৃষ্টঃ স পুরুষে লোকে ব্রহ্মেতি কীর্ত্ত্যতে॥

"ইহা তখন তমস্বরূপ অপ্রজ্ঞাত লক্ষণশূণ্য, অপ্রতর্ক, অবিজ্ঞেয় অবস্থায় ছিল, যেন সমুদায় প্রসুপ্ত ছিল।

"তখন সেই অব্যক্ত স্বয়ম্ভু, ভগবান মহাভূতাদি সমুদায় প্রকাশিত করিয়া অন্ধকারনাশক মূর্ত্তিতে সশক্তি প্রকাশ হইলেন।

যিনি প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয় শক্তি সমূহের অতীত শক্তিবিশেষ দ্বারা অনুভূত হইয়া থাকেন, যিনি সূক্ষ্ম, অব্যক্ত, সনাতন, সর্ব্বভূতময় ও অচিন্ত্য, তিনি নিজেই সপ্রকাশ হইলেন।

*   *   *   *   *   *

সেই নিত্য সদসদাত্মক, অব্যক্ত কারণ পুরুষ-রূপে প্রকট হইলেন তিনি ব্রহ্ম নামে কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন।"

এই স্থলে "ইদং" "ইহা" পদ বিশ্বের সূচক। তখন ইহার মূলপ্রকৃতি অবস্থা, অব্যক্ত, অবিজ্ঞেয়। যখন স্বয়ম্ভু প্রকাশিত হইয়া বিশ্ব প্রকাশিত করিলেন, তখন ইহা প্রকাশিত হইল। তিনি প্রকৃতিকে আশ্রয় না করিয়া প্রকাশিত হইতে পারেন না, প্রকৃতিও তাহাকে আশ্রয় না করিয়া প্রকাশ হইতে পারেন না। এই দুই, দুয়ে এক, একে দুই। পুরুষ ও প্রকৃতি, সৎ ও অসৎ, আত্ম ও অনাত্ম, দুই হইয়াও এক, এক হইয়াও দুই। এই দুই বা এক সমস্তের কারণ।

"তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং, তস্যভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি।" (কট ২।৫।১৫)

"তিনি প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে সমুদায় প্রকাশিত হইল, তাঁহার দীপ্তিতেই সমুদায় দীপ্ত হইল।"

তিনিই সগুণব্রহ্ম, এবং প্রকৃতিবশে সচ্চিদানন্দ স্বরূপ! তিনি অক্ষয়, কারণ তাঁহার নাশ নাই, তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া প্রকৃতি বিভাসিত। তিনিই

"আত্মান্তর্য্যাম্যমৃতঃ" আত্মা, অন্তর্যামী ও অমৃত। তিনি পৃথিব্যাদি ভূত পঞ্চে অনুস্যূত ভাবে বর্ত্তমান—স্বর্গে, দেবগণে, চরাচরবিশ্বের সমুদায়ে তিনি অনুস্যূত ভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছেন। বৃহদারণ্যক বলিয়াছেন—

"অদৃষ্টোদ্রষ্টাহশ্রুতঃ শ্রোতাহমতোমন্তাহবিজ্ঞাতো বিজ্ঞাতা নান্যোহতোহস্তি দ্রষ্টা নান্যোহতেহস্তি শ্রোতা নান্যোহতোহস্তি মন্তা ন্যান্যোহতোহস্তিস্তি বিজ্ঞাতৈষ ত আত্মান্তর্য্যাম্যমৃতোহতোহন্যদার্ত্ত। (বৃহদারণ্যক ৩।৭।২৩)

"তাঁহাকে কেহ দেখিতে পায় না, কিন্তু তিনি সকলি দেখিতেছেন। তাহাকে কেহ শুনিতে পায় না, কিন্তু তিনি সকলি শুনিতেছেন। তাহাকে কেহ চিন্তা করিয়া নির্ণয় করিতে পারে না, কিন্তু তিনি সকলি চিন্তা করিতেছেন। তাহাকে কেহ জানে না, কিন্তু তিনি সকলি জানিতেছেন। তিনি বই দ্রষ্টা শ্রোতা, মন্তা বা বিজ্ঞাতা আর কেহই নাই। তিনিই আত্মা, অন্তর্যামী ও অমৃত আর সকলই অন্তযুক্ত।"

তিনি সর্ব্বভূতাশয়স্থিত আত্মা, এই তত্ত্বটি হৃদ্‌গত করিয়া অনুক্ষণ ধ্যান পূর্ব্বক স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। সগুণ ব্রহ্মই জগৎকারণ তিনিই সর্ব্বত্র সর্ব্বদা "ব্রহ্মাহঙ্কারমূর্ত্তিধৃক্।" অথচ নির্গুণ ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র তত্ত্ব নহেন, কেবল মূলপ্রকৃতিকে আশ্রয় পূর্ব্বক তাহার প্রকট অবস্থা মাত্র।

শ্রীসনাতন ধর্ম্মের ভাষা গূঢ়ার্থযুক্ত ও সাঙ্কেতিক। ইহাতে ঈশ্বর ত্রিভুজাকারের যন্ত্র বিশেষ দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। ঐ ত্রিভুজ ঊর্দ্ধ সূক্ষ্মাকারে

চিত্রিত হয়। ইহার তিন কোণে সৎ চিৎ ও আনন্দ এই ত্রিবিধাবস্থা সূচিত হইয়া থাকে। এই ত্রিভুজ অপর একটী নিম্নমুখ ত্রিভুজের সহিত সংযুক্ত ভাবে অঙ্কিত হইয়া থাকে। এই যন্ত্র অনেক মন্দিরে অঙ্কিত দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার স্বরূপ ও অর্থ পরে বর্ণিত হইবেক।

সেই অনন্ত তত্ত্ব, আত্মা, আমিত্বের ভাব সুন্দররূপে হৃদঙ্গম হইলে, তৎপরে ছাত্রগণ অনন্ত পদার্থ-মূল প্রকৃতি বা আদি অনাত্ম পদার্থ বিষয়ের আলোচনা করিবেন।

মনুস্মৃতির যে অংশ উদ্ধৃত করা হইয়াছে তাহা হইতে অবগত হওয়া যায়, যে অপ্রকট অবস্থায় এই মূল প্রকৃতির স্বরূপ অবিজ্ঞেয়। তখন ইহা অরূপ! পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের ঈথরের (ether) সঙ্গে তাহার কতক সাদৃশ্য কল্পনা করা যাইতে পারে। ইনি নিজে অরূপ হইয়াও সর্ব্ববিধ সরূপ পদার্থের আদি উপাদান। ইহা অব্যয় হইয়াও সর্ব্ববিধ সব্যয় পদার্থের আদি কারণ। ইহা প্রকৃতিবশে বিভজনশীল, পরমাত্ম পদার্থ কিন্তু অবিভাজ্য। ইহার স্বরূপ বহুত্ব, তাঁহার একত্ব। তিনি পিতা ইনি মাতা, ইহা হইতেই সমস্ত বিশ্ব সৃষ্ট হইতেছে। এই প্রকৃতি গর্ভেই জগদ্বীজ নিক্ষিপ্ত হইয়া জগতের উৎপত্তি। তিনি গীতায় বলিয়াছেন—"মম যোনির্মহদ্ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহং। (গীতা ১৪।৩) এই মহদ্ব্রহ্মই ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি।

এইবার আমরা সেই তিন গুণের বিষয় আলোচনা করিব। কারণ এই ত্রিগুণরহস্য হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিলে প্রকৃতির কার্য্য ভাল করিয়া বুঝা যাইবেক না। গুণ বলিলে সাধারণতঃ যাহা বুঝায় এখানে গুণ শব্দের অর্থ ঠিক তাহা নহে। এখানে গুণ শব্দে প্রকৃতির প্রকৃতি বা স্বভাব বুঝিতে হইবেক; কারণ এই গুণত্রয়ের এক দুই বা সমুদায়ের সমষ্টির ধারণা ব্যতীত কোনও প্রাকৃত পদার্থের তত্ত্ববোধ অসম্ভব। এ জগতে যেখানে সরূপ বা অরূপ কোনও পদার্থ বিদ্যমান আছে সেখানে এই তিন গুণের কোনটী প্রধান ভাবে ও অপর দুইটি আনুসঙ্গিক ভাবে অবশ্য বর্ত্তমান দেখিতে পাওয়া যাইবে। এই তিনের সাম্যভাবই প্রলয়বস্থা। এই গুণত্রয় তমঃ রজঃ ও সত্ত্ব নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

প্রলয়াবস্থায় অবস্থিত গুণত্রয় প্রধান নামে আখ্যাত হয়। তমোগুণের বশে জড় মাত্রের স্থিতিশীলতা, ও বাধাদান শক্তি আছে, সেই জন্য ভৌতিক পদর্থ মাত্রেই ঐ গুণ লক্ষিত হইবেক। তমোগুণের সত্ত্বারফলেই আকারের উৎপত্তি। রজোগুণের স্বরূপ গতি। এই গুণবশে প্রত্যেক পরমাণু নিরন্তর স্থান পরিবর্ত্তন করিতেছে। ঐরূপ পরিবর্ত্তন বিশেষ প্রয়োজনীয় ও বটে। বৈজ্ঞানিক ভাষায় যাহাতে গতি বলে রজঃ তাহাই। সত্ত্বগুণের স্বরূপ গতির সামঞ্জস্য রক্ষা। বৈজ্ঞানিক ভাষায় তাহাতে প্রকম্পন বলে। এইরূপে দেখিতে পাওয়া যায় যে প্রত্যেক পরমাণুতে স্থিতি গতি ও সামঞ্জস্য ভাব বর্ত্তমান

আছে। যথন ঈশ্বরের প্রশ্বাস বশে এই তিন গুণের সামঞ্জস্যাভাব হয় তথনই তিন গুণ প্রকট হইয়া স্ব স্ব কার্য্য করিতে থাকে। তমঃ ও রজোগুণবশে যথাক্রমে স্থিতি ও গতি উপলব্ধ হয়, আর সত্ত্ববশে তাহার সামঞ্জস্যভাব যথা প্রয়োজন রক্ষিত হইয়া প্রকম্পন বা উৎপত্তি হয়। এই গুণত্রয়ের নানানুপাতে মিলন বশে অসংখ্য গুণের উৎপত্তি হইয়াছে। তমঃ প্রাধান্য বশতঃ কাঠিন্য স্থিরত্বাদি গুণের উৎপত্তি হইয়াছে, উহা পাষানাদিতে লক্ষিত হয়। রজোগুণের প্রাধান্য বশতঃ চাঞ্চল্যাদির উৎপত্তি হইয়াছে এবং সত্ত্ব গুণের প্রাধান্য দ্বারা সুনিয়ম প্রভৃতি স্থাপিত হইয়া থাকে। কিন্তু ইহাই পাষাণখণ্ডের প্রত্যেক পরমাণু নিরন্তর অনুরণিত হইতেছে। তাহার হেতু এই যে এই জগতের কোনও পদার্থেই তিন গুণের একটিরও অভাব থাকিতে পারে না। অত্যন্ত চঞ্চল পশু পক্ষ্যাদিতেও ঐ গুণত্রয়ের সত্ত্বা আছে, তবে কোথাও রজঃ কোথাও বা তমঃ প্রবল এইমাত্র বিশেষ। এই প্রাবল্যেরও আবার তারতম্য আছে।

ঈশ্বরের স, চিৎ ও আনন্দ রূপ যেমন অগ্নিশিখারন্যায় উদ্ধ শীর্ষ ত্রিভুজ দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হয়, তেমনি মূলপ্রকৃতির এই গুণ জলবিন্দুরন্যায় নিম্নশীর্ষ ত্রিভুজ দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে।

এই দুই ত্রিভুজ মিলনে ঈশ্বর ও ব্রহ্মান্ডের চিহ্ন স্বরূপ চিত্রিত হইয়া মধ্যে বিন্দুযুক্ত হইয়া বহু দেবালয়ে অঙ্কিত আছে। ইহাই প্রধান সপ্তের চিহ্ন; ইহা বিশ্ব ও বিশেশ্বরের দ্যোতক।
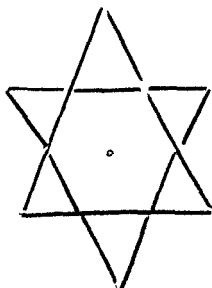
ইহা দ্বৈতত্ত্বের দ্বিতীয় তত্ত্ব। মনু ইহাকেই সমস্তের কারণ বলিয়াছেন। এই শক্তিই ঈশ্বরের মায়া। দেবী ভাগবতের ষষ্ঠ স্কন্ধের পঞ্চাদশ অধ্যায়ের

"পরাত্মনস্তথা শক্তেস্তয়োরৈক্যং সদৈবহি।
অভিন্নংতদ্বপুজ্ঞাত্বা মুচ্যতে সর্ব্বদোষতঃ॥

ব্যাখ্যাবসরে টীকাকার নীল কণ্ঠে বলিয়াছেন যে "এই শক্তি চন্দ্রের জ্যোৎস্না ও অগ্নির দাহিকা শক্তির ন্যায় পরমশ্বরের চিরমিলিত।"

দেবী ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধের ষোড়শ অধ্যায়ের ৩৬ শ্লোকে—

"তস্য চেচ্ছাস্ম্যহং দৈত্য সৃজামি সকলং জগৎ।
সমাং পশ্যতি বিশ্বাত্মা তস্যাহং প্রকৃতিঃ শিবা।
তৎসান্নিধ্যবশাদেব চৈতন্যং ময়ি শাশ্বতং॥

"আমি তাঁহার ইচ্ছাস্বরূপিনী, হে দৈত্য, আমি সমস্ত জগৎ সৃজন করি। সেই বিশ্বাত্মা আমাকে দর্শন করেন আমিই তাঁহার মঙ্গলময়ী প্রকৃতি। তাঁহার সহিত নিরন্তর মিলিত আছি বলিয়াই আমাতে শাশ্বত চৈতন্য রহিয়াছে॥"

টীকাকার নীলকণ্ঠ ঐ শ্লোকের টীকায় "ইচ্ছাশক্তিঃ উমা কুমারী" বলিয়াছেন।

তিনি পরমপুরুষে চিরমিলিতা। অভিমুখী অবস্থায় তিনি মহাবিদ্যা ও বিমুখী অবস্থায় তিনিই অবিদ্যা বা মহামায়া,মূলপ্রকৃতিতে অনুস্যূতা। আধ্যাত্মরামায়নে লিখিত আছে :—

"রাম, মায়াদ্বিধাভাতি বিদ্যাঽবিদ্যেতি তে সদা।"

"হে রাম, মায়া বিদ্যা ও অবিদ্যা এই দুইরূপে প্রকটিতা।

এই ঈশ্বর শক্তিকে মূলপ্রকৃতি হইতে অভিন্ন জানিয়া মায়াকেও মূলপ্রকৃতি ও প্রকৃতি বলা হয়।

শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন—

"ভূমিরা পোহনলোবায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেবচ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥
অপরেয়ং ইতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিংবিদ্ধিমে পরাং।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥ (৭।৪।৫)।

"ক্ষিতিতত্ত্ব, অপ্‌তত্ত্ব, তেজতত্ত্ব, বায়ুতত্ত্ব, আকাশতত্ত্ব, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার

তত্ত্ব আমার অষ্ট অপরা প্রকৃতি , এতদ্ব্যতীত যে পরাপ্রকৃতি, তিনি জীবভূতা, এবং এই জগৎ ধারণ করিয়া আছেন ॥”

গীতার নবম অধ্যায়ে, ভগবান বলিয়াছেন, এই পরাকেই “দৈবীং প্রকৃতিং” বলিয়াছেন। তিনিই যোগমায়া,বিশ্বধারয়িত্রী। শ্বেতাশ্বতরশ্রুতিতে লিখিত আছে,

“মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনং তু মহেশ্বরং ॥”

“মায়াকে প্রকৃতি এবং মায়ীনকে মহেশ্বর বলিয়া জানিবে।”

দেবী ভাগবতে এই মায়া সম্বন্ধে নিম্নলিখিত সুন্দর শ্লোকগুলি দৃষ্ট হয়—

“এষা ভগবতী দেবী সর্ব্বেষাং কারণং হি নঃ।
মহাবিদ্যা মহামায়া পূর্ণা প্রকৃতিরব্যয়া ॥”

* * *

ইচ্ছা পরাত্মনং কামং নিত্যানিত্যস্বরূপিনী ঃ

* * *

বেদগর্ভা বিশালাক্ষী সর্ব্বেষামাদিরীশ্বরী ॥
এষা সংহৃত্য সকলং বিশ্বং ক্রীড়তি সংক্ষয়ে।
লিঙ্গানি সর্ব্বজীবানাং স্বশরীরে নিবেশ্য চ ॥

* * *

মূলপ্রকৃতিরেবৈষা সদা পুরুষসংগতা।
ব্রহ্মাণ্ডং দর্শয়ত্যেষা কৃত্বা বৈ পরমাত্মনে ॥
তস্যৈষা কারণং সর্ব্বা মায়া সর্ব্বেশ্বরী শিবা ॥”

“সেই ষড়ৈশ্বর্য্যশালিনী দেবী, আমাদের সকলের কারণস্বরূপা। তিনি মহাবিদ্যা, মহামায়া, পূর্ণা ও অব্যয় প্রকৃতি * * “তিনিই সেই পরমাত্মার ইচ্ছাশক্তি এবং তিনি স্নেহাময়ী নিত্যানিত্য স্বরূপিনী ... ... তিনি বেদগর্ভা, বিশালাক্ষী, এবং সকলের আদিস্বরূপ ও ঈশ্বরী॥ প্রলয় কালে তিনি এই চরাচর বিশ্ব সংহার করিয়া সর্ব্বজীবের লিঙ্গশরীর স্বশরীরে অন্তর্হৃত করিয়া রাখেন।

“তিনিই মূলা প্রকৃতি এবং পরম পুরুষের সহিত নিত্যসংগতা। এই ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন করিয়া পরমাত্মাকে দেখাইয়াছেন। * * “তিনিই ইহার কারণ তিনি সর্ব্বময়ী সর্ব্বেশ্বরী, মায়া, মঙ্গলময়ী ॥

এই মায়া ঈশ্বর হইতে অসতন্ত্র। ঈশ্বর স্বগুণ ব্রহ্ম। দেবী ভাগবতের ষষ্ঠস্কন্ধে ৩১ অধ্যায়ে লিখিত আছে।

"সা চ মায়া পরেতত্ত্বে সম্বিদ্রূপেঽস্তি সর্ব্বদা।
তদধীশ প্রেরিতা চ তেন জীবেষু সর্ব্বদা॥
ততো মায়া বিশিষ্টানাং সম্বিদং পরমেশ্বরীং।
মায়েশ্বরীং ভগবতীং সচ্চিদানন্দরূপিনীং।
ধ্যায়েৎ * * * * ॥

সেই মায়া, সম্বিৎরূপা এবং সর্ব্বদা পরমতত্ত্বে আস্থিতা ও চিরদিন তাঁহারই অধীনা, এবং সর্ব্বদা জীবমধ্যে প্রেরিতা হইয়া থাকেন। অতএব সেই মায়া-বিশিষ্টা, সম্বিদ্রূপা, পরমেশ্বরী, মায়েশ্বরী সচ্চিদানন্দরূপিনী ভগবতীর ধ্যান করিবে॥

ঈশ্বরের সেই মায়া শক্তি, বন্ধনের হেতু হইয়াই, মোক্ষের উপায় স্বরূপা। অবিদ্যারূপে তিনি মায়ায় মোহিত রাখিয়াছেন; আবার বিদ্যারূপে তিনিই জীবকে মহেশ্বরের পাদপদ্মের অধিকারী করিতেছেন। যখন সেই বিদ্যাবিদ্যা-রূপিনী পরম কারণে লীনা হন, তখনই আত্মজ্ঞানের উদয়ে মোক্ষাপ্তি ঘটে। যথা দেবী ভাগবতে—

"ভেদবুদ্ধিস্ত সংসারে বর্ত্তমানা প্রবর্ত্ততে॥
অবিদ্যেয়ং মহাভাগ বিদ্যা চ তন্নির্ত্তনম।
বিদ্যাঽবিদ্যে চ বিজ্ঞেয়ে সর্ব্বদৈব বিচক্ষণৈঃ॥
বিনাঽতপং হি ছায়ায়া জায়তে চ কথং সুখং।
অবিদ্যায়া বিনা তদ্বৎ কথং বিদ্যাং চ বেত্তি চ॥
ভেদবুদ্ধি সংসারের প্রবৃত্তিকারণ।
অবিদ্যারূপিনী তিনি জানে সর্ব্বজন॥
বিদ্যাজানি সংসারের বন্ধনে বিরাগ।
বিদ্যাবিদ্যারূপা তিনি শুন মহাভাগ॥
জ্ঞানীগণ উভয়ের জানেন স্বরূপ।
বিনা রৌদ্র ছায়া সুখ না হয় যেরূপ॥
সেইরূপ অবিদ্যার না হলে সঞ্চার।
বিদ্যার স্বরূপ বুঝে আছে সাধ্য কার॥

অধ্যাত্মরামায়ণে লিখিত আছে—

"প্রবৃত্তিমার্গনিরতা অবিদ্যাবশবর্ত্তিনঃ।
নিবৃত্তিমার্গনিরতা বেদান্তার্থবিচারকাঃ॥

যাহারা প্রবৃত্তিমার্গ নিরত তাঁহারা অবিদ্যাবশবর্ত্তী। নিবৃত্তিমার্গনিরতগণ বেদান্তার্থের বিচারক॥"

জীব যখন প্রকৃতির অভিমুখে গমন করেন, বা ঈশ্বর শক্তি তখন মায়া, তাহাকে অবিদ্যারূপে আবরণ করেন। কিন্তু যখন জীব প্রকৃতি বিমুখ হইয়া থাকেন, যখন তাহার গতি ঈশ্বরাভিমুখী হয়। তখন সেই মায়াই বিদ্যারূপে স্বীয় ঈশ্বরের সহিত তাঁহার হৃদয় অধিকার পূর্ব্বক তাহাকে মুক্ত করেন। নীলকণ্ঠ দেবী ভাগবত টীকায় উশবশাম উদ্ধার পূর্ব্বক বলিয়াছেন "অন্তর্মুখা শক্তিরেব বিদ্যা॥"

যখন জীব মায়ায় মহতীশক্তি ও স্বরূপ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয়, যখন মায়াকে ঈশ্বর হইতে অভিন্ন বলিয়া বুঝিতে পারেন ও তখন স্তব করিয়া বলেন—

"অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ড নায়িকে তে নমো নমঃ॥
নমঃ কুটস্থরূপায়ৈ চিদ্রূপায়ৈ নমো নমঃ।
নমো বেদান্তবেদ্যায়ৈ ভুবনেশ্বর্য্যৈ নমোনমঃ॥
নেতি নেতীতি বাকৈর্য্যা বোধ্যতে সকলাগমৈঃ।
তাং সর্ব্বকারনাং দেবী সর্ব্বভাবেন সম্মতাঃ॥

পরমেশ্বর, স্বীয় মায়াকে আশ্রয় করিয়া অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করিছেন। ছান্দোগ্য বলিতেছেন—"তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়"

তাঁহার ইচ্ছা হইল আমি বহু হইব জন্মিব। তাহা হইতে সমুদায় হইল। ঋগ্বেদ বলিতেছেন—"একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি।"

"জ্ঞানীগণ সেই এককেই বহুরূপে কীর্ত্তন করিতেছেন।"

তাঁহাকে যত নামেই অভিহিত করা যাক না কেন, তিনি এক বই বহু নহেন। শ্রুতি, স্মৃতি প্রভৃতি তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছেন। বিষ্ণু পুরাণেও লিখিত আছে—

"সৃষ্টিস্থিতান্তকরণাং ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মিকং।
স সঙ্গাং যাতি ভগবান্ এক এব জনার্দ্দনঃ॥"

"এক দেব সেই জনার্দ্দন।
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবরূপী হন॥
তিন হয়ে তিন কার্য্য তাঁর।
সৃষ্টি, স্থিতি আর যে সংহার॥
জগতের সৃজন পালন।
সংহারের তিনিই কারণ॥

এইবার আমরা এই অধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত সার সংকলন করিব।

অরূপ অবস্থায়—১। তিনি, নিত্য, অব্যয় সর্ব্বপরমাত্মা নির্গুন ব্রহ্ম।

সরূপ অবস্থায়—

২। তিনি, এক, ঈশ্বর, আত্মা, বিষয়ী, সৎ, সগুণ ব্রহ্ম।

৩। মূল প্রকৃতি, অনাত্ম, বিষয়, অসৎ।

৪। মায়া, শক্তি, ঈশ্বরের ইচ্ছারূপিণী।

৫। ঈশ্বর মায়া শক্তি দ্বারা মূলপ্রকৃতি হইতে বহুরূপে প্রতিভাত হইতেছেন।

এই পাঁচটির স্বরূপ ও পরস্পর সম্বন্ধ বিষয়ে বহু মতভেদ থাকিলেও অধুনা প্রচলিত ষড় দর্শনে তাহা পরস্পর অধিক অনৈক্য নয়। এই পঞ্চ যেখানে যে নামেই অভিহিত হইয়া থাকুক না কেন, কিন্তু সকলেই তাহা স্বীকার করিয়া থাকেন। দর্শন সমূহের কর্ত্তাগণ একই বিষয়ের ভিন্ন অংশের বিষয় মীমাংসা করিয়াছেন মাত্র।　　　(ক্রমশঃ)

বিজ্ঞান প্রাচ্য ও প্রতীচ্য।

R. K. Duncan নামক জনৈক রসায়ণ ও বিজ্ঞান অধ্যাপক N. Ray নামক জ্যোতি বিশেষের সম্বন্ধে Harper's Magazine নামক পত্রিকায় একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। উক্ত প্রবন্ধে প্রমাণিত বিষয়টী বড়ই সুন্দর। মানবের চিন্তা শক্তির ক্রিয়া সহিত তাঁহার দেহ হইতে এ সকল জ্যোতির নির্গমণ হয় এবং পরে প্রসারিত হইয়া ভাব রাজ্যে ছটার ন্যায় (Aura) প্রকাশ পায়। তাঁহার মতে এক চিত্ত হইতে অন্য চিত্তে ভাব সংক্রমণ প্রভৃতি কার্য্যও মানবের স্বভাব প্রভৃতি অবস্থা এই N. Rayএর কার্য্য মাত্র।

World's Work and Play নামক পত্রিকায় Leroy Scott সাহেব নির্জ্জীব যন্ত্রের সাহায্যে কিরূপে United States এর Census Departmentএ লোকসংখ্যা গণন প্রভৃতি অন্যান্য কার্য্য সাধিত হইতেছে তাহা বর্ণনা করিয়াছেন। যন্ত্রের সাহায্যে আজকাল হিসাব মিলান হয়। তিনি এক প্রকার অদ্ভুত Telephone বর্ণনা করিয়াছেন। মনে করুন আপনি আফিস হইতে কিছুক্ষণের জন্য স্থানান্তরে গমন করিয়াছেন। ইতিমধ্যে অন্য কেহ আপনাকে Telephone করিল। আপনার যন্ত্রটি অমনি উত্তর করিল "তিনি আফিসে নাই আপনার বক্তব্য আমাকে বলুন, তিনি ফিরিয়া আসিলে তাঁহাকে বলিব।" আপনি ফিরিয়া আসিয়া Recieverটি গ্রহণ করিলে আপনার অসাক্ষাতে গৃহীত সংবাদটীর পুনরাবৃত্তি হইল।

ব্যষ্টিজীবের যেরূপ স্মৃতি আছে সমষ্টি জগতে সে প্রকার স্মৃতি আছে কিনা এ সম্বন্ধে Mrs. Campbell Praed নাম্নী বিদুষী Occult World নামক পত্রিকায় একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। বোধ হয় অনেকের জানা নাই যে Mrs. Praed, Nyria নামে একটী উপন্যাসে পুনর্জন্ম সম্বন্ধে তাঁহার ঘটনাবলী প্রকাশ করেন। প্রবন্ধে তিনি প্রথমে গত ঘটনাবলী কিরূপে মানবের অন্তর্নিহিত শক্তি বিষয়ের সাহায্যে উদ্ঘাটিত হয় তাহা বর্ণনা করিয়া বলেন, যে এই প্রকার লব্ধ অতীত স্মৃতি যে কেবল ব্যক্তিগত তাহা নহে। অনেক সময়ে ৪।৫ জন ব্যক্তি একই চিত্র এক সঙ্গে দেখিতে পান এবং পরস্পরের বর্ণনা ঠিক কি না তাহা অনুসন্ধান দ্বারা প্রমাণ করিতে পারেন। তাহা হইলে বুঝা গেল যে চিত্রগুলি মানস কল্পিত বা ব্যক্তিগত নহে। প্রত্যেক সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তিই একরূপে দেখিতে পান এবং প্রত্যেকরই দৃশ্যরূপে স্থিত বিষয়গুলির স্বতন্ত্র সত্ত্বা স্বীকার করিতে হয়।

উক্ত বিদুষী কি প্রকারে ঐ শক্তি প্রকটিত হয় তাহা বলিয়াছেন। তাঁহার মতে সর্ব্ব প্রথমে মনকে বিষয় হইতে নিগৃহীত করিয়া একেবারে শূন্য করিতে হয়। তখন বাহ্যিক দৃশ্যগুলি একে একে চিত্ত ক্ষেত্র হইতে অপসারিত হইয়া যায় এবং তৎপরে Cinematograph এর ন্যায় গতিশীল চিত্র সকল মানসপথে উদিত হইতে থাকে, এবং তৎসঙ্গে প্রত্যেক্যের ভাব গুলি দর্শকের হৃদয়ে প্রকাশিত হয়।

একজন সূক্ষ্মদর্শক কি প্রকারে দেখিতে পান, তাহার বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন যে যে বিষয়টা দেখিতে হইবে সেইটাকে মনে ধারণা করিয়া সমষ্টি চৈতন্যের স্মৃতিক্ষেত্র অবলম্বন করিয়া যেন পশ্চাদগতিতে যাইতে হয়। ঐ সমষ্টি স্মৃতিতে যাহা কিছু হইয়াছে তাহা রক্ষিত হয়—এই প্রকারে বিষয়টি মনে বা মনোময় কোষে জানিয়া ফিরিয়া আসিতে হয়, কিন্তু কথায় দৃষ্ট দৃশ্যগুলি বর্ণনা করা বড়ই কঠিন।

এই স্থূল জগতে সমষ্টি চৈতন্য এবং সমষ্টি স্মৃতি হিন্দুশাস্ত্রে বিরাট নামে বর্ণিত আছে। তাহা ঈশ্বরের স্থূল স্মৃতি:ক্ষেত্র। শিক্ষিতাভিমানী নব্য ভ্রাতাগণ এক্ষণে কি বলিবেন? ব্রহ্মার মনোময় চক্র তাহা হইলে একেবারে শাস্ত্রের গাঁজাখুরী নহে।

North American Review নামক পত্রিকাতে Professor Hyslop নামক একজন মনীষি আত্মার অবিনশ্বরত্ব প্রমাণ করিতে গিয়া বিজ্ঞানের সাহায্যে যে সকল যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন তাহা বিশেষরূপে বিবেচ্য। মৃত্যুর পর মনুষ্যের যে অস্তিত্ব থাকে তাহা প্রমাণ করিবার জন্য বিজ্ঞান উদ্যত হইয়াছেন। গত কয়েক বৎসরের ভিতর বিজ্ঞান এইরূপ প্রমাণ করিয়াছেন, যে যাহাকে আমরা প্রত্যক্ষ জগৎ বলিতেছি, তাহা যে আরও অনেক দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া অদৃশ্যে মিশিয়াছে তাহার আর সন্দেহ নাই। Rontgen রশ্মির আবিষ্কার হওয়াতে মনুষ্য বুঝিতে পারিয়াছে যে এই রশ্মি অদৃশ্য জগতেও কার্য্য করিয়া থাকে। পদার্থকে বিশ্লেষণ করিতে গিয়া তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছেন যে ইহা স্থূল অণু দ্বারা গঠিত নহে,—Ions এবং Electrons এর দ্বারা গঠিত ইহাদের কার্য্যকলাপের প্রতি অনু-সন্ধিৎসু হইয়া তাঁহারা অদৃশ্য ঈথিরীয় (Etheric) রাজত্বে উপনীত হইয়াছেন। যাহাকে আমরা পদার্থ বলিয়া থাকি তাহা যে দৃশ্য ও অদৃশ্য জগতকে সংযুক্ত করিয়া রাখিয়াছে, তাহা এখন অনেকেই বুঝিতে পারিতেছেন। Telepathy অর্থাৎ চিন্তা প্রেরণের বিষয় যতই আলোচিত হইতেছে ততই মনুষ্য আশ্চর্য্যান্বিত হইতেছে। অদৃশ্য জগতের ভিতর দিয়া যদি চিন্তা প্রেরণ করা যাইতে পারে, তাহা হইলে অদৃশ্য সত্ত্বার সহিত যে আমাদের আদান প্রদান হইতে পারে তাহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে? এই সকল বৈজ্ঞানিক ব্যাপারের প্রতি লক্ষ্য করিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এখন এইরূপ স্থির করিতেছেন যে দৃশ্য জগতের ন্যায় অদৃশ্য জগৎ এবং অদৃশ্য সত্ত্বার অস্তিত্ব আছে এবং মনুষ্যের আত্মা অনন্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে।

৯ম ভাগ। { আষাঢ় ১৩১২, ইং ১৯০৫ সাল } ৩য় সংখ্যা।

মহিম্ন-স্তব।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

অসিদ্ধার্থানৈব ক্বচিদপি সদেবাসুরনরে
নিবর্ত্তন্তে নিত্যং জগতি জয়িনো যস্য বিশিখাঃ।
স পশ্যন্নীশ! ত্বামিতরসুরসাধারণমভূৎ
স্মরঃ স্মর্ত্তব্যাত্মা ন হি বশিষু পথ্যঃ পরিভবঃ। ১৫

অথ ত্রৈলোক্য শরণং সমদর্শনঃ স কথং কামং বিনাশিতবানিত্যাশঙ্কা প্রৌঢ়োক্তি মূল পুরাণকথামবলম্ব্যাহ স হি কামস্তস্যৈব গর্ব্বস্য ফলং স্বয়মাপ্তবান্। বস্তুতস্তু কামরহিতে ঈশ্বরে ন কামাবসরঃ ইত্যেব নিগূঢ়ার্থে কামভস্মীকরণরূপা সা প্রৌঢ়োক্তিঃ। কামস্তু ভোগসঙ্কল্পঃ অহঙ্কারজন্যঃ অবিদ্যাবিষয়ঃ ইতি ন পূর্ণে ব্রহ্মণি পরমজ্যোতিষি সম্ভবঃ।

অসিদ্ধার্থা ইতি। হে ঈশ সকলশক্তিনিধানঃ দেবৈরসুরৈর্ণরৈশ্চ সহবর্ত্তমানে জগতি স্বর্গে মর্ত্তে পাতালে চেত্যর্থঃ জয়িনো জয়শীলস্য স্মরস্যসঙ্কল্পজন্মনঃ বিশিখা বাণাঃ হৃন্মর্ম্মচ্ছিদঃ সম্মোহনাদয়ঃ ক্বচিদপি অসিদ্ধার্থাঃ নৈব নিবর্ত্তন্তে,লক্ষ্যে পতিতা ব্যর্থা নৈব ভবন্তীত্যর্থঃ; স্ববিষয়ীভূত ত্রিভুবনস্থ সর্ব্বেষামেব মোহ করত্বাদিতিভাবঃ। স স্মরঃ কামঃ পুনঃ পুনঃ ভোগ্য বস্তু স্মরণাত্তস্য স্মর ইতি সংজ্ঞা, ভোগার্থমভীষ্ট বস্তুকামনাচ্চ কাম ইতি। এবমন্যত্রাপি ত্বাং ইতরেষাং সুরাণাং সাধারণং সমানং পশ্যন চিন্তয়ন্, ইতরসুরেষ্বিব ত্বয়ি বিশিখঃ প্রজুজ্ঞানঃ সন্নিত্যর্থ স্মর্ত্তব্যঃ ভস্মীভূতত্বাদদৃশ্য ইত্যর্থঃ, আত্মা দেহো যস্য তাদৃশঃ অভূৎ অতএবহিসোঽনঙ্গ ইতি কবি প্রৌঢ়োক্তি। আত্মাদেহেধৃতৌজীবে স্বভাবে পরমাত্মনি ইতি বিশ্বঃ। হি তথাহি বশিষু সর্ব্বথা জিতেন্দ্রিয়েষু যোগিষু পরিভবঃ অবজ্ঞা, অনাদর পরিভবঃ পরিভাবাস্তিরস্ক্রিয়া, রীঢ়াবমাননাবজ্ঞা অবহেলমসূক্ষণামিত্য-মরঃ। ন পথ্যঃ শুভকরঃ। জগজ্জয়গর্ব্বিতস্য কামস্য তাদৃশ্যবস্থা কেবলং তস্য গর্ব্বস্যৈব—ফলং নান্যদিতি ভাবঃ। বস্তুতস্তু স্ত্রীসম্ভোগাদি প্রবৃত্তিরূপস্য কামস্যপ্রাণিমাত্রেষ্বিব প্রসবঃ, নতু ভোগসঙ্কল্পবর্জ্জিতে ঈশ্বরে ত্বয়ীতি ভাবঃ। ইদঞ্চেশ্বরস্য নিষ্কামস্য নিরীহত্বাদি কথাং। সঙ্কল্পনাশস্তু যোগিনাং মোক্ষোপায় ইতি কর্ত্তব্য এবেতি সূচিতং, ন তত্র সম দর্শিত্বভঙ্গপ্রসঙ্গঃ, অপিতু সমদর্শনে হেতুরেব কাম নাশঃ।১৫।

ঈশ্বর যদি সর্ব্বত্র সমদর্শন, তবে কামকে কেন নষ্ট করিলেন এই আশঙ্কায় প্রৌঢ়োক্তিমূলক পুরাণ কথা অবলম্বন করিয়া "কাম আপনা হইতেই তাহার নিজ কর্ম্মফল পাইয়াছে" এই কথা বলিতেছেন। ফলিতার্থ এই যে কামের কর্তৃত্ব ত্রিভুবনে সর্ব্বত্র পরিদৃশ্যমান হইলেও ঈশ্বরের নিষ্কামত্ব নিরীহত্ব প্রযুক্ত তাঁহার সমীপে তাহার সত্তা নাই। কাম বিষয় ভোগে বাসনা মাত্র তাহার কর্ম্ম প্রার্থিত বস্তুর কামনা ও ভোগ ইত্যাদি। এই জন্যই তাহার নাম স্মর কাম, সঙ্কল্পজন্মা ইত্যাদি হইয়াছে। প্রবৃত্তি মাত্র হওয়াতে কাম অনঙ্গ অর্থাৎ অঙ্গরহিত কবিরা প্রৌঢ়োক্তি দ্বারা কামের অনঙ্গত্ব প্রসিদ্ধ গল্প দ্বারা কল্পিত করিয়াছেন। যেমন স্বভাবতঃ কাষ্ঠ বিড়ালের পৃষ্ঠচিহ্ন রামের করাঙ্গুলি-স্পর্শজনিত বা ব্রাহ্মণের দরিদ্রত্ব সপত্নী সরস্বতী সেবাজনিত ইত্যাদি বাক্যে কল্পিত হইয়া থাকে। বস্তুতঃ শাস্ত্রে সাকার নিরাকার চরাচর সমস্ত বস্তুতে এইরূপ দেব

দেবীত্ব কল্পনা আছে। কেবল তাৎপর্য্য গ্রহণ করাই আমাদের কর্ত্তব্য।

আবরকার্থ। হে সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বর জগজ্জয়ী যে কামদেবের বাণ সুর অসুর নর কাহাতেও কথনও ব্যর্থ হয় নাই, সেই কামদেব সামান্য দেবতার ন্যায় তোমারও নিকট প্রভুত্ব করিতে গিয়া বিনষ্ট হইয়া গেল। যাঁহারা ইন্দ্রিয়ের অধীন নয়, ইন্দ্রিয়াদি যাঁহাদের অধীন, তাঁহাদের কি কাহারও প্রভুত্ব থাটে? তাদৃশ চেষ্টাই বিনাশের মূল।১৫।

অপাবৃতার্থ। হে সর্ব্বশক্তিনিধান পরমেশ্বর! জগতে জীব মাত্রেই মনের অধীন হওয়াতে মনোজ কামেরও (স্ত্রীসম্ভোগাদি বিষয়ক মনোবাসনারও) অধীন হইয়াছে। সেই কামের উপর দেব অসুর নর কাহারও প্রভুত্ব নাই, সকলের উপর কামেরই প্রভুত্ব। কিন্তু শক্তিময় তুমি, তুমি মনে শক্তিরূপে, কামে শক্তিরূপে, বিষয় প্রপঞ্চেও শক্তিরূপে প্রকাশ পাইতেছ! তোমা হই-তেই কামের সৃষ্টি ও লোকের বিষয় বাসনা, আবার তোমা হইতেই কামের নাশ ও বিষয়ে বৈরাগ্য উভয়েই তোমারই শক্তিপ্রকাশ। তোমার শক্তি-ময়ত্বে কামের শক্তি কোথায়? তোমার সত্ত্বা যাহার হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে সেথানে কামের প্রভুত্ব হয় না। তোমার দর্শনমাত্র কাম বিনষ্ট হইয়া যায়। তত্ত্ব-জ্ঞানের উদয়ে লোক কামনা ত্যাগ করিয়া মোক্ষধাম প্রাপ্ত হয়।

এতএব কামের উৎপত্তি ও কামের নাশ পরমেশ্বর সত্ত্বায় হইলেও পরমেশ্বর তাহাতে সাক্ষাৎ কর্ত্তা নহেন। কিন্তু জীবের কাম জীবের গুণেই নষ্ট হয় বা কাম জীবের কর্ম্মফলেই উৎপন্ন ও বিনষ্ট হয়, ইহাতে ঈশ্বরের নিরীহত্ব বা সমদর্শনত্বের হেতু হইয়া থাকে ॥ ১৫॥ (ক্রমশঃ)

শুকাষ্টকং।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

(৬)

দৃষ্টা বেদ্যং পরমথপদং স্বাত্মবোধ স্বরূপং
বুদ্ধাত্মানং সকল বপুষামেকমন্তর্বহিস্থং।
ভূত্বা নিত্যং সদুদিততয়া স্বপ্রকাশ স্বরূপং
নিস্ত্রৈগুণ্যে পথি বিচরতঃ কো বিধিঃ কো নিষেধঃ।

চিন্ময় স্বরূপ পূর্ণ পরমাত্ম ধনে
আপন আত্মায় হেরি মানসনয়নে
অন্তরে বাহিরে সর্ব্বদেহে বিদ্যমান
এক অদ্বিতীয় আত্মা হেন যাঁর জ্ঞান
স্বরূপ চিন্তনে সদা হইয়া মগন
পরমাত্মে আত্মহারা হয়েছে যে জন
নিস্ত্রৈগুণ্য মার্গে যিনি করেন বিহার
বিধি কিম্বা প্রতিষেধ বল কি তাঁহার ?

(৭)

কার্য্যাকার্য্যে কিমপি সততং নৈব কর্ত্তৃত্বমস্তি
জীবন্মুক্ত স্থিতিরবগতো দগ্ধবস্ত্রাবভাসঃ।
এবং দেহে প্রবিলয়গতে তিষ্ঠমানো বিমুক্তো
নিস্ত্রৈগুণ্যে পথি বিচরতঃ কো বিধি কো নিষেধঃ ॥

কার্য্যাকার্য্য নাহি যার, চিত্ত নির্ব্বিকার
সদা অহঙ্কার শূন্য হৃদয় যাঁহার
দেহ নাশ নাহি হয় বসন পুড়িলে
আত্মার বিনাশ তথা নাহি চিতানলে
হেন তত্ত্বজ্ঞান লভি যেই মহাজন
জীবন্মুক্ত ভাবে দেহ করেন ধারণ
অন্তিমে যখন দেহ হয় অবসান
বিমুক্ত হইয়া যিনি লভেন নির্ব্বাণ
ত্রিগুণ অতীত মার্গে করেন বিহার
বিধি কিম্বা প্রতিষেধ বল কি তাঁহার

(৮)

কস্মাৎ কোঽহং কিমপি চ ভবান্ কোঽয়মত্র প্রপঞ্চঃ
স্বং স্বং বেদ্যং গগন সদৃশং পূর্ণতত্ত্বপ্রকাশম্।
আনন্দাখ্যং সমরসঘনে বাহ্যমন্তর্বিহীনে
নিস্ত্রৈগুণ্যে পথি বিচরতঃ কো বিধিঃ কো নিষেধঃ।

আমি কেবা ? কোথা হতে আসিনু হেথায় ॥
তুমি কেবা ? কোনজন সৃজিল তোমায়
জগৎ প্রপঞ্চ কিবা ? কিম্বা কি কারণ
কাহার ইচ্ছায় ইহা হইল সৃজন
বিচারি এ সব তত্ত্ব আপনার মনে
বিভোর হয়েন যিনি স্বরূপ দর্শন
অনন্ত গগন সম পূর্ণ পরাৎপরে
হেরিয়া সচ্চিদানন্দে আপন অন্তরে
অদ্বৈত তুরীয় মার্গে করেন ভ্রমণ
তার পক্ষে কিবা বিধি কিবা নিবারণ

(৯)

সত্যং সত্যং পরমমৃতং সর্ব্বকল্যাণরূপম্
মায়ারণ্যে দহনমলিনে শান্তনির্ব্বাণদীপম্।
তেজোভুক্তং নিগমমদনং ব্যাসপুত্রাষ্টকং, যঃ
প্রাতঃকালে পঠতি মনসা যাতি নির্ব্বানমার্গে ॥
পরম অমৃত সর্ব্বকল্যাণ নিদান
মায়ারণ্যে প্রজ্জলিত প্রদীপ সমান
ত্রিতাপ মলিন বিশ্বে দিব্য জ্যোতির্ম্ময়
আগম নিগম বেদ বেদান্ত নিলয়
এই শুকাষ্টক ব্যাস পুত্র বিরচিত
প্রতিদিন যিনি করি চিত্ত সমাহিত
বারেক করেন পাঠ প্রভাত সময়
অন্তিমে নির্ব্বাণ মুক্তি লভেন নিশ্চয়।

শ্রীগোবিন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

চৈতন্য কথা।

প্রস্তাবনা।

চতুর্যুগান্তে কালেন গ্রস্তান শ্রুতিগণান্ যথা

তপসা ঋষয়োঽপশ্যন যতো ধর্ম্মঃ সনাতন॥ ভাঃ পুঃ ।৮-১৪-৪।

চারি যুগের অবসানে বেদ সকল বিলুপ্ত হয়। সত্য যুগের আরম্ভে আবার নূতন করিয়া বেদের পত্তন করিতে হয়। নূতন মনুষ্য জাতিকে আবার ক, খ, শিখাইতে হয়। তখন মনুষ্য নিতান্ত শিশু। এই শৈশব ভাব যাইতে যাইতে ত্রেতাযুগ আসিয়া উপস্থিত হয়। তখনই বেদের কিয়দংশ মনুষ্য বুঝিতে পারে। যেমন যেমন মনুষ্য জাতির বুদ্ধি বিকসিত হইতে থাকে তেমন তেমন বেদেরও আবির্ভাব হয়। যাঁহারা তপস্যা দ্বারা পূর্ব্ব জন্মের সংস্কার দ্বারা, বিশেষ উদ্যম দ্বারা মনুষ্য জাতি মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেন, সেই সকল ঋষিগণ হৃদয়ের গভীর আবেগে পবিত্রতার পূত নয়নে বেদের দর্শন লাভ করেন। কালের প্রবাহে একে একে তিন কাণ্ড বেদ প্রকটিত হয়। তখন কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাস বেদের ভাগ নির্ণয় ও সঙ্কলন করেন এবং বেদের সমগ্র অর্থ পঞ্চম বেদরূপ মহাভারতে সন্নিবেশিত করেন। এই সময়ে নারায়ণরূপী শ্রীকৃষ্ণ নররূপী অর্জ্জুনকে বেদের সমগ্র তাৎপর্য্য বুঝাইয়া দেন।

বেদে যাহা আরম্ভ হইয়াছিল, শ্রীকৃষ্ণের শিক্ষায় তাহা সম্পূর্ণ হয়। বেদের আবির্ভাব হইতে শ্রীকৃষ্ণের অবতরণ পর্য্যন্ত ধর্ম্ম শিক্ষার এক মহা অভিনয়। ধর্ম্মজগতের এক মহাযুগ। আর্য্য শিশু সরল হৃদয়ে দেবতাদিগকে ঘরের কথা সব বলিতেন। তাঁহাদের লুকাইবার কিছুই ছিল না। সেই সরল শিশুদিগকে দেবতারা হাতে হাতে করিয়া শিক্ষা দিতেন, তাহাদিগকে সকল বিপদ হইতে রক্ষা করিতেন। শিশুগুলি যেমন যেমন বড় হইতে লাগিল, অমনি ঋষিগণ জ্ঞানের কথা বলিতে লাগিলেন। কি জানি কোথা হইতে জ্ঞানের স্রোত হু হু শব্দে প্রবাহিত হইতে লাগিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে চরিত্রের

সংগঠন, কর্ত্তব্যের ত্যাগময় অনুশীলন যেমন হওয়া উচিত তাহা হইল না। স্বয়ং রামচন্দ্র অবতীর্ণ হইয়া এ বিষয়ে জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দেখাইলেন। নিষ্কাম ধর্ম্ম, কর্ত্তব্যের পূর্ণ অনুষ্ঠান, ঈশ্বর জ্ঞানের বিকাশ ও ভক্তির প্রবল উচ্ছ্বাস এক বারে ধর্ম্ম জগৎকে তোলা পাড়া করিল।

কিছুদিন লালনের কার্য্য বন্ধ থাকিল। দেবতাগণ ঋষিগণ ও অবতারগণ দেখিতে লাগিলেন, বিনা সাহায্যে বিনা প্রেরণায় বিনা দৈববলে, বিনা ঐশ্বরিক উত্তেজনায় তাঁহাদের আদরের আর্য্যজাতি কতদূর যাইতে পারে। জ্ঞানের স্বতন্ত্র ধারা বহিতে লাগিল, ভিন্ন ভিন্ন পথে, ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞানের পথিক চলিতে লাগিল। সকলেই দম্ভের সহিত আপন আপন পথের গুণগান করিতে লাগিলেন। সকলেই নূতন পন্থার আবিষ্কার করিতে চাহেন। যাঁহার প্রবর্ত্তিত কোন একটা নূতন পথ নাই, তিনি মুনির মধ্যে গণ্য নহেন। "নাস্তি মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নাম্"। মনুষ্যের সাধ্য নয় এই ভেদের সমন্বয় করে। এক ঈশ্বরেই সকল ভেদের সমাধান হয়। যাহারা ঈশ্বর বিমুখ তাহারা জ্ঞান গর্ব্বিত হইলেও ভেদের ঝঞ্ঝাবাতে বিক্ষিপ্ত ও অহঙ্কারের আবরণ দ্বারা তাহাদের জ্ঞান সঙ্কীর্ণ। যাহারা ঈশ্বর প্রমুখ, তাহারা ঐশ্বরিক আলোকে জ্ঞানের সমন্বয় ও একতা দেখিতে পায়। দুই পক্ষের বিষম বিরোধ। বেদব্যাস শাস্ত্র বিচার দ্বারা শাস্ত্র সমন্বয় করিলেন। "জন্মাদ্যস্য যতঃ" সেই ব্রহ্মের জ্ঞানে সকল জ্ঞান কেন্দ্রময় করিলেন। কিন্তু যাহারা বিচার চায় না যাহারা মিথ্যা জ্ঞানের দোহাই দিয়া দম্ভ ও প্রবল প্রতাপে বাকি অংশটুকু সম্পূর্ণ করিতে চায়, যাহারা নিজ নিজ ভুজবলে পৃথিবীর অধিকারী হইয়া, আসুরিক ভাবে পৃথিবী তোলা পাড়া করিতে চায়, সেই সকল মানবরূপধারী অসুরগণের আধিপত্য ও উদাহরণ কিরূপে বিলুপ্ত হইবে। রাজ্যহীন, ধনহীন, বন্ধুহীন, বনবাসী পাণ্ডবগণ কাহার সাহায্যে অধর্ম্মের অত্যাচার হইতে নিষ্কৃতি পাইবে? কিরূপে দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন, ও ধর্ম্মের সংস্থাপন হইবে। তাই স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়া কুরুক্ষেত্রের প্রবল ঝঞ্ঝার আরম্ভে অর্জ্জুনকে ধর্ম্ম সমন্বয়ের শিক্ষা দিলেন এবং যাহাতে সেই ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষা হয় সেজন্য যথা বিহিত দুষ্টের দমন করিলেন। অতি গোপনে, অন্যত্র ভেদময় জগতের অন্তরালে, ধর্ম্মের আর একটী মধুর চিত্র রাখিয়া দিলেন। অভিনয়ের সমাপ্তি

হইল। বেদের পবিত্র সঙ্গীতে যে অভিনয় আরম্ভ হইয়াছিল, সেই অভিনয়ের রোধপট পড়িয়া গেল। দেবগণ ঋষিগণ অবতারগণ গা ঢাকা দিলেন!

এদিকে কলি আসিয়া উপস্থিত হইল। গভীর অন্ধকারে জগৎ আবৃত হইল। এমন সময়ে আর্য্য জাতিকে নিজের ব্যবস্থা নিজে করিতে হইল। মনুষ্যজাতি, দেখি তোমাদের নিজবল কতদূর। ঘোর তমসাচ্ছন্ন ধর্ম্মজগতে অতীত শাস্ত্রের আলোকে কেবলমাত্র আলো আঁধারি হইতে লাগিল। বরং আঁধার ভাল "আলো আঁধারি" অত্যন্ত ভয়াবহ। শাস্ত্রের দোহাই দিয়া নিত্য অশাস্ত্রীয় কাজ হইতে লাগিল। বেদের নামে জীবহিংসা প্রচলিত হইল। ধর্ম্মের বন্ধন শিথিল হইল। ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মের প্রচার হইতে লাগিল। নীতির মস্তকে নিত্য পদাঘাত হইতে লাগিল।

এ ধর্ম্ম থাকা অপেক্ষা না থাকা ভাল। এ বেদ জানা অপেক্ষা না জানাই শ্রেয়স্কর। ফেলে দেও বেদধর্ম্ম। সরল সদাচার ও নৈতিক ধর্ম্মের অবলম্বন কর। আগে হিংসা, দ্বেষ, দম্ভ পরিত্যাগ কর সর্ব্বজীবে দয়া করিতে শিখ। মিথ্যাচার কপট ধর্ম্মভান ছাড়িয়া দাও। এ কথা কে বলিবে। আর্য্যজাতির অগ্রণী কে আছ? কে বুদ্ধির পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছ? কে মনুষ্যত্বের সীমা ছাড়াইয়া, অবতার পদবী লাভ করিয়া মনুষ্যজাতির জন্ত করুণ হৃদয়ে রোদন করিতেছ? কে কপিলাবস্তুর রাজসিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া দীন ভাবে জগতের দুঃখে ব্যথিত হৃদয় হইয়া বনে বনে পর্ব্বতে পর্ব্বতে অনসন ব্রতে বিচরণ করিতেছ। তুমি নইলে আজ সাহস করিয়া কে বলিতে পারে ফেলে দেও বেদ, ধর্ম্ম। কে হুঙ্কার করিয়া বলিতে পারে—আবার সকলে নূতন করিয়া আরম্ভ কর। সর্ব্বাগ্রে নৈতিক ধর্ম্মের আশ্রয় কর। ভাল মন্দের বিচার কর। ধর্ম্মের ভাণ্ডার এখন দেখিবার প্রয়োজন নাই। অমনি স্বর্গে দুন্দুভিনাদ হইল। ধর্ম্মজগতে নূতন অভিনয়ের আরম্ভ হইল। দেবতারা ঊর্দ্ধগ্রীব হইয়া দেখিতে লাগিলেন, এ অভিনয় কত দূরে যায়।

গৌতম বুদ্ধ অন্তর্হিত হইলেন। নূতনত্ব চলিয়া গেল। কতক লোক তাঁহার মতাবলম্বী হইল। অন্যে ভাবিতে লাগিল, শাস্ত্রই বা ছাড়িব কেন। বাস্তবিক শাস্ত্র ছাড়িলে ভারতবর্ষীয় আর্য্য জাতির থাকিল কি? শাস্ত্র যে বুঝে না তাহারই দোষ। যে শাস্ত্রকে অহঙ্কার দ্বারা সসীম করিতে চায়, তাহারই

দোষ। শাস্ত্রের দোষ কি? এখন শাস্ত্রের দোষ হউক, না হউক, ভারতের আর্য্যজাতি শাস্ত্র ছাড়িতে পারিল না। আবার বৈদিক ধর্ম্মের প্রচার হইতে লাগিল। আবার ভেদের ছায়া ধর্ম্ম জগৎ আবৃত করিল। ঘন হুঙ্কার দিয়া শঙ্করাচার্য্য সমর ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। শাস্ত্র, শাস্ত্র করিতেছ? এস শাস্ত্র দ্বারা শাস্ত্রের খণ্ডন করি। দেখ অবশিষ্ট কি থাকে। বাস্তবিক কিছুই অবশিষ্ট থাকিল না। বেদও গেল। বেদের ঈশ্বরও গেল। এক মায়ার জালে সমগ্র ভেদ আবৃত হইয়া দূরে অপসারিত হইল। হুলস্থূল পড়িয়া গেল। অভিনয় গড়াইয়া পড়িল। আর কেহই স্থির থাকিতে পারিল না। এক "তত্ত্বমসি" মহাবাক্য লইয়া সকলের মাথা ঘুরিয়া গেল। জীব ও ঈশ্বর কি বাস্তবিক এক। জীব ঈশ্বরের ভেদ কি কল্পিত ভেদ। এক ব্রহ্ম ভিন্ন কি আর কিছুই নাই। তবে ধর্ম্ম থাকে কোথায়। তবে আমি, তুমি যাই কোথায়। যদি আচার্য্য মহাবাক্যের যথার্থ অর্থ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে বিষম ধর্ম্ম বিভ্রাট হয়।

এ কথার মীমাংসা করিবার জন্য এক মহাপ্রয়াস পড়িয়া গেল। মনুষ্য নিজ শক্তির উপরে নির্ভর করিয়া গভীর গবেষণা করিতে লাগিল। শঙ্করাচার্য্যের তুক্ লাগিয়া গেল।

রামানুজস্বামী সিদ্ধান্ত করিলেন,—ঈশ্বরশ্চিদচিচ্চেতি পদার্থত্রিতয়ং হরিঃ। ঈশ্বরশ্চিতইত্যুক্তো জীবো দৃশ্য মচিৎ পুনঃ॥ পদার্থ ত্রিবিধ চিৎ, অচিৎ ও ঈশ্বর। চিৎ জীবসংজ্ঞক। দৃশ্য জগৎ অচিৎ। "তত্ত্বমসি" মহাবাক্যে জীব ও ঈশ্বরের যে তদাত্মতা কথিত হইয়াছে, সে যেমন শরীর ও শরীরীর তদাত্মতা।' সেইরূপ, "জীব পরমাত্মনোঃ শরীরাত্মভাবেন তাদাত্ম্যং ন বিরুদ্ধম্!"

মধ্বাচার্য্য সিদ্ধান্ত করিলেন, তত্ত্ব দুই প্রকার, স্বতন্ত্র ও অস্বতন্ত্র।

স্বতন্ত্র অস্বতন্ত্রঞ্চ দ্বিবিধং তত্ত্বমিষ্যতে।

স্বতন্ত্রো ভগবান্ বিষ্ণু নির্দোষোঽশেষসদ্গুণঃ।

'তৎ' ও 'ত্বং' এক হইতে পারে না।

আহ নিত্যপরোক্ষন্তু তচ্ছব্দোহ্যবিশেষিতঃ।

ত্বং শব্দশ্চাপরোক্ষার্থং তয়োরৈক্যং কথং ভবেৎ।

এদিকে তন্ত্রশাস্ত্রের বিবিধ আচার প্রকটিত হইল। পুরাণ ও তন্ত্রশাস্ত্র লইয়া নানাবিধ ভেদের অবতরণ হইল। কেহ শৈব, কেহ শাক্ত, কেহ গাণপত্য, কেহ সৌর, কেহ বৈষ্ণব। পুরাতন দর্শন শাস্ত্রের স্থানে অভিনব দর্শন শাস্ত্রের উদ্ভব হইল। অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও দ্বৈত মতাবলম্বীরা আপন আপন মত লইয়া তর্কজাল বিস্তার করিতে লাগিলেন। কূট তর্কে জগৎ ব্যাপিল। ধর্ম্মের রস শুকাইয়া গেল।

এইবার ধর্ম্মসমন্বয়ের কাল আবার উপস্থিত হইল। বুদ্ধদেব যে অভিনয়ের অবতরণ করিয়াছিলেন, আজ তাহার পরিসমাপ্তির কাল। এক অভিনয়ের শেষ পট স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ উত্তোলন করিয়াছিলেন। এই নূতন অভিনয়ের শেষ অধিনায়ক কে হইবে? কে বিরোধের বিরোধী হইবে? কে ভায়ে ভায়ে মিলাইয়া দিবে। কে হিন্দু মুসলমানকে একত্র করিবে। কে মহাভাবে জগৎ উদ্ভাবিত করিবে? কে প্রেমের বন্যায় জগৎ ভাসাইয়া দিবে? কে মধুর রসে সমগ্র জীবকে মধুর করিবে? কে মধুর হইতে মধুর মানবকে ঈশ্বরের প্রিয় সহচর ও প্রিয় সহচরী করিতে প্রয়াস করিবে?

যখন শ্রীকৃষ্ণ অবতার গ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন ত কলির সন্ধ্যা মাত্র। এখন যে ঘোর কলি। যাহা অসম্ভব তাহা কিরূপে সম্ভব হইবে।

(ক্রমশঃ) শ্রীপূর্ণেন্দু নারায়ণ সিংহ।

জ্ঞান ও প্রাণ।

চলিত ভাষায় "জ্ঞান" ও "প্রাণ" এই দুয়ের মধ্যে একটা অর্থগত প্রভেদ লক্ষিত হয়। চলা, ফেরা প্রভৃতি বাহিক কর্ম্ম, শ্বাস প্রশ্বাস, হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন প্রভৃতি দৈহিক চেষ্টা, এগুলিকে প্রাণের লক্ষণ বলিয়া কথিত হয়। ফলতঃ একটা নড়া চড়ার ভাব না থাকিলে প্রাণের সত্তাই স্বীকার করা যায় না। পক্ষান্তরে সেই নড়া চড়ার সঙ্গে সঙ্গে যে একটা আন্তরিক অনুভূতি আসে, তাহাকেই জ্ঞান বলা হইয়া থাকে। যেন প্রাণ গতিশীল রাজসিক; জ্ঞান শান্ত, সাত্ত্বিক। প্রাণ যেন বাহিরের (objective) প্রাকৃতিক; জ্ঞান ভিতরের (subjective) পৌরুষেয়। এ বিষয়ে শাস্ত্রোপদেশ অনুসন্ধান করিলে দৃষ্ট হয়,

কৌষীতকী উপনিষদে পুনঃ পুনঃ উক্ত হইয়াছে :—

যো বৈ প্রাণঃ সা প্রজ্ঞা, যাবা প্রজ্ঞা স প্রাণঃ।
সহহ্যেতাবাস্মিন শরীরে বসতঃ সহোৎক্রমতঃ"।

অর্থাৎ যে প্রাণ সেই প্রজ্ঞা, যাহা প্রজ্ঞা তাহাই প্রাণ ইহারা উভয়ে সম্মিলিত ভাবেই এই শরীরে বাস ও এই শরীরে হইতে উপক্রমণ করে।

উপনিষদের এই বাক্যে প্রথমতঃ প্রাণ ও প্রজ্ঞার ঐক্যই কথিত হইয়াছে। বাক্যের পরাংশে উভয়ের সম্মিলিত ভাবে বাস ও উৎক্রমণ উল্লিখিত হওয়ায় লৌকিক দৃষ্টিতে উভয়ের যে বিভিন্নতা লক্ষিত হয় তাহাও সূচিত হইয়াছে। এস্থলে একটা সমস্যা উপস্থিত হয় :—প্রাণ ও প্রজ্ঞা যে দেহে এক সঙ্গে বাস করে ও দেহ হইতে এক সঙ্গে বহির্গত হয় ইহা সামান্য দৃষ্টিতে যথার্থ বটে; মৃত দেহে প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের সমুদয় চেষ্টা, শ্বাস প্রশ্বাস, রক্তসঞ্চালন, দর্শন, শ্রবণ, প্রভৃতি সমুদয়ই অপনীত হয়; জ্ঞানেরও কোন লক্ষণ পাওয়া যায় না। উভয়েরই এক সঙ্গে অভাব দেখা যায়। কিন্তু জ্ঞান বলিতে যাহা বুঝি তাহার অভাবেও প্রাণের ক্রিয়া কি দেখিতে পাওয়া যায় না। মূর্চ্ছাবস্থায় ও নিদ্রায় শরীরে প্রাণের ক্রিয়া অল্পাধিক পরিমাণে থাকে, কিন্তু তৎকালে জ্ঞান তিরোহিত হয়। মৃত ব্যক্তির শরীরেও কেশাদির উদ্গম দেখা গিয়াছে। Hypnotic sleep কিম্বা trance অবস্থায় শারীরিক প্রাণের ক্রিয়া খুব অল্প পরিমাণেই থাকে, সে অবস্থায়ও জ্ঞানের অধিকতর প্রখরতা অনেক সময় দৃষ্ট হইয়া থাকে। অন্যদিকে আবার যখন অধিক পরিমাণে শারীরিক পরিশ্রম হয়, তখন জ্ঞানের ক্রিয়া খুব অল্প। সুতরাং আমাদের প্রত্যক্ষ দৃষ্ট এই সমস্ত ব্যাপারের সহিত শ্রুতি বাক্যের যেন একটা বিরোধ ভাব দেখা যাইতেছে। এই বিরোধের সহজ এই এক মীমাংসা সম্ভব, যে মোটামুটী যাহা ঘটে শ্রুতি তাহাই বলিতেছেন; আমরা আজকাল যত সূক্ষ্ম বিচার করিতে ভালবাসি শ্রুতি তত আবশ্যক বোধ করেন নাই। কিন্তু এ মীমাংসা ঠিক নয়; কারণ উদ্ধৃত বাক্যের পূর্ব্বাংশেই বলা হইয়াছে যে প্রাণ ও প্রজ্ঞা একই পদার্থ। যদি একই হয় তবে প্রাণের প্রবলতায় জ্ঞানের স্বল্পতা এরূপ ঘটে কেন? একি একত্ব না বৈপরীত্য?

কিঞ্চিৎ প্রনিধান করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে বাস্তবিক জ্ঞান ও প্রাণের

বিকাশের এই তারতম্যই তাহাদের একত্ব প্রতিপন্ন করিতেছে। দুইটী পদার্থের একটীকে অপরটীতে পরিণত করিতে পারিলেই আমরা বুঝিতে পারি যে তাহারা বাস্তবিক ভিন্ন নহে, একটী অন্যের অবস্থান্তর মাত্র। আধুনিক বিজ্ঞান শাস্ত্রে ইহার ভূরি ভূরি উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যায়; দৃষ্টান্তস্বরূপ তাপ ও গতির কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। বিজ্ঞান বলিতেছে তাপ গতি শক্তিরই অবস্থান্তর মাত্র; নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ গতিশক্তিকে বাহির হইতে টানিয়া ভিতরে চালাইতে পারিলেই নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ উত্তাপে পরিণত হয়। বাহিরের গতি (External motion) ভিতরে গিয়া molecular motion আনবিক গতিতে পরিণত হইলেই হইল উত্তাপ। আবার ভিতরের উত্তাপ বাহিরে আসিলেই হইল গতি। উভয়েই এক পদার্থ, শুদ্ধ অবস্থান্তর ভেদে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের নিকট গতি ও তাপ এই দুই বিভিন্ন ভাবে প্রতীয়মান হয়। যদি গতিরূপে প্রতীয়মান কার্য্যকে নির্দ্দিষ্ট অনুপাতে তাপরূপে অনুভূত পদার্থে পরিণত করিতে না পারিতাম, অথবা তাপকে গতিরূপে পরিণত করা অসম্ভব হইত, তবে ইহাদের বাস্তবিক একত্ব কিছুতেই বোধগম্য হইত না। রেলগাড়ী ও কল কারখানা সমাকুল বর্ত্তমান যুগে তাপ ও গতির একত্ব কে না স্বীকার করিবে?

প্রাণ ও প্রজ্ঞার ক্রিয়ার মধ্যেও এই প্রকারে রূপান্তরই ঘটিতেছে। আমরা প্রাণ দ্বারা প্রাণের রাজসিক পরিণাম অর্থাৎ প্রাণ বায়ুর ও বাহেন্দ্রিয়ের কার্য্যই বুঝিয়া থাকি। জ্ঞান ও সেইরূপ অন্তরেন্দ্রিয়ের কার্য্য মাত্র;—অর্থাৎ মনন বা চিত্তের বৃত্তি। ইহার কোনটীই ক্রিয়াশূন্য নিশ্চল (static) অবস্থা নহে। যেখানে প্রাণবায়ুর কার্য্য অত্যধিক পরিমাণে চলিতেছে সেখানে শক্তির বিকাশ অধিকাংশই বাহিরে, অন্তরিন্দ্রিয়ের কার্য্য সামান্য মাত্র। সকলেই জানেন দৌড়াইয়া চলিবার সময় কোনও জটিল বিষয়ের বিচার করা অসম্ভব; এমন কি তৎকালে অধিকাংশ ইন্দ্রিয়ের কার্য্যই স্থগিত হয়। কোন জটিল তত্ত্বের সমাধান করিতে গেলে স্থির হইয়া বসিতে হয়। স্থির হওয়ার অর্থ প্রাণ বায়ুর ক্রিয়া বাহির হইতে সঙ্কুচিত করিয়া অন্তরিন্দ্রিয়ে অধিকাংশ শক্তির সংক্রমণ। কিন্তু সেরূপ সন্তরণ করিতে হইলে যথেচ্ছ হস্তপদসঞ্চালন তাহার অনুকূল নয়, সমুদায় শরীর স্থির করিয়া অঙ্গবিশেষকে কৌশলের সহিত পরিচালন করা আবশ্যক সেইরূপ অন্তরিন্দ্রিয়ে

শক্তির সংক্রমনেই চিন্তার গাঢ়তা হয় না, সে শক্তিকে বিক্ষিপ্ত না করিয়া একমুখী করিতে পারিলে, তবেই সুবিচারে উপনীত হওয়া যায়।

তাপ ও গতির দৃষ্টান্তে আমরা আর একটী বিষয় বুঝিতে পারিতেছি, তাপ ও গতি একই শক্তির রূপান্তর ও বিভিন্ন ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য, তাপ ত্বকের ও গতি দৃষ্টির দ্বারা অনুমেয়, ইন্দ্রিয়ের বিভিন্নতা বশতঃই একই শক্তি দুইরূপে আমাদের নিকট প্রতিভাত হইতেছে। প্রাণ ও জ্ঞান সেইরূপ এক হইয়াও বিভিন্ন উপাধিতে বিভিন্নরূপে অনুভূত হইতেছে। ইহাদের সম্মিলন ও একের অন্য স্বরূপে সংক্রমন দেখিয়া আমরা উভয়ের একত্ব উপলব্ধি করিতে পারি, কিন্তু বিভিন্ন উপাধিতে বিকাশ বাহুল্য হেতু পৃথক বোধ হইলেও ইহাদের ক্রিয়া সম্মিলিত। কোন উপাধিই নাই, যাহাতে প্রাণ ও জ্ঞান উভয়েই বিকাশিত না হইতেছে।

উপাধি বলিতে হইলেই তাহার ব্যষ্টি ও সমষ্টি উভয় ভাব অনুসন্ধান করিতে হইবেক। উপাধি সমগ্রভাবে এক প্রকার ক্রিয়া করে, সেইটী আমাদের জ্ঞানে অনুভূত হয়। আর তাহার প্রত্যেক অংশ পরস্পর একরূপ ক্রিয়া সম্বন্ধে আবদ্ধ হয়, সেইটী তাহার নিজস্ব তাহার প্রাণের ক্রিয়া। এই দুইটী বুঝিতে হইলে উপাধি কিরূপে নিজের কাজ করিতে শিখে তাহা দেখা আবশ্যক। ইহার সহজ দৃষ্টান্ত হস্তলিপি অভ্যাস। প্রথম অবস্থায় অক্ষর সংযোজনায় কি পরিমাণ কষ্ট ও মনঃ সংযোগেরই না প্রয়োজন হয়? প্রত্যেক অক্ষরের প্রত্যেক টানে কতখানি মানসিক শক্তিই না ব্যয় হয়! আদর্শের জ্ঞানও তাহা আয়ত্ব করিবার ইচ্ছা এই দুই মানসিক শক্তি, হস্ত ও অঙ্গুলির উপর বারম্বার চালিত হইয়া লেখা কার্য্যটাকে কেমন করিয়া ক্রমশঃ অভ্যস্ত করিয়া তুলে! পরিশেষে পূর্ব্বের সে মানসিক শ্রম আর প্রয়োজন হয় না,—মানসিক ক্রিয়া শারীরিক কৌশলে পরিণত হয়। জ্ঞান প্রাণে পরিনত হয়, প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ই এইরূপে জ্ঞানকে অংশ করিয়া আপনার আয়ত্ব করিয়াছে। ক্রমাভিব্যক্তির এই তত্ত্ব কৌষিতকী উপনিষদে এইরূপে উল্লিখিত হইয়াছে :—

নাগেবাস্যা একমঙ্গম দুহঠঠং তস্মৈর্নামঃ পরস্তাৎ প্রতিবিহিতা ভূতমাত্রা, প্রাণ এবাস্যা একমঙ্গম দুহঠঠং তস্য গন্ধঃ, পরস্তাৎ প্রতিবিহিতা ভূতমাত্রা হস্তাবেস্যা একমঙ্গম দুহঠঠং তয়ো কর্ম্মঃ। ইত্যাদি।

অর্থাৎ বাগিন্দ্রিয় এই প্রজ্ঞার একভাগ দোহন করিয়া লইয়াছে; তাহা হইতে নাম, পরে ভূত মাত্রায় উৎপত্তি হইয়াছে। এইরূপে হস্তাদি প্রত্যেক ইন্দ্রিয় ইহার একৈক দেশ দোহন করিয়া নিজস্ব করিয়াছে। আমরা চক্ষু দ্বারা রূপ দর্শন করি, শ্রোত্র দ্বারা শব্দ শ্রবণ করি। এই যে আংশিক জ্ঞান ইহা "আমাদের" জ্ঞান চক্ষু বা শ্রোত্রের জ্ঞান নহে, চক্ষু বা শ্রোত্রের যে জ্ঞান উহা আমাদের নিকট উহাদের প্রাণরূপে কল্পিত। এইরূপ দেহের প্রত্যেক অংশকে বিভিন্ন কল্পনা করিলে তাহাদের যে জ্ঞান কল্পিত হয় তাহা আমাদের জ্ঞান নহে। আমরা তাহাদের প্রাণরূপে চেষ্টা কথঞ্চিৎ জ্ঞাত আছি মাত্র। তাহারা সমগ্রভাবে যে কার্য্য করে তাহাই আমাদের জ্ঞানের মধ্যে প্রবেশ করে। তাহাদের জ্ঞান, তাহাদের প্রাণ, আমাদের জ্ঞানের, ও প্রাণের আধার। কিন্তু মূল তথ্য দেখিতে গেলে, যেরূপ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, উহা আমাদেরই স্ব স্ব জ্ঞানের বহু জন্মার্জ্জিত কর্ম্মফল। আমি আমার মানসিক ক্রিয়াগুলিকে দেহের ক্রিয়াপেক্ষা নিকটবর্ত্তী অনুভব করি। "আমার হাত নড়ে এরূপ কথা অনেক সময় বলি কিন্তু আমার মন ভাবে" না বলিয়া আমি ভাবি এইরূপ বলি।

কিন্তু এই যে বাহ্য ও অভ্যন্তরের পার্থক্য, ইহা অতীত ও বর্ত্তমানে যে পার্থক্য তাহার অতিরিক্ত কিছুই নহে। মনকে যখন হাতের মত বাহিরে দেখিতে শিখিব তখন চিন্তাকে ও প্রাণের কার্য্যের ন্যায় বহিঃস্থ বোধ হইবে। মনকে বাহিরে ধরিতে না পারায় চিত্ত বৃত্তিকে শান্ত ও সাত্ত্বিক জ্ঞান বলিয়া ভ্রম করিতেছি। যেমন রূপ দর্শনে চক্ষুর আভ্যন্তরিক স্পন্দন প্রত্যক্ষ হয় না, সেইরূপ ভাব গ্রহণে মানসিক ক্রিয়ার উপলব্ধি হয় না। দেহ ও মনের এই রাজসিক ভাব তিরোহিত হইলে, প্রাণ ও জ্ঞানের যে স্থির সত্ত্বা উদ্ভূত হয় তাহাই বিশুদ্ধ প্রাণ ও বিশুদ্ধ জ্ঞান (সংবিৎ) ও তাহাই আত্মা। পতঞ্জলি বলিয়াছেন তত্র দ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানং। স্বরূপ অবস্থায় প্রাণ ও জ্ঞানের ঐক্য আমরা অনুমান করিতে পারি ও বৃত্তি অবস্থায় উভয়ের পৃথকত্ব এবং সম্মিলন আমারা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি। এই ঐক্য ও সাম্মিলনই কৌষিতকী উপনিষদে উপদিষ্ট হইয়াছে। শাস্ত্রে ঐ স্বরূপাবস্থা হইতে প্রাণ ও মন উভয়েরই উদ্ভব উপদিষ্ট হইয়াছে। এতস্মাৎ জায়তে প্রাণঃ। হিরণ্যগর্ভই প্রাণ এবং তিনিই

ব্রহ্মা, উপাধি বিশেষে তিনি নানা জ্ঞানাকারে উপলব্ধ হইতেছেন। যেমন এক জাগতিক শক্তি তাপ গতি প্রভৃতি নানারূপে প্রতীয়মান হইতেছে, তেমনি এক আত্মাই উপাধিভেদে ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়ারূপে প্রতিভাত হইতেছেন। তাপ ও গতির পরিণামে যে পরিমাণ ও স্বভাবগত নির্দ্দিষ্ট অনুপাত, তাহাতেই উপাধি রহস্য সূচিত হইতেছে।

জ্ঞান ও প্রাণ,—কর্ম্ম ও অদৃষ্ট।

উক্ত বিষয় লইয়া "পন্থায়" যে আন্দোলন চলিতেছে ও এতৎ সম্বন্ধে যে সকল প্রশ্নগুলি উত্থাপিত হইয়াছে তাহা আমাদের সর্ব্বদা বিবেচ্য। ইহা যে কেবল দার্শনিক হিসাবে প্রয়োজনীয়, তাহা নহে। প্রশ্নগুলি আমাদের জীবনের সহিত গঠিত, এবং তৎসমাধানে মানব জীবনের রহস্য কথঞ্চিৎ ভাবে বুঝিতে পারা যায়। যাহাতে বিদ্বদ্গুণী প্রশ্নগুলিতে আকৃষ্ট হন, ইহাই আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য; নতুবা নিগূঢ় তত্ত্ব সকল উদ্ভাবনে আমাদের সামর্থ্য নাই।

কোন বিষয় বিচার করিতে গেলে তৎসমুদায়ের পরিভাষা স্থির হওয়া আবশ্যক। কোন্ অর্থে কোন্ সংজ্ঞাগুলি কি ভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা আমাদের দেখিতে হইবে। "কর্ম্মের সহিত প্রাণের সম্বন্ধ" ও "জ্ঞান ও প্রাণ" শীর্ষক প্রবন্ধে "জ্ঞান" শব্দ যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা চিত্তবৃত্তি ভিন্ন আর কিছু নহে। জ্ঞান শব্দে মনোময় কোষের ক্রিয়া বিশেষ। যে চিত্তবৃত্তি নিরোধের জন্য পতঞ্জলি ঋষি যোগ শাস্ত্রের অবতারণা করিয়াছেন, এই বৃত্তিই লেখকগণের মতে "জ্ঞান" শব্দ বাচ্য। ইংরাজী দর্শনে ইহাকে States of consciousness বা modification of consciousness বলে। কিন্তু জ্ঞান শব্দের অন্য অর্থ আছে। প্রজ্ঞাশক্তি বা consciousness একটী অর্থ। কিন্তু বস্তু সান্নিধ্যে চিত্তের যে তাদাত্ম্যভাব উৎপন্ন হয়, সেই ভাবের নামও জ্ঞান। পুনশ্চ জ্ঞান অর্থে সম্বিত বা আত্মার চিৎ ধর্ম্ম অনুসূচিত হয়, যথা সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম ইত্যাদি। এখানে জ্ঞান শব্দ আত্মার স্বাভাবিক ধর্ম্ম অর্থে ব্যবহৃত। ইহা শক্তি নহে, বিশিষ্ট বৃত্তিও নহে। ইহা ধর্ম্ম কর্ম্ম নহে। শাস্ত্রে এই

জ্ঞানকে জ্ঞান বলে, আর সমস্ত অজ্ঞান মাত্র। নির্দ্দিষ্ট পরিচ্ছিন্ন অর্থে "জ্ঞান" শব্দ ব্যবহার করিলে "কর্ম্ম ও জ্ঞানে" কোন পার্থক্য নাই; কারণ এই জ্ঞান বিশিষ্ট কর্ম্ম মাত্র, আর কিছু নহে। স্থূল অবয়বের স্পন্দন বা গতি যেমন শারীরিক কর্ম্ম উৎপাদন করে, সেইরূপ এই জ্ঞান মনোময় কোষের স্পন্দনের ফল মাত্র। এই জ্ঞান প্রাকৃতিক, যে হেতু কর্ম্মজ। ইহা কোষ সকলের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন। কিন্তু প্রকৃত অর্থে জ্ঞান নিত্য, অব্যয়, সৎ পদার্থ। প্রকৃতি এই জ্ঞান হইতে উদ্ভূত। কোষ সকল দ্বারা ইহা অপরিচ্ছিন্ন।

একটী উদাহরণ গ্রহণ করিলে বিষয়টী কিয়ৎ পরিমাণে বুঝা যাইতে পারে। সুখ ও দুঃখ উভয়ই জ্ঞান বটে, কিন্তু এই বিশুদ্ধ জ্ঞানের বিশিষ্টরূপ মাত্র। বিশুদ্ধ জ্ঞান বস্তুর সাহায্যে উৎপন্ন হয় না; ইহা পূর্ব্ব হইতেই আছে। ইহাতে বিশেষ নাই। "আমি আছি" ও "আমি নাই" "ঘট আছে" ও "ঘট নাই", "সৃষ্টি ও লয়," এই প্রকার বিরুদ্ধধর্ম্মাত্মক ভাবের মধ্য দিয়া একই অদ্বিতীয় জ্ঞান বরাবর বর্ত্তমান রহিয়াছে। ঐ প্রকার জ্ঞান থাকাতে আমরা "নেতি" বা অভাবের মধ্যে, ভাব বা অস্তিত্ব অস্পষ্টভাবে অনুভব করি। কোষাদ্ভূতবৃত্তি সকল স্পন্দন সাহায্যে প্রকাশিত হয়। বৃত্তি সকলের গতি ও ধর্ম্ম এই যে, ইহারা বিশেষ ভাবাপন্ন। গতি (Change of states) বা বিশিষ্ট স্পন্দন না হইলে, বৃত্তি উৎপন্ন হয় না। বৃত্তি মাত্রেই ভেদ বা বিভিন্নতামূলক। যেখানে ভেদ বা বিভিন্নতা নাই, সেখানে বৃত্তি চলিতে পারে না। মনোবৃত্তি একই পদার্থে একইভাবে প্রযুক্ত হইলে, চিত্ত বৃত্তির লয় হইয়া নিদ্রাবস্থা উৎপন্ন হয়। চিত্ত বৃত্তি হইতে দেশ, কাল, নাম, রূপ ও গুণ প্রভৃতি পার্থক্য ব্যঞ্জক ভাবগুলি উঠাইয়া লইলে চিত্তের লয় হয়। ইন্দ্রিয়, মন বুদ্ধি প্রভৃতি করণাদি এই প্রকারে ভেদগ্রস্থ হওয়াতে তদ্দ্বারা অবিশেষ চৈতন্যের উপলব্ধি হয় না। এই জন্যই উক্ত আছে, "যত্র বাচঃ নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ" যাঁহাকে না পাইয়া বাক্য ও মন ফিরিয়া আসে। বৃত্তি সগুণস্বরূপ ও নিগুণ জ্ঞানকে পরিচ্ছিন্ন করিতে পারে না। সেই জন্য রাজা পরীক্ষিত প্রশ্ন করিয়াছিলেন:—

"ব্রহ্মণ্ ব্রহ্মণ্যনির্দ্দেশ্যে নির্গুণে গুণবৃত্তয়ঃ।
কথং চরন্তি শ্রুতয়ঃ সাক্ষাৎ সদসতঃ পরে॥ ভাগবত, ১০।৮৭।১

মানব হৃদয়ে অস্ফুট ও অব্যক্তভাবে এক অবিকারী ন "জ্ঞান সত্ত্বা" যদি না

থাকিত, তাহা হইলে কখনই সেই নির্ব্বিশেষসত্ত্বা আত্মাকে জানা যাইত না। অন্য সময়ে এ বিষয়টী বিসদরূপে বিবেচিত হইবে।

এক্ষণে নির্গুণ ও সগুণ, নির্ব্বিকার ও সবিকার জ্ঞানের পরস্পর সম্বন্ধ কি? যাহাকে আমরা জাতি বা গুণ বিষয়ক জ্ঞান বলি (Abstract knowledge) তাহা উদাহরণ স্বরূপ লইলে, এই বিষয়টী কিয়ৎ পরিমাণে বুঝিতে পারা যায়। "মানব" বা "ধর্ম্ম" শব্দ ব্যবহার করিলে একটী অপরিস্ফুট সুতরাং অনির্দ্দেশ্য (Incapable of definition) ভাবের উদয় হয়। এই ভাবটী স্থূল বুদ্ধির ক্ষেত্রে অপ্রকট ভাবে থাকিলেও ইহার সত্ত্বা অবশ্য স্বীকার্য্য। কারণ এই অবিশেষ জ্ঞান না থাকিলে, বিশেষ বা পরিচ্ছিন্ন জ্ঞান অসম্ভব। "এইটীই মনুষ্য", এই বিচারের মধ্যে বিশেষ ও অবিশেষ, দুইটি জ্ঞানেরই সত্ত্বা দেখা যায়। অবিশেষ বা মনুষ্যজাতি বিষয়ক জ্ঞান না থাকিলে, বিশেষ "ব্যক্তি" জ্ঞান অসম্ভব হইত। আবার বিশিষ্ট ও ব্যক্তভাবাপন্ন মনুষ্য বিশেষ সম্মুখে না থাকিলে আমাদের ভিতরে সেই অব্যক্ত জ্ঞান আছে কি না তাহা জানা যাইত না। এই অবিশেষ বা জাতিগত জ্ঞান বিশিষ্ট বস্তুর সাহায্যে মানবচিত্তে কিয়ৎ পরিমাণে প্রকট হয়। পরিমিত, বিশিষ্ট ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা অবচ্ছিন্ন, বস্তুরূপ ছায়ার সাহায্যে বিজ্ঞানময় কোষস্থিত ও আপেক্ষিকভাবে (relatively) অপরিস্ফুট ভাবটী প্রকট হইল।

অপর একটী দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিয়া দেখা যাউক :—"ধর্ম্ম" অর্থে যে অব্যক্ত ভাব সত্ত্বা নিহিত আছে, তাহা বালকের অনুভূতির বহির্ভূত। সেই ভাবময় ধর্ম্ম বিজ্ঞানময় কোষে গমন করিলে প্রত্যক্ষ হয় ; কিন্তু স্থূল, ভেদ-ভাবাপন্ন, পরিচ্ছিন্ন মস্তিষ্কের ভিতর দিয়া ঐ ভাব প্রকাশিত হয় না। সেই জন্য বালককে কোন বিশিষ্ট ক্রিয়াকে ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া দিলে, সেই বিশিষ্ট ভাবের মধ্যে অনুস্যূত অব্যক্তভাবটী অস্ফুটভাবে তাহার হৃদয়ে একটু মাত্র প্রকাশ হয়। কিন্তু সে তাহা বাহিরে প্রকাশ করিতে পারে না, এবং এমন কি, সে নিজে পূর্ণভাবে ভাব গ্রহণ করিতে পারে না। পরে যখন অন্যান্য ও আপাততঃ বিভিন্ন ক্রিয়া গুলিকে ধর্ম্ম বলিয়া বুঝাইয়া দিলে "সমন্বয়কারী বিজ্ঞানের" সাহায্যে এবং সেই অস্ফুট অপরিজ্ঞাত ভাবটীর দ্বারা প্রণোদিত হইয়া আপাততঃ বিভিন্ন ক্রিয়াগুলির মধ্যে একভাবেস্থিত এক ও অদ্বিতীয় সত্ত্বা অনুভূতির জন্য প্রয়াস করে।

তদ্দ্বারা ক্রমে "ধর্ম্ম" শব্দে অপরিস্ফুট এবং ক্রিয়াদিবিবর্জ্জিত ভাবটী অধিকতর ভাবে প্রকট হয়। পূর্ব্বে সে মনে করিত ধর্ম্ম কেবল ক্রিয়া বিশেষ। কিন্তু বিভিন্ন ক্রিয়াগুলি একীকরণ প্রয়াসে, তাহার অস্ফুট অনুভূতির প্রসার হয়। তখন সে বুঝিতে পারে যে, ধর্ম্ম কেবল কর্ম্ম করিবার বিশিষ্ট প্রণালী বা পদ্ধতি মাত্র নহে; উহা ভাবময়। এইরূপে যে ধর্ম্মে ক্রিয়াবহুলতারূপ পরিচ্ছিন্নভাব ত্যাগ করিয়া ভাবময় রূপ গ্রহণ করিতে শিখে। এই ভাবময় রূপটী পূর্ব্ব হইতেই ছিল: কারণ ইহা না থাকিলে বিভিন্ন কর্ম্মগুলিকে ভাবরূপে সমন্বয় করা যাইতে পারে না। ক্রমে আনন্দময় কোষের পরিপুষ্টির সহিত ধর্ম্ম শব্দটী অন্যরূপ ধারণ করিবে। তখন "ধর্ম্ম" অর্থে ত্যাগজনিত ক্লেশভাবটী আর সূচিত হইবে না। পরন্তু এক অনির্ব্বচনীয় অভূতপূর্ব্ব আনন্দভাব হৃদয়ে প্রকাশিত হইবে। আর এক স্তর উপরে যাইলে "ধর্ম্ম" এবং "আত্মা" যে এক, তাহা অপরোক্ষভাবে বুঝা যাইবে। ধর্ম্ম শব্দে আত্মার অতীত, ক্রিয়ারূপ বহির্ভূত ভাবটী তিরোহিত হইয়া, ধর্ম্ম ও আত্মা এক হইয়া যাইবে। পূর্ব্ব হইতেই এই ভাবটী মানব হৃদয়ে অপরিস্ফুট ভাবে ছিল বলিয়াই, মানব চিরকাল ধর্ম্মের প্রয়াসী। তবে বদ্ধ ও পরিচ্ছিন্ন মস্তিষ্কে যাহা অনুভূত হইত না, তাহা ক্রমোন্নতির সহিত পরিষ্কৃত ও সাধনার দ্বারা প্রসারিত চিত্তে এক্ষণে প্রকট হইল। "আত্মা" "ব্রহ্ম" "ঈশ্বর" প্রভৃতি ভাবগুলি এইরূপে প্রকট হয়।

জ্ঞান আত্মা। জ্ঞান পূর্ব্ব হইতেই মানবহৃদয়ে বর্ত্তমান। ইহা নিত্য সর্ব্বগত স্থাণু অচল ও সনাতন। ইহাতে ভাসমান হইয়া এই পরিদৃশ্যমান জগত প্রকাশিত রহিয়াছে। তবে, রাম শ্যাম যায়, আসে ও আসিবে।

আত্মা বা অসীম এক অদ্বিতীয় অবিকারী জ্ঞান সর্ব্বদাই বর্ত্তমান। তবে যেন আপনাকে আপনি চিনিবার জন্য, আত্মা, বহুও পরিচ্ছিন্ন ও বিকারী সত্তায় প্রতিভাত। সে ভাব, সে অসীমতা, অপরিচ্ছিন্নতা অথচ অদ্বিতীয়তা ও একত্ব আমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না বলিয়াই—আমি আত্মা ও আমি সর্ব্ব এই দুই ভাবের অদ্ভুত সমন্বয় "সর্ব্বংখল্বিদং ব্রহ্ম," "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না বলিয়াই, আমি নিজে একভাবে কুটস্থ অদ্বিতীয় "অহং" শব্দ বাচ্য ও অপর ভাবে বিকারী পরিবর্ত্তনশীল "তৎ" শব্দবাচ্য জগৎরূপে যেন বিভক্ত

হইয়া প্রকাশিত রহিয়াছি। ভিতরে জীব, বাহিরে জগত এই দুই ভাবেস্থিত সৎ পদার্থই আমি:—

নিত্যোঽসি শুদ্ধোঽসি নিরঞ্জনোঽসি।
সংসারমায়াপরিবর্জ্জিতোঽসি॥

পরিবর্ত্তনশীল বহির্জ্জগৎ যাহাতে সমন্বিত, আমার সেই ভাবের নাম "প্রাণ"। যে ভাবে ভিতরের ও বাহিরের সমন্বয় সাধিত হয়, তাহার নাম "জ্ঞান"। যে ভাবে আপাততঃ প্রতীয়মান দ্বৈত নিরাশ হইয়া এক অদ্বিতীয় সত্বার প্রকাশ হয় তাহাই "আত্ম বা তত্ত্ব জ্ঞান"।

যোবৈ প্রাণঃ স প্রজ্ঞা, যা বা প্রজ্ঞা সা প্রাণঃ। আত্মাএব প্রাণঃ।

আমরা যে ভাবের দ্বারা স্থূল শরীরস্থিত কোষাণু (cells) সকলকে এক সূত্রে গ্রথিত ও একভাবে নিয়োজিত করি তাহা স্থূল প্রাণ। যে শক্তির সাহায্যে ইন্দ্রিয়াদি সঞ্চালনরূপ ক্রিয়ারূপে বাহিরের বস্তুর সহিত সম্মিলিত হই, তাহাও প্রাণ। যে শক্তির সাহায্যে বিভিন্নভাবেস্থিত স্থূল ও সূক্ষ্ম পদার্থ নিচয়কে আমরা একীকৃত করি, তাহাও প্রাণের কার্য্য। সাধারণে ইহাকে জ্ঞান বলে বটে, কিন্তু ইহাও প্রাণ; ইহা মনোময় কোষের দ্বারা প্রকাশিত।

এক্ষণে অনেকে একটী প্রশ্ন উত্থাপন করিতে পারেন, যে পূর্ব্বোক্ত অবিশেষ জ্ঞানটী পূর্ব্ব হইতে কখনই ছিল না, ইহা কেবল ক্রিয়ার ফল বিশেষ। একটী দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিয়া দেখা যাউক, এ মতে কত দূর সত্য নিহিত আছে। একটী বালককে অঙ্ক শাস্ত্র শিক্ষা দেওয়া যাইতেছে। মনে করুন, তাহাকে "যোগ" শিক্ষা দেওয়া যাইতেছে। এক্ষণে "যোগ" শব্দবাচ্য জ্ঞানটী অস্ফুটভাবে তাহার ভিতর না থাকিত, যদি বিভিন্ন ব্যক্ত পদার্থের সমন্বয়ভাব, বা অন্তত যোগশক্তি মানব হৃদয়ে না থাকিত, তাহা হইলে কি কোন বিশিষ্ট যোগের অঙ্ক কেহ বুঝিতে পারিত? "এক একে দুই" এই জ্ঞানটী আপাততঃ বড় সহজ। কিন্তু ১+১ এই পদে "+" জ্ঞানটী না থাকিলে আমরা কি "দুই" গণনা করিতে পারিতাম? এখানে একটী গল্প না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। শীতকালের রাত্রে এক মাতাল বাটীতে ফিরিয়া আসিয়া ঘড়িতে বারটা বাজিতে শুনিল এবং "টং—এক;" "টং—এক;" "টং—এক;" এই প্রকারে শব্দ গুণিতে লাগিল। অবশেষে রাগত ও বিস্মিত হইয়া বলিল, "শালার ঘড়িটা

একবারে খারাপ হইয়া গিয়াছে; কি না ১২ বার একটা বাজলো।" যোগ শক্তি মুহূর্ত্ত মাত্র অন্তর্হিত হইলে, আমরাও ১২ বার "একটা" বাজিতে শুনিব। এই মহাযোগশক্তি, এক, অবিনাশী, অবিকারী জ্ঞানরূপে চিত্তক্ষেত্রে চিরকাল বিরাজমানা আছেন বলিয়াই আমরা বিভিন্ন পদার্থ, বিভিন্ন ইন্দ্রিয় ও মনোবৃত্তি সকল যোগ করিয়া আবার পূর্ণ অদ্বিতীয়তা ও একতা পাইবার জন্য প্রয়াস করি। বালকের পক্ষে বিশিষ্ট পর্ব্ব সহিত একই অঙ্গুলিতে স্থিত সেই একত্ব, গুণন দ্বারা অস্ফুট ভাবে প্রতিভাসিত হয়। এই অদ্ভুত অব্যবহার্য্য আত্মার মূল-শক্তি, যোগ বা জ্ঞান শক্তি। এই অব্যক্তা শক্তিকে নমস্কার—

নমস্তে মহাযোগিনী জ্ঞানরূপে।

এই শক্তি অঙ্ক শাস্ত্রের সাহায্যে বিশিষ্ট নামরূপের মধ্য দিয়া বাহিরে প্রকট হইয়া অঙ্ক শাস্ত্রের "যোগ" ভাবের মধ্যে প্রকাশিত হন। পূর্ব্বে যাহা অদৃষ্ট ছিল, তাহা এখন দৃষ্ট হইল। দর্পণ সাহায্যে যেমন পূর্ব্বে অদৃষ্ট স্বীয় মুখ দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ বাহিরের বস্তু সাহায্যে আত্মার অপ্রকট আত্মশক্তি প্রতিবিম্বিত হইয়া প্রকট হন। "আমি এক" বলিয়াই, আত্মার যোগশক্তি (যোগিনী শক্তি) আমারই প্রক্ষিপ্ত ভাবরূপী বস্তুগুলিকে আবার আমার সহিত যোগ করিয়া দেন। জ্ঞানময়ী স্বয়ং প্রকট হইয়া ভেদাত্মক ব্যবহার জগতেও আমার অদ্ভুত অভেদাত্মক একত্ব প্রতিপাদনের জন্য ব্যস্ত। বিষয়-গুলিকে আমাতে যোগ করিয়া পুনরায় সেই অদ্বিতীয় অদ্ভুত একত্বের উৎপাদন করিতেছেন।

জ্ঞান আত্মার স্বরূপ। আত্মা এক এবং অদ্বিতীয়। সেই জন্যই স্থূল উপাধিতে প্রকাশিত এবং বদ্ধভাবাপন্ন আমার "আমি" সর্ব্বদাই যোগশক্তির সাহায্যে জগতের বিভিন্নতা সমন্বয় করিয়া আপাততঃ পরিদৃশ্যমান বহুত্বকে মনোবুদ্ধিইন্দ্রিয়াদির সাহায্যে একীকৃত করিয়া জ্ঞানরূপে এক করিতেছে। আমার দ্বিতীয় নাই; সেই জন্য প্রবৃত্তি মার্গে ক্রমশঃ অবতরন (Involution) কালে, দেবইন্দ্রিয়ভূতময় যোনিতে বিক্ষিপ্ত, সুতরাং ব্যক্তভাবে পরিছিন্ন, আমার ভাব গুলিকে যাহাতে পুনরায় কুড়াইয়া লইয়া, এবং তাহাদের আপাততঃ প্রতীয়মান দ্বিতীয়তা ভাব নিরাশ করিয়া পুনরায় সেই অদ্বিতীয় অদ্ভুত একত্বে উপনীত

হইতে পারি,এই জন্যই মাতৃকা দেবী, অদৃষ্ট, কৃষ্ম,জ্ঞান, প্রভৃতি বিভিন্ন ভাবের মধ্য দিয়া আমাকে এক করিতেছেন। অদৃষ্টই আত্মার অলৌকিক ও প্রকৃত ভাব পৌরষেয় ভাবই ক্রিয়াপরিচ্ছিন্ন। যাহাকে পৌরুষেয় বলি, তাহাই আমাদের *লৌকিক, ব্যক্তিগত ও ভেদাত্মক ভাব মাত্র। একটীতে পরিচ্ছন্নতা আসে।* আর একটী আমাদের অসীমতা ও অনন্ততা এবং অনির্ব্বচনীয়তা ও প্রকৃত অদ্বিতীয়তা উৎপাদন করে। ইনিই আমাদের স্নেহময়ী জননী। উপাধিগত ব্যক্তভাব বিনষ্ট করিয়া আত্মার অব্যক্ততা সাধনে সদাই নিরতা। ইহাকে সর্ব্বদা নমস্কার।

মা, কবে বিষয়ের বিষময় অজ্ঞান ও ব্যক্তভাবে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিত্বের মোহ দূর করিবে? কবে আমার আব্রহ্মস্তম্ভপর্য্যন্ত ব্যাপ্ত, "এক" ভাব দেখাইয়া দিয়া *জীবনের সংগ্রামে কর্ম্মজ ভ্রান্তি ও ব্যক্তিত্বের অশান্তি দূর করিবি? মা! গায়িত্রী,* মা সাবিত্রী, মা উমা, সেই আশায় নিশিদিন বসিয়া আছি। মা তুমি নারায়ণী তুমি যোগমায়া, আত্মাশক্তি। তোমার কৃপাতেই, তুমি স্বপ্রকাশিত হইলেই জীবভ্রান্তি ঘুচিয়া "বাসুদেব সর্ব্বমিতি" জ্ঞান প্রকট হয়। তোমাকে নমস্কার।

সর্ব্বমঙ্গল্যমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গোরী নারায়ণী নমস্তুতে।

কস্যচিৎ তৃষ্ণাতুরস্য॥

পঞ্চীকরণ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

অপিচ—সোবিভেত্তস্মাদেকাকী বিভেতি সহায়মীক্ষঞ্চক্রে। বৃহদারণ্যকং। সো বিভেৎ স প্রজাপতি যোয়ং প্রথমঃ শরীরী পুরুষীবিধোব্যাখ্যাতঃ স অবিভেভীতবানস্মদাদীবদেবেত্যাহ। যস্মাদয়ং পুরুষবিধঃ শরীর করণবানাত্মনাশ বিপরীত দর্শনবত্ত্বাদবিভেত্তস্মাত্তৎ সামান্যাদদাত্বেপ্যোকাকীবিভেতি। কিঞ্চা-

স্মাদাদিবদেব ভয়হেতু বিপরীত দর্শনাপনোদকারণং যথা ভূতাত্ম দর্শনং সোয়ং প্রজাপতিরীক্ষামীক্ষণঞ্চক্রে কৃতবানসহ। শাঙ্করভাষ্যং।

যাঁহাকে পুরুষবিধরূপে প্রথম শরীরী বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সেই প্রজাপতি একাকী থাকিয়া ভীতিযুক্ত হইলেন। অজর:অমর অজ অব্যয়াত্মা পরমেশ্বর প্রথম শরীরী; তিনি কি অস্মদাদির ন্যায় আপনার বিনাশ দর্শনে ভয়যুক্ত হইয়াছিলেন? [বিবক্ষিতার্থ সিদ্ধ্যর্থং হেতু ভয় ভাক্তমিতি শেষঃ।] অর্থাৎ একাকী থাকিলে যে ভয় হয়, তাহার উৎপত্তি নিমিত্ত সামান্য লোকবৎ ভীত হইয়াছিলেন; নচেৎ পরমাত্মার ভয়োৎপন্নের সম্ভব কি? অতএব তাঁহার ভয় বর্ণন ভাক্ত মাত্র। পুনঃ তদ্ভয় নিবারণোপায় স্থির করতঃ আত্মাতেই উপমা দিতেছেন, সেই প্রজাপতি একাকী আত্ম রক্ষার্থ সহায়ের ঈক্ষণ করিতেছেন, অর্থাৎ সর্ব্বত্র দৃষ্টি সঞ্চালনপূর্ব্বক দেখিতে লাগিলেন; যথা—

যন্মদনন্নাস্তি কস্মান্ন। বিভেমীতি তত এবাস্যভয়ং বীয়ায় কস্মাদ্ব্যভেষ্যদ্দ্বিতীয়াদ্বৈ ভয়ং ভবতি। বৃহদারণ্যকং।

কথমিত্যাহ। যদ্যস্মাম্মন্নোন্যদাত্ম ব্যতিরেকেণ বস্তন্তরং প্রীতিস্বংদ্বীভূতং নাস্তিতস্মিন্নাত্ম বিনাশহেত্বভাবে কস্মান্নবিভেমীতি। ততএব যথা ভূতাত্ম দর্শনাৎ। অস্ত প্রজাপতের্ভয়ং বীয়ায় বিস্পষ্টমপ্যাভবৎ। কস্মাদ্বাভৈষ্যৎ কিমিত্য সৌভীতবান্ পরমার্থ নিরূপণায়াং ভয়মনুপপন্নমেবেত্যভিপ্রায়ঃ। যস্মাদ্দ্বিতীয়াদ্বস্তত্বন্তরাৎবৈ ভয়ং ভবতি দ্বিতীয়ঞ্চ বস্ত্বন্তর মবিদ্যা প্রত্যুপ স্থাপিত মেব নহ্য দৃশ্যমানং দ্বিতীয়ং ভয় জন্মনোহেতুঃ। শাঙ্করভাষ্যং।

সে কি প্রকার তাহা কহিতেছেন। প্রজাপতি আলোচনা করিলেন যে, আমা ব্যতীত আর দ্বিতীয় বস্তু মাত্র নাই, তবে আমার ভয় হইবার কারণ কি, যে আত্মব্যতিরেকে দ্বিতীয় ব্যক্তি থাকিলে আপনার বিনাশভীতি উপস্থিত হইতে পারে, যখন তাহার অভাব দেখিতেছি, তখন আর আমার ভয় কি, ইতি চিন্তা মাত্রেই প্রজাপতি ভয় রহিত হইলেন।

যদি বল, পরেমেশ্বররূপের সামান্য লোকবৎ ভয় উৎপন্ন কেন হইল। উত্তর; প্রজাপতির যে ভয়, সে শুদ্ধ অবিদ্যা নিমিত্ত জানাইয়া দিলেন, নচেৎ যাঁহাকে জানিলে অভয়পদ প্রাপ্তি হয়, তাঁহাকে অবিদ্যা প্রভব যে ভয় সে কিরূপে স্পর্শ করিতে পারে; ইহাতে এই প্রতিপন্ন হয় যে, যাবৎ মায়ার

কার্য্য তাবৎ ভয়, নচেৎ ব্রহ্মাত্মজ্ঞান অর্থাৎ আত্মভিন্ন দ্বিতীয় নাই, এমন জ্ঞান যাহার হইবেক, তাহার এরূপ ভয় উৎপন্ন হয় না; যথা শ্রুতিঃ—"তত্র কো মোহঃ কঃ শোকঃ একত্বমনুপশ্যত ইতি।" তথাহি—

সবৈনৈব মেতস্মা দেবকী নরমতে সদ্বিতীয়মৈচ্ছৎ .সহৈতাবানা স যথা স্ত্রী পুমাংসৌ সংপরিষক্তৌ সইমমেবত্মানং দ্বেধা পাতয়ৎ। বৃহদারণ্যকং।

ইতশ্চ সংসার বিষয় এব প্রজাপতিত্বং যতঃ স প্রজাপতির্বৈনৈবরেমে। ০০০। অস্মাদাদিবৎ এব যতঃ ইদানীমপি তস্মাদেকাকিত্বদেকাকীমরমতে নানুভবতীতি। (রতির্নাম ইষ্টার্থসংযোগজা ক্রীড়া) ০০। অরতেরপনোদনায় দ্বিতীয়মৈচ্ছৎ ।০০০। স্ত্রীবর্ত্তেচ্ছতগৃদ্ধিমকরোৎ। স্ত্রিয়াপরিষক্তস্যেবাত্মনো ভাবোবভুব। ০০০। যথালোকে স্ত্রীপুমাংসাবরত্যপনোদায় সংপরিষক্তৌ বৎ পরিমাণৌ স্যাতাং তথা তৎ প্রমনো বভুবেত্যর্থঃ। শাঙ্করভাষ্যং।

সৃষ্টি বিষয়ের কর্ত্তার নাম প্রজাপতি, তাঁহার নিঃশরীর সম্ভব হয় না, একারণ মনুষ্যবৎ শরীরী, তাঁহাকে মান্য করেন; কিন্তু মনুষ্যের ন্যায় ক্ষণ বিধ্বংসী নহেন, সেই প্রজাপতি একাকী থাকিতে সুখী হইলেন না, তজ্জন্য অদ্যাপিও আমরা একাকী সুখী নহি, এই অনুভব হয়; অতএব আমাদিগের ন্যায় পত্নী বিশিষ্ট হইবার কামনা করিলেন। সুখের নাম রতি তাহার এই অর্থ যে, অভিলষিত উভয় সংযোগ জাত ক্রীড়া, তদ্বিয়োগের নাম অরতি, সেই অরতির বিচ্ছেদ হেতু স্ত্রী বিষয় ইচ্ছা করিলেন, যদ্রূপ সামান্য লোকে স্ত্রীপুরুষ সংসক্ত হইয়া সুখী হয়, সেই পরিমাণে আমার দ্বিধাত্মা হউক, এই কামনা করিলেন। তথাহি—

যতঃ পতিশ্চ পত্নী চাভবতাং তস্মাদিদমর্দ্ধব্রুগলমিব মনুষ্যা অজায়ন্ত।৩। বৃহদারণ্যকং।

ভূত কারণাৎ বিরাজো বিশেষণার্থং ন ক্ষীরস্য সর্ব্বোপমর্দ্দেন দধিভাবোৎপত্তিবৎ। বিরাট ভাবোপমর্দ্দেনৈবানাস। কিংতর্হ্যাত্মনো ব্যবস্থিতস্যৈব বিরাজঃ সত্য সংকল্পত্বাৎ আত্ম ব্যাতিরিক্তং স্ত্রীপুংপরিষক্ত পরিমাণং শরীরান্তরং বভূব। স এব চ বিরাট তথাভূতঃ সহৈতাবানাসেতি। ০০০। পতিশ্চ পত্নীচা ভবতামিতি। ০০। লৌকিকয়ো রত এব তস্মাৎ যস্মাৎ আত্মন এবার্দ্ধঃ পৃথক ভূতো যেয়ং স্ত্রী। ০০০। স প্রজাপতির্মন্বাখ্যঃ শতরূপাথ্যাং আত্মনো দুহিতরং

পত্নীত্বেন কল্পিতাং। সমত্তবমৈথুনমুপগত বাংস্ততস্তস্মাৎ তদুপগমনাৎ মনুষ্যা অজায়ন্ত উৎপন্নাঃ। শাঙ্করভাষ্যং।

প্রজোৎপত্তি কারণ বিরাট অর্থাৎ প্রজাপতি দ্বিধাবিভাগে পতি ও পত্নীরূপ হইলেন, তাহাতে কি তিনি সেইরূপে বিকারাপন্ন হইয়া দুইরূপ হইলেন, না,— তদ্দেহাতিরিক্ত অন্য কোন রূপের সৃষ্টি করিলেন? তৎ সংশয় নিবারণ করিয়া কহিতেছেন; যদ্রূপ ক্ষীরবিকার ক্ষীরশরীর দধিত্বকে পায় তদ্রূপ নহে; (অতএব আর এক কুযুক্তিরও নিরাশ হইল যে, রূপান্তর গ্রহণে পরমেশ্বরের স্বরূপের নাশ হয় না।) বিরাট ভাবোপমর্দ্দ দ্বারা, সত্য সংকল্প প্রযুক্ত বিরাট পুরুষ পরমেশ্বর আত্মরূপ সত্ত্বে ইচ্ছামাত্র স্ত্রীপুরুষ সংসক্ত অন্য একরূপে শরীরান্তর প্রাপ্ত হইলেন; একারণ সেইরূপেরও বিরাজ সংজ্ঞা খ্যাত হইয়াছে। অতএব পরমাত্মার দাম্পত্য ভাবে পতি ও পত্নীত্বভাব বিখ্যাত হয়, যাজ্ঞবল্ক্য ইহা উক্ত করিয়াছেন। এই নিমিত্ত অদ্যাপিও অস্মদাদির পৃথক ভূতা যে স্ত্রী তাহাকে আপনার অর্দ্ধশরীর বলিয়া গৃহীত হয়। বিবাহের পূর্ব্বে ঐ বিরাট পুরুষ মনু; যাবৎ স্ত্রীতে অসংসক্ত ছিলেন তাবৎ অসংপূর্ণ অর্থাৎ স্ত্রীর অর্দ্ধভাগ শূন্য ছিল, যখন ঐ স্ত্রীকে প্রকাশ করিয়া বিবাহ করিলেন, তখন সম্পূর্ণতাকে প্রাপ্ত হইলেন। সেই প্রজাপতি বিরাট পুরুষ স্বায়ম্ভুব মনু নামে আখ্যাত, এবং ঐ স্ত্রীর নাম শতরূপা, মনু হইতে উৎপন্না অতএব তাঁহার কন্যা কিন্তু তদন্যভাবে পত্নীত্বে গ্রহণ করিলেন, সেই স্ত্রীতে মৈথুনোপগত হওয়াতে মনুষ্য উৎপন্ন হইল। এই প্রস্তাবে যদি আপত্তি কর যে, বিরাটের পুত্র মনু তাঁহার বিরাট সংজ্ঞা কিরূপে হইতে পারে? উত্তর, তুমি উপনিষদের স্বরূপার্থ উপলব্ধি করিতে পার নাই, যে হেতু স্বায়ম্ভুব মনু আদি বিরাট হইতে উৎপন্ন হয়েন এবং তাঁহারও আখ্যা বিরাট। (ক্রমশঃ)

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ শর্ম্মা।

অসাধারণ শক্তি।

যাহা কিছু আমরা বুঝিতে পারি না বা আমাদের দ্বারা সম্যক্ পরিজ্ঞাত নিয়মাবলীর বহির্ভূত বলিয়া বিবেচনা করি, তাহাকে হয় অলীক অপ্রাকৃতিক বলিয়া অগ্রাহ্য করি, কিম্বা অলৌকিক বা দৈবশক্তি সম্ভূত বোধে তৎসম্বন্ধে

আলোচনা অনুসন্ধানে অমনোযোগী হইয়া থাকি। কিন্তু আজকাল বিজ্ঞ প্রবীণ বৈজ্ঞানিক পুরুষগণ এবম্প্রকার ঘটনাসমূহকে বিশ্লেষণ করতঃ তাহা-দিগকে নৈসর্গিক নিয়মের অধীনে আনিতে চেষ্টা করিতেছেন ; এবং তাঁহাদের সেই চেষ্টা ফলবতীও হইতেছে। অবশ্য এই শ্রেণীর বুধগণ, সমস্তই ইউরোপীয়, আমাদের দেশে এখনও নিতান্ত বিরল, কারণ প্রকৃত বৈজ্ঞানিক পুরুষ ভারতে কয়জন হইয়াছেন ? তারপর, নিরপেক্ষভাবে অনুসন্ধান করিবার উদার প্রবৃত্তি আজও আমাদের মধ্যে পৌঁছে নাই ; এখনও অনেক বিলম্ব। পতঞ্জলির দেশে এরূপ সঙ্কীর্ণ জড়তা আসিয়াছে ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় হইলেও প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে। পাশ্চাত্য শিক্ষার বিকৃত ফলস্বরূপ আমাদের এই অবনতি। "বিশ্বকোষের সমস্ত সংবাদ মস্তকে বহন করিবার শক্তি থাকিতে পারে, অথচ একটা বৈজ্ঞানিক চিন্তার ক্ষমতা নাই, ইহা অসম্ভব নহে।"* মার্কিণ পণ্ডিত উইলিয়মস্ সাহেবের এ কথা যুক্তি সঙ্গত। আমাদের মধ্যে অনেকেরই এই দশা।

কয়েক বৎসর হইল আমাদের হারাণ রক্ষিত তাঁহার "চিত্রা ও গৌরী" নামক উপন্যাসে দুই একটী অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ করাতে অনেকের নিকট বিদ্রূপভাজন হইয়াছিলেন, কিন্তু ইউরোপীয় আধুনিক নবেলসমূহে ওরূপ কথা বিস্তর উল্লিখিত দেখিতে পাওয়া যায়।

যাহা হউক নিম্নে কয়েকটী প্রকৃত বৃত্তান্ত পাঠকগণের সম্মুখে উপস্থিত করতঃ নিবেদন করিতেছি তাঁহারা নিরপেক্ষ ভাবে যেন অনুসন্ধান করেন।

বিগত শতাব্দীর অৰ্দ্ধেক তখনও শেষ হয় নাই, কোন মুসলমান গ্রামে জনৈক ক্ষীণতনু কদাকার জটাধারী হিন্দু সন্ন্যাসী উপস্থিত হন। ওরূপ ক্ষেত্রে গ্রামের বালকগণ প্রায়ই এবম্বিধ কিম্ভূত-কিমাকার লোকের পশ্চাতে ছুটিয়া থাকে ; বিশেষ তাহাদের মধ্যে হিন্দু যোগীর আগমনে মুসলমান বালকদের কুতূহল উত্তেজিত হইবারই কথা। দুষ্ট বালকেরা কেহ সন্ন্যাসীকে বিদ্রূপ

* "A man may pack his head with all that lies between the covers of all the encyclopaedias, and yet incapable of a single intellectual thought". Introduction to the Study of Yoga Aphorsims of Patanjali. Geo. C. Williams.

করিতেছে, কেহ তাহার প্রতি ঢিল ছুড়িতেছে, কেহ চীৎকার রবে হাততালি দিয়া নাচিতে নাচিতে পশ্চাদ্গামী। এমন সময় ধীর প্রকৃতি একটী বালক তথায় আসিয়া তাহাদের চপলতার নিন্দা করতঃ বলিল, "ফকির হিন্দু হইলেও তাহাকে গালি দেওয়া অন্যায়, সকল জাতীয় সাধুই সম্মানার্হ।" অতগুলি দুষ্ট-প্রকৃতির মধ্যে এক জনকে এরূপ শিষ্ট দেখিয়া সন্ন্যাসী তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। যোগী কয়েক দিনের জন্য ঐ গ্রামের প্রান্তে অবস্থিতি করায় উক্ত বালক প্রত্যহ তাঁহার নিকট গিয়া বসিত। একদিন সাধু তাহাকে বলিলেন, "যদি তুমি ঠিক্‌ঠাক্ আমার উপদেশ মত কার্য্য করিতে পার, আমি তোমাকে অলৌকিক শক্তি প্রদান করিতে প্রস্তুত।" বালক প্রতিশ্রুত হইয়া দীক্ষা গ্রহণান্তর প্রায় চল্লিশ দিবস উপবাস সহকারে কতকগুলি ক্রিয়াতে এবং কয়েকটী মন্ত্র জপে নিযুক্ত থাকে। অবশেষে একদিন নিরম্বু উপবাসী থাকিয়া গুরু কর্ত্তৃক নিকটস্থ পর্ব্বত গুহায় প্রবেশ করিতে এবং তথন যাহা নয়নগোচর হয় তাহা জানাইতে আদিষ্ট হয়। কম্পান্বিত কলেবরে নিবিড় তমসাচ্ছন্ন গুহাভ্যন্তরে উপস্থিত হইয়া দেখিল, সেই গভীর অন্ধকার ভেদ করতঃ এক প্রকাণ্ড দীপ্তিমান চক্ষু দপ্ দপ্ করিয়া জ্বলিতেছে ;—ভয়ঙ্কর দৃশ্য! কোন প্রকারে বাহিরে আসিয়া গুরুকে সংবাদ দিলে তিনি বলিলেন, "যাও, তোমার সিদ্ধি হইয়াছে।" অতঃপর কতকগুলি উপলখণ্ড দেখাইয়া সে গুলির উপর এক একটী যন্ত্র * আঁকিতে অনুমতি করিলেন ; আঁকা শেষ হইলে আজ্ঞা দিলেন, "বাড়ী যাও, তথায় আপন প্রকোষ্ঠের দ্বার রুদ্ধ করতঃ নবপরিচিত ব্যক্তিকে প্রস্তরগুলি তোমার সম্মুখে উপস্থিত করিতে হুকুম দাও।" এবম্প্রকারে উপদিষ্ট হইয়া বালক গৃহে প্রত্যাগমন করত যথাবিধানে কার্য্য করিলে পাথরগুলি তাহার পদপ্রান্তে উপস্থিত হইল। প্রক্রিয়া সফল দেখিয়া সন্ন্যাসীর সকাশে তদ্বার্ত্তা জানাইলে তিনি বলিলেন, "প্রদর্শিত চিহ্ন যে দ্রব্যের উপর আঁকিবে তাহা ঐ প্রকারে আয়ত্তাধীনে আসিবে ; কিন্তু জানিও, ঐ শক্তির দ্বারা যাহা কিছু তুমি পাইবে তাহা তোমার নিকট স্থির না থাকিয়া সত্বর চলিয়া যাইবে।" সাধুর এই কথাগুলি বরাবর ফলিয়া আসিয়াছিল।

উল্লিখিত বালকের নাম হোসেন, ইনি সিপাহীবিদ্রোহের পরবর্ত্তী সময়ে

---

* Mystic Sign.

কিছুকাল কলিকাতা নগরে হোসেন খাঁ-জিন্নী নামে প্রখ্যাত ছিলেন। আমাদের বয়সীদের মধ্যে অনেকেই তাঁহার বুজরুকী প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। ৺হীরালাল শীল মহাশয়ের কাশীপুরস্থ বাগানে হোসেন খাঁ প্রায়ই ধনকুবেরদিগের আমোদার্থ তামাসা দেখাইতেন। কাহারও পকেট হইতে ঘড়ি উড়াইয়া দিলেন; কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল উহা কোন বৃক্ষে দোদুল্যমান। কাহারও হাতে ফল, মূল, খাদ্য দ্রব্যাদি শূন্য হইতে আসিয়া উপস্থিত হইল; এই প্রকার অনেক আজগুবি কাণ্ড তাঁহার দ্বারা সম্পন্ন হইত।

ইংরাজ মহলেও হোসেন খাঁর বিলক্ষণ প্রতিপত্তি ছিল। লাহোর গবর্ণমেণ্ট কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রাকৃতিক-বিজ্ঞানাধ্যাপক ওমান সাহেব তাঁহার পুস্তকে লিখিয়াছেন :—

"Several European friends of mine had been personally acquainted with Hussankhan, and witnessed his performances in their own homes. It is directly from these gentlemen, and not from Indian sources, that I derived the details which I now reproduce." *

ওমান সাহেবের ইংরাজ বন্ধুগণ তাঁহাকে বলিয়াছেন যে হোসেন খাঁ তামাসা দেখাইয়া কখন কোন প্রকার পারিশ্রমিক বা পারিতোষিক লইতেন না। দর্শকদের মধ্যে যে কেহ কোন রকম জিনিস চাহিতেন, টেবিলের নীচে বা দরজার পাশে হাত বাড়াইলেই তাহা উপস্থিত হইত। এবম্প্রকারে কতবার অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে কত দ্রব্য তাঁহারা পাইয়াছেন ও ব্যবহার করিয়াছেন, বিস্কুট, কেক্, চুরট, কলিকাতার বড় বড় দোকানের ছাপ মারা নানাবিধ মদ্যপূর্ণ বোতল ইত্যাদি। একদা কোন সাহেবী মজলিসে পানীয় ফুরাইয়া যাওয়ায় সভাস্থ এক ব্যক্তি বিদ্রূপচ্ছলে টিট্‌কারি দিয়া বলিলেন, "কেন হোসেন খাঁ এখনি আমাদিগকে অনায়াসে এক বোতল শাম্পেন আনাইয়া দিতে পারেন।" এতচ্ছ্রবণে হোসেন একটু ব্যস্ত হইয়া বারাণ্ডায় গিয়া কিঞ্চিৎ উচ্চভাবে কোন অদৃশ্য-শক্তিকে এক বোতল শাম্পেন আনিতে হুকুম দিলেন।

* The Mystics, Ascetics and Saints of India. By John Campbell Oman. প্রবন্ধের সংবাদগুলি প্রায়শঃ এই গ্রন্থ হইতে সংকলিত।

দুই তিন বার চীৎকারের পর আকাশ হইতে এক বোতল শাম্পেন আসিয়া তাঁহার বুকে আঘাত করত মাটীতে পড়িয়া চুরমার হইয়া গেল। তখন হোসেন বলিয়া উঠিলেন, "আমি আমার ক্ষমতা দেখাইলাম; কিন্তু আমার অনুরোধে জিন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছে।"

ওমান সাহেবের কোন ইংরাজ বন্ধু একদা হোসেন খাঁর সহিত এক গাড়িতে রেলে যাইতেছিলেন; পথিমধ্যে কোন রকম পানীয় চাওয়াতে, হোসেন তাঁহাকে গাড়ীর জানালা দিয়া হাত বাড়াইতে বলেন; তদ্রূপ করিবামাত্র তাঁহার হস্তে এক বোতল উৎকৃষ্ট সুরা আসিয়া পৌছে।

ওমানের আর একটী ইউরোপীয় বন্ধু হোসেনের প্রক্রিয়া সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞানলাভোদ্দেশে তাঁহার সহিত খুব ঘনিষ্ঠতা করিয়াছিলেন। এক দিন দুই জনে গাড়ী হাঁকাইয়া বাজার দিয়া যাইতেছেন, হোসেন গাড়ী থামাইতে বলিল। পরে উভয়ে নামিয়া কোন রোকড়ের দোকানে গিয়া হোসেন গিনি কিনিবার প্রস্তাব করিলেন। দোকানদার লোহার সিন্দুক হইতে কয়েকটী গিনি বাহির করিয়া তাঁহাকে দেখাইল। হোসেন সেগুলি একটু বিশেষ ভাবে অঙ্গুলি দ্বারা স্পর্শ করিলেন ও দামে না বনায় লওয়া হইল না, এইরূপ প্রকাশ করিয়া ফেরত দিলেন। তৎপর দিবস আবার দুইজনে সেই দোকানে গিয়া জানিলেন ঠিক সেই কয়টী স্বর্ণমুদ্রা তালা-চাবির ভিতর হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। তদবধি সাহেব ভীত হইয়া হোসেনের সঙ্গ ত্যাগ করেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীচন্দ্রশেখর সেন।

শ্রীরামচন্দ্র।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

"ভদ্রে, আমি সমরেতে শত্রু জয় করে,
তোমারে আনিনু এই আমার গোচরে।
পৌরুষেতে যতদূর করিবার হয়—
ততদূর করিয়াছি আমি সুনিশ্চয়।
অপমান করেছিল রাক্ষস রাবণ,
প্রতিশোধ লৈনু তারে করিয়া নিধন।
এইক্ষণে পর গৃহবাস নিবন্ধন

তোমার চরিত্রে মোর দ্বিধা করে মন।
এই হেতু আজি আমি কহি এই কথা,
যথা যেতে প্রাণ চায়,চলি যাও তথা !"

রামচন্দ্র যে সীতাকে এই কথা বলিলেন, ইহা প্রাণের কথা নয়। প্রাণ সীতাকে ভালবাসে, কিন্তু তা বলিয়া তিনি সীতার জন্য জগৎ উচ্ছন্ন হইতে দিতে পারেন না—তিনি ভাবিয়াছিলেন—

"স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে।"

আমি যদি আজি, মনে মনে সীতাকে সতী বুঝিয়া, বিশেষ পরীক্ষা না করিয়া, হৃদয়ে গ্রহণ করি, লোকে সীতা সতী কি অসতী জানিবে না। সুতরাং অসতীর প্রশ্রয় বাড়িবে। সুতরাং হৃদয় ছিন্ন হইয়া যায় যাউক, কিন্তু সংসারে পবিত্রতার দৃষ্টান্ত অটুট থাকুক ! সীতা কে ? আমিই বা কে ? এই ভাবিয়াই তিনি সীতাকে ওরূপে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন।

সীতা প্রাণে প্রাণে জানিতেন তাঁহাতে অসতীত্বের ছায়া মাত্রও নাই ! তিনি সেই সতীত্ব অটুট রাখিবার জন্য যে সকল যন্ত্রণা তৃণবৎ উপেক্ষা করিয়াছিলেন তাহাও স্মরণ করিলেন ; কিন্তু রামচন্দ্র যে আজ তাঁহাকে এরূপ বাক্য বলিবেন তাহা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই। সতী স্ত্রীর বিশ্বসংসার সবই স্বামী—ধর্ম্ম কর্ম্ম সবই স্বামী—স্বামী বই আর যে কিছু জগতে আছে তাহা সতী জানেন না—কাজেই রামচন্দ্র যে জগতের জন্য ভাবিলেন সে ভাবনা সীতার হৃদয়ে প্রবেশ করিতে পারিল না। রামের শেলসম বাক্যে তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইল। তিনি গদগদ ভাবে বলিলেনঃ—

"নীচ রমণীরে যথা নীচ নর কহে কথা
তথা শ্রুতি কটু অতি কঠোর বচন।
পুনঃ পুনঃ মোর প্রতি কহ কি কারণ ?
যেই মত তুমি মোরে ভাবিছ এখন,
নিজ চরিত্রের তরে কহি অঙ্গীকার করে
তথা দুষ্ট নহে কভু চরিত্র সীতার,
প্রত্যয় করহ মনে কহি বার বার।
আর অস্বাধীনা আমি ছিলাম যখন

হইয়াছি স্পৃষ্টদেহ তাহে দোষী নহে কেহ
সে বিষয়ে মম দোষ নাহিক কিঞ্চিৎ,
একমাত্র দৈব তাহে দোষীই নিশ্চিত।
যেই অংশমাত্র ছিল আমার অধীন
সে মম হৃদয় ধন তোমাতে ছিল তখন
পরায়ত্ত দেহ মোর ছিল পরাধীন
কি করিব তাহে আমি নিজে শক্তি হীন।
পরস্পর অনুরাগ হয়েছে বর্দ্ধিত।
যদি নাহি জান মোরে পড়িনু বিষম ফেরে
দীর্ঘ সহবাসে যদি না জান আমায়,
তবে এ বিপদে আর না দেখি উপায়।
চিতা বিরচিয়া শীঘ্র দেহত দেবর,
নাহি চাহি বহিবারে দেহ অতঃপর।
মম বিপদের সেই ঔষধ নিশ্চয়,
মিথ্যা অপবাদ আর প্রাণে নাহি সয়!
এ ছার দেহেতে আর কিবা প্রয়োজন
অগ্নি মাঝে প্রবেশিয়া মরিব এখন।

সীতার অনুমতি শ্রবণ করিয়া লক্ষ্মণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া রামচন্দ্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। রামচন্দ্র অসম্মতি প্রকাশ করিলেন না। চিতা প্রস্তুত হইল। সীতা পতির চারিদিকে নীরবে প্রদক্ষিণ করিলেন, মনে কোনও উদ্বেগ নাই মুখে বিষাদ চিহ্ন নাই দেবতা ও ব্রাহ্মণগণকে প্রণাম পূর্ব্বক করযোড়ে অগ্নি সমক্ষে বলিলেন —

"যদি রাম প্রতি থাকে স্থির মম মন,
তা'হলে আমারে রক্ষা কর হুতাশন।
অসতী বলিয়া পতি করিলা বর্জ্জন!
যদি সতী হই আমি তবে হুতাশন,
লোক সাক্ষী তুমি, মোরে করিও রক্ষণ।

এই বলিয়া সীতা অম্লান বদনে অনলকুণ্ডে প্রবেশ করিলেন। চারিদিকে

রোদন রোলে পূর্ণ হইল।

সীতা অনলে প্রবেশ করিলে, রামচন্দ্র পুনরায় চিন্তাপরায়ণ হইলেন। এমন সময়ে ব্রহ্মা, শিব, বরুণ, যম, প্রভৃতি দেবগণ তথায় উপনীত হইলেন। দেবগণ বলিলেন—

"সকলের কর্ত্তা রাম, সবার প্রধান,
কেবা আছে জ্ঞানী বল তোমার সমান।
সীতা দেবী প্রবেশিলা দীপ্ত হুতাশন,
উপেক্ষা তাহাতে কেন কর প্রদর্শন?
সামান্য নরের মত করি অবিচার
সীতারে উপেক্ষা কেন কর তেজোধার?"

রামচন্দ্র বলিলেন—আমি কে? আমি ত দশরথের পুত্র রাম? তাহা যদি না হয় তবে পিতামহ বলুন আমি কে? আমার স্বরূপ কি?

পিতামহ ব্রহ্মা বলিলেন—

কহিব যথার্থ তত্ত্ব, করহ শ্রবণ
শঙ্খচক্রগদাধর তুমি নারায়ণ।
নিত্য তুমি, সত্যরূপ, তুমি হে অক্ষয়
কালরূপ, ব্রহ্ম তুমি কহিনু নিশ্চয়।
ধার্ম্মিকের ধর্ম্ম তুমি নিজে স্বপ্রকাশ,
আদি অন্ত মাঝে প্রভু সদা তব বাস।
জানকী কমলা দেবী তুমি নারায়ণ,
রাবণ নাশিতে নর মূরতি ধারণ।
আমাদের কর্ম্ম দেব সুসম্পন্ন হ'ল,
অতঃপর হৃষ্টমনে নিজ লোকে চল।

ব্রহ্মার বাক্য শেষ হইবামাত্র, অগ্নিদেব জানকীকে ক্রোড়ে লইয়া অনলকুণ্ড হইতে উত্থিত হইলেন; এবং সীতাকে রামচন্দ্রের সমক্ষে রাখিয়া বলিলেন—

"সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী সীতা করহ গ্রহণ
নিষ্পাপ শরীরা দেবী কহিনু বচন
ছাড় দ্বিধা মম বাক্য না কর হেলন

পবিত্র জানকী অতি সুবিমল মন।"

রামচন্দ্র বলিলেন—

রক্ষপুরে বহুকাল ছিলেন জানকী
তাই শুদ্ধিকার্য্য তার অতি প্রয়োজন।
পরীক্ষা না করি আমি লইলে সীতাকে
শ্রীরামচন্দ্র কামুক, মূর্খ ক'বে সর্ব্বজন।
জানকী যে পতিব্রতা জানে মম চিত
চরিত্রে ইহার দোষ নাহিক নিশ্চিত।

সকলে রামচন্দ্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহার প্রশংসা করিতে লাগিল।

অষ্টম অধ্যায়।

বিজয়োৎসব।

দেবগণ স্ব স্ব স্থানে চলিয়া গেলে মহেশ্বর, রামচন্দ্রকে পিতৃদর্শন করিতে বলিলেন। দশরথ রামচন্দ্রকে বক্ষে ধারণ পূর্ব্বক বলিলেন যে শ্রীরামচন্দ্রের অদর্শনে তাঁহার স্বর্গ সুখও অকিঞ্চিৎকর বোধ হইত। তিনি বলিলেন, "বৎস! চতুর্দ্দশ বৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছে, এক্ষণে তুমি আর কালবিলম্ব না করিয়া জানকী ও লক্ষ্মণের সঙ্গে অযোধ্যায় গমনপূর্ব্বক রাজ্যভার গ্রহণ কর। তোমাকে পাইলে কৌশল্যার সাধ পূর্ণ হইবেক। অযোধ্যার প্রজাগণ সুস্থ হইবেক।" রামচন্দ্র বলিলেন—পিতঃ আপনি বলিয়াছিলেন, "কৈকেয়ী দেবীরে তনয়সহ করিলাম পরিহার" আজ আমার প্রতি কৃপাপূর্ব্বক সেই শাপ বাক্য প্রত্যাহার করুন। দশরথ তথাস্তু বলিলেন। তৎপরে লক্ষ্মণ ও সীতাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। অবশেষে সীতাকে বলিলেন—

"বৎসে, রামচন্দ্র তোমা কৈলা প্রত্যাখ্যান
সেজন্য অন্তরে ক্রোধ নাহি দিও স্থান।
চিরকাল জেন রাম হিতার্থী তোমার,
তব শুদ্ধি তরে কৈলা এহেন আচার।
যেরূপেতে পবিত্রতা করিলে রক্ষণ
অন্যের দুষ্কর তাহা কহিনু এখন;

পতি সেবা উপদেশ নাহি প্রয়োজন
জান তুমি ভাল মতে জানে সর্ব্বজন
তথাপিও কহি আমি "পুত্রবধূ সীতা,
ভূমণ্ডলে রাম তব পরম দেবতা।

এই বলিয়া দশরথ চলিয়া গেলেন। তৎপরে ইন্দ্র রামচন্দ্রের সমক্ষে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে দাশরথি যখন আমাদের দর্শন পাইয়াছ, তখন কি অভিলাষ আছে বল তাহা সুসম্পন্ন হইবেক। রামচন্দ্র বলিলেন, 'এই যুদ্ধে অসংখ্য বানর ও ঋক্ষ সৈন্য নিহত হইয়াছে, তাহারা সকলে জীবিত হউক; আর তাহারা যখন যেখানে বাস করিবে সেই স্থান ফল পুষ্পাদিতে পরিপূর্ণ থাকুক।" ইন্দ্র তথাস্তু বলিয়া বানর ও ভল্লুকগণকে পুনর্জ্জীবিত করিলেন; এবং রামচন্দ্রকে সত্বরে অযোধ্যায় গমনপূর্ব্বক রাজ্যভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়া নিজ স্থানে প্রস্থান করিলেন।

পরদিন প্রভাতে রামচন্দ্র পুষ্পকরথে আরোহণ পূর্ব্বক অযোধ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন। সঙ্গে লক্ষ্মণ, জানকী, বিভীষণ ও সুগ্রীবপ্রমুখ সৈন্যগণ। শূন্যপথে গমন করিতে করিতে রামচন্দ্র জানকীকে রণস্থল দেখাইতে লাগিলেন। সেতু উত্তীর্ণ হইয়া যেখানে প্রথম উপস্থিত হইয়াছে, সুগ্রীবের রাজধানী কিষ্কিন্ধ্যা প্রভৃতিও দেখাইতে লাগিলেন। সীতার অভিলাষানুসারে কিষ্কিন্ধ্যায় বিশ্রাম করিলেন। প্রধান প্রধান কপিসেনানায়কের পত্নীগণও সহগামিনী হইল। সীতার অন্বেষণ সময় যেখানে কোনও ঘটনা ঘটিয়াছিল, রামচন্দ্র জানকীকে সমস্তই দেখাইতে লাগিল। অবশেষে অযোধ্যা দৃষ্টিপথে পতিত হইল। রামচন্দ্র লঙ্কাত্যাগের পর পঞ্চম দিবসে মহর্ষি ভরদ্বাজের আশ্রমে অবতীর্ণ হইলেন।

(ক্রমশঃ)

আমি কয়জন?

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

প্রকৃত ব্যাপার কি? ১।—ষ্টেভ্ সাহেবের মত।

এক্ষণে প্রশ্ন এই যে একাধারে বহু ব্যক্তিত্বের আবির্ভাবরূপ মতবাদ কতদূর সত্য। নিশ্চয়ই ইহার মধ্যে কিয়ৎ পরিমাণ সত্য আছে, কিন্তু গ্রন্থকর্ত্তারা তাহাকে অতিরঞ্জিত করিয়াছেন। আমেরিকার মনোবিজ্ঞান-বিদ্গণের রীতিই এই। মৃত হাডসন সাহেব দূরানুভূতির সত্যতা সম্বন্ধে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি প্রকৃতির দৃষ্টাদৃষ্ট রাজ্যদ্বয়ের মিলন ভূমির (Borderland) রহস্যোদ্ঘাটনে দূরানুভূতি (Telepathy) ব্যতীত অন্য কারণ খুঁজিয়া পাইতেন না। বর্ত্তমান গ্রন্থকর্ত্তারাও বহু ব্যক্তিত্বের মতবাদ দ্বারা যাবতীয় রহস্যের উদ্ঘাটন করিতে প্রয়াস পাইয়া তদ্রূপ ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। স্ফটিক দর্শন (Crystalgazing বা নখ দর্পণ), শঙ্খনাদ শ্রবণ (shell-hearing), অনায়াস লিখন (Automatic writing) এবং গত সংজ্ঞ ব্যক্তিতে ভূতানয়ন (trance mediumship) প্রভৃতি যাবতীয় রহস্যের কেবল একমাত্র কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহারা তাঁহাদের আত্মপক্ষেরই অনিষ্ট করিয়াছেন। কারণ যাঁহাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও অতীন্দ্রিয় রাজ্যের সঙ্গম স্থানের প্রকৃত ঘটনাবলীর সামান্যমাত্রও প্রত্যক্ষ জ্ঞান আছে, তাঁহারা ক্ষণকালের জন্যও এরূপ অযৌক্তিক ব্যাখ্যা গ্রহণ করিতে পারেন না। তাঁহাদের নিজের উক্তি মানিয়া লইলেও তাঁহাদের যুক্তিবাদ অসম্পূর্ণ। তাঁহাদের মতানুসারে মানবের ব্যক্তিত্ব যতই বহুরূপী হউক না কেন, তাহার মন বহির্জগৎ হইতে যতগুলি "ক্ষণলব্ধ সংস্কার" অর্জ্জন করিয়াছে তন্মধ্যে ততগুলি সংস্কার থাকাই সম্ভব। স্বতঃই হউক অথবা সম্মোহন নিদ্রাবশে হউক তদতিরিক্ত সংস্কার তাহার অন্তস্থল হইতে নিষ্কাশিত করা যাইতে পারে না। মনে করুন যদি একজন অশিক্ষিত ইংরেজ কৃষক সম্মোহন বশে বিশুদ্ধ ফরাসী ভাষায় অথবা প্রাচীন গ্রীক ভাষায় কথোপকথন করে (এরূপ ঘটনা বিরল নহে), বহু ব্যক্তিত্বের মতবাদ কি এবম্বিধ ঘটনার

কারণ নির্ণয়ে সমর্থ ? বহুদিন অতীত হইল লণ্ডনের একজন আবিষ্ট ব্যক্তি (medium) অনায়াসলিখনলব্ধ কোনও অজ্ঞাত প্রাচ্য ভাষায় লিখিত সুদীর্ঘ একখণ্ড পত্র প্রাপ্ত হয়েন। ব্রিটিশ চিত্রশালায় কেহই সে পত্র পড়িতে পারিলেন না। কিয়দ্দিন পরে এক জাপানী পণ্ডিত আসিয়া তাহার অর্থ করিয়া দিলেন এবং বলিলেন যে উক্ত পত্র বহু প্রাচীনকালে জাপানে প্রচলিত কোনও বর্ণমালায় লিখিত। আবিষ্ট ব্যক্তির অন্তশ্চেতনায় বাহিরে না গেলে, এই ঘটনার ব্যাখ্যান অসম্ভব। তৎপরে স্ফটিক দর্শনের উদাহরণ লওয়া যাউক। নিঃসন্দেহই বহুস্থলে দর্পণে দৃশ্যমান বস্তু দ্রষ্টার পূর্ব্বদৃষ্ট, পূর্ব্বশ্রুত অথবা স্বকপোলকল্পিত বস্তু বা বিষয়ের প্রতিরূপ মাত্র। কিন্তু যে সকল বস্তু বা বিষয় সম্বন্ধে দ্রষ্টার কোনরূপ অভিজ্ঞতা নাই, এরূপ অদৃষ্টপূর্ব্ব, অচিন্তিতপূর্ব্ব বস্তু বা বিষয়ের প্রতিকৃতি যদি স্ফটিকে প্রতিবিম্বিত হয়, তখন কিরূপে তাহার ব্যাখ্যা হইবে? আর একটী ঘটনা লওয়া যাউক। কোনও আবিষ্টব্যক্তি কর্ত্তৃক প্রেতাত্মার নিকট হইতে আগত একটী সংবাদ প্রচারিত হইল। এ সংবাদ কেবল প্রেতাত্মা জীবিতকালে অবগত ছিলেন। অপরে ইহার বিন্দুমাত্র জানে না। বহু ব্যক্তিত্বের মতবাদ এ ঘটনার কিরূপে মীমাংসা করিবে? যদি স্বীকার করা যায় যে কোনও উপায় দ্বারা জীবিত ব্যক্তির নষ্টস্মৃতির উদ্ধার সাধন সম্ভব, সে উপায়েও মৃত ব্যক্তির জীবিতকালের স্মৃতিকে টানিয়া আনা যায় না।

পরিবর্ত্তনশীল ব্যক্তিত্বের (একাধারে এক ব্যক্তির আবির্ভাব পরক্ষণেই সে ব্যক্তির অন্তর্ধান এবং দ্বিতীয় ব্যক্তির আবির্ভাব) বিচিত্র ঘটনা সম্বন্ধে তাঁহারা যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন, তাহাও সুসঙ্গত নহে। মানুষের মনকে ক্ষণিক জ্ঞানধারার সমষ্টিমাত্র কল্পনা না করিয়া, প্রত্যেক মনুষ্য এক একটী অখণ্ড জীবাত্মা এইরূপ অনুমান করিলে, পূর্ব্ববর্ণিত ঘটনাগুলি সুচারুরূপে ব্যখ্যাত হইতে পারে। আলোকচিত্রকর তাহার চিত্রাগারস্থিত আলোক চিত্রের সংঘাত মাত্র, এ কথা যেরূপ সঙ্গত, বহু ব্যক্তিত্বের মতবাদও তদ্রূপ। প্রথম এবং প্রধান ঘটনাটীর দিকে দৃষ্টিপাত করুন। হান্নার মধ্যে দ্বৈত ব্যক্তি-সত্তার কোনও প্রমাণ নাই। হান্নার ঘটনা হইতে (ডাক্তার ডানা বর্ণিত মিঃ এস্-এর ঘটনা হইতে) ইহাই প্রমাণ হয় যে হঠাৎ আহত হইলে জীবাত্মার

পূর্ব্বস্মৃতি অন্তর্হিত হইতে পারে এবং তাহাকে পুনর্ব্বার নূতন করিয়া শিশুর মত বহির্জগতের জ্ঞানসংগ্রহে প্রবৃত্ত হইতে হয়। প্রথম হান্নার ও দ্বিতীয় হান্নার জীবাত্মা এক বৈ দুই নহে। ক্ষণিক জ্ঞানধারার নূতনপ্রবাহ অভিনব জীবের সৃষ্টি করিয়াছিল এরূপ কোনও প্রমাণ নাই। স্মৃতিভ্রংশ হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহার মূল চরিত্র অপরিবর্ত্তিত ছিল।

হান্না ও মিঃ এস্ সম্বন্ধে গ্রন্থকর্ত্তাদের সিদ্ধান্ত ত কোনও মতেই সমীচীন নহে। কিন্তু কুমারী বী ও দুষ্টা সালী এবং কুমারী আলমা, টৌয়ী ও বালক, এই দুইটী ঘটনা সম্বন্ধে তাঁহাদের যুক্তি আরও অসার। প্রেতাত্মার আবির্ভাব উক্ত ঘটনাদ্বয়ের একমাত্র সুসঙ্গত কারণ বলিয়া মনে হয়। জাগ্রৎ চৈতন্যের অন্তস্থলস্থিত চৈতন্যে অদ্ভুত শক্তি নিহিত আছে এ কথা স্বীকার করিলেও, আমাদের বহুরূপী ব্যক্তিসত্ত্বার এক একটী খণ্ড অথবা কতকগুলি খণ্ডের সমষ্টি বাহিরে বসিয়া সমগ্র ব্যক্তিত্বের কার্য্যকলাপ পরিদর্শন করিতে পারে। (আলমা ও বালকের বৃত্তান্ত দ্রষ্টব্য) এ কথা কিছুতেই স্বীকার করা যায় না। বিজ্ঞানের নামে অনুষ্ঠিত হইলেও, অদ্ভুত বিষয় গলাধঃকরণ করিবার একটা সীমা আছে।

মোট কথা এই যে—দূরানুভূতি ও বহু ব্যক্তিত্ব দ্বারা অনেক তিমিরাবৃত বিস্ময়কর ঘটনার কারণ নিরূপণ হয় বটে, কিন্তু এতদুভয়ের কার্য্যক্ষেত্র শেষ হইয়াও এমন একটী প্রকাণ্ড দুর্জ্ঞেয় রাজ্য বিস্তৃত থাকে, যাহার মর্ম্মোদ্ঘাটনে দূরানুভূতি বা ব্যক্তিসত্ত্বার বহুরূপিত্ব একেবারেই অক্ষম। প্রেতাত্মার আবির্ভাব সত্য হইতে পারে, বা মিথ্যা হইতে পারে; কিন্তু এই সিদ্ধান্ত যে বহু বিষয়ের কারণ নির্ণয় পক্ষে একটী যুক্তি সঙ্গত অনুমান, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। পক্ষান্তরে অপরাপর অনুমান, যে অলৌকিক, অথচ সত্য ব্যাপারের কারণ নির্দ্দেশ করিতে একেবারে অক্ষম ইহাও প্রত্যক্ষ।

(ক্রমশঃ)

চিত্ত-শুদ্ধি।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

প্রত্যহ অরণ্যে বাস করিয়া, ইন্দ্রিয় তৃপ্তির উপাদান সকল হইতে দূরে থাকিয়া, সকল বিষয়ে নিলিপ্ত হইয়া মনে করা যায় বটে যে, আমি ইন্দ্রিয় জয়ী হইয়াছি। কিন্তু যে মৃতপাত্র অগ্নি সংস্কৃত হয় নাই, সে যেমন স্পর্শ মাত্রে টিকে না, এই ইন্দ্রিয় সংযমও তেমনি লোভের স্পর্শমাত্র টিকে না। যে প্রত্যহ ইন্দ্রিয় চরিতার্থের উপযোগী উপাদান সমূহের সংসর্গে আসিয়াছে তাহাদিগের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া কখন জয়ী বা কখন বিজিত হইয়াছে, সেই পরিশেষে ইন্দ্রিয় জয় করিতে পারিয়াছে। বিশ্বামিত্র বা পরাশর ইন্দ্রিয় জয় করিতে পারেন নাই। ভীষ্ম বা লক্ষ্মণ পারিয়াছিলেন। হিন্দুধর্ম্মের এই একটি নিগূঢ় কথা কহিলাম।

কিন্তু অপেক্ষাকৃত ইন্দ্রিয় সংযম তুচ্ছ কথা। চিত্ত-শুদ্ধির তাহার অপেক্ষা গুরুতর লক্ষণ আছে। অনেকের ইন্দ্রিয় সংযত কিন্তু অন্য কারণে তাহাদিগের চিত্ত শুদ্ধ নয়। আমি ভাল থাকিব কিন্তু ইন্দ্রিয় সুখ ভোগ করিব না, এই বাসনা তাঁহাদের মনে বড় প্রবল। আমার সম্পদ হউক, আমার ধন হউক, আমার মান হউক, আমার যশঃ হউক, আমার সৌভাগ্য হউক, আমি বড় হই, আর সবাই আমার অপেক্ষা ছোট হউক, তাঁহারা এইরূপ কামনা করেন। এই সকল অভীষ্ট যাহাতে সিদ্ধ হয়, চিরকাল অনুদিন সেই চেষ্টায়, সেই উদ্যোগে ব্যস্ত থাকেন। সে জন্য না করেন এমন কাজ নাই; তদ্ভিন্ন মন দেন এমন বিষয় নাই। যাহারা ইন্দ্রিয়াসক্ত, তাহাদের অপেক্ষাও ইহারা নিকৃষ্ট। ইঁহাদের নিকট ধর্ম্ম কিছুই নহে, কর্ম্ম কিছুই নহে, জ্ঞান কিছুই নহে, ভক্তি কিছুই নহে। তাঁহারা ঈশ্বর মানিলেও, কার্য্যতঃ তাঁহাদের কাছে ঈশ্বর নাই; জগৎ থাকিলেও তাহাদের কাছে জগত নাই; কেবল আপনিই আছেন, আপনি ভিন্ন আর কিছুই নাই। ইন্দ্রিয়াসক্তির অপেক্ষাও এই আত্মাদর, এই স্বার্থপরতা চিত্ত-শুদ্ধির গুরুতর বিঘ্ন। পরার্থপরতা ভিন্ন চিত্তশুদ্ধি নাই। যখন আপনি যেমন পর তেমন, এই কথা বুঝিব; যখন আপনার সুখ যেমন খুঁজিব

পরের সুখ তেমনি খুঁজিব ; যখন আপনা হইতে পরকে ভিন্ন ভাবিব না, যখন আপনার অপেক্ষাও পরকে আপনার ভাবিব। যখন ক্রমশঃ আপনাকে ভুলিয়া গিয়া পরকে সর্ব্বস্ব জ্ঞান করিতে পারিব ; যখন পরেতে আপনাকে নিমজ্জিত রাখিতে পারিব ; যখন আত্মা বিশ্বব্যাপী ও বিশ্বময় হইবে, তখনই চিত্তশুদ্ধি হইবে। তাহা না হইলে ডোর কৌপিণ ধারণ করিয়া সমস্ত সংসার পরিত্যাগ করিয়া ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক দ্বারে দ্বারে হরিনাম করিয়া ফিরিলে চিত্তশুদ্ধি হইবে না। পক্ষান্তরে রাজসিংহাসনে হীরকমণ্ডিত হইয়া বসিয়াও যে রাজা জনৈক ভিক্ষুক প্রজার দুঃখ আপনার দুঃখের মত ভাবেন তাঁহার চিত্তশুদ্ধি হইয়াছে। যে ঋষি, বিশ্বামিত্রকে একটি গাভী দান করিতে পারিলেন না, তাঁহার চিত্তশুদ্ধি হয় নাই। হে রাজা অঙ্কগত কপোতের বিনিময়ে আপনার মাংস কাটিয়া দিয়াছিলেন, তাঁহারই চিত্তশুদ্ধি হইয়াছিল।

ইহা অপেক্ষাও চিত্তশুদ্ধির গুরুতর লক্ষণ আছে। যিনি সকল শুদ্ধির স্রষ্টা, যিনি শুদ্ধিময়, যাঁহার কৃপায় শুদ্ধি, যাঁহার চিন্তায় শুদ্ধি, যাঁহার অনুকম্পা ব্যতীত শুদ্ধি নহে, তাঁহাতে গাঢ় ভক্তি চিত্ত-শুদ্ধির লক্ষণ। ইন্দ্রিয় সংযমই বল, আর পরার্থপরতাই বল, তাহার সম্পূর্ণ স্বভাবের চিন্তা এবং তৎপ্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ ব্যতীত কখনই লব্ধ হইতে পারে না। এই ভক্তি চিত্ত-শুদ্ধির মূল এবং ধর্ম্মের মূল। এ বিষয়ে স্থানান্তরে এবং সময়ান্তরে আমরা অনেক বলিব ইচ্ছা আছে, এজন্য এখানে আর বিস্তার করিলাম না।

চিত্ত-শুদ্ধির প্রথম লক্ষণ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, তাহার স্থূল তাৎপর্য্য হৃদয়ে শান্তি। দ্বিতীয় লক্ষণ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, তাহার স্থূল তাৎপর্য্য প্রীতি। তৃতীয় লক্ষণ, ঈশ্বরে ভক্তি। অতএব চিত্ত-শুদ্ধির স্থূল লক্ষণ, ঈশ্বরে ভক্তি, মনুষ্যে প্রীতি এবং হৃদয়ে শান্তি। ইহাই হিন্দুধর্ম্মের মর্ম্ম কথা।

ভক্তি, প্রীতি, শান্তি লক্ষণাক্রান্ত এই চিত্ত-শুদ্ধি হিন্দু শাস্ত্রকারেরা কিরূপে বুঝাইয়াছেন, তাহার উদাহরণ স্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবত তৃতীয় স্কন্ধ হইতে নিম্নলিখিত ভগবদুক্তি উদ্ধৃত করিতেছি।

লক্ষণং ভক্তি যোগস্য নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতং
অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে। ১০।

সালোক্যসার্ষ্টিসামীপ্যঃসারূপ্যৈকত্বমপ্যুত
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎ সেবনং জনাঃ। ১১।
স এব ভক্তিযোগাখ্য আত্যন্তিক-উদাহৃতঃ
যেনাতিব্রজ্য ত্রিগুণান্‌ মদ্ভাবায়োপ পদ্যতে। ১২।
নিষেবিতানিমিত্তেন সধর্ম্মেণ মহীয়সা
ক্রিয়া যোগেন শস্তেন নাতিহিংস্রেন নিত্যশঃ। ১৩।
মদ্ধিষ্ণ্যদর্শনস্পর্শপূজাস্তুত্যভিবন্দনৈঃ
ভূতেষু মদ্ভাবনয়া সত্ত্বেনা সঙ্গমেন চ
মহতাং বহুমানেন দীনানামনুকম্পয়া
মৈত্র্যা চৈবাত্মতুল্যেষু যমেন নিয়মেন চ।
আধ্যাত্মিকানুশ্রবণান্নাম সংকীর্ত্তনাচ্চ মে
আর্জ্জবেনার্য্য-সঙ্গেন নিরহং ক্রিয়য়া তথা। ১৪।
মদ্ধর্ম্মণো গুণৈরেতৈঃ পরিসংশুদ্ধ আশয়ঃ
পুরুষস্যাঞ্জসাভ্যেতি শ্রুতমাত্র গুণং হি মাং। ১৫।
যথা বাতরথো ঘ্রাণমাবৃঙ্‌ক্তে গন্ধ আশয়াৎ
এবং যোগরতং চেত আত্মানমবিকারি যৎ। ১৬।
অহং সর্ব্বেষু ভূতেষু ভূতাত্মাবস্থিত সদা
তমবজ্ঞায় মাং মর্ত্ত্যং কুরুতেঽর্চ্চা বিড়ম্বনং। ১৭।
যো মাং সর্ব্বেষু ভূতেষু সন্তমাত্মানমীশ্বরং
হিত্বার্চ্চাং ভজতে মৌঢ্যাদ্ভস্মন্যেব জুহোতি সঃ
দ্বিষতঃ পরকায়ে মাং মানিনো ভিন্ন দর্শিনঃ
ভূতেষু বদ্ধবৈরস্য ন মনঃ শান্তিমৃচ্ছতি। ১৮।
অহমুচ্চাবচৈর্দ্রব্যৈঃ ক্রিয়য়োৎপন্নয়ানঘে
নৈবতুষ্যেঽর্চ্চিতোঽর্চ্চয়াং ভূতগ্রামাবমানিনঃ। ১৯।

(ক্রমশঃ)

শ্রীবলাইচাঁদ মল্লিক

বিজ্ঞান, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য।

মহিশুর প্রদেশে বিদুর অশ্বথ নামক একটি অতি প্রাচীন অশ্বথ বৃক্ষ আছে। প্রবাদ এই যে উহা "বিদুর" দ্বারা রোপিত। জনসাধারণে এ বৃক্ষটীকে অত্যন্ত ভক্তি করে। বৃক্ষটি চারিধারে প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত, এবং উহার সংলগ্ন কতকগুলি ছোট ছোট প্রকোট আছে। ভিন্ন ভিন্ন দেশ হইতে নানাবিধ রোগাক্রান্ত ব্যক্তি সকল রোগ সারিবার জন্য বৃক্ষের তলায় আসিয়া বসিয়া থাকে। পরে নিদ্রাবেশে আপনাপন রোগের নিগূঢ় তত্ত্ব ও তাহার ঔষধ স্বপ্নাবস্থায় জানিতে পারে। কদাচিৎ এক একজন নিজের রোগ অসাধ্য বলিয়াও জানিতে পারে। এক্ষণে প্রশ্ন এই যে, কোন শক্তির ক্রিয়ায় রোগ আরোগ্য হয়।

মৃত Myers সাহেব তাঁহার জগদ্বিখ্যাত Human Personality নামক পুস্তকে এই প্রকারের কতকগুলি ঘটনা উদ্ধৃত করিয়াছেন। তন্মধ্যে Lourdes নামক ফরাসী পল্লীগ্রামে স্থিত Virgin Mary'র একটী মন্দিরে যাইয়া কিরূপে অসংখ্য মানব অদ্ভুতভাবে রোগমুক্ত হইতেছে তাহার বর্ণনা আছে।

আমাদের ৺শ্রীতারকেশ্বরের মন্দিরের কথা সকলেই জানেন। আমরা জানি অনেকেই ঐ পীঠস্থানে গিয়া অলৌকিক উপায়ে রোগমুক্ত হইয়াছেন। এক্ষণে এই প্রকার রোগমুক্তির কারণ কি? তৎ সম্বন্ধে মতগুলি বিবেচনা করা উচিৎ। শিক্ষিত ভ্রাতারা এই প্রকার ঘটনা গুলিকে উড়াইতে পারিলে ছাড়েন না; কিন্তু একেবারে না পারিলে বলেন যে ইহা মানব কল্পনা প্রসূত শক্তি বিশেষের কার্য্য। ইহাতে অলৌকিকত্ব কিছুমাত্র নাই। Myer সাহেবের মতে জাগ্রত প্রজ্ঞার বহির্ভূত পরাক্রমশালী অদ্ভুতশক্তি আছে,—ইহার নাম Subliminal Self. হিন্দুমতে ইহার নাম অন্তপ্রজ্ঞ চৈতন্য। জাগ্রত চৈতন্য বদ্ধ, কিন্তু অন্তপ্রজ্ঞ চৈতন্য Myer সাহেবের মতে ঐশ্বরিক শক্তি বিশিষ্ট। তাঁহার মতে mesmerism দ্বারা প্রকটিত এই আত্মার শক্তির সাহায্যে রোগের শান্তি হয়, ও এই চৈতন্যের সাহায্যেই দূরদৃষ্টি, দূরশ্রবণ, প্রভৃতি অদ্ভুত ক্রিয়া হয়। এমতে কতকটা সত্য আছে বটে, কিন্তু ইহাই যে একমাত্র কারণ তাহা বলা যায় না। আমাদের দেশের বিদ্বনমণ্ডলী এই তত্ত্বটা অনুসন্ধান করিতে চেষ্টাবান হইবেন কি?

সমালোচনা।

"আর্য্যধর্ম্ম গ্রন্থাবলীর" ১ম খণ্ডে প্রকাশিত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাখানি দেখিয়া আমরা বড়ই আনন্দিত হইয়াছি। ইহার প্রণয়নকর্ত্তা শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ইহাতে শ্রীধর টীকা ও তদনুসরণে অন্বয় সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন এবং তাহার সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ দিয়াছেন। পুস্তকখানি মেটকাফ প্রেসে মুদ্রিত ও সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয় হইতে প্রকাশিত। ইহার মুদ্রাঙ্কন উত্তম কাগজে বিশুদ্ধ ও সুচারুরূপে সম্পাদিত হইয়াছে। অনুবাদ বেশ প্রাঞ্জল ও প্রসাদগুণ বিশিষ্ট; ব্যাখ্যাও মূলের অনুযায়ী হইয়াছে। মূল্য পাঁচ আনা মাত্র। গীতার ঈদৃশ সুলভ ও সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর সংস্করণ, সকলের নিকটেই যে সমাদৃত হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।
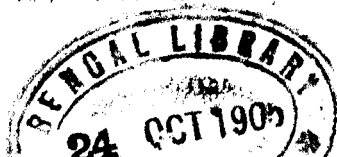
নবম ভাগ। { শ্রাবণ ১৩১২ সাল } ৪র্থ সংখ্যা।

ভিক্ষা।

দয়াময়, এই ভিক্ষা মাগি শ্রীচরণে,
ব্যথা যেন নাহি দিই ভ্রমে কার' মনে ;
আপনার স্বার্থ তরে পর স্বার্থ নাশে
নীচ আশা যেন নাথ এ চিতে না আসে।
যে দিন প্রগল্‌ভ বাক্যে পীড়িব কাহারে,
তার পূর্ব্বে মূক প্রভু, করিও আমারে।
ক্রূর আঁখি দিবে কারে যে দিন বেদন
সে দিন দেখিতে যেন না রয় নয়ন।
পর পরিবাদ যবে করিতে শ্রবণ
হবে সাধ তার পূর্ব্বে হরিও শ্রবণ।

এই কর' যেন নাথ, পরের বেদন
বারিতে করিতে পারি আত্মনিবেদন।
পরের নয়ন বারি মুছাতে যতনে,
নিত্য যেন চাহে চিত্ত, সজল নয়নে।
অপরে করিতে দান আপন আহার
যেন নিত্য উপবাস হয় গো আমার ;
তব নাম প্রেমময়, পূত সুধাধার
পানে যেন ক্ষুধা শান্তি হয় অনিবার।
যতদিন দীননাথ, তোমারে না পাই,
ততদিন যেন নাথ কাঁদিবারে পাই।
বৃথা সুখ দিয়ে দেব, ভুলায়ো না মোরে
মজাওনা ক্রীড়নক দিয়ে মোহ ঘোরে।
যতদিন তব পদে না হই বিলীন
ততদিন চিত্ত রয় পদ চিন্তালীন,
ততদিন বৈরাগ্যের অবিচ্ছিন্ন তান
জাগাইয়া রাখে যেন মোহমুগ্ধ প্রাণ।
যে ক'দিন কর্ম্ম তুমি করাইবে নাথ
সে ক'দিন এ সংসারে হয় যেন পাত
পরম পরার্থব্রত পালনে নিয়ত
রাখিয়া চঞ্চল চিত্ত শ্রীপদে সংযত।
না হয় কর্ম্মের শান্তি অনন্ত মরণে
যতকাল, এক ভিক্ষা মাগি গো চরণে।
এই কর' যেন প্রভু, যেই দিকে চাই
সেই দিকে তব সত্তা দেখিবারে পাই॥

মহিম্ন স্তব।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

মহীপাদাঘাতাদ্‌ব্রজতি সহসা সংশয়পদং,
পদং বিষ্ণোর্ভ্রাম্যদ্‌ভুজপরিঘরুগ্ন-গ্রহগণম।
মুহুর্দ্যৌর্দৌস্থং যাত্যনিভৃতজটা তাড়িততটা
জগদ্রক্ষায়ৈ ত্বন্নটসি নমু বামৈব বিভুতা ॥ ১৬ ॥

সম্প্রতি জগৎ পালনে ঈশ্বরস্যাচিন্তনীয়ম্ বিভুত্বমালোচয়ন্ তস্যালৌকিকত্বং স্তৌতি।

মহিতি। মহী পৃথ্বীপাদাঘাতাৎ অজস্রং নৃত্যতস্তব চরণ তাড়নায়াঃ সহসা হঠাৎ সংশয়স্য পৃথ্বীয়ং অধঃপততি বেতি, সন্দেহস্য পদমাস্পদমবস্থামিতি যাবৎ ব্রজতি গচ্ছতি শূন্যমার্গে ভ্রমন্তী মুহুরধঃ পতনশঙ্কাং জনয়তীত্যর্থঃ। সহসেতি ব্রজতীতি ক্রিয়ায়াঃ বিশেষণম্। বেবেষ্টি ব্যাপ্নোতি বিশ্বসিতি বিষ্ণুঃ বিষধাতোর্নু প্রত্যয়ঃ তস্য, বিষ্ণোঃ সূর্য্যরূপস্য পদং ভ্রমণ স্থানমাকাশং, বিয়দ্বিষ্ণুপদং বাতু পুংস্যাকাশা বিহায়সীত্যমরঃ। ভ্রাম্যন্তৌ ভুজারেব পরিঘৌ অয়োমুদ্গরৌ তাভ্যাং রুগ্নাস্তাড়িতাঃ গ্রহগণাঃ যস্মিন তৎ তথাভূতং ভবতীতি শেষঃ। ভুবর্লোকেঽপি গ্রহগণাঃ পুনঃ পুঘূর্ণ্যমান বাহুতাড়নেনাজস্রং ক্লিষ্টা বিনাশশঙ্কাং জনয়তীত্যর্থঃ। দ্যোঃ স্বর্লোকঃ অনিয়তা অসংযতা, অবদ্ধতয়া, ভৈরবনৃত্যবেগবশাৎ পুনঃ পুনরূর্দ্ধাধঃ প্রসৃতা ইত্যর্থঃ, যা জটা স্তাভিঃ তাড়িতানি আহতানি তটানি যস্যাঃ সা তথোক্তা সতী, মুহুঃ পুনঃ পুনঃ দ্যৌস্থং দুরবস্থাং যাতি প্রাপ্নোতি, স্বর্গলোকোঽপি জটাভিস্তাড়িতশ্চঞ্চলতাং ব্রজতীত্যর্থঃ। ইত্থং তব নর্ত্তনেন সমস্তমেব ব্রহ্মাণ্ডং বিলয়ং জাতি তঞ্চ নৃত্যসি, নচাদ্যাপি নৃত্যাদ্ বিরমসীত্যস্মাকং মহদাশঙ্কা স্থানং ভবসীতি ভাবঃ। বস্তুতস্তু ত্বং ন তথেত্যাহ। জগদিতি ত্বং জগতাং রক্ষায়ৈ রক্ষার্থমেব নতু বিনাশায় নটসি নৃত্যতি। রক্ষার্থমেব স্বকীয় নর্ত্তনেন ব্রহ্মাণ্ডমেবং নর্ত্তয়সীতি ভাবঃ। "তদৈব চেষ্টতে লোকো যদা জাগর্ত্তি শঙ্করঃ। যদা স্বপিতি বিশ্বাত্মা তদা সর্ব্ব প্রলীয়ত" ইতি "শিবনিদ্রায়ৈব জগৎ সর্ব্বং প্রলীয়তে তৎক্রীড়ায়াচ ক্রীড়তী'' ইতি শাস্ত্র বচনাৎ

তব নর্ত্তনেনৈব জগৎসর্ব্বং নৃত্যতি সচেষ্টঞ্চবর্ত্ততে ইতি তেন নাস্য বিনাশ ইতি কবেরভিপ্রায়ঃ। অতএবাহঃ নন্বিতি। ননু ভো দেব তে বিভুতা বিশ্বপালন মহিমা বামৈব বিপরীত বৃত্তিরেব। ইহ কশ্চিল্লোকঃ কিঞ্চিদ্বস্তু রক্ষিতুং তৎ কুত্রচিন্নিভৃতে স্থিরমনাহতঞ্চ যথা স্যাৎ তথা স্থাপয়তি ত্বং পুন রক্ষনীয়বস্তু স্বয়মেব সর্ব্বৈরবয়বৈরজস্রং তাড়য়সীত্যদ্ভুতং তে বিভুত্বমিতি ভাবঃ। ১৬।

অত্র সর্ব্বত্র প্রৌঢ়োক্ত্যা সাকার বদ্‌বর্ণিতস্যাপি নিরাকারত্বে কবেরভি-প্রায়োহনুসন্ধেয়ঃ মূর্ত্তস্যেবতস্য করচরণাদের্দর্শনাভাবাৎ। স চাভিপ্রায়ঃ বিষদ্ব্যাপীত্যাদৌ পরস্মিন্ শ্লোকে স্পষ্টীকৃতঃ।

নিরাকার পক্ষেহপি অস্মাকমিব অধোমধ্যোর্দ্ধ ক্রমেণ ব্রহ্মণশ্চরণবাহু শিরঃ স্থানানি কল্পিতানীতি পৃথ্ব্যাং পাদাঘাতঃ, আকাশে করাঘাতঃ দিবিচ জটাঘাতো বর্ণিতঃ। নচৈষোহভিনবক্রমঃ শাস্ত্রকারাণাম। "সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ। সভূমিং বিশ্বতোবৃত্বাহত্য তিষ্ঠদ্দশাঙ্গুল" মিত্যাদেঃ শ্রুতাবপি দর্শনাৎ।

সাকার পক্ষেহপি "ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদ" মিত্যাদের্দর্শনাৎ বিষ্ণুরূপস্য সূর্য্যনারায়ণস্য পাদৈরধঃ প্রসৃতৈ রসাতলাক্রমণং করৈর্মধ্য প্রসৃতৈরাকাশাক্রমণং কেশৈরূর্দ্ধ প্রসৃতৈঃ স্বর্গাক্রমণং ; তেন চ ভুবনানাং স্থাবর-জঙ্গমাত্মকানাং, সমুৎপাদনং, সঞ্চারণং, সংরক্ষণং, জীবানাং, সঞ্জীবনং, বুদ্ধ্যাদে-রপিস্কারণং, শাস্ত্র সিদ্ধং গায়ত্র্যামপি তথা প্রতিপাদিতত্বাৎ ইতি সুধীভি-রনুসন্ধেয়ম। ১৬।

মানবাকার মহাদেব পক্ষেতু তস্যৈকদাচিদেবং নর্ত্তনং; পুরানাদিষু দৃশ্যতে সতু নান্যাঃ স্তুতের্বিষয়ঃ অতীত ক্রিয়াবোধকত্বাৎ। অত্রতু শ্লোকে ব্রজতি যাতি নটসীত্যাদীনাং বর্ত্তমানপ্রয়োগঃ বর্ত্তমানতাচ তস্যক্রিয়া সূচনার্থেতি বোদ্ধব্যং। নচ কথাদিবদতীতে বর্ত্তমানপ্রয়োগ ইতি বাচ্যম্ ঈশ্বরস্য জগৎপালন বিভুতস্য সার্ব্বকালিকত্বাৎ।

এক্ষণে জগৎপরিরক্ষণে ঈশ্বরের অন্তিনীয় বিভুত্ব চিন্তা করিয়া স্তব করিতেছেন।

হে বিভো, তুমি যে অনবরত নৃত্য করিতেছ, তদ্ধেতুক তোমার চরণ

তাড়নায় পৃথিবী মুহুর্মুহুঃ সংশয়দশা প্রাপ্ত হইতেছে; তোমার পুনঃ পুনঃ উৎক্ষিপ্ত ও ঘূর্ণিত ভুজ পরিঘের তাড়নায় আকাশে গ্রহগণ যেন পরস্পর আহত সংঘৃষ্ট ও ছিন্ন ভিন্ন হইয়া বিলয় প্রাপ্ত হয় এরূপ শঙ্কা হইতেছে; এবং তোমার উর্দ্ধ প্রসৃত বিমুক্ত জটাসংঘের সংঘর্ষণে স্বর্গ মুহুর্মুহুঃ কম্পিত ও বিচলিত হইয়া যেন রসাতলেরও অধস্তলে যাইবার উপক্রম করিতেছে। অহো তোমার এই নৃত্যই জগতের রক্ষার নিমিত্ত * কিন্তু হে বিভো আমাদের নিকট ইহার বিপরীতই প্রতীয়মান হয়। অতএব তোমার চেষ্টা লৌকিকের বিপরীত। + মূর্ত্তের ক্রিয়ার ন্যায় ঈশ্বরের ক্রিয়া বর্ণনা না করিলে সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম হয় না এই জন্যই নর্ত্তন ও করচরণাদির বর্ণনা হইয়াছে। বস্তুতঃ মূর্ত্তবৎ করচরণাদি থাকিলে দেখা যাইত।

সাকার পক্ষে এই মূর্ত্তিমান্ দেব মহাদেবের অষ্ট মুর্ত্তির অন্যতম মূর্ত্তি সূর্য্যনারায়ণ হইতে পারে। কারণ দেখা যায় যে ঐ মূর্ত্তিতেই মহাদেব বামন মূর্ত্তি হইয়া ত্রিধা পদ বিক্ষেপ করিয়া জগৎ রক্ষা করিতেছেন "ইদং বিষ্ণু-বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদং।" এদিকে পদ, কর ও জটা এই তিন শব্দই কিরণ অর্থে প্রযুক্ত হয়। তন্মধ্যে পৃথিবীতে কিরণরূপে যে শক্তি প্রয়োগ করিতেছেন তাহাকে আমাদিগের উর্দ্ধাধঃ মধ্য বিষয়িণী বুদ্ধি অনুসারে নিম্নস্থ বলিয়া চরণ, গ্রহ নক্ষত্রাদিস্থান আকাশে যে সকল শক্তি প্রয়োগ করিতেছেন তাহাকে কর, ও তদূর্দ্ধে অলক্ষ্য স্বর্গ নামকস্থানে যে সকল শক্তি প্রয়োগ করিতেছেন তাহাকে তাঁহার জটা বলিতে পারি। এই সূর্য্য হইতেই যে এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক ত্রিভুবন উৎপাদিত সঞ্চারিত ও পরিরক্ষিত

---

* ঈশ্বরের জাগরণ ও চেষ্টাই জগতের জাগরণ ও চেষ্টার মূল। সেই মূলশক্তির পরিচালনেই সূর্য্য চন্দ্র নক্ষত্রাদি চরাচর সমস্ত বিশ্ব পরিচালিত হইয়া স্ব স্ব কার্য্য করিতেছে। তাহার বিশ্রামে সকলেই বিশ্রান্ত ও বিলীন হইয়া যাইবে। এ সকল আর কিছুই থাকিবে না।

+ আমরা কোনও বস্তুকে বিনাশ হইতে রক্ষা করিতে হইলে ঐ বস্তুতে কোনও শক্তিপ্রয়োগে আঘাতাদি না লাগিতে পারে এজন্য উহাকে নিভৃতে স্থির রাখিতে চেষ্টা করি, কিন্তু ঈশ্বর রক্ষার্থ রক্ষনীয় বস্তুতে নিরন্তর শক্তি প্রয়োগ করিয়া তাড়না করেন, এজন্য তাহার চেষ্টা লৌকিকের বিপরীত।

হইতেছে এবং উদ্ভিজ, স্বেদজ, অণ্ডজ জরায়ুজ প্রভৃতি জীবগণের জীবন ও বুদ্ধির স্ফুরণ হইতেছে তাহা যুক্তি ও শাস্ত্র সিদ্ধ এবং বেদমূলক গায়ত্রী দ্বারাও প্রতিপাদিত হইয়াছে। অতএব সাকার পক্ষে অন্ততঃ এইরূপ অর্থও গ্রহণ করা যুক্তি সিদ্ধ হইতে পারে। কিন্তু কবি এস্থলে মহাবিষ্ণু রূপ লক্ষ্য করিয়াই স্তব করিতেছেন তাহা পর শ্লোকে দেখা যাইতেছে। সাকার পক্ষে এস্থলে পুরাণাদি বর্ণিত মহাদেবের নর্ত্তন সাধারণে যেরূপ অর্থে গ্রহণ করিয়া থাকেন, সেরূপ অর্থে কোন ক্রমেই স্বীকার করিতে পারা যায় না। কেন না ঐ নর্ত্তন কোনও সময় বিশেষে হইয়াছে এরূপ বর্ণিত থাকায় তাহার অতীতত্বই প্রতীয়মান হয়, আকল্প স্থায়িত্ব প্রতীত হয় না। কিন্তু এস্থলে ঐরূপ নর্ত্তনে জগৎ রক্ষা হইতেছে বলায় তাহার আকল্প বর্ত্তমানতা বুঝাইতেছে। তিনি যেরূপ ইতি পূর্ব্বে নৃত্য করিয়াছেন; সেইরূপ এখনও করিতেছেন এবং ভবিষ্যতেও যাবৎ জগৎ তাবৎ এরূপ নৃত্য করিবেন এই শ্লোক দ্বারা সেই রূপই অর্থের প্রতীতি হইতেছে, অতীতার্থ বুঝাইতেছে না। অতএব এই স্তুতির বিষয় সাধারণ গৃহীত পুরাণাদি বর্ণিত নর্ত্তন নহে। ফলতঃ বিভুর আকারে পরমেশ্বরকেই গ্রন্থকার স্বয়ং বর্ণনা করিতেছেন।

(ক্রমশঃ)

জ্যোতিঃ পথে। *

হে শিষ্য, চাহ কি পথে আলোক দেখিতে,
এই উপদেশ তবে শুন বিধিমতে।
দেখিতে বাসনা যদি—কর তার আগে
নয়ন আসারহীন; শুনিতে বাসনা
কর যদি,—ত্যজ তবে আশক্তি শ্রবণে।
চাহে যদি বাক্য তব গুরুর সকাশে
করিবারে নিবেদন, তবে যেন তার

---

* মেবেল কলিন্স লিখিত Light on the Path এর কিয়দংশ বাঙ্গালায় অনুবাদিত।

নাহি থা'ক শক্তি আর অন্যে ব্যাথা দিতে।
আত্মা তব চাবে যদি শক্তি, দাঁড়াইতে
গুরুদেব সম্মুখেতে,—কর তার আগে
হৃদয় শোণিতে তার চরণ ক্ষালন।
(১) পরিহর উচ্চ আশা ; (২) প্রাণের মমতা
কর দূর ; (৩) ত্যাগ কর সুখের বাসনা ;
(৪) কর কর্ম্ম—করে লোকে উচ্চাশার মোহে
যেইরূপে ; কর আর প্রাণের মমতা
করে যথা প্রাণে মায়া যার, হ'য়ো সুখী—
তার মত—যার সুখ উদ্দেশ্য জীবনে।
অন্তরেতে পাপ বীজ করহ সন্ধান
কর তার পরিহার। নতুবা তা হবে
ফলবান—নিষ্ঠাবান শিষ্যের অন্তরে—
কামীর হৃদয়ে যথা। সুধু শক্তি মানে
পারে তারে নাশিবারে ; হীন গতি জনে
অপেক্ষা করিতে হয়,—বর্দ্ধন ফলন
পরে তাহার মরণ। পাপ তরু এই—
বর্দ্ধিত হইতে থাকে কত যুগ ধরি।
অসংখ্য জন্মের কর্ম্ম করিলে সঞ্চিত
তবে ইহা মানবেতে হয় কুসুমিত।
যাহারা সিদ্ধির পথ করে অন্বেষণ,—
অবশ্য তাদের হবে করিতে ইহারে
একেবারে উৎপাটিত অন্তর হইতে।
হৃদয় বিদীর্ণ হবে,—জীবন তখন
বোধ হবে যেন শূন্যে যেতেছে মিলায়ে।
কঠোর পরীক্ষা এই,—হইবে সহিতে।
অমৃতের পথে যেতে প্রথম সোপানে
হয়ত পরীক্ষা এই হবে উপস্থিত,—

হয়ত আসিতে পারে শেষে একেবারে।
কিন্তু ওহে শিষ্য! তুমি রাখিও স্মরণে
নিশ্চয় তোমাকে ইহা হইবে সহিতে।
এই ব্রত তরে তবে কর কেন্দ্রীভূত
তোমার আত্মার শক্তি
তোমার জীবন
নহে বর্ত্তমান কিম্বা ভবিষ্যত কালে ;
অমৃত তোমার ধাম। নাহি হয় কভু
বিশাল কুবৃক্ষ এই পুষ্পিতে সেথায়।
মুছে যায় অস্তিত্বের এই যে কালিমা
অনন্ত জ্ঞানের বাক্য যবে হয় লাভ।

৫। পরিহর ভেদ বুদ্ধি ;

৬। বিষয় ভোগের
বাসনা বিনাশ কর ;

৭। বাড়িবার তৃষ্ণা
কর ত্যাগ।

৮। সুধু একা অসঙ্গ হইয়া
কর অবস্থান তুমি ; জানিও নিশ্চয়,—
শরীরী যাহারা—যারা ভেদ বুদ্ধি যুত,—
কিম্বা যারা নিত্য হতে হয়েছে প্রচ্যুত,
নারিবে করিতে তারা সাহায্য তোমার।
বিষয় সংস্পর্শজাত বেদনা সকল,
করি আলোচনা লভ শিক্ষা তাহা হতে,
সুধু এইরূপে হয় আরম্ভ করিতে
আত্ম তত্ত্ব জ্ঞান শিক্ষা ; জেন এইরূপে
প্রথম সোপানে তার হয় পদার্পণ।
পুষ্পের বিকাশ মত হও বিকশিত
অজ্ঞাতে আপন ; থাকে যেমন তাহার

উৎকট বাসনা উপ্ত, মুক্তবায়ু ক্রোড়ে
আপনাকে প্রস্ফুটিত করিবার তরে।
তুমি সেইরূপে সদা হও অগ্রসর
অনন্তের পানে, আত্মবিকাশের তরে।
যেন সেই অনন্তের আকর্ষণ হতে,
আপন সৌন্দর্য্য আর শকতি তোমার
স্বতঃ হয় বিকাশিত। বিকাশ-বাসনা
যেন নাহি করে কভু বিকাশ তাহার।
স্বতঃ বিকাশের ফলে হবে অগ্রসর
নির্ম্মল অন্তর হয়ে। কিন্তু অন্যরূপে,
আত্ম-উন্নতির তীব্র বাসনার বলে,
নীরস করিয়া দিবে অন্তর তোমার।

(ক্রমশঃ)

শ্রীদেবেন্দ্র বিজয় বসু।

সনাতন ধর্ম্ম।

চতুর্থ প্রস্তাব।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

অনেক।

গীতা বলিতেছেন—অব্যক্তাদ্ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে।
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে।
ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে।
রাত্র্যাগমেঽবশঃ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে॥
পরস্তস্মাত্তু ভাবোঽন্যোঽব্যক্তোঽব্যক্তাৎ সনাতনঃ।
যঃ স সর্ব্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি॥
অব্যক্তোঽক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিং॥”

"দিবস আগমে অব্যক্ত হইতে
ব্যক্ত হয় সমুদায়।
রাত্রি আগমনে অব্যক্তেতে পুন
চরাচর লয় পায়॥
পুনঃ পুনঃ হেন ভূতগ্রাম দেখ
নিশায় প্রলীন হয়।
অবশের মত দিবসে আবার
প্রকাশিছে সুনিশ্চয়॥
ইহার অতীত সনাতন ভাব
অব্যক্ত বলিয়া জান।
সর্ব্বভূত নাশে নাশ নাহি তার
স্থির বলি মনে মান॥
অব্যক্ত অক্ষর পণ্ডিতেরা তাঁরে
বলিছেন নিরন্তর।
তিনিই পরম গতি সুনিশ্চয়
তিনি দেব বিশ্বেশ্বর॥"

উল্লিখিত শ্লোক গুলিতে সেই এক অব্যক্ত হইতে বহু বা বিশ্বের বিকাশ বর্ণিত হইয়াছে। দিবাগমে মূলপ্রকৃতি হইতে সমুদায় প্রসূত হয়, ইহা মনুস্মৃতিতে লিখিত আছে। দিবাপগমে যখন প্রলয় রজনী আগমন করিতে থাকে তখন আবার এই বহু-বিকাশ মূলপ্রকৃতিতে লীন হয়। পুনঃ পুনঃ এইরূপ ঘটিতেছে। কারণ অনন্তকাল সৃষ্টি ও প্রলয় হইয়া আসিতেছে। সেই প্রকৃতির পশ্চাতে অবশ্যই একজন অব্যক্ত দেব বা অক্ষর ব্রহ্ম আছেন।

জ্ঞানী যখন "ভূতপৃথগ্‌ভাবমেকস্থমনুপশ্যতি। ততএব চ বিস্তারং॥"

এইস্থলে আমরা বিকাশের ক্রম বিচার করিব। ইহাকে শাস্ত্রে সর্গ বলে। সনাতনধর্ম্মের সৃষ্টিপ্রকরণ অবৈজ্ঞানিক নহে। ইহাতে আদৌ কিছুই ছিল না, তাহা হইতে জগত সৃষ্ট হইল বলা হয় নাই। সনাতনধর্ম্মে সৃষ্টি ক্রমবিকাশরীতিতে হইয়াছে বলিয়া বর্ণিত।

"যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্নতে চ,
যথা পৃথিব্যামোষধয়ঃ সম্ভবন্তি।
যথা সতঃ পুরুষাৎকেশলোমানি
তথাক্ষরাৎসম্ভবন্তীহ বিশ্বম॥ মুণ্ডকোপনিষৎ ১।১।৭

যেমন উর্ণনাভি আপন দেহ হইলে সূত্র ক্ষেপন দ্বারা জাল প্রস্তুত করে, এবং প্রয়োজন সিদ্ধ হইলে আবার স্বীয় শরীরে গ্রহণ করে। যেমন পৃথিবীদেহে ওষধিসমূহ জন্মে; যেমন পুরুষদেহে কেশ লোমাদির উৎপত্তি হয়, এই বিশ্বও সেইরূপ অক্ষর হইতে উৎপন্ন।

"যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাৎ বিস্ফুলিঙ্গাঃ
সহস্রশঃ প্রভবন্তে স্বরূপাঃ।
তথাক্ষরাদ্বিবিধাঃ সৌম্যভাবাঃ
প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপিয়ন্তি॥"

* * * *

এতস্মাজ্জায়তে প্রাণোমনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়ানি চ।
খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবীবিশ্বস্যধারিনী॥

* * * *

তস্মাচ্চ দেবা বহুধা সম্প্রসূতাঃ
সাধ্যা মনুষ্যাঃ পশবো বয়াংসি।"

যেরূপ সুদীপ্ত পাবক হইতে সহস্র পাবকধর্ম্মধৃৎ বিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হয় হে সৌম্য! সেইরূপ সেই অক্ষর হইতে বিবিধ ভাবের (সত্বার) আবির্ভাব হয়, আবার তাহা তাহাতেই বিলীন হয়।

তাহা হইতে প্রাণ, মন ও ইন্দ্রিয়গ্রাম আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও বিশ্বধারিনী পৃথিবীর উৎপন্ন হইয়াছে।

তাঁহা হইল দেবতা, সাধ্য, মানব, পশু, পক্ষী বহুধা সম্প্রসূত হইয়াছে।

মনুস্মৃতিতে এই বিকাশ ক্রম সবিস্তারে বর্ণিত আছে। তথায় সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা হইতে এতৎ সমুদায়ের উৎপত্তি কীর্ত্তিত আছে। ব্রহ্মাণ্ড অসংখ্য এই কথা শাস্ত্রের নানাস্থানে বর্ণিত আছে। যথা আর্থর্ব্বণ মহানারায়ণে :——

"অস্য ব্রহ্মাণ্ডস্য সমন্ততঃ স্থিতান্যেতাদৃশান্যনন্তকোটিব্রহ্মাণ্ডানি সাবরনানি

জলন্তি। চতুর্মুখপঞ্চমুখষন্মুখসপ্তমুখাষ্টমুখাদিসংখ্যাক্রমেণ সহস্রাবধিমুখান্তৈর্নারায়ণাংশৈ রজোগুণপ্রধানৈ রেকৈকসৃষ্টিকর্তৃভিরধিষ্ঠিতানি বিষ্ণুমহেশ্বরাখ্যৈর্নারায়ণাংশৈ সত্ত্বতমোগুণপ্রধানরেকৈকস্থিতিসংহার কর্তৃভিরধিষ্ঠিতানি মহাজাল মৎস্যবুদ্বুদানন্তসঙ্ঘবৎ ভ্রমন্তি ॥"

"এই ব্রহ্মাণ্ডের চারিদিকে এইরূপ অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড সাবরণে বিভাত হইতেছে। চতুর্মুখ, পঞ্চমুখ ষন্মুখ, সপ্তমুখ, অষ্টমুখাদি সহস্রমুখ পর্য্যন্ত অনন্ত কোটি সৃষ্টিকর্ত্তা নারায়ণের রজোপ্রধানগুণ দ্বারা ভূষিত হইয়া সেই সমুদায় ব্রহ্মাণ্ডের অধিষ্ঠাতৃরূপে অবস্থান করিতেছেন। নারায়ণের সত্ত্ব ও তমোগুণ প্রধান অংশ বিষ্ণু ও মহেশ্বরগণ সেই সমুদায় ব্রহ্মাণ্ডের স্থিতি ও সংহার কার্য্য সাধন করিতেছেন। এই সমুদায় ব্রহ্মাণ্ড মহাজলধিস্থিত মৎস্যবুদ্বুদাদির ন্যায় নিরন্তর ভ্রমণ করিতেছে।

দেবী ভাগবতে লিখিত আছে—

"সংখ্যা চেৎ রজসামপ্তি বিশ্বানাং ন কদাচন।
ব্রহ্মবিষ্ণু শিবাদীনাং তথা সংখ্যা ন বিদ্যতে ॥
প্রতিবিশ্বেষু সন্ত্যেব ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদয়ঃ ॥

এ পৃথীবীর ধুলিকণারও সংখ্যা করা সম্ভব, কিন্তু ব্রহ্মাণ্ড সংখ্যা নির্ণয় করা কদাচ সম্ভবপর নয়। সেইরূপ ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিবগণের সংখ্যা নির্ণয় করা অসম্ভব। প্রতিবিশ্বে সতন্ত্র ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিব আছেন।

এই রহস্য কেহ না বলিলেও সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে, একমাত্র ঈশ্বর জনার্দ্দন সৃষ্টি পালন ও লয় কার্য্যার্থ ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিব নামে কথিত হইয়া থাকেন। প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডেই সৃষ্টি প্রভৃতি কার্য্য নিরন্তর সংঘটিত হইতেছে অতএব প্রতিবিশ্বেই ঈশ্বর এই ত্রিমূর্ত্তিতে বিরাজিত আছেন।

এই ত্রিমূর্ত্তিও সেই নির্গুণ ও সগুণ ব্রহ্মের এবং মূলপ্রকৃতির দেশকালানুরূপ প্রতিবিম্ব বলিয়া বুঝিতে হইবেক। এই ত্রিমূর্ত্তি সেই ঈশ্বরের ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তির স্বরূপ বিকাশ।

ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্ত্তা, তাঁহার শক্তি সরস্বতী, তদ্ব্যতীত ক্রিয়াশক্তির পূর্ণস্ফুর্ত্তি অসম্ভব। ব্রহ্মা চতুর্মুখ তিনি চারিদিকে দৃষ্টি রাখিয়া সৃষ্টি কার্য্য সম্পন্ন

করিতেছেন। তাঁহার বাহন "হংস" উহা "সোঽহং" শব্দের রূপান্তর। অর্থাৎ ব্রহ্ম অহঙ্কার মূর্ত্তিধারী ও পরমাণুসমূহের বিকাশকারী।

বিষ্ণু রক্ষাকর্ত্তা। তিনি তাহার শক্তিবলে জগৎ ধারণ ও রক্ষণ করিতেছেন। তাঁহার শক্তি লক্ষ্মী ধনাধিষ্ঠাত্রী। বিষ্ণু চতুর্ভূজ; তিনি চারিভুজে চারিদিক রক্ষা করিতেছেন। তাঁহার বাহন গরুড় গতি ও জ্ঞানের প্রতিমূর্ত্তি। তিনি সমুদায় অবতারের নিদান। তিনি স্বমূর্ত্তিতেও সমুদায় অবতাররূপে ভারতের সর্ব্বত্র বহুল ভাবে পূজিত। তিনি নারায়ণরূপে সগুণ ব্রহ্ম ভাবে পূজিত হন।

শিব, মহাদেব বা মহেশ্বর সংহারকর্ত্তা। তিনি আত্মাকে বন্ধাবস্থা হইতে মুক্ত করেন। অবিদ্যার নাশ করিয়া বিদ্যা প্রদান করেন; এবং শেষ সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড সংগ্রহ পূর্ব্বক লয় করেন। তাঁহার শক্তির নাম উমা, ইচ্ছা বা ব্রহ্ম বিদ্যা।

শিব মহাযোগী এবং যাবতীয় যোগীগণের চিরপূজ্য; তিনি বৃষভ বাহন। বৃষভ মনের প্রতিচ্ছবি। তিনি তাহাকে বশীভূত করেন; এবং সমস্ত বাসনার নাশচিহ্ন স্বরূপ শার্দ্দূল চর্ম্ম তাহার পরিধেয়। এই জন্য তিনি শিব, মঙ্গলময়, আনন্দরূপ, আত্মার শান্তি ও আনন্দ দাতা এবং কামের বিনাশক ও মনের দমন কর্ত্তা।

কার্য্যভেদে একই ঈশ্বরের রূপভেদ। বস্তুত তিনি এক বই অনেক নহেন, তিনি ব্রহ্মাণ্ডের প্রাণশক্তি। তাঁহার সেই ত্রিবিধ শক্তি হইতে ত্রিবিধ কার্য্য হইতেছে এবং সৃজন, পালন ও লয় সম্পন্ন হইতেছে। এই শক্তিত্রয়ের পার্থক্য উপলব্ধি করিতে হইবে, অথচ শক্তিমানকে এক অখণ্ডরূপে বুঝিতে হইবেক।

কারণ সলিলে বিসর্জ্জিত পরমাত্মবীর্য্য হইতে স্বর্ণময় অণ্ড মধ্যে সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার উৎপত্তি হইয়াছিল।

"সোঽভিধ্যায় শরীরাৎ স্বাৎ সিসৃক্ষু বিবিধাঃ প্রজাঃ।
অপ এব সসর্জ্জাদৌ তাসু বীর্য্যমবাসৃজৎ॥
তদণ্ডমভবদ্বৈমং সহস্রাংশু সমপ্রভং।
তস্মিন জজ্ঞে স্বয়ংব্রহ্মা সর্ব্বলোক পিতামহ॥"

তিনি বিবিধপ্রজানিচয় সৃষ্টির ইচ্ছায় স্বশরীর হইতে অপের সৃষ্টি

করিলেন এবং তাহাতে সৃষ্টির উপাদান বীজ ক্ষেপন করিলেন। সেই বীর্য্য সহস্রাংশুসমপ্রভ হৈম অণ্ডে পরিণত হইল। সেই অণ্ডে সর্ব্বলোক পিতামহ ব্রহ্মা স্বয়ং উৎপন্ন হইলেন।

সেই কারণ সলিলকেই মুলপ্রকৃতি বলিতে হইবেক। তিনিই প্রাণ শক্তিরূপ বীর্য্য ধারণ পূর্ব্বক অণ্ডমধ্যে হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মাকে ধারণ করিয়াছিলেন। এই জন্য প্রত্যেক বিশ্বকে ব্রহ্মাণ্ড বলা হয়। কারণ প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডই অণ্ডাকার। আমরা বিষ্ণুপুরাণে দেখিতে পাই যে প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে ব্রহ্মা ও তাঁহার ব্রহ্মাণ্ডের সমুদায় গ্রহ নক্ষত্রাদি বর্ত্তমান আছে। তাহার উপরিভাগ সপ্ত আবরণে আবৃত। সেই সপ্ত আবরণ জল, তেজ, বায়ু প্রভৃতি।

প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডই যে সূক্ষ্ম উপাদান সপ্তকের আবরণে আবৃত তাহা মনুস্মৃতির প্রথম অধ্যায়ে বর্ণিত আছে। সৃষ্টিতত্ত্ব মহর্ষি ভৃগুকে বলা হয়, তিনিই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিব্যাপার বর্ণনা করেন। ঐরূপ সৃষ্টি তত্ত্ব মহাভারত ও বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতি পুরাণে বর্ণিত আছে।

সৃষ্টিতত্ত্ব সাধারণ ভাবে আয়ত্ত করিতে পারিলে, বহুবিধ ধর্ম্ম শাস্ত্র বর্ণিত জটিল রহস্য নিচয় সহজে আয়ত্ত করা যাইতে পারিবে। স্থূল ভাবে এই টুকু স্মরণ করিয়া রাখিলেই যথেষ্ট হইবেক যে সৃষ্টি মধ্যে বহু ব্রহ্মাণ্ড আছে। সকল ব্রহ্মাণ্ডেরই উৎপত্তি প্রভৃতির ক্রম এক প্রকার।

দেবী ভাগবত মধ্যে সৃষ্টি প্রকরণের একটি সুন্দর বিবরণ আছে উহা পাঠ করিলে, সৃষ্টিতত্ত্বের ক্রম সহজে উপলব্ধি হইবেক, এই জন্য তাহা এস্থলে উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

"স পুনঃ কামকর্ম্মাদিযুক্তয়া স্বীয়মায়য়া।
পূর্ব্বানুভূতসংস্কারাৎ কালকর্ম্মবিপাকতঃ॥
অবিবেকাচ্চ তত্ত্বস্য সিসৃক্ষাবান্ প্রজায়তে।
অবুদ্ধিপূর্ব্ব সর্গোঽয়ং কথিতস্তে নাগাধিপঃ।
এতদ্ধি যৎময়া প্রোক্তং মম রূপমলৌকিকং।
অব্যাকৃতং তদব্যক্তং মায়াশবলমিত্যপি॥
প্রোচ্যতে সর্ব্বশাস্ত্রেষু সর্ব্বকারণ কারণং।
তত্ত্বানামাদিভূতং চ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহং॥

সর্ব্বকর্ম্ম ঘণীভূতং ইচ্ছাজ্ঞানক্রিয়াশ্রয়ং।
হ্রীঙ্কার মন্ত্রবাচ্যং তৎ আদিতত্ত্বং তদুচ্যতে॥
তস্মাদাকাশ উৎপন্নঃ শব্দতন্মাত্ররূপকঃ।
ভবেৎ স্পর্শাত্মকো বায়ুস্তেজোরূপাত্মকং পুনঃ॥
জলং রসাত্মকং পশ্চাৎ ততো গন্ধাত্মিকা ধরাঃ।

* * * *

তেভ্যোঽভবৎ মহৎসূত্রং যল্লিঙ্গং পরিচক্ষতে॥
সর্ব্বাত্মকং তৎ সংপ্রোক্তং সূক্ষ্মদেহোঽয়মাত্মনঃ।
অব্যক্তং কারণো দেহঃ স চোক্তঃ পূর্ব্বমেবহি॥
যস্মিন্ জগৎ বীজরূপং স্থিতং লিঙ্গেস্তি বো যতঃ।
ততঃ স্থূলানি ভূতানি পঞ্চীকরণমার্গতঃ॥

* * * *

তৎ কার্য্যং চ বিরাট দেহঃ স্থূলদেহোঽয়মাত্মনঃ॥

তিনি নিজ মায়া এবং কাম ও কর্ম্মের সহিত যুক্ত হইয়া পূর্ব্বানুভূত সংস্কারবশে কাল ও কর্ম্ম বিপাকের অনুবর্ত্তী হইয়া এবং তত্ত্ব সমুহের অবিবেক বশতঃ সৃষ্টির অভিলাষী হইলেন। হে নাগাধিপ! এই যে সৃষ্টি ইহাই অবুদ্ধিপূর্ব্ব বলিয়া জানিবে। ইহা আমার অলৌকিক রূপ; ইহাকে আমি অব্যাকৃত অব্যক্ত ও মায়াশবল বলিয়াছি। সর্ব্ব শাস্ত্রেই ইহাকে সর্ব্ব-কারণ কারণ বলা হইয়াছে। ইহাই তত্ত্বসমুহের আদিভূত ও সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ বলিয়া জানিবে। ইহা সর্ব্বজ্ঞানের ঘনীভূত ইচ্ছা জ্ঞান ও ক্রিয়াত্রয়। ইহা হ্রীঁ মন্ত্রবাচ্য এবং আদিতত্ত্ব বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।

ইহা হইতে শব্দ তন্মাত্রাত্মক আকাশতত্ত্বের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা হইতে স্পর্শতন্মাত্রাত্মক বায়ুতত্ত্ব, বায়ুতত্ত্ব হইতে রূপ তন্মাত্রাত্মক তেজতত্ত্ব, এবং তাহা হইতে রসতন্মাত্রাত্মক অপস্তত্ত্ব এবং তাহা হইতে গন্ধতন্মাত্রাত্মক পৃথ্বিতত্ত্ব উৎপন্ন হইয়াছে।

এই সমুদায় হইতে মহৎসূত্র উৎপন্ন হইয়াছে, উহা লিঙ্গ নামে কথিত হয়। ইহাতে সমুদায় তত্ত্বের প্রকৃতি বর্ত্তমান। ইহাই আত্মার সূক্ষ্মদেহ। কারণ দেহকে অব্যক্ত বলা হয়, তাহাতে বিশ্ব বীজরূপে অবস্থিত। তাহা

হইতেই লিঙ্গ দেহের উৎপত্তি। তাহা হইতেই পঞ্চীকরণ ব্যাপার সিদ্ধ স্থূল ভূতের উৎপত্তি হয়। * * তাহার কায় বিরাটদেহ বা আত্মার স্থূল দেহ॥"

আদি তত্ত্বই প্রথম সৃষ্টি, তৎপরে বুদ্ধিতত্ত্ব, ইহাকে কোনও কোনও স্থলে মহৎতত্ত্ব বলা হইয়াছে, তৎপরে আকাশাদি পঞ্চতত্ত্বের যথাক্রমে উৎপত্তি হইয়াছিল। এই সপ্ত তত্ত্বের প্রথম দুইটির নাম নানা গ্রন্থে ভিন্ন ভিন্ন দেখা যায়। কোথাও মহৎ ও অহঙ্কার, কোনও স্থলে আদিভূত ও মহৎ বলিয়া লিখিত আছে। নাম যাহাই হউক, জগতের উপদান যে ক্রম সূক্ষ্ম সপ্ততত্ত্ব সে বিষয়ে মতভেদ নাই। মনুসংহিতার প্রথমাধ্যায়ের ১৯ শ্লোকে লিখিত আছে—"তেষামিদং তু সপ্তানাং পুরুষানাং মহৌজসাং। সূক্ষ্মাভ্যো মূর্ত্তিমাত্রাভ্য * *

এই সমুদায় আলোচনা দ্বারা বোধ হইল যে সমুদায় ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্ট্যাদি ক্রিয়া একই ক্রমে সম্পন্ন হইয়া থাকে।

বিষ্ণু পুরাণানুসারে ব্রহ্মা প্রধান নামক আদিভূত দ্বারা আবৃত। সেই প্রধানে গুণত্রয় সাম্যাবস্থায় অবস্থিত। তাঁহার শক্তিবশে তমোগুণের হ্রাস হইলে রজোঃগুণের প্রাবল্যবশত প্রবল গতির উদয় হয়। তৎপরে তিনি মহৎ বুদ্ধিতত্ত্বের উৎপাদন করেন; তাহা অনুপ্রবেশ দ্বারা কার্য্যকারী হইলে সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি ঘটে। তখন গতির সাম্যভাব ও নিয়মের উদয় হয়; তাহা হইতে অহঙ্কারের উদয় হয়, তখন সৃষ্টির উপাদান অনু আকার ধারণ করে। অহঙ্কার তত্ত্বের জন্য প্রকৃতিতে তমোগুণের বাহুল্য ঘটে, তাহা হইতে যথাক্রমে ষটতন্মাত্রের উদয় হয়। তাহা হইতে পঞ্চেন্দ্রিয়ের শক্তি ও তাহার বিষয় ক্ষিত্যাদির উৎপত্তি হয়। রজোগুণের প্রাবল্যে অহঙ্কারতত্ত্বসাহায্যে, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হয়। সত্ত্বগুণের প্রাবল্যে দশ ইন্দ্রিয় অধিষ্টাতৃ দেবতা ও মনের উৎপত্তি হয়। এই ত্রিবিধ সৃষ্টি যথাক্রমে ভূতাদি সৃষ্টি, তৈজস সৃষ্টি ও বৈকারিক সৃষ্টি, নামে কথিত হইয়া থাকে। এস্থলে ইহা স্মরণ করিয়া রাখা কর্ত্তব্য যে ভূত সমূহে তমোগুণ, ইন্দ্রিয় নিচয়ে রজোগুণ এবং তদধিষ্টাত্রী দেবগণে সত্ত্বগুণ প্রবল।

মনুসংহিতায় দেবগণকে কর্ম্মাত্মক বলা হইয়াছে। অর্থাৎ দেবগণই

কর্ম্ম সমূহের আত্মা স্বরূপ; অর্থাৎ অসংখ্যবিধ কর্ম্ম শক্তি রূপে অসংখ্য দেবসত্তা বিদ্যমান আছেন।

হিন্দুগণ জানেন এই অসংখ্য দেবগণ ঈশ্বরের একত্বের অন্তরায় নহেন। ঈশ্বর একই। ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব এই তাঁহার ত্রিমূর্ত্তি বিকাশ। অসংখ্য, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, বৃক্ষ লতা, ধাতু মৃৎ প্রস্তরাদিও তাঁহারই বিকাশ। শ্রুতিতে কথিত আছে— ইন্দ্রং মিত্রং বরুণামগ্নিমাহুরথো দিব্যঃ স সুপর্ণো গুরুত্মান্। এক সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্ত্যগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ॥

সেই একমাত্র সৎপদার্থতেই বিপ্রগণ বহুধা বর্ণনা করেন। তাঁহারা তাহাকেই, ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, অগ্নি, যম, মাতরিশ্বা বলিয়া থাকেন।

স্মৃতিতেও আছে—আত্মৈব দেবতাঃ সর্ব্বাঃ সর্ব্বমাত্মন্যবস্থিতং।" সকল দেবতাই আত্মা। আত্মাতেই সকল অবস্থিত।"

অন্যত্র লিখিত আছে—"এতমেকে বদন্ত্যগ্নিং মনুমন্যে প্রজাপতিং। ইন্দ্রমেকেঽপরে প্রাণমপরে ব্রহ্ম শাশ্বতং॥"

কেহ তাহাকে অগ্নি বলেন, অপর ব্যক্তিগণ মনু, অপরে প্রজাপতি, কেহবা ইন্দ্র অপর ব্যক্তিগণ প্রাণ, অপরে তাহাকেই শাশ্বত ব্রহ্ম বলিয়া থাকেন॥"

কিন্তু প্রাকৃত জগতে দেবগণের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র স্থান আছে, তাঁহারা সকলেই ঈশ্বরের ইচ্ছাশক্তির কার্য্যকারক রূপে কেহ শাসন, কেহ রক্ষণ কেহ নিয়ন্ত্রণ, কেহ পরিচালন করিতেছেন। তাঁহাদের শক্তি মানব অপেক্ষা অধিক হইলেও সসীম। তাঁহারা মানব অপেক্ষা অধিক বুদ্ধি ও শক্তি সহযোগে সমুদায় কার্য্য সম্পন্ন করেন। দেব শব্দ দ্বারা তাঁহারা জ্যোতিষ্মান তাহা বুঝিতে পারা যায়। তাহারা জ্যোতির্ম্ময় দেহসম্পন্ন। তাঁহাদের দেহের উপাদানই জ্যোতিপদার্থ। তাহাদের সহিত বিশ্বের ভৌতিক অংশ সম্বন্ধযুক্ত। ভৌতিক জগতের ক্রম বিকাশ তাঁহাদের সাহায্যসাপেক্ষ। আমরা বিজ্ঞান সাহায্যে যে সমুদায় ঘটনপটীয়সীর শক্তির আলোচনা করি তাহা সমুদায়ই দেবশক্তি। সেই শক্তি সমূহের কার্য্যই সর্ব্ববিষয়ে মানব চেষ্টার ফলদান করিয়া থাকে। যে সমুদায় ব্যক্তি পার্থিব সম্পদাদির অভিলাষী তাহাদের নিরন্তর ঐ সমুদায় শক্তির সাহায্য একান্ত প্রয়োজনীয়। সেই সাহায্য প্রাপ্তির নির্দ্দিষ্ট নিয়ম আছে। কি নিয়মে

ঐ সমুদায় শক্তি কার্য্য করে, তাহার বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আয়ত্ব করিতে পারিলেই, মানব লৌকিক ব্যাপারে শুভফল লাভ করিতে সমর্থ হইয়া থাকে। যে সমুদায় পদার্থ যে দেবতার প্রয়োজনীয় অথবা যাহা দ্বারা যে দেবতার ক্রিয়া শক্তির বর্দ্ধন হয় সেই দ্রব্যাদি দ্বারা যজ্ঞাদিকার্য্য করিলে, সেই দেবতা মানবের অভাব দূর করেন। অর্থাৎ প্রাকৃতিক জগতে তৎশক্তি কার্য্যকারিণী হইয়া মানবের কার্য্যে সহায়তা করে। দেবতাগণের অভীষ্ট কার্য্য সম্পাদন (যথা ক্ষুধার্ত্তকে অন্নদান, বস্ত্রহীনকে বস্ত্রদান, প্রভৃতি) দ্বারা, তাঁহাদের সন্তোষ উৎপাদন করিলেও তাঁহারা প্রসন্ন হইয়া থাকেন। যোগী ঋষিগণ তাঁহাদের তপস্যা ও শক্তির দ্বারা সহজে তাহাদের প্রসন্নতা সাধন করিতে পারেন। কখন কখন, মানব, জন্মজন্মান্তরীণ প্রকৃতি বলে সহজেই কোনও দেবতার প্রসন্নতা লাভে সমর্থ হইয়া থাকেন। সেরূপ অবস্থায় সেই ব্যক্তির সমস্ত পার্থিব ব্যাপার উন্নতি লাভ করিতে থাকে। অন্যে যে কার্য্যে অকৃত কার্য্য হইল, তিনি তাহাতেই কৃতকার্য্য হইতেছেন দেখিতে পাওয়া যায়। সেইরূপ ব্যক্তিকে লোকে ভাগ্যবান বলে। সৌভাগ্য দৈবশক্তি বলেই উৎপন্ন হয়। মানব তাহার কারণ দেখিতে পায় না বলিয়া মনে করে উহা হঠাৎ ঘটিয়া গেল। কিন্তু সকলেরই জানিয়া রাখা কর্ত্তব্য যে কিছুই হঠাৎ ঘটে না। দৈবশক্তির কার্য্য বিধিবদ্ধ আছে, বিধি অতিক্রম করিয়া জগতে কোনও দিন কিছু ঘটে না, ঘটিতে পারেও না। বেদে যে সমস্ত যজ্ঞাদি ব্যাপার বর্ণিত আছে, তাহা দেবতা ও মানবের মধ্যে সহানুভূতি সাধক একটি গূঢ় বিধি মাত্র।

"দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তুবঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ॥
ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ।" গীতা ৩।১১।১২

এইরূপে (যজ্ঞ দ্বারা) দেবতাগণের তুষ্টি সাধন করিলে দেবগণও তোমাদের পুষ্টি 'বিধান করিবেন। এইরূপে পরস্পর পরস্পরের বিষয়ে চেষ্টা করিলে তোমরা পরম শ্রেয় লাভ করিবে। যজ্ঞ কার্য্য দ্বারা তুষ্ট হইয়া দেবগণ তোমাদিগকে ইষ্ট দান করিবেন। তাহার কারণ এই—

"অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি পর্জ্জন্যাদন্নসম্ভবঃ।

যজ্ঞাদ্ভবতি পর্জ্জন্যঃ * * *॥" (গীতা ৩।১৪)

অন্ন হইতে ভূতগণ উৎপন্ন হয়। পর্জ্জন্য হইতে অন্নের উৎপত্তি হইয়া থাকে। যজ্ঞ হইতে পর্জ্জন্য উৎপন্ন হয়।"

"কাংক্ষন্তঃ কর্ম্মণাং সিদ্ধিং যজন্তে ইহ দেবতা।"

"কর্ম্ম সিদ্ধির জন্য দেবগণের যজন করে।" কিন্তু এই যজ্ঞোদ্ভূত ফল অস্থায়ী। গীতা বলিয়াছেন অন্তবত্তু ফলং তেষাং।'' এইজন্য যাঁহারা লৌকিক সম্পদের অভিলাষী নহেন তাহারা দেবতাগণের আরাধনা করেন না। তাহারা কর্ম্মসচিবগণের উপাসনা না করিয়া ঈশ্বরের উপাসনা করেন। কেহ তাঁহাকে ব্রহ্মরূপে, কেহ বা ত্রিমূর্ত্তির কোনও মূর্ত্তিতে বা শক্তির কোনও মূর্ত্তিতে, অথবা বিদ্যার জন্য গণেশকে, কিম্বা অন্য কোনও ঈশ্বরাবতারের উপাসনা করিয়া থাকেন। এই বিষয় দ্বিতীয় খণ্ডের পঞ্চম অধ্যায়ে বিশেষরূপে আলোচিত আছে।

এইবার দেবগণের বিষয় আলোচনা করা যাইবে। ক্ষিত্যপ্‌তেজমরুদ্ব্যোম এই পঞ্চ মহাভূতের, অধিদেবতাগণ—যথাক্রমে, কুবের, বরুণ, অগ্নি, পবন ও ইন্দ্র নামে অভিহিত, ইহারা তত্তৎ লোকপাল বলিয়া কথিত। ইন্দ্রই এই দেবগণের অধিপতি। সাধ্যগণ, বসুগণ, আদিত্যগণ, ও অপ্সরাগণ দেবরাজের অনুগত। মরুদ্গণ পবনের অনুগত। যক্ষ, বিদ্যাধর, গন্ধর্ব্ব ও কিন্নরগণ কুবেরানুগত। নাগরাজ সর্পগণের এবং সুপর্ণ পক্ষিগণের অধিপতি। ইন্দ্র, যম, বরুণ, ও কুবের যথাক্রমে পূর্ব্ব দক্ষিণ পশ্চিম ও উত্তর এই চারি দিকের অধিপতি। যম মৃত্যুপতি, ইনি কৃপা করিয়া নাচিকেতাকে তত্ত্বোপদেশ করিয়াছিলেন।

সুর বিরোধীগণ অসুর নামে অভিহিত। দেব শক্তি যেমন সৃষ্টির সহায়, অসুর শক্তি তেমনই নাশকার্য্যে সহায়তা করিয়া থাকে। সুতরাং দেবশক্তির ন্যায় অসুর শক্তিরও জগতে উপকারী ও প্রয়োজনীয়। এই শক্তিবলে ভৌতিক পদার্থের প্রধানগুণ অর্থাৎ তমোগুণের কার্য্য হয়, এবং সত্ত্ব ও রজোর বাধক হইয়া শক্তির বর্দ্ধন করে ও ক্রম বিকাশে বিশেষ সহায়তা করে।

এই সমস্ত সৃষ্টি অদৃশ্য জগতে হইয়া থাকে। কিন্তু ইহার কার্য্য দৃশ্য জগতে বিশিষ্টরূপে ফলদ হয়। এই দৃশ্যাদৃশ্য লোক সমূহ লইয়াই সংসার।

সৃষ্টির ক্রম এইরূপ, ভূত, উদ্ভিদ, জন্তু, ও মানব। বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে। "ব্রহ্মা সৃষ্টি বিষয়ে চিন্তা করিতেছেন, তিনটি প্রাকৃত সৃষ্টি অর্থাৎ মহৎ, ভূত, ও ইন্দ্রিয় সৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, তৎপরে আর ধাতাব ও ঔদ্ভিদ সৃষ্টির উদয় হইল। তৎপরে তির্য্যকস্রোত নামক জীব সৃষ্টি হইল। তৎপরে কতকগুলি দেবতা উৎপন্ন হইলেন, কিন্তু পুরাণে লিখিত আছে তাহাদের সহিত এই ভৌতিক জগতের কোনও সম্পর্ক নাই। তৎপরে মানব সৃষ্টি।" এস্থলে ইহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, যদিও ইহাই সৃষ্টির ক্রম বটে তথাপি কল্পভেদে ঘটনা বৈচিত্র আছে, সেই জন্য পুরাণ সমুহে মতভেদ দৃষ্ট হইবেক। এই ক্রম হইলেও মানব সৃষ্টির বহুপরেও বহুবিধ নূতন জীব ও উদ্ভিদ উৎপন্ন হয়। এই জগতে ঐ চতুর্ব্বিধ সৃষ্টি নিরন্তর সংঘটিত হইতেছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে সৃষ্টির ক্রম সুন্দররূপে বিবৃত হইয়াছে।

"তস্য আত্মানমাবিস্তরাং বেদাশ্নুতে হাবির্ভুয়ঃ। ওষধিবনস্পতয়ো যদ্যকিঞ্চপ্রাণভৃৎ স আত্মানমাবিস্তরাং বেদ। ওষধিবনস্পতিষুহি রসো দৃশ্যতে। চিত্তং প্রাণভৃৎসু। প্রাণভৃৎসু ত্বেবাবিস্তরাসাত্মা। তেষু হি রসোঽপিদৃশ্যতে। ন চিত্তং ইতরেষু। পুরুষে ত্বেবাবিস্তরাসাত্মা। সহি প্রজ্ঞানেন সম্পন্নতমঃ। বিজ্ঞাতং বদতি। বিজ্ঞাতং পশ্যতি। বেদ শ্বস্তনম্। বেদ লোকালোকৌ। মর্ত্ত্যেনামৃতং ইপ্সতি। এবং সম্পন্ন। অথেত্তরেষাং পশূনামশনপিপাসে এবাভিবিজ্ঞানম্। ন বিজ্ঞাতং বদন্তি। ন বিজ্ঞাতং পশ্যন্তি। ন বিদুঃ শ্বস্তনম্। ন লোকালোকৌ। ত এতাবন্তোভবন্তি। যথাপ্রজ্ঞং হি সম্ভবাঃ॥" ঐতরেয় ২।৩।২

যিনি আত্মাকে (পরম পুরুষের) প্রকাশ বলিয়া জানেন তিনি অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করেন। ওষধিবনস্পতি প্রভৃতি প্রাণভৃৎ সমূহ যে আত্মারই বিকাশ তাহা তিনি উপলব্ধি করেন। ওষধি বনস্পতি প্রভৃতিতে রস দৃষ্ট হয়, প্রাণভৃৎ সমূহে চিত্ত আছে। সমুদায় প্রাণভৃৎ মধ্যে আত্মা সপ্রকাশ। সেই সমুদায়েও রস বর্ত্তমান আছে। কিন্তু অপরগুলিতে চিত্তের সংস্থান নাই। মানবে আত্মা (অধিকতর) সপ্রকাশ। মানব অধিকতর প্রজ্ঞান সম্পন্ন। মানব জ্ঞান পূর্ব্বক বাক্য উচ্চারণ করে। জ্ঞান পূর্ব্বক দর্শন করে। মানব জানে কাল কি ঘটিয়াছিল। দৃশ্যাদৃশ্য বহুতত্ত্ব মানবের

বিদিত। মানব মর্ত্ত্য হইয়াও অমৃতত্ত্বের অধিকারী হইতে পারে। মানব এইরূপ সম্পন্ন। কিন্তু ইতর জন্তুর কেবল ক্ষুধাপিপাসাই জ্ঞান। তাহারা জ্ঞানপূর্ব্বক বাক্য উচ্চারণ করে না। জ্ঞান পূর্ব্বক দর্শন করে না। অতীত বিষয় তাহাদের জ্ঞানগোচর থাকে না। দৃশ্যাদৃশ্য তত্ত্বের কিছুই তাহাদের জ্ঞানগোচর নহে। তাহাদের অবস্থা এইরূপ। যথাপ্রজ্ঞ উৎপত্তি হইয়া থাকে। উল্লিখিত অংশের ব্যাখ্যাবসরে সায়নাচার্য্য বলিয়াছেন—

সচ্চিদানন্দ রূপস্য জগৎকারণস্য পরমাত্মনঃ কার্য্যভূতাঃ সর্ব্বেঽপি পদার্থা আবির্ভাবোপাধয়ঃ। তত্রাচেতনেষু মৃৎপাষাণাদিষু সত্তামাত্রাবির্ভবতি ন চাত্মনো জীবরূপত্বং। যে তু ওষধিবনস্পতয়ো জীবরূপাঃ স্থাবরাঃ যে চ শ্বাসরূপ প্রাণধারিণো জীবরূপা জঙ্গমাঃ তে উভয়ে অতিশয়েন আবির্ভাব স্থানমিতি..............."॥

"সচ্চিদানন্দরূপ, জগৎকারণ পরমাত্মার কার্য্যভূত সমুদায় পদার্থই তাঁহার আবির্ভাবোপাধি। তন্মধ্যে অচেতন মৃৎপাষাণাদি পদার্থে সত্ত্বামাত্রাবির্ভাব, তাহাতে আত্মার জীবভাব নাই। ওষধিবনস্পতি জীবরূপ স্থাবরগণ এবং শ্বাসরূপ প্রাণধারী জীবরূপ জঙ্গমাণ তদপেক্ষা উচ্চতর সত্ত্বারূপ।

সকলেরই এই অংশটুকু ভাল করিয়া আলোচনা করা কর্ত্তব্য, কারণ বর্ত্তমান সময়ে অনেকেই মনে করেন বিবর্ত্তবাদ আধুনিক।

ব্রহ্মা তপঃ প্রভাবে সমুদায় পদার্থের সৃষ্টি করিয়াছেন একথা আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিরাছি। কিন্তু শিবপুরাণে ও শ্রীমদ্ভাগবতে দেখিতে পাই, যে তৎকার্য্য সাধন জন্য ও সৃষ্টি প্রাযুণক্ত করিববার জন্য তাহাকে বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইতে হইয়াছিল। ঈশ্বরের বিষ্ণুস্বরূপ হইতে প্রাণের উৎপত্তি বা তিনি প্রাণস্বরূপ। সেই প্রাণশক্তি বলে সমস্তই ধৃত হইতেছে এবং তাহা হইতেই চিৎ উৎপন্ন হইতেছে '

শিবপুরাণে ইহাও কথিত আছে যখন সমুদায় রূপের উৎপত্তি হইল তখন ব্রহ্মা শিবের শরণাপন্ন হইলে তিনি তাহাতে অমৃতত্ত্বের সংযোগ করিলেন। অর্থাৎ পূর্ব্ব কল্পের জীবাত্মাসমূহ তাহাতে সঞ্চারিত করিলেন। তদ্ধেতু রুদ্রের অহঙ্কার তত্ত্ব নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সৃষ্টির এই ত্রিবিধ ক্রম অর্থাৎ ব্রহ্মা কর্ত্তৃক সমুদায়ের মূর্ত্তি উৎপাদন, বিষ্ণু কর্ত্তৃক প্রাণ ও চিদর্পন এবং

শিব কর্ত্তৃক জীবাত্মাসংযোগ এই তিনটি তত্ত্ব বিশেষরূপে আলোচিত হওয়া কর্ত্তব্য।

মনুস্মৃতিতে এই বিষয়ে ঈঙ্গিত মাত্র প্রদত্ত আছে, তাহাতে কেবল ব্রহ্মারই উল্লেখ আছে। লিখিত আছে তিনিই বিরাটরূপ ধারণ করেন, তাহা হইতে স্বায়ম্ভুব মনু উৎপন্ন হন। তিনি দশজন মহর্ষিকে উদ্বোধিত করেন। তাহারা সাতজন মনুর সৃষ্টি করেন। পরে এই সাতজনই প্রজাসংস্থাপনের হেতু হইয়াছিলেন। ব্রহ্মা ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি ও সৃষ্টির স্রোত প্রবাহিত করিয়া বেদ প্রদান পূর্ব্বক অন্তর্দ্ধান করিয়াছিলেন। ঐ বিবরণ অতি সংক্ষিপ্ত সুতরাং কিছু জটিল, কিন্তু সৃষ্টি প্রকরণ ঐ গ্রন্থের উপক্রমণিকা মাত্র। শিব সংহিতায় সৃষ্টি বিবরণ নিম্নলিখিত রূপ বিবৃত হইয়াছে।

ব্রহ্মা প্রথমে জল সৃষ্টি করিলেন, এবং তাহাতে বীজক্ষেপ করিলেন। সেই বীর্য্য হইতে একটি অণ্ডের উৎপত্তি হইল। উহা চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বময়। ব্রহ্মা বিরাট রূপে প্রকাশ হইয়া দেখিলেন ঐ অণ্ড কঠিন হইয়াছে। তাঁহার মনে সন্দেহের উদয় হওয়াতে তিনি তপস্যা আরম্ভ করিলেন। বিষ্ণুতে একাগ্র হইয়া দ্বাদশ বর্ষ তপস্যার পর বিষ্ণু আবির্ভূত হইয়া বলিলেন আমি তুষ্ট হইয়াছি বর প্রর্থনা কর।" ব্রহ্মা বলিলেন হে প্রভো! যেরূপ হওয়া উচিত তাহাই হইয়াছে। আমি শিবাজ্ঞায় আপনার শরণাপন্ন। তাঁহার আদেশে আমি ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টিতে নিয়োজিত হইয়াছি; কিন্তু এখন দেখিতেছি আমার সৃষ্ট ব্রহ্মাণ্ড জড়রূপ ও ভৌতিক। এক্ষণে আপনি প্রাণরূপে ইহার চেতনা বিধান করুন। ব্রহ্মার বাক্য শ্রবণে শিবনির্দ্দিষ্ট প্রকারে বিষ্ণু অণ্ড মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তিনি সহর্স্রশীর্ষ সহস্রাক্ষ সহস্রহস্তপদবিশিষ্ট। সেই পুরুষ স্বর্গ ও পৃথিবী ব্যাপিয়া অধিষ্ঠিত হইলেন।

সেই চতুর্বিংশতি তত্ত্বময় অণ্ডমধ্যে বিষ্ণু প্রবিষ্ট হইলে, পাতাল হইতে সত্যলোক পর্য্যন্ত প্রাণযুক্ত ও সচেতন হইল।

পুরুষোত্তম হরি সত্যলোকে আসনোপবিষ্ট হইলেন। ব্রহ্মা তপোলোকে অধিষ্ঠিত হইলেন, অন্যান্য পুরুষগণ অন্যান্য লোকে অধিষ্ঠিত হইলেন। ব্রহ্মা সর্ব্বপ্রথমে কতকগুলি মানস সুত্রের সৃষ্টি করিলেন। তাহারা সকলেই যোগমার্গ অবলম্বন করিয়াছিলেন। তৎপরে তিনি অন্য মানস

পুত্রগণকে উৎপন্ন করেন। তাহারাও সংসার ত্যাগ করিয়াছিলেন। তাহাদের সংসার ত্যাগে ব্রহ্মা রোদন করিতে লাগিলেন, তখন মহাদেব আবির্ভূত হইলেন। সেই জন্য তাঁহার নাম রুদ্র হইল। তিনি আবির্ভূত হইয়া ব্রহ্মাকে বলিলেন "হে ব্রহ্মণ! আপনার কষ্ট কি? আমায় বলুন আমি এখনই তাহা দূর করিব।

ব্রহ্মা বলিলেন "দেব, ইতঃপর সৃষ্টি বিষয়ে অন্তরায় দৃষ্ট হইতেছে। আপনি ব্যবস্থা করিলে সেই অন্তরায় দূর হইতে পারে।" সন্তাপহারক মহাদেব তচ্ছ্রবণে ব্রহ্মার অভিলাষ পূরণে সম্মত হইয়া বলিলেন" তোমার সৃষ্টিকে আমি চিরস্থায়ী করিব।"

এই বলিয়া আনন্দময় শ্রীমাহাদেব সগণে অন্তর্দ্ধান পূর্ব্বক কৈলাশে গমন করিলেন। তৎপরে শিবের কৃপায় ব্রহ্মা ভৃগু প্রভৃতি ছয় জন ঋষিকে উৎপন্ন করিলেন। তাঁহার ক্রোড় হইতে নারদের উৎপত্তি হইল। তাঁহার ছায়া হইতে কর্দ্দম ও পদাঙ্গুষ্ঠ হইতে দক্ষ উৎপন্ন হইলেন। এইরূপে দশ-জন ঋষির উৎপত্তি হইল। ভৃগুর পর মরীচি। মরীচির পুত্র কশ্যপ নামে বিখ্যাত। সেই কশ্যপের সন্তানাদিতে ব্রহ্মাণ্ড পূর্ণ হইয়াছে।

শিবপুরাণ ১।৬।১-২০

শ্রীমদ্ভাগবতের সৃষ্টি প্রকরণ ইহারই অনুরূপ কেবল বিষ্ণুকে সৃষ্টি কার্য্যে শক্তি দাতা বলা হইয়াছে যথা—

"যদৈতেঽসঙ্গতা ভাবা ভূতেন্দ্রিয়মনোগুণাঃ।
যদায়তননির্ম্মাণে ন শেকুর্ব্রহ্ম বিত্তম॥
তদা সংহত্য চান্যোঽন্যং ভগবচ্ছক্তিচোদিতাঃ।
সদসত্ত্বমুপাদায় চোভয়ং সসৃজুর্হ্যদঃ॥ (ভাগবত ২।৫।৩২-৩৩)

যখন ভূত, ইন্দ্রিয়, মন ও গুণবাণ সতন্ত্রভাবে আয়তন নির্ম্মাণে অসমর্থ হইল, হে ব্রহ্মবিত্তম! সেই সময়ে ভগবৎ-শক্তি প্রেরিত হইয়া তাহারা পরস্পরে মিশ্রিত হইয়া সদসৎ সমুদায়ের সৃষ্টি করিল।

মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, প্রচেতা, বশিষ্ট, ভৃগু ও নারদ এই দশজন মহর্ষি দেবযোনি, ইহারা পূর্ব্ব কল্পে মোক্ষলাভ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান কল্পে সৃষ্টির শৃঙ্খলার জন্য পুনরাবিভূত হইয়াছিলেন।

তাঁহারা বিশ্বচক্রের ভাগ্য পরিচালন পূর্ব্বক প্রলয় পর্য্যন্ত অবস্থিতি করিবেন। প্রচেতা, ভৃগু ও নারদ ব্যতীত অপর সাতজন সপ্তর্ষি নামে অভিহিত হইয়া থাকেন; এবং উক্ত দশজনের সহিত দক্ষ ও কর্দ্দমকে অন্তর্ভুক্ত করিয়া দ্বাদশ মহর্ষির সংখ্যা পূর্ণ হয়।

পুরাণে কোথাও চারিজন, কোথাও পাঁচজন, কোথাও ছয়জন, কোথাও বা সাতজন কুমার মহর্ষির উল্লেখ দেখা যায়। তাঁহারাও সকলেই ব্রহ্মাণ্ডের মঙ্গল প্রদাতা। শিব তাহাদের একজন, তাহার নাম রুদ্র বা নীললোহিত। সনৎ কুমার, সনন্দন, সনক, সনাতন এই চারিজন কুমার সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ এবং সকল পুরাণেই ইহাদের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। অন্যত্র ঋভু, কপিল ও সন ইহাদের সহিত উল্লিখিত হইয়া থাকেন।

সৃষ্টি প্রক্রিয়ার এই সংক্ষিপ্তসার মধ্যে ইহাও উল্লেখ করা কর্ত্তব্য যে আর্য্য জাতীয়গণের পূর্ব্বতন মানবজাতীয়গণ দানব ও দৈত্য নামে পুরাণাদিতে কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। তাহারা মহাকায়, তাহাদের শক্তি ও অধ্যবসায় অসীম। দেবতাগণের সহিত তাহাদের বহুতর যুদ্ধ হইয়াছিল। আর এক জাতীয়গণকে রাক্ষস বলা হয় তাহাদিগকে পাশব প্রকৃতি বিকৃতাকার, বিশালদেহ, নির্দ্দয়, আমমাংসভোজী ও ভীষণ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে; অধিকন্তু তাহারা মলিন মায়া বিষয়ে সবিশেষ দক্ষ, সেই মায়া বলে তাহারা অন্যলোকগণের উৎপীড়ন করিত। এই সকল জাতী এখন আর নাই।

এইত বিস্তীর্ণ সংসার ক্ষেত্র। ইহাতে জীবাত্মা পান্থ রূপে আসিয়া উপস্থিত। এই জীবাত্মা বিভিন্ন দেহে ভ্রমণ করিতে করিতে বহু জন্মান্তে মানব জন্ম লাভ করে, তার পর কালে আত্মজ্ঞানের অধিকারী হইয়া মুক্তি লাভ করিয়া থাকে।

এইবার এই অধ্যায়ের স্মরণযোগ্য বিষয়ের সংক্ষিপ্ত সার করা যাইতেছে।

১। মায়ার শক্তি সাহায্যে সগুণব্রহ্ম ও মূল প্রভৃতি হইতে সমস্তের উৎপত্তি হইয়াছে। ব্রহ্মার দিবসান্তে তাহারা আবার লীন হইবেক।

২। ঈশ্বর সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় কার্য্যের জন্য ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিব এই ত্রিমূর্ত্তিতে সর্ব্ব শক্তি সরস্বতী, লক্ষ্মী ও উমার সহিত প্রকাশ হইয়াছেন।

৩। ব্রহ্মা সৃষ্টির উপাদান ও আদর্শ সত্বা, সুর, অসুর, ধাতু, উদ্ভিদ, পশু পক্ষ্যাদি ও মনুষ্য উৎপন্ন করিয়াছেন।

৪। বিষ্ণু সেই সমুদায়কে প্রাণ ও চিৎ যুক্ত করিয়া যত প্রকার চেতন মূর্ত্তি সম্ভব তাহার বিকাশ করিয়া তাহাদের রক্ষণ ও পোষণ করিতেছেন।

৫। এই সমুদায় সত্বা যখন মানবত্ব উৎপত্তির উপযোগী হয়, সেই সময়ে তন্মধ্যে পূর্ব্ব কল্পের পূর্ণতাপ্রাপ্ত জীবাত্মার স্পর্শ করেন। ঐ দেহে অবিদ্যার নাশ হইয়া বিদ্যার উদয় হইতে থাকে।

৬। ঋষি কুমার প্রভৃতি দৈবশক্তিসপন্ন সত্বাগণ পূর্ব্বকল্পসঞ্চিত শক্তির সহিত বর্ত্তমান কল্পের মানবগণের শুভোদ্দেশে কল্পান্ত পর্য্যন্ত অবস্থিতি করেন।

৭। দানব, দৈত্য ও রাক্ষগণ এই পৃথিবীর অতীত যুগের অধিবাসী, এক্ষণে তাহাদের সত্বা আর নাই।　　(ক্রমশঃ)

আমি ও আমার দেহ।

——()*()——

উপক্রমণিকা।

আমি এবং আমার দেহ এক পদার্থ নহে। আমার জামা কাপড় প্রভৃতির সহিত আমার যে রূপ সম্পর্ক, আমার দেহের সহিতও আমার অনেকটা সেইরূপ সম্পর্ক। কাপড় পুরাতন হইয়া গেলে বা ছিঁড়িয়া গেলে, আমরা তাহা ফেলিয়া দিয়া আবার নূতন কাপড় পড়ি। দেহও জীর্ণ হইলে আমরা তাহা পরিত্যাগ করিয়া আবার প্রয়োজন মত নূতন কলেবর ধারণ করি। পরিচ্ছদকে অঙ্গের অংশ বলিয়া মনে করা যেমন নির্ব্বুদ্ধিতা, আমি এবং আমার দেহ অভিন্ন বলিয়া বিবেচনা করাও সেইরূপ নির্ব্বুদ্ধিতা। দেহের অস্তিত্বের উপর আমার অস্তিত্ব নির্ভর করে না—দেহ গেলেও আমার বিনাশ হয় না। দেহ আমার প্রয়োজনে লাগে এইমাত্র এবং যতটুকু প্রয়োজন তাহার দ্বারা সিদ্ধ হয়, ততটুকুই তাহার মূল্য। জাগ্রত অবস্থায় (এবং

কখন কখন স্বপ্নাবস্থায়) আমাদের যে সকল জ্ঞান বা অনুভূতি হয় তাহা সাধারণতঃ এই দেহের ভিতরেই হইয়া থাকে—দেহ ছাড়িয়া হয়না ; সুতরাং আমাদের দেহ ও আত্মা অভিন্ন বলিয়া বোধ হয়।

কিন্তু এ ভ্রম দূর করা অসাধ্য নহে। দেহ আমার যান এবং আমি তাহার চালক—ইহা আমরা চেষ্টা করিলে মনে মনে বেশ বুঝিতে পারি। ক্রমে সাধনা করিতে করিতে যখন আমরা আমাদের এই দেহ হইতে পৃথক হইয়া কার্য্য করিতে শিক্ষা করি, যখন স্পষ্ট দেখিতে পাই যে এই দেহ না থাকিলেও আমাদের কোন ক্ষতি হয় না, বরং আমরা দেহের ভিতরে বদ্ধ না থাকিয়া বাহিরে আসিলে আমাদের জ্ঞান অধিকতর পূর্ণমাত্রায় ফুটিয়া উঠে, তখন আর সন্দেহের অবসর থাকে না। যিনি একবার এ অবস্থায় উপনীত হইয়াছেন, তিনি পুনরায় আপনাকে দেহের সহিত অভিন্ন বিবেচনা করারূপ মহাভ্রমে পতিত হন না। অবশ্য এ অবস্থায় উপনীত হওয়া সহজ সাধ্য নহে। কিন্তু *আমি এবং আমার দেহ, দুইটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পদার্থ—দেহের সহিত আমার দিন* কয়েকের মাত্র সম্বন্ধ—আজ যে দেহের সহিত সংযুক্ত আছি কাল তাহা ত্যাগ করিতে পারি—একথাটা হৃদয়ঙ্গম করা এবং স্মরণে রাখা সকলেরই সাধ্যয়ত্ত। অন্ততঃ এই কথাটুকু সর্ব্বদা স্মরণে রাখিয়া যিনি সংসার ক্ষেত্রে বিচরণ করেন, সংসারের জ্বালায় আর তাঁহাকে বড় বেশী জ্বালাতন হইতে হয় না। সংসারের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিরক্তিকর ব্যাপারগুলা, যে গুলা আমাদিগকে সকল সময় বিব্রত করিয়া রাখে—সে গুলা তাঁহাকে সহজে বিচলিত করিতে পারে না। তিনি যেন সংসার সমুদ্র মধ্যে দৃঢ় গঠিত পর্ব্বতের উপর বসিয়া থাকেন ; তরঙ্গের পর তরঙ্গ আসে কিন্তু পর্ব্বতের পদতলে আছাড় খাইয়াই তাহারা ফিরিয়া যায় ; তাঁহাকে আর তাহারা স্পর্শ করিতে পারে না। সাধারণ লোকের ন্যায় তাঁহাকে আর সংসারসাগরে হাবুডুবু খাইতে হয় না।

দেহ আমার আবরণ মাত্র ; আর যিনি এই দেহ মধ্যে থাকিয়া অনুভব করিতেছেন, চিন্তা করিতেছেন, জানিতেছেন, সেই চৈতন্যময় জীবই আমি। “মানুষ” বলিলে এই জীবনকেই বুঝায়। মানুষ কর্ম্মকার, দেহ তাঁহার যন্ত্র। ভাস্করের যেমন নানাবিধ যন্ত্র থাকে, আমাদেরও প্রত্যেকের তেমনিই নানাবিধ দেহ আছে। আমরা সাধারণতঃ যাহাকে দেহ বলি সেইটিই সর্ব্বা-

পেক্ষা স্থূল দেহ। অপর ছয়টী * দেহ এত সূক্ষ্ম উপাদানে নির্ম্মিত যে চর্ম্ম চক্ষে সে গুলিকে দেখিতে পাওয়া যায় না।

এক এক প্রকারের দেহ এক এক প্রকার জগতে কার্য্যকারী। আমরা স্থল পথে অশ্বযান প্রভৃতি ব্যবহার করি, কিন্তু জল পথে যাইতে হইলে নৌকায় উঠিতে হয়। আবার আকাশ পথে বিচরণ করিতে হইলে ব্যোমযান ভিন্ন উপায় নাই। যেমন পথ তেমনই যান। সেইরূপ জগৎ যেরূপ উপাদানে নির্ম্মিত, দেহ ও তদনুরূপ এবং তদপোযোগী উপাদানে নির্ম্মিত হওয়া চাই। স্থূল জগতে স্থূলদেহেই কার্য্য করা যায়, কিন্তু সূক্ষ্ম জগতে কার্য্য করিতে হইলে সূক্ষ্মদেহের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়; কিন্তু যে দেহেই যখন কার্য্য করি না কেন, আমি যেমন তেমনই থাকি। এক যান ছাড়িয়া অপর যান গ্রহণ করিলে কি মানুষের পরিবর্ত্তন হয়? আমার গাড়ীও আছে; নৌকাও আছে, প্রয়োজনমত কখন এটা, কখন ওটা, ব্যবহার করি। কিন্তু যখন একটি ত্যাগ করিয়া আর একটিতে উঠি, তখন আমি অবস্থা বদলাইয়া অন্য লোক হইয়া যাই না। সেইরূপ যদি আবশ্যক মত আমি এক দেহের পরিবর্ত্তে দেহান্তর ব্যবহার করি তাহা হইলে আমার কোন পরিবর্ত্তন হয় না। আমি নিত্য বস্তু। আমার তুলনায় আমার সকল দেহই অনিত্য, ক্ষণ স্থায়ী। তবে আমার সকল দেহ সমান অনিত্য বা সমান শক্তিশালী নহে। কোনটির পরমায়ু বেশী, কোনটির কম; কোন টির কার্য্যকারিকা শক্তি অল্প, কোনটির অধিক। প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়।

এই সকল দেহের কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়াই এই পুস্তকের উদ্দেশ্য। আমরা সর্ব্বনিম্নস্থ দেহ হইতে আরম্ভ করিয়া একে একে সমস্ত দেহগুলির পরিচয় দিয়া অবশেষে সকল দেহের দেহী মানুষের বিষয় কিছু বলিব।

---

* আমরা অপর ছয়টী দেহের কথা জানি না। এ মতের জন্য লেখক দায়ী—বাং মু।

প্রথম অধ্যায়।

কোষ ও লোক।

আমি মানুষ। আমার গৃহের অনেকগুলি প্রাচীর;—নানা আবরণে আবৃত হইয়া আমি ইহ সংসারে বিচরণ করিতেছি। এক একটি দেহ এক প্রকারের আবরণ, তাই বৈদান্তিকেরা দেহের নাম দিয়াছেন কোষ।* কোষের অর্থ আধার বা আচ্ছাদক, চলিত কথায় খাপ। কিন্তু অসিকোষ যেরূপ অসিকে একেবারে ঢাকিয়া রাখে, আমার দেহগুলি আমাকে ঠিক সেরূপ ভাবে ঢাকিয়া নাই। লণ্ঠনের ভিতর আলোক থাকিলে যেমন তাহা লণ্ঠনের বাহিরেও প্রকাশ পায়, আমিও সেইরূপ আমার দেহগুলির ভিতর দিয়া বাহিরে ফুটিয়া থাকি।

বৈদান্তিকেরা সর্ব্বশুদ্ধ পাঁচটি কোষের উল্লেখ করেন। এই পাঁচটি কোষের যথাক্রমে নাম—অন্নময় কোষ; প্রাণময় কোষ, মনোময় কোষ, বিজ্ঞানময় কোষ এবং আনন্দময় কোষ। নামগুলির সার্থকতা পরে বুঝা যাইবে, এক্ষণে এই পর্য্যন্ত বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, কোষগুলির উপাদান বা কার্য্য অনুসারে এই নামকরণ হইয়াছে। ইহা ভিন্ন আরও দুই একটি নাম উপনিষদাদিতে দেখিতে পাওয়া যায়। যথা, হিরণ্ময় কোষ। †

---

* দেহ ও কোষ এক পর্য্যায়ের শব্দ নহে—রাং মু।

† "হিরন্ময়ে পরে কোষে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলং"—মুণ্ডকোপনিষৎ ২-২-৯

সর্ব্বোপনিষৎসারঃ" নামক গ্রন্থে ছয়টি কোষের স্পষ্ট উলেখ আছে যথা;—"ষণ্ণাং কোষাণাং সমূহো"—২য় শ্লোক। এতভিন্ন শ্রুতিতে গুহা, হৃদয়, দহর পুণ্ডরীক প্রভৃতি নামে অভিহিত আর একটি দেহেরও উলেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

"গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণং—কঠোপনিষৎ ২-১২। "গুহাং প্রবিষ্টৌ পরমে পরার্দ্ধে"—ঐ ৩-২১। "হৃদ্যাকাশময়ং কোষং—মৈত্রী উপনিষৎ ৬-২৭। "তদস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম"।—ছান্দোগ্য উপনিষৎ ৮-১-১ সম্ভবতঃ যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে লীলার উপাখ্যানে এই দেহই "জ্ঞানময়" দেহ নামে উল্লিখিত হইয়াছে।

এই দেহগুলির মধ্যে অন্নময় কোষ সর্ব্বাপেক্ষা স্থূল। এই অন্নময় কোষই সাধারণতঃ আমাদের নিকট দেহ বলিয়া পরিচিত। অন্য সকল দেহই ইহা অপেক্ষা সূক্ষ্ম। কিন্তু সেগুলিও সমান সূক্ষ্ম নহে। মনোময় কোষ প্রাণময় কোষ অপেক্ষা সূক্ষ্ম, বিজ্ঞানময় কোষ তদপেক্ষা সূক্ষ্ম, আনন্দময় কোষ আরও সূক্ষ্ম। কিন্তু সূক্ষ্ম বলিয়া কেহ আয়তনে ক্ষুদ্র বলিয়া বোধ করিবেন না। বরং যে দেহ যত সূক্ষ্ম সে দেহ আয়তনে তত বৃহৎ। অন্নময় কোষ আয়তনে সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র। স্থূলত্বের অর্থ উপদানের ঘনত্ব। চলিত ভাষায় মিহি বলিলে যাহা বুঝায় এখানে সূক্ষ্মের অর্থ তাহাই বুঝিতে হইবে। যেমন, ময়দা সুজী হইতে সূক্ষ্ম, বায়ু জল হইতে সূক্ষ্ম, জল মৃত্তিকা হইতে সূক্ষ্ম ইত্যাদি। দেহগুলির ন্যাসপ্রণালী একটু বিচিত্র রকম। সর্ব্বনিম্নে অন্নময়, তাহার পর প্রাণময়, তাহার পর মনোময়—অর্থাৎ প্রথমে সর্ব্বাপেক্ষা স্থূল, তাহার পর তদপেক্ষা সূক্ষ্ম, তাহার পর আরও সূক্ষ্ম দেহগুলির মধ্যে এইরূপ একটা পর্য্যায় দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু পদ্মের কুঁড়ির বা বাঁধা কপির পাতাগুলি যেরূপ ভাবে স্তরে স্তরে সজ্জিত, দেহগুলি ঠিক সেরূপ ভাবে সজ্জিত নহে। বাঁধা কপি বা পদ্মের কুঁড়ির পাতার একস্তর আর একস্তরের সম্পুর্ণ বাহিরে থাকে, কিন্তু মানুষের একটি দেহ আর একটি দেহের সম্পূর্ণ বাহিরে থাকে না। দেহগুলি পরস্পরের মধ্যে যথাসম্ভব অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে। যথাসম্ভব বলিলাম, কেন না কোন সূক্ষ্মদেহ কোন স্থূলতর দেহের ভিতর সম্পূর্ণভাবে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া থাকিতে পারে না; কারণ সূক্ষ্মদেহ আয়তনে স্থূলতর দেহ অপেক্ষা বড়। মনোময় কোষ প্রাণময় কোষের ভিতর অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছে বটে; কিন্তু ক্ষুদ্র প্রাণময় কোষ বৃহত্তর মনোময় কোষকে সম্পূর্ণরূপে ধারণ করিতে পারে না। সুতরাং মনোময় কোষের কিয়দংশ প্রাণময় কোষের বাহিরে তাহার চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়াছে। এইরূপে বিজ্ঞানময় কোষের মধ্যভাগ প্রাণময় ও মনোময় উভয় কোষের মধ্যে সংপ্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে এবং তাহার বহির্ভাগ উভয়ের চতুর্দ্দিকে ঘেরিয়া রহিয়াছে।

একখণ্ড কাগজের উপর সমকেন্দ্র করিয়া তিনটি অসমান চক্র আঁকিলে এ বিষয় কতকটা পরিষ্কার করিয়া বুঝা যাইবে। মনে করুন, চক্র

তিনটির নাম ক, খ এবং গ। "ক" চক্রটি সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র, "খ"টি তদপেক্ষা বৃহৎ, "গ" সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। তিনটি চক্রেরই কেন্দ্র এক, "ঙ"। এখন স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে "খ" চক্রটির মধ্যভাগ "ক" চক্রের ভিতর ওতপ্রোতভাবে রহিয়াছে এবং উহার বহির্ভাগ অঙ্গুরীয়কের ন্যায় "ক" চক্রটিকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। "গ" চক্রের কতক অংশ "ক" ও "খ" উভয় চক্রের ভিতর রহিয়াছে, কতক অংশ শুদ্ধ "খ" চক্রের ভিতর আছে এবং অবশিষ্টাংশ উভয়ের বহির্ভাগে উভয়কে ঘেরিয়া অবস্থিতি করিতেছে। চক্র তিনটি যদি বিভিন্ন বর্ণে রঞ্জিত করা যায় তাহা হইলে বুঝিবার পক্ষে আরও একটু সুবিধা হয়। মনে করুন প্রথমে "গ" চক্রটিকে নীলবর্ণে রঞ্জিত করিলেন। এখন যদি "খ" চক্রটিকে পীতবর্ণে রঞ্জিত করেন, তাহা হইলে ইহার বর্ণ পীত না দেখাইয়া নীল ও পীত বর্ণের মিশ্রণে উৎপন্ন হরিত বর্ণ দেখাইবে। তাহার পর যদি "ক" চক্রটিকে লোহিত বর্ণে রঞ্জিত করেন, তাহা হইলে ইহার ভিতর নীল, পীত ও লোহিত তিন বর্ণেরই সমবেশ থাকিবে। সেইরূপ আমাদের স্থূল অন্নময় দেহের ভিতর অপর সমস্ত সূক্ষ্ম দেহগুলিই বর্ত্তমান রহিয়াছে। কেবল তাহারা বৃহত্তর বলিয়া এই দেহের বাহিরেও ছটার মত বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে। এক খণ্ড সিক্তস্পঞ্জের (sponge) সূত্রে সূত্রে শিরায় শিরায় প্রত্যেক সূক্ষ্ম ছিদ্র অবলম্বন করিয়া যেরূপ জল থাকে, সেইরূপ প্রতিদেহের প্রত্যেক অণু বেষ্টন করিয়া অভ্যন্তরস্থ সূক্ষ্মতর দেহের অণুগুলি অবস্থিতি করিতেছে। সে প্রগাঢ় ওতপ্রোতভাব কল্পনাতে আনা সহজ সাধ্য নহে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, নানাবিধ দেহ নানা প্রকার জগতে কার্য্যকারী। দেহ যেমন অনেকগুলি জগৎও তেমনই অনেকগুলি। যে জগৎ স্থূলচক্ষে দেখিতে পাইতেছি, ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা স্থূল জগৎ। দেহগুলি যেরূপ পর্য্যায়ক্রমে অবস্থিত, যেরূপ ভাবে বিন্যস্ত, জগৎগুলিও ঠিক সেই পর্য্যায়ক্রমে অবস্থিত এবং সেইরূপ ভাবে বিন্যস্ত। জগতের প্রত্যেক দ্রব্যের মধ্যেও এইরূপ নানা স্তর দেখিতে পাওয়া যায়। সর্ব্বনিম্ন স্তর সর্ব্বাপেক্ষা স্থূল ও ক্ষুদ্র এবং তাহাই আমাদের স্থূল চক্ষের গোচরীভূত।

আমাদের শাস্ত্রে এই সকল জগৎ লোক নামে অভিহিত হইয়া থাকে,

যথা, ভূর্লোক ভুবর্লোক, স্বর্লোক, মহর্লোক, জনর্লোক, তপোলোক, সত্যলোক। ভুবর্লোক ভূর্লোক অপেক্ষা সূক্ষ্ম, স্বর্লোক তদপেক্ষা সূক্ষ্ম—এইরূপ ক্রমে সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইয়া গিয়াছে। একদেহ যেরূপ আর এক দেহের সম্পূর্ণ বাহিরে অবস্থিত নহে, এক জগৎ ও সেইরূপ আর এক জগতের সম্পূর্ণ বাহিরে অবস্থিত নহে। ভুবর্লোক ভূর্লোককে শুদ্ধ বাহির হইতে বেষ্টন করিয়া নাই, তাহার ভিতরেও অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে। আবার স্বর্লোক ভূ ও ভুবর্লোক উভয়কে বেষ্টন করিয়া এবং উভয়ের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া অবস্থিতি করিতেছে।

সুতরাং এক লোক হইতে লোকান্তরে গমন করিতে হইলে অধিক দূর যাইবার প্রয়োজন হয় না। যে লোকে যাইবার প্রয়োজন তদনুরূপ দেহের সাহায্য গ্রহণ করিলেই তথায় নিমেষ মধ্যে উপস্থিত হওয়া যায়। যিনি নিজের সমস্ত দেহগুলির ব্যবহার প্রণালী অবগত তিনি মুক্তপুরুষ—তিনি যথেচ্ছা গমন করিতে পারেন, সকল লোকের দ্বারই তাঁহার নিকট মুক্ত। কিরূপ সাধনায় এই সিদ্ধিলাভ করিতে পারা যায়—কিরূপ সাধনায় দ্বারের পর দ্বার মুক্ত হয়—তাহারই কতক আভাস আমরা এই গ্রন্থে দিতে চেষ্টা করিব। যে সকল মহাপুরুষ এই পথের পথিক হইয়া আমাদের অগ্রবর্ত্তী হইয়াছেন, তাঁহাদের উপদেশই আমাদিগের এ বিষয়ে প্রধান অবলম্বন। (ক্রমশঃ)

আচার।—সমাবর্ত্তন।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে উপনীত দ্বিজাতিতনয় ছয়ত্রিশ আঠার কিংবা নয় বৎসর পর্য্যন্ত, অথবা যথাশক্তি গুরুকুলে বাস ও যথাবিধি বেদাধ্যয়নে পরিসমাপ্ত করিয়া গুরুর আজ্ঞাক্রমে গুরুদক্ষিণা প্রদান পূর্ব্বক সমাবর্ত্তন করিবেন।

এখন পূর্ব্বকালের ন্যায় গুরুকুলে বাস নাই, গুরুসমীপে পূর্ব্বের ন্যায়, শিক্ষাপদ্ধতিও নাই, পূর্ব্বে যাহা দীর্ঘকালসাধ্য একটী আবশ্যক কার্য্য

বলিয়া প্রচলিত ছিল, এখন তাহা কোন স্থানে একাদশ দিন, কোন দেশে তিন দিন, কোন স্থানে অর্থাৎ আধুনিক শিক্ষাসমুজ্জল রাজধানী প্রভৃতি স্থানে সদ্য সদ্যই সমাপিত হইয়া থাকে ও শাস্ত্রীয় ব্যবহার অতি অল্পমাত্রায়ই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

কি আশ্চর্য্য শক্তি! কি অপূর্ব্ব মহিমা! বোধ হয় এই জন্যই এই অভূতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তনের পূর্ব্ববর্ত্তী মহর্ষিগণ কলির মানব মণ্ডলীকে হীনবল ও ক্ষীণায়ু দর্শন করিয়া ও জানিয়া সহজ ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন যে, কলিকালে কোন ব্রহ্মচারীকেই আর দীর্ঘকালব্যাপী কঠোর ব্রহ্মচর্য্য ব্রতের জন্য বাধ্য হইতে হইবে না; এবং কমণ্ডলুও ধারণ করিতে হইবে না। (১) সুতরাং নিজ নিজ শক্তি অনুসারে কিছুকাল গুরুকুলে বাস সমাবর্ত্তন করিলেও অশাস্ত্রীয় বা বিরুদ্ধ হয় না।

সে যাহা হউক, বস্তুতঃ যথাবিধি সমাবর্ত্তন সংস্কার সম্পাদন করিতে হইলে ব্রহ্মচারীকে শাস্ত্রোক্ত নিয়মানুসারে যে সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হয় তাহা এইরূপ, ব্রহ্মচারী গৃহস্থাশ্রমোচিত নিয়ম ধর্ম্ম সকল সুন্দররূপে স্মরণ পূর্ব্বক আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ ও অগ্নিস্থাপনাদি করিয়া অগ্নির নিকট প্রার্থনা করিবেন যে, "হে অগ্নে!" আমি উপনয়ন সংস্কার সময়ে যে তোমায় সহায়তায় ব্রত করিবার প্রার্থনা করিয়াছিলাম, তাহা সমাপ্ত করিয়া, অধ্যয়ন সমাপ্তি ও সত্য স্বভাব প্রাপ্ত হইয়াছি। এইরূপে প্রজাপতি প্রভৃতি পূর্ব্বপ্রার্থিত প্রত্যেক দেবতার নিকট বিশেষ বিশেষ প্রর্থনা করার বিধান আছে। অনন্তর আচার্য্য সমীপে উপস্থিত হইয়া উদকাঞ্জলি গ্রহণপূর্ব্বক বলিতে হয় যে "জলের মধ্যে যে সমুদায় দেহ দূষক দোষ নিহত আছে, আমি সে সকল ত্যাগ করিলাম, সুতরাং জল আমার স্নানোপযোগী হইল। পুনশ্চ জলের মধ্যে যে সকল আশক্তিকর দোষ বর্ত্তমান আছে, আমি তৎসমুদায়ও পরিত্যাগ করিলাম; এবং উহার দীপ্তি ও রুচিকর, তেজোভাগই গ্রহণ করিয়া আত্মাকে অভিষিক্ত করিলাম। আমি যেন ইহা দ্বারা যশঃ, তেজঃ বল, ইন্দ্রিয় সামর্থ্য প্রভৃত অন্ন ও ধনসম্পত্তি কান্তি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে

(১) "দীর্ঘকালং ব্রহ্মচর্য্যং ধারণঞ্চ কমণ্ডলোঃ"।

পারি। + + + ইত্যাদি অনেক প্রার্থনার পর ব্রহ্মচারী গাত্রোত্থানপূর্ব্বক সূর্য্যাভিমুখী হইয়া বলিলেন যে, আমি ভগবান্ সূর্য্যদেবের নিকট যাচকরূপে উপস্থিত হইতেছি, তিনি আমার অভিপ্রেতফল প্রদান করিয়া সহায় হউন। হে সূর্য্যদেব! তুমি আমার অনিষ্টকর পাপসকল অপনীত কর। যে চন্দ্র ওষধি ও ব্রাহ্মণগণের রাজা বলিয়া বিখ্যাত, তাঁহাকেও তুমি বর্দ্ধিত কর। আমি তোমায় নমস্কার করিতেছি, তুমি কখনও আমার প্রতিকূল হইও না।

ইহার পর মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক পূর্ব্ব গৃহীত মেখলাদি পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণ ভোজন, যজ্ঞোপবীত ধারণ, মাল্য উপস্নেহ ও বেণুযষ্টি গ্রহণ করিবে। ঐ সকল কার্য্য সম্পাদন করিয়া উপস্থিত আচার্য্যের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক প্রার্থনা করিবে; সর্ব্বলোক প্রিয় যক্ষের ন্যায় আমিও যেন তোমাদের দৃষ্টিপ্রিয় হই ইত্যাদি। তাহার পর জিহ্বাকে সম্বোধন করিয়া বলিবে যে, হে জিহ্বে! তুমি কখনও কোন অভ্যস্ত বিষয় বিস্মৃত হইও না, এবং সতত সত্য ও মধুর বাক্য উচ্চারিত করিও। তুমি স্বভাব চঞ্চলা, ওষ্ঠ ও দন্তদ্বারা সীমাবদ্ধ না থাকিলে সময়ে অতি কঠোর ভাব ধারণ করিয়া থাক। ইত্যাদি। (১)

উপরে শিষ্য প্রর্থনায় যাহা প্রয়োজিত হইয়াছে; বিচার করিয়া দেখিলে সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইবে যে, উহা গৃহস্থাশ্রমে প্রবিষ্ট ব্যক্তির নিত্য প্রয়োজনীয় বিষয়। বোধ হয় কাহারো অবিদিত নাই যে স্বাস্থ্য সংরক্ষণের নিমিত্ত গৃহস্থকে প্রতিনিয়তই জলের সংশোধন করিতে হয়; এই দূষিত জল ব্যবহার যে নিতান্ত পরিহার্য্য, বোধ হয় এ বিষয়ে কাহারও সন্দেহ নাই। পবিত্র জল ব্যবহার করা গৃহিগণের পক্ষে অন্যতম পুণ্যলক্ষণ। দুষ্টা স্ত্রী, উন্মত্তকরী সুরা, এরা অশেষ দোষীর আকর। অক্ষক্রীড়া প্রভৃতি নির্দ্দিষ্ট ব্যসন সমুদায়ও ধার্ম্মিক গৃহস্থের সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য, এবং অনেকানেক জনের পোষণ ও ঐহিক সুখসমৃদ্ধির চেষ্টা করাও গৃহস্থের পক্ষে একটী প্রধান ধর্ম্ম; পরন্তু বিবিধ ব্যবহার সমকূল সংসারধর্ম্মে থাকিয়া সত্য, প্রিয় ও মিতভাষিতার নিমিত্ত প্রার্থনা তাহাও নিতান্ত প্রয়োজনীয়

(১ উপরে যে সকল কথা বলা হইল তাহা সেই সেই মন্ত্রের অর্থ নহে, কেবল স্থূল তাৎপর্য্য মাত্র॥

বলিয়া মনে হয়। সমাবর্ত্তন সময়েও ঠিক সেই সমস্ত বিশদ্‌ভাবই যেন সংক্ষেপে সংকলিত হইয়া গৃহস্থের চিরজীবনের সূক্ষ্মতম কর্ত্তব্য সূত্রের উপদেশ দিয়াছে।

তাহার পর আচার্য্যের উপদেশক্রমে ব্রহ্মচারী রথারোহণ পূর্ব্বক স্বগৃহাভিমুখে প্রস্থান করিবেন।—

বিবাহ-পূর্ব্বভাগ।

বর্ত্তমান সময়ে শিক্ষাবিভাগে শিক্ষার্থীগণের নিমিত্ত যেরূপ প্রবেশিকাদি চারিটী পরীক্ষা সৃষ্টি হইয়াছে, আর্য্যশাস্ত্রেও সেইরূপ শিক্ষা ও পরীক্ষার জন্য ব্রহ্মচর্য্যাদি চারিটী আশ্রম নির্দ্দিষ্ট আছে। শিক্ষা বিভাগে যেরূপ পূর্ব্ব পূর্ব্ব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বা কৃতকারী হইলে পর পর পরীক্ষায় অধিকার হয়, এদিকেও ঠিক সেইরূপ পূর্ব্ব পূর্ব্ব আশ্রমে কৃতকার্য্য হইলে, পর পর আশ্রমে প্রবেশাধিকার লাভ করা যায়। প্রচলিত প্রবেশিকা পরীক্ষা যেরূপ প্রকৃত শিক্ষার স্থান হউক আর নাই হউক, উহা যে শিক্ষা রাজ্যে প্রবেশের প্রথম দ্বার, উত্তীর্ণ না হইলে যে প্রকৃত শিক্ষা রাজ্যে প্রবেশ ঘটে না, ইহা সত্য, সেইরূপ প্রবেশিকা স্থানীয় ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম প্রকৃত শিক্ষার বা আত্মজ্ঞানের স্থান হউক আর নাই হউক, উহাতে প্রবেশ না করিলে, উহাকে করায়ত্ত না করিতে পারিলে যে পরবর্ত্তী ধর্ম্মরাজ্যে প্রবেশ হইতে পারে না, তাহা নিশ্চয়। ক্রমে পূর্ব্ব পূর্ব্ব আশ্রম প্রতিপালন করিয়া উত্তরোত্তর আশ্রমে প্রবেশ করিতে হয় (১) প্রথম পরীক্ষা স্থান ব্রহ্মচর্য্যে কৃতকার্য্য হইলে, দ্বিতীয় পরীক্ষাস্থানে উপস্থিত হইতে হয়, সেই দ্বিতীয় স্থান গার্হস্থ্যজীবন। শিক্ষা বিভাগের দ্বিতীয় পরীক্ষা (এফ এ) যত কঠোর, দ্বিতীয় পরীক্ষা স্থান গার্হস্থ্যাশ্রম মনুষ্যের পক্ষে তদপেক্ষায় শতগুণে কঠোর। এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া বড় কঠিন। জলে থাকিয়া আর্দ্র না হওয়া, কর্দ্দমে থাকিয়া মলিন না হওয়া, এবং অগ্নিতে থাকিয়া দগ্ধ না হওয়া যেরূপ দুষ্কর ও অসম্ভব, গার্হস্থ্যে প্রবেশ করিয়া অনাশক্ত বা নির্লিপ্ত থাকা মনুষ্যের পক্ষে ততোধিক অসম্ভব।

যে স্নেহকণার ঈষদাকর্ষণে সর্ব্বত্যাগী রাজর্ষিবর ভরতেরও কষ্টময়

---

(১) আশ্রমানুক্রমঃ পূর্ব্বৈঃ স্মর্য্যতে নব্যতিক্রমঃ।

জন্মান্তর পরিগ্রহ করিতে হইয়াছিল, যে বিষয়রাশির দুষ্পরিহর অভিলাষ জরাগ্রস্ত মহামতি যযাতিকেও নবযৌবন কামনায় ব্যস্ত হইতে হইয়াছিল। এবং যে ভোগ বাসনার প্রবল প্রতাপে উগ্রতপা মহর্ষি বিশ্বামিত্রকেও তপোভ্রষ্ট হইতে হইয়াছিল, সেই সমস্ত বিলাসসামগ্রীসম্পূর্ণ এই গার্হস্থ্য যে কিরূপ ভয়ানক পদস্খলন স্থান, তাহা বলাও বাহুল্য!

ব্রহ্মচর্য্য কালে বিষয় সম্পর্ক থাকে না, এবং ভোগাবসরও তেমন ঘটে না, সুতরাং তৎকালীন ইন্দ্রিয় সংযম ব্যাপার বিশেষ দুঃসাধ্য না হইলেও সাধিত হইতে পারে। কিন্তু এ অতি বিষমস্থান, এখানে বিষয় থাকিবে ষোল আনারও অধিক এবং ভোগও চলিবে সচ্ছন্দ। অথচ তাহা দ্বারা আকৃষ্ট বা বিকৃতচিত্ত হইতে পারিবে না। ইহা অপেক্ষা আর কঠিন ব্যাপার কি হইতে পারে? কিন্তু ইহাও জানা আবশ্যক যে, যিনি এইরূপ সংযম সাধন করিতে পারেন, বিষম হলাহল পান করিয়াও জীর্ণ করিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত সংযমী, তিনিই যথার্থ জ্ঞানী, তিনি গৃহে থাকিয়াও উদাসীন। এবং "গৃহেঽপি পঞ্চেন্দ্রিয় নিগ্রহঃ শমঃ (তপ)" এই বাক্যও তাঁহারই নিমিত্ত। মহাকবি কালিদাসও বলিয়াছেন, "বিকার হেতৌ সতি বিক্রিয়ন্তে যেষাং ন চেতাংসি তে এব ধীরাঃ॥" অর্থাৎ বিকার সামগ্রী সমুদায় উপস্থিত সত্ত্বেও যাহাদের চিত্ত বিকৃত অর্থাৎ বিচলিত না হয়, তাঁহারাই যথার্থ ধৈর্য্যসম্পন্ন ধীর, তাঁহারা গৃহে থাকিয়াও সর্ব্বাশ্রমফল লাভ করিয়া থাকেন। সংসার তাঁহার পক্ষে অসার রজোরাশির ন্যায় অকিঞ্চিৎকর।

ফলকথা,—যাহারা গৃহাশ্রমে থাকিয়াও শাস্ত্রোক্ত নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মকলাপ বিহিত বিধানে আচরণ করিতে বিস্মৃত বা উদাসীন না হন, তাহারা এই একাশ্রমেই সর্ব্বাশ্রমের সকল ফল লাভ করেন (১)।

অতএব এ পরীক্ষাই যথার্থ পরীক্ষা, এবং ইহা হইতে উত্তীর্ণ হইলেই মনুষ্য অগ্নিদগ্ধ সুবর্ণের ন্যায় সম্পূর্ণ বিশুদ্ধিলাভ করে।

অবশিষ্ট আশ্রমত্রয়ের মধ্যে গার্হস্থ্যাশ্রমই উৎকৃষ্ট। উৎকর্ষের কারণ দুইটী, প্রথম কারণ গার্হস্থ্যই সর্ব্বাশ্রমের মূল, গৃহস্থ না থাকিলে অন্য কোন আশ্রমই স্থিতি লাভ করিতে পারে না; ব্রহ্মচারীই বল বানপ্রস্থই বল বা

(১) "স গৃহেঽপি বসন্নিত্যং সর্ব্বাশ্রমফলং লভেৎ"॥ মনু। ৩।

ভিক্ষুকই বল, ইহারা সকলেই গৃহস্থের অন্নে প্রতিপালিত এবং গৃহস্থ উঁহাদের রক্ষণাবেক্ষণে সবাধান থাকে বলিয়াই উঁহারা নিরাপদে নিজ ধর্ম্ম কর্ম্ম সম্পাদনে সমর্থ হন। দ্বিতীয় কারণ—আশ্রমীর অধিকার বা অবস্থা যাহার হৃদয়ে বিবেকবীজ প্রস্ফুটিত হয় নাই, তাহার পক্ষে সন্ন্যাসাদি গ্রহণ বিড়ম্বনা মাত্র।

কিন্তু গৃহস্থ স্বাশ্রমে থাকিয়া শাস্ত্রোক্ত সমস্ত নিয়ম প্রতিপালন করিবেন, এবং বিধিবিহিত কোন কার্য্যই ত্যাগ করিতে পারিবেন না। সুতরাং তাহার দৈনন্দিন পাপক্ষয়ের পথ অতি প্রশস্ত ও অপেক্ষাকৃত সহজ বলিতে হইবে। ইহার পরেও তাহাকে অশেষ প্রকার নিয়ম প্রতিপালন করিতে হইবে এবং ঋষিসেবিত সেই কঠোর সংযমসাধনেও নিত্য ব্রতী থাকিতে হইবে। গৃহি যদি ভাগ্যক্রমে সংযমের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানসিদ্ধিও লাভ করিতে পারেন, তাহা হইলেতো একেবারে মনিকাঞ্চন যোগ হইয়া উঠে; এবং সন্ন্যাসীর চিরকাঙ্ক্ষিতফলও তাহার করতলগত হইতে থাকে, কাযেই গৃহস্থাশ্রমকে সর্ব্বাশ্রমের সার বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে হয়। যাহারা তেজ ও তিমিরের ন্যায় অত্যন্ত বিরোধী ভোগ মোক্ষেরও একত্র সমাবেশ করিতে পারেন, তাঁহারা শ্রেষ্ঠ হইবে না তো হইবে কাহারা?

(ক্রমশঃ)

চিত্ত-শুদ্ধি।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

"মা! নির্গুণ ভক্তি যোগ কিরূপ, তাহাও বলি শ্রবণ করুন। আমার গুণ শ্রবণমাত্রে সর্ব্বান্তর্যামী যে আমি আমাতে অর্থাৎ পুরুষোত্তমে সমুদ্রগামী গঙ্গাসলিলের ন্যায় অবিচ্ছিন্না ও ফলানুসন্ধান রহিতা এবং ভেদ দর্শন বর্জ্জিতা মনের গতিরূপ যে ভক্তি, তাহাই ভক্তিযোগের লক্ষণ। যে সকল ব্যক্তির এইরূপ ভক্তিযোগ হয় তাহাদের কোনই কামনা থাকে না, অধিক কি তাহাদিগকে সালোক্য (আমার সহিত একলোকে বাস) সার্ষ্টি (আমার তুল্য ঐশ্বর্য্য) সামীপ্য (সমীপবর্ত্তিত্ব) সারূপ্য (সমান রূপত্ব) এবং একত্ব অর্থাৎ সাযুজ্য এই সকল মুক্তি দিতে চাহিলেও তাহারা আমার

সেবা ব্যতিরেকে কিছুই গ্রহণ করিতে চাহে না। মা! ঐ প্রকার ভক্তিযোগকেই আত্যান্তিক বলা যায়, উহা হইতে পরম পুরুষার্থ আর নাই। মানবি! ত্রৈগুণ্য ত্যাগ করিয়া ব্রহ্ম প্রাপ্তি পরম ধন বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে সত্য, কিন্তু তাহা আমার ঐ ভক্তির আনুষঙ্গিক ধন, ভক্তিযোগেই ত্রিগুণ অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তি হইয়া থাকে। মা! ঐ প্রকার ভক্তির সাধন, বলি শ্রবণ করুন। ধনাভিসন্ধি পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিত্য নৈমিত্তিক স্ব স্ব ধর্ম্মের অনুষ্ঠান এবং নিত্য শ্রদ্ধাদিযুক্ত হইয়া নিষ্কামে অনতিহিংস্র অর্থাৎ একেবারে হিংসাদি বর্জ্জন না করিয়া পঞ্চারাত্রাদ্যুক্ত পূজা প্রকরণ দ্বারা। আমার প্রতিমাদি দর্শন, স্পর্শন, পূজন, স্বকরণ বন্দন, সকল প্রাণীতে আমার ভাব চিন্তা করণ, ধৈর্য্য, বৈরাগ্য, মহৎ ব্যক্তিদিগকে বহু সম্মান করণ, দীনের প্রতি অনুকম্পা, আত্মতুল্য ব্যক্তিতে মিত্রতা, যম অর্থাৎ বাহ্যেন্দ্রিয়ের নিগ্রহ, নিয়ম অর্থাৎ অন্তরেন্দ্রিয় দমন, আত্ম বিষয় শ্রবণ, আমার নাম সংকীর্ত্তন, সরলতাচরণ, সতের সঙ্গকরণ এবং নিরহংকারিতা। ঐ সকল গুণ দ্বারা ভগবদ্ধর্ম্মানুষ্ঠানকারী পুরুষের চিত্ত সর্ব্বতোভাবে শুদ্ধ হয়, এবং সেই পুরুষ আমার গুণ শ্রবণমাত্রে বিনা প্রযত্নে আমাকে প্রাপ্ত হয়। ফলতঃ যেমন গন্ধ বায়ুযোগে স্বস্থান হইতে আসিয়া ঘ্রানকে আশ্রয় করে, তাহার ন্যায় ভক্তি যোগযুক্ত অধিকারীর চিত্ত বিনা প্রযত্নেই পরমাত্মাকে আত্মসাৎ করে। এই প্রকার চিত্ত-শুদ্ধি সর্ব্বপ্রাণীতে আত্মদৃষ্টি দ্বারাই হয়, আমি সকল ভূতের আত্মাস্বরূপ হইয়া সর্ব্বপ্রাণীতেই সতত অবস্থিত আছি। অথচ কোন কোন ব্যক্তি আমাকে অবজ্ঞা করিয়া প্রতিমাদিতে পূজারূপ বিড়ম্বনা করিয়া থাকে। পরন্তু আমি সর্ব্ব-প্রাণীতে বর্ত্তমান ও সকলের আত্মা এবং ঈশ্বর, যে ব্যক্তি মূঢ়তা প্রযুক্ত আমাকে উপেক্ষা করিয়া প্রতিমা পূজা করে, তাহার কেবল ভস্মে আহুতি প্রদান করা হয়। সে পরদেহে আমাকে দ্বেষ করে এবং অভিমানী, ভিন্নদর্শী ও সকল প্রাণীর সহিত বদ্ধ বৈর হয়, সুতরাং তাহার মন শান্তি প্রাপ্ত হয় না। হে অনঘে! যে ব্যক্তি প্রাণী সমূহের নিন্দাকারী, সে যদি বিবিধ দ্রব্য ও বিবিধ দ্রব্যে উৎপন্নাদি ক্রিয়া দ্বারা আমার

প্রতিমাতে আমার পূজা করে তথাচ আমি তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হই না। মা! এমত বিবেচনা করিবেন না যে প্রতিমাদিতে অর্চ্চনা করা বিফল। পুরুষ যে পর্য্যন্ত সর্ব্বপ্রাণীতে অবস্থিত যে আমি, আমাকে আপনার হৃদয় মধ্যে জানিতে না পারে তাবৎ পর্য্যন্ত স্বধর্ম্মে রত হইয়া প্রতিমাদিতে অর্চ্চনা করিবে। পরন্তু যে মূঢ় আপনার ও পরের মধ্যে অত্যল্পও ভেদ দর্শন করে অর্থাৎ যাহার আপনার দুঃখের তুল্য পরের দুঃখ অনুভব হয় না, আমি সেই ভিন্নদর্শী ব্যক্তির প্রতি মৃত্যু স্বরূপ হইয়া ঘোরতর ভয় বিধান করি। অতএব পুরুষের কর্ত্তব্য যে আমাকে সর্ব্বভুতের অন্তর্যামী এবং সকল প্রাণীতে অবস্থিত জানিয়া দান, মান ও সকলের সহিত মিত্রতা এবং সমদৃষ্টি দ্বারা সকলকে অর্চ্চনা করে।

চিত্ত-শুদ্ধি সম্বন্ধে এইরূপ উক্তি হিন্দু ধর্ম্মের সকল গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে, বাহুল্যে প্রয়োজন নাই। হিন্দুদিগের স্মরণ থাকে যেন, যে চিত্ত-শুদ্ধি ব্যতীত প্রতিমাদি পূজায় কোন ধর্ম্ম নাই। সে স্থলে প্রতিমাদির পূজা বিড়ম্বনা মাত্র।

এই চিত্ত-শুদ্ধি মনুষ্যদিগের সকল বৃত্তিগুলির সম্যক স্ফুর্ত্তি পরিণতি ও সামঞ্জস্যের ফল। ভক্তি ও প্রীতি কার্য্যকারিণী বৃত্তি। কিন্তু কেবল কার্য্যকারিণী বৃত্তির অনুশীলনে ধর্ম্মলাভ হইতে পারে না। চিত্ত-রঞ্জিণী বৃত্তিগুলির অনুশীলন ব্যতীত ধর্ম্মের মাহাত্ম্য এবং সৌন্দর্য্য সম্যকরূপ উপলব্ধ হয় না, এবং চিত্ত-শুদ্ধির সকল পথ পরিষ্কার হয় না। শারীরিক বৃত্তি সকলের সমুচিত অনুশীলন ব্যতীত ধর্ম্মানুমোদিত কার্য্যের উপযোগী ক্ষমতা জন্মে না, এবং হৃদয় ও শান্তিলাভ করে না। অতএব চিত্ত-শুদ্ধি, সকল বৃত্তিগুলির সম্যক্ অনুশীলন ও সামঞ্জস্যেরই ফল। একথা সমায়ান্তরে সবিস্তারে বুঝাইব ইচ্ছা আছে।

শ্রীবলাইচাঁদ মল্লিক।

চিত্তশুদ্ধির উপায়।

গত জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার "পন্থা"য় সুলেখক শ্রীযুক্ত বলাইচাঁদ মল্লিক মহাশয় "চিত্ত-শুদ্ধি" নামক একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। প্রবন্ধে আলোচ্য বিষয়টী "পন্থার"ই উপযুক্ত। প্রবন্ধটী সুখপাঠ্য হইলেও স্থল বিশেষে লেখকের সহিত একমত না হওয়ায় দুঃখিত হইলাম। লেখক মহাশয় লিখিয়াছেন "এখন অনেক লোক দেখা যায় যে ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তিতে একেবারে বিমুখ; কিন্তু মনের কলুষ ক্ষালিত করে নাই। লোকের নিকট প্রতিপত্তির জন্য বা

লোক লজ্জায় কিংবা ঐহিক উন্নতির জন্য, অথবা ধর্ম্মের ভাণে পীড়িত হইয়া তাহারা সংযতেন্দ্রিয়ের ন্যায় কার্য্য করে; কিন্তু ভিতরে ইন্দ্রিয়ের দাহ বড় প্রবল। আজন্ম মৃত্যু পর্য্যন্ত তাহারা কখন স্খলিত পদ না হইলেও তাহারা ইন্দ্রিয় সংযম হইতে অনেক দূরে। যাহারা মুহুর্ম্মুহুঃ ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তিতে উদ্যোগী ও কৃতকার্য্য তাঁহাদিগের হইতে উক্ত ধর্ম্মাত্মাদের প্রভেদ বড় অল্প।" "এস্থলে আমার বক্তব্য এই যে লোকের নিকট প্রতিপত্তির জন্যই হউক, লোকলজ্জা প্রযুক্তই হউক অথবা অন্য যে কোন কারণেই হউক যাঁহারা স্খলিত পদ না হন, তাঁহাদের সহিত যাঁহারা মুহুর্মুহুঃ ইন্দ্রিয় পরিতর্পণে কৃতকার্য্য, তাঁহাদের প্রভেদ যদি না থাকে, তবে ধর্ম্মশাস্ত্রাদিতে মানসিক ও কায়িক পাপ ক্ষালন জন্য প্রায়শ্চিত্তের বৈষম্য দৃষ্ট হয় কেন? ধর্ম্মশাস্ত্রাদিতে পরিদৃষ্ট হয় যে মানসিক অপেক্ষা কায়িক পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত অধিক। এমত স্থলে মানসিক পাপীর সহিত কায়িক পাপীর সমতা করা উচিত বলিয়া বোধ হয় না। এমন অনেক দেখা গিয়াছে যে অনেকে প্রথমাবস্থায় লোক লজ্জা প্রযুক্তই হউক অথবা অন্য কোন কারণেই হউক ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তিতে বিমুখ হইয়া পরে চিত্তশুদ্ধি দ্বারায় মহাত্মা বলিয়া পরিগণিত হন। ধরিতে গেলে ইন্দ্রিয় সংযমই চিত্ত-শুদ্ধির উৎকৃষ্ট সোপান। লোকলজ্জা প্রযুক্তই হউক অথবা অন্য কোন কারণেই হউক ইন্দ্রিয় সকলকে সংযত করিবার চেষ্টা করিলে ক্রমেই ইন্দ্রিয় সকল সংযত হইয়া চিত্তের শুদ্ধতা জন্মে। ইন্দ্রিয় সংযমের প্রথমাবস্থাতেই চিত্তের শুদ্ধতা জন্মে না। ইন্দ্রিয় সকল সংযত হইলে ক্রমে তত্তদিন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুতে বিরাগ উৎপন্ন হইয়া চিত্তের শুদ্ধতা জন্মে। আর এক কথা লেখক মহাশয়ের মতে সংসার ধর্ম্মেই, কার্য্যক্ষেত্রেই ইন্দ্রিয় সংযমলাভ করা যায়। আমার বিবেচনায় কার্য্যক্ষেত্রে ইন্দ্রিয় সংযম লাভ অসম্ভব না হইলেও বড়ই কঠিন। যে ইন্দ্রিয়ের যত পরিতর্পণ করা যায়, তাহা ততই অপরিতৃপ্ত হয়; কারণ ইন্দ্রিয়ের দাহ বড়ই প্রবল। তদপেক্ষা ধর্ম্মগ্রন্থাদি পাঠ দ্বারা যদি তত্তদিন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুতে ঘৃণার উৎপত্তি হয়, তবেই ইন্দ্রিয় সকল সুসংযত হয়। প্রাতঃস্মরণীয় শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি মনীষিগণ এই উপায়েই ইন্দ্রিয় সকল সংযত করেন। লেখক মহাশয় লিখিয়াছেন, "যোগে বা তপস্যায় ইন্দ্রিয় সকল সংযত হয় না।" অবশ্য প্রথমাবস্থায় কোন প্রকারেই ইন্দ্রিয় সকল সংযত হয় না; কিন্তু সাধনা করিলে তপশ্চর্য্যা দ্বারা যেরূপ শীঘ্র ইন্দ্রিয় সকল সুসংযত হয়, এরূপ আর অন্য কিছুতেই হয় না। অধিক বাহুল্য।—

শ্রীরাজগোপাল আচার্য্য।

বিজ্ঞান, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য।

আমাদের ব্যক্তিত্ব এক কি বহু, এই লইয়া ইউরোপে অনুসন্ধান চলিতেছে। তৎসম্বন্ধে M. Charles Richet নামক বৈজ্ঞানিক একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তিনি আমাদের ব্যক্তিত্বের অহংভাব বিশ্লেষণ করিয়া বলেন যে, ইহা সর্ব্বপ্রথমে এবং প্রধানতঃ আমাদের স্মৃতি হইতে উদ্ভূত; তৎপরে এই অহংজ্ঞান বহির্জগত এবং আমাদের ইন্দ্রিয় এতদুভয় হইতে উৎপন্ন ভাবসকল এবং শরীর চালনাদি হইতে উৎপন্ন প্রযত্ন দ্বারা পরিপুষ্ট হয়। তাঁহার মতে একাধারে বহুব্যক্তিত্বের যে সকল ঘটনা দেখা যায় তাহা বাস্তবিক বহুব্যক্তিত্বের খেলা নহে। একই ব্যক্তি অন্য একটি লোকের সহিত কথা কহিতেছে, এবং সেই সময়ে তাহার দুইটী হস্ত দুইটী পরস্পর বিভিন্ন বিষয় লিখিতেছে, এইরূপ ঘটনা অনেক সংগৃহীত হইয়াছে। এ বিষয়ে M. Richet বলেন, যে ইহা হইতে অনেকে মনে করেন যে তিনটী বিভিন্ন ব্যক্তিত্ব প্রকাশ হইল, কিন্তু সেটী ভুল। তাঁহার মতে আমাদিগের "আমিটী" অসীম ক্ষমতাশালী, এবং আমাদের প্রজ্ঞা বা consciousness. বহু ভাবে আকার ধারণ করিতে পারে, এবং এমন কি এক সঙ্গে, এক সময়ে, অভ্যন্তরীণ চিৎশক্তি বহু বিভিন্ন ভাবে প্রতীয়মান হইতে পারে। এই বিভিন্ন ভাবের মধ্যে একই দেহী বর্ত্তমান, বাস্তবিক তাহার ভিতরে কোন বিভিন্নতা নাই। তবে যেন খেলার জন্য, অভিনয়ের জন্য আপনাকে আপাততঃ প্রতীয়মানও বিভিন্নরূপে বিকাশ করে। এমতে কতকটা সত্য আছে তাহা স্বীকার্য্য। তবে ঐ অভিনেতা দেহী বা অহোঙ্কারোপাধিযুক্ত জীবভাবাপন্ন "অহং" আত্মা নহে। ব্যক্তিত্ব অর্থে যতদিন জীবভাব বুঝিব, ততদিন বহু ব্যক্তিত্বের রহস্য ঠিক বুঝা যাইবে না। এবিষয়ে পন্থায় যে প্রবন্ধটী প্রকাশিত হইতেছে তাহা পাঠ করিলে রহস্য কতকপরিমাণে বুঝা যাইতে পারে।

* * *

আমাদের জীবনীশক্তি কি, তৎসম্বন্ধে প্রতীচ্য বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকগণের মত অনেকেই অবগত আছেন। এতদিন বৈজ্ঞানিক জগতে জীবনীশক্তি স্বতন্ত্র শক্তি বলিয়া গৃহীত হইত না। বিভিন্ন পদার্থ সমন্বয় হইতে যেরূপে সুরা উৎপন্ন হয়, সেইরূপ পরমাণু সংঘাতে জীবনীশক্তির উৎপত্তি। এই মত এতদিন সর্ব্ববাদী সম্মত ছিল; কিন্তু জ্ঞানের চর্চ্চার সহিত অল্পে অল্পে সে মত পরিবর্ত্তিত হইতেছে। আমাদের শাস্ত্র চিরকালই বলিয়া আসিতেছে যে চিৎ বা জীবনীশক্তি জড় পরমাণুর অন্তর্ভূত নহে। পরন্ত উহা ঈশ্বরের দৈবী প্রকৃতির বিকাশ মাত্র। উহা অপার্থিব ও অজড়। মনোবিজ্ঞান ও আত্মানুসন্ধানের সাহায্যে যে সত্য আমাদের দেশে আবিষ্কৃত, তৎ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক Sir Oliver Lodge কি বলেন তাহা শুনুন। "জীবনী শক্তি যে শুধু অপার্থিব বা প্রকৃতি বহির্ভূত তাহা নহে ইহা জড়ও নহে। যাহাকে আমরা জড় বা শক্তি বলি, ইহা তদুভয়ের বাহির্ভূত, কিন্তু তাহাদের ন্যায় সত্য এবং তাহাদের নিয়ন্তা। এই অত্যাশ্চর্য্য শক্তির সাহায্যে বিবিধ জড় পদার্থে গঠিত, ও উপাধিসকল উজ্জীবিত হয় এবং কিছু দিনের জন্য উপাধিগত শক্তি সকলকে এই শক্তি ব্যবহার করিয়া খেলা করে, ও তৎপরে আবার কোথায় চলিয়া যায়। এই জগতে এই শক্তির আবির্ভাবের সহিত ব্যক্তিত্বের প্রকাশ হয়। এই শক্তি আপনাকে আপনি জানিতে চেষ্টা করে, এবং ব্যক্তিত্বলাভ করিয়া আপন বিজ্ঞানময় এবং আধ্যাত্মিক অস্তিত্ব আপনি উপলব্ধি করে। এই শক্তি পদার্থবিজ্ঞান রসায়ন প্রভৃতি বিজ্ঞানের বহির্ভূত। ইহা স্বকার্য্য উদ্ধারার্থ জড় পরমাণু সকলকে চালনা করে এবং এই সৌরজগত ও পৃথিবী নষ্ট হইয়া গেলেও ইহা স্বকীয় গুণে অদৃশ্য মনোহর জগতে অবস্থান করে।"

নবম ভাগ। { ভাদ্র। } ৫ম সংখ্যা।

মহিম্ন স্তব।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

বিয়দ্ব্যাপী তারাগণগুণিত-ফেনোদ্গমরুচিঃ,
প্রবাহো বারাং যঃ পৃষত লঘুদৃষ্টঃ শিরসি তে।
জগদ্দ্বীপাকারং জলধিবলয়ং তেন কৃত-
মিত্যনেনৈবোন্নেয়ং ধৃত-মহিমদিব্যং তব বপুঃ॥ ১৭।

প্রভোরাকারঃ কীদৃশঃ যেন স নৃত্যতি ইতি বিশ্বম্ভর মূর্ত্তেস্তস্য শরীর-স্যালৌকিকত্বম্ বর্ণয়ন্ স্তৌতি বিয়দিতি। তে তব শিরসি মস্তকে মহাকাশ ইত্যর্থঃ ব্যোমকেশত্বাদীশ্বরস্য প্রসিদ্ধমেব। বিয়ং আকাশং। বিয়ৎ শব্দেনাত্র দর্শক মস্তকোপরি আকাশস্ত যাবানাংশোবর্ত্ততে তাবানংশো বোদ্ধব্যঃ। তদ্ব্যাপ্নোতি ইতি তথোক্তঃ তারাগণৈঃ নক্ষত্রপুঞ্জৈঃ গুণিতা বৰ্দ্ধিতা ফেনোদ্গমানাং উদ্গতফেনানামিত্যর্থঃ রুচিঃ শোভা যস্য স তথোক্ত,

যো বারাং জলানাং মন্দাকিনীজলানামিত্যর্থঃ আপঃ স্ত্রী ভূমিবার্বারি সলিলং কমলং জলমিত্যমরঃ। প্রবাহঃ স্রোতঃ ছায়াপথরূপঃ পৃষতইব বিন্দুরিব লঘুঃ দুরত্বাদল্পঃ সন্নিত্যর্থঃ দৃষ্টঃ। মস্তকাকাশ মণ্ডলব্যাপিত্বা-মহানপি যো মন্দাকিনী প্রবাহঃ তব মহাকাশরূপে শিরসি, সমুদ্রে বারি-বিন্দুরিব লঘুতয়া দৃষ্ট ইত্যর্থঃ। তেন প্রবাহেণ জগৎ অনন্তাকাশব্যাপি দৃশ্যাদৃশ্য গ্রহনক্ষত্রাদিরূপং সমস্তং ব্রহ্মাণ্ডখণ্ডমিত্যর্থঃ, জলধি সমুদ্রোবলয়ং বেষ্টনং যস্য তৎ তথোক্তং পৃথিবী মণ্ডলং সাগরেণেব সমস্ত জগৎ তেন প্রবাহেণ সবেষ্টনম্ অতএব দ্বীপস্যেব আকারঃ আকৃতির্যস্য তৎ তথোক্তং কৃতম্। তব শিরস্তেকদেশে মন্দাকিন্যাঃ যঃ প্রবাহো বর্ত্ততে তত্র পৃথ্বীব কোটিঃ কোটি জগন্তি দ্বীপাকারেণ বর্ত্তন্তে ইতি ভাবঃ। যদ্বা তারাগণ বর্জ্জিত শ্রিয়া তেন প্রবাহেন আকাশরূপ জলধিনা বেষ্টিতং অতএব দ্বীপাকারং জগৎ জগৎপুঞ্জং পুনরেব আত্মাধিষ্ঠানেন দ্বীপাকারং কৃতং। এতেন যাবদাকাশং তাবজ্জগৎ, তচ্চ সমস্তং জগত্তে শিরস্থ নক্ষত্রগণশোভিত বারিপ্রবাহেণ বেষ্টিতমিতি জগৎপুঞ্জ পুঞ্জতোঽপি মহত্তর স্তে মস্তকৈক-দেশবর্ত্তী প্রবাহ ইতি সূচিতং। অতোঽপি মহত্তরং চ তে বপুরিত্যত আহ। ইতীতি। ইতি পূর্ব্বোক্তেন অনেনৈব বিধিনা মস্তক মহত্ত্বদর্শনে-নৈবেত্যর্থঃ ধৃতঃ মহিমা মহত্ত্বং যেন তৎ তথোক্তং দিব্যং অলৌকিকং তব বপুঃ শরীরং উন্নেয়ং অনুমেয়ং অনেন তব মস্তক মহিম্নৈব তব বপুষো মহত্ত্বং অলৌকিকত্বঞ্চ সুধীভিরনুমেয় মিতি ভাবঃ। ১৭।

প্রভুর আকার কিরূপ যে তিনি নৃত্য করেন, ইহা বুঝাইবার নিমিত্ত সেই বিশ্বম্ভর মূর্ত্তির অলৌকিক শরীর বর্ণনা করিয়া স্তব করিতেছেন।

মধ্যে মধ্যে পৃথিবীতুল্য ভূরি ভূরি নক্ষত্রগণের অবস্থানে যে মন্দাকিনী প্রবাহের ফেনশোভা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে, আকাশ মণ্ডলব্যাপী সুবিস্তীর্ণ সেই মন্দাকিনী প্রবাহ তোমার অনন্ত আকাশরূপ মস্তকের কিঞ্চিন্মাত্র স্থান অধিকার করায়, সাগরে জলবিন্দুর ন্যায় ক্ষুদ্র দৃষ্ট হইতেছে। সেই মন্দাকিনী প্রবাহ জলের মধ্যে পৃথিবী যেমন জলময় ও দ্বীপাকার হইয়া অবস্থান করিতেছে, সেইরূপ কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডখণ্ডও জলধিবলয় দ্বীপাকার হইয়া রহিয়াছে। তোমার মস্তকের পরিমাণ এই। এখন

এতদ্বারা তোমার শরীরের অলৌকিকত্ব ও মহত্ব লোকে অনুমান করিয়া দেখুক। ১৭।

রথঃ ক্ষৌণী যন্তা শতধৃতিরগেন্দ্রো ধনুরথো,
রথাঙ্গে চন্দ্রার্কৌ রথচরণ-পাণিঃ শর ইতি।
দিধক্ষোস্তে কোঽয়ং ত্রিপুর-তৃণমাড়ম্বর-বিধি-
র্বিধেয়ৈঃ ক্রীড়ন্ত্যো ন খলু পরতন্ত্রাঃ প্রভুধিয়ঃ ॥ ১৮ ॥

বপু মহিমানমুক্ত্বা সম্প্রতি পুরনাশন ব্যাপারমবলম্ব্য তস্যাজ্ঞেয় মদ্ভুত চরিত মহিমানাং বর্ণয়তি।

রথ ইতি। তত্র রুদ্র পক্ষে সাধারণ গ্রহণযোগ্য আবরকার্থঃ। ত্রিপুর স্ত্রিপুরাসুর এব তৃণং তদ্দগ্ধুমিচ্ছো স্তে ক্ষৌণী পৃথিবী রথঃ চন্দ্রার্কৌ চন্দ্রসূর্য্যো-রথাঙ্গে রথচক্রে, শতং ধৃতয়ঃ ক্রতবো যস্য স তথোক্ত ইন্দ্রঃ যন্তা সারথিঃ। "নিয়ন্তা প্রাজিতা যন্তা সূতঃ ক্ষত্তা চ সারথি" রিত্যমরঃ। ন গচ্ছন্তি ইতি অগাঃ অগেন্দ্রঃ পর্ব্বতশ্রেষ্ঠঃ মন্দরঃ ধনুঃ রথচরণশ্চক্রং পানৌ হস্তে যস্য স তথোক্তো বিষ্ণুঃ শরঃ বানঃ ইত্যয়ং ইত্যেবম্প্রকারঃ আড়ম্বরবিধিঃ মহান আরম্ভঃ কঃ কিমর্থঃ। নিরর্থক এবেতি ভাবঃ। হেলয়া কোটি কোটিব্রহ্মাণ্ডনির্ম্মাণ-স্থিতি লয়কারিণস্তব সংবন্ধে অযুতমত্তহস্তিবলধরোঽপি ত্রিপুর স্তৃণমিব লঘুরিতি ন যত্নতঃ সংহরণীয়স্তৎ কিমর্থোঽয়ং বৃথাড়ম্বর প্রকার ইতি নিষ্কৃষ্টার্থঃ। অথবা কিমত্র হেতোরন্বেষণে ইত্যর্থান্তরং ন্যস্যতি বিধেয়ৈরিতি। বিধেয়ৈঃ অনুজীবিভিঃ কার্য্যৈর্বা ক্রীড়ন্ত্যঃ স্বেচ্ছয়া বিচরন্ত্যঃ প্রভুণাং ঈশ্বরাণাং ধিয়ঃ সঙ্কল্পাঃ (অস্মাকমিব) ন খলু পরতন্ত্রাঃ অস্মাদৃশানাং জীবানাং অন্যেষাং বা বস্তুনাং অধীনা ইত্যর্থঃ। ঈশ্বরসৃষ্টপদার্থানুগুণমেবাস্মাকং প্রয়োজনং প্রবৃত্তিশ্চ ভবতীতি তৎ সৃষ্টানাং বস্তুপ্রাণিনামধীনৈরস্মাভির্বস্তুনাং প্রাণিনাঞ্চ প্রয়োজনং প্রবৃত্তির্বা কথঞ্চিদনুমীয়তে নত্বীশ্বর প্রবৃত্তারস্মাকং কিমপ্যনুমানে প্রমাণমিতি ভাবঃ।

ব্রহ্ম পক্ষে অপাবৃতার্থঃ। ত্রিপুরঃ পুরতি অগ্রে গচ্ছতি ইতি পুরঃ অগ্রগঃ কারণমিতি যাবৎ, ত্রয়াণাং (তাপানাং) পুরঃ কারণং অদৃষ্টমিতি যাবৎ সএব তৃণং তদ্দগ্ধুং বিনাশয়িতুমিচ্ছোস্তে পরমাত্মনোঽপি জীবাত্মভূতস্য তব, ক্ষৌণী ক্ষিতিঃ কার্য্যার্থমালম্বনভূত দেহ ইত্যর্থঃ রথঃ, শতং অতি-

শয়িতা ধৃতির্ধৈর্য্যং, ধৃতির্যয়া ধারয়তে মনঃ প্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়েতি। যন্তা সারথিঃ দেহরথবাহনানাং ইন্দ্রিয়াণাং নিয়ন্ত্রীত্যর্থঃ, অগন্তি বক্রং গচ্ছন্তি ইত্যগাঃ ন গচ্ছন্তি ইতি চ অগা স্তেষামিন্দ্রঃ অগেন্দ্রঃ পর্ব্বতশ্রেষ্ঠঃ হিমালয়াদ্রিঃ স ইব দৃঢ় নিশ্চলশ্চেত্যর্থঃ যঃ অগেন্দ্রঃ অগানামিন্দ্রিয়াণাং শ্রেষ্ঠঃ মনইত্যর্থঃ অত্রাপি অগশব্দস্য পূর্ব্ববদ্বিবিধা ব্যুৎপত্তিঃ। ধন্বঃ ত্রিতাপঃ নিধন সাধনং মোক্ষসাধনমিতি যাবৎ। ধনধাতোরুস্। অগেন্দ্রো হিমালয়াদ্রি যথা পূর্ব্বং পক্ষযুক্তত্বাৎ সচলোঽপি পশ্চাৎ শতধৃতিনা ইন্দ্রেন পক্ষচ্ছেদান্নিশ্চলঃ কৃতঃ তথা অগেন্দ্রোমনঃ অগ্রে চঞ্চলমপি পশ্চাৎ জীবভূতেন ত্বয়া ত্রিতাপনাশার্থং অতিশয়িত ধৈর্য্যো নিশ্চলং করোতী তাৎপর্য্যং।* চন্দ্রার্কৌ চন্দ্র সূর্য্যৌ অহো রাত্রামিত্যর্থঃ। জন্য জনকত্ব সম্বন্ধেন অহো রাত্রোর্থে লক্ষণা।

রথাঙ্গে চক্রদ্বয়ং। চক্রং রথাঙ্গ মিত্যমরঃ। ক্রিয়তেঽনেনেতি ব্যুৎপত্ত্যা চক্রস্য ক্রিয়াসাধন রূপার্থতয়া তদ্বাচক রথাঙ্গ শব্দেনাপি ক্রিয়া সাধন দিবারাত্ররূপঃ কালাংশো লক্ষ্যতে। ন কেবলং চন্দ্রার্কয়োঃ বৃত্তা কারত্বাৎ চক্র সাদৃশ্যং স্থানানুমাপকং চক্রং যথা রথস্য গতিক্রিয়া সম্পাদনদ্বারা রথিনং শত্রু নাশোপযোগিস্থানং নয়তি তথা দিবারাত্রানুমাপকশ্চন্দ্রসূর্য্যরূপ কাল চক্রদ্বয়ং দেহস্য গতিক্রিয়া সম্পাদন দ্বারা দেহিনং ত্রিতাপনাশোপযোগিনী মবস্থাং নয়তীতি চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ কার্য্যতশ্চাপি চক্র সাদৃশ্যং দিবারাত্র স্যাপি চক্রবৎ পরিবর্ত্তনমনুসন্ধেয়ম্। রথচরণপাণিশ্চক্রপাণির্বিষ্ণুঃ। শৃণাতীতি শরঃ বিনাশ সাধনঃ ত্রিতাপনাশন ইত্যর্থঃ। অত্র শত্রুনাশে ধনুষা শর সংযোগইব চিত্তেন বিষ্ণু সংযোগরূপ ক্রিয়ৈব ত্রিতাপনাশে হেতুরিতি বিষ্ণোঃ শরোপম্যং। পরমাত্মা ত্বং জীবাত্মা ভূত্বা দেহে অধিষ্ঠায় অতিশয়িত ধৈর্য্যেণ নিশ্চলেন মনসা অহোরাত্রং বিষ্ণুধ্যানেনাধ্যাত্মিক মাধিভৌতিক মাধিদৈবিকঞ্চেতি ত্রিতাপং নাশয়সীতি ভাবঃ ইতি উক্ত প্রকারঃ অয়ং এব আড়ম্বর বিধিঃ ব্যাপার বাহুল্যানুষ্ঠানং কঃ কিমর্থঃ; সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কারণস্য

---

* "অত্রোপময়ায়ামগেন্দ্র শব্দঃ শ্লিষ্টঃ। পর্ব্বতানাং পক্ষবতাম্ ইন্দ্রেণ পক্ষচ্ছেদঃ রামায়ণে কথিতঃ। পূর্ব্বং কৃতযুগে তাত পর্ব্বতাঃ পক্ষিণোঽভবন্। তেঽপি জগ্মু র্দিশঃ সর্ব্বা গরুড়া ইব বেগিনঃ। ততস্তেষু প্রয়াতেষু দেবসঙ্ঘা মহর্ষিভিঃ॥ ভূতানিচ ভয়ং জগ্মু স্তেষাং পতন শঙ্কয়া। ততঃ ক্রুদ্ধঃ সহস্রাক্ষঃ পর্ব্বতানাং শতক্রতুঃ। পক্ষাংশ্চিচ্ছেদ বজ্রেণ ততঃ শত সহস্রশঃ॥" ইতি ১১৭-১১৯ শ্লো ১ম সর্গে সুন্দরা কাণ্ডে।

সর্ব্বশক্তিমতস্তবেদমনুষ্ঠান বাহুল্যং বৃথৈরেত্যর্থঃ। অথবা বৃথৈরাস্মাকং তর্ক প্রকারঃ ইত্যর্থান্তরং স্তুতি বিধেয়ৈরিতে। বিধেয়ৈঃ প্রভোরধীনৈ স্ব সৃষ্টিভূতৈঃ করণৈঃ ক্রীড়ন্ত্যঃ স্ফুরন্ত্যঃ প্রভোঃ পরমেশ্বরস্য ধিয়ঃ সঙ্কল্পাঃ অস্মদীয়া ইব ন খলু পরতন্ত্রাঃ পরাধীনাঃ। ঈশ্বরঃ শ্রেষ্ঠ পদার্থান্তরৈঃ সংবদ্ধা বয়মিতি তেষাং আনুকূল্য প্রাতিকূল্যাদি দর্শনেনৈবাস্মাকং প্রয়োজনং প্রবৃত্তি নিবৃত্তি র্বা ভবতি অতস্তং প্রমানে নৈবাস্মাকং প্রবৃত্ত্যাদিকং কথঞ্চিত্তুমীয়তে তত্ত্বীশ্বর প্রবৃত্তাবস্মাকং কিমপ্যনুমানে প্রমাণামিতি ভাবঃ। ১৮।

প্রোঢ়োক্তিমূলক পুরাণোক্ত ত্রিপুর নাশব্যাপার লক্ষ্য করিয়া ঈশ্বরের অদ্ভুত চরিত্র বর্ণনা করিতেছেন। আবরকার্থ। তোমার পক্ষে ত্রিপুরাসুর তৃণ তুল্য। তাহাকে নষ্ট করিতে তোমার পৃথিবীকে রথ করা কেন? ইন্দ্রকে সারথি করা কেন, আর মন্দর পর্ব্বতকে ধনু ও বিষ্ণুকেই বা শর করা কেন? এত আড়ম্বর কি জন্য? অথবা স্বহস্ত নির্ম্মিত পুত্তলিকাদি লইয়া শক্তিমানদের ক্রীড়া তাঁহাদেরইচ্ছানুসারেই হয়, পরের ইচ্ছানুসারে হয় না। ১৮।

অপাবৃতার্থ। ত্রিতাপের কারণীভূত অদৃষ্টরূপ তৃণ দগ্ধ করিতে পরমাত্মা হইয়াও জীবাত্মা হইয়া দেহরূপ রথ আশ্রয় করা কেন? সে রথ চালাইতে চন্দ্র সূর্য্যরূপ কালচক্র কেন? ইন্দ্রিয়গণকে অতি চঞ্চল ও বেগবান্ করিয়া আবার ধৈর্য্যরূপ সারথি দ্বারা তাহাদিগকে নিয়ত করা কেন? আর মনকেই বা পর্ব্বতদিগের ন্যায় শতঃ গতিশীল ও তীব্র জব করিয়া পশ্চাৎ নিশ্চল করিয়া ধনু অর্থাৎ মোক্ষ সাধন করা কেন? আর এই মনোরূপ ধনুর সহিত সংযোগার্থ বিষ্ণুকেই বা বিনাশসাধন শর করা কেন? ফলিতার্থ এই যে, ত্রিতাপের সৃষ্টিই বা কেন, আবার সেই ত্রিতাপ নষ্ট করিতে তোমার জীবাত্মা হইয়া দেহে অধিষ্ঠান, তৎপরে অহোরাত্র যত্ন সহকারে বিশিষ্ট ধৈর্য্য অবলম্বন, তৎপরে ধৈর্য্য দ্বারা চঞ্চল মনকে স্থির ও দৃঢ় করণ, ও তৎপরে সেই মনঃসংযোগে বিষ্ণু ধ্যান এই সকল ক্রিয়া বাহুল্য কেন? অথবা যে সকল কাজ করিয়া ক্রীড়া করিতে ঈশ্বরের ইচ্ছা হয় তিনি তাহাই করেন। তাঁহার ক্রীড়া আমাদের ইচ্ছাধীন নয়। ফলিতার্থ তিনি এইরূপই করেন, কেন করেন তাহা কে বলিতে পারে? আমাদের ইচ্ছার নিয়ামক আছে কিন্তু তাঁহার ইচ্ছার নিয়ামক তিনি ভিন্ন আর কেহই বা কিছুই নাই। ১৮। (ক্রমশঃ)

৺প্যারীমোহন সেন গুপ্ত কবিভূষণ।

প্রশ্নোত্তর।

আপনার প্রশ্নগুলির উত্তর একটু বেশী করিয়া লিখিব মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু তেমন সময় পাইলাম না তাই সংক্ষেপেই উত্তর দিব।

১ম প্রশ্ন।—যদি আমিই সেই ব্রহ্ম হই তাহা হইলে পূজা উপাসনা কি নিমিত্ত; কেই বা পূজা করে এবং কাহাকেই বা পূজা করে?

অদ্বৈতবাদ।

উত্তর।—অল্প শিক্ষিতা কিন্তু ভক্তিমতী একটী বঙ্গমহিলার নিকট অদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে গুটিকতক কথা শিখিয়াছিলাম; প্রথমে আপনাকে আমি সেই কথাগুলি বলিব। তিনি বলিয়াছিলেন যে "দেখ দুইটা ঘর আছে, আর মাঝে একটা দরজা আছে। যদি দরজা বন্ধ করে দাও তবে দুটি ঘর পৃথক হইয়া গেল। আর দরজা খুলিয়া দাও দুইটি ঘর এক হইয়া গেল; সেইরূপ ভগবান ও আমার মাঝে একটি দরজা আছে; সেই দরজাটি যতক্ষণ বন্ধ থাকে ততক্ষণ তিনি ও আমি পৃথক। কিন্তু যখন সেই দরজাটি খুলিয়া যায় তখন ঠিক বোধ হয় যে তিনি আর আমি এক; এই দরজাটি আমার বুকের কপাট।" ভক্তিমতীর এই কথা গুলি হইতে আমি বুঝিয়াছিলাম যে ভক্তির স্রোতে তাঁহার হৃদয়দ্বার কখন কখন উদ্ঘাটিত হইয়া যাইত এবং সেই সময়ে তিনি অদ্বৈতভাব অন্তরে অনুভব করিতেন। তাঁহার কথা হইতে ইহা শিখিয়াছিলাম যে যতক্ষণ হৃদয়দ্বার বন্ধ থাকে ততক্ষণ ঈশ্বর ও আমি পৃথক; কিন্তু ঐ দ্বার খুলিলেই তিনি ও আমি এক। যতক্ষণ পৃথক ততক্ষণ আমি তাঁহার উপাসক। হৃদয়ের দ্বার উন্মোচন করাই উপাসনার উদ্দেশ্য। দ্বার খুলিয়া গেলে আর উপাসনা থাকে না।

২য় প্রশ্ন। ভগবানের দয়া বলিলে কি বুঝায়? যদি সকলেই কর্ম্মাধীন, তবে দয়ার কার্য্য কি?

উত্তর। আমি ও তিনি এই ভেদ জ্ঞান যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ আমি দুঃখ পীড়িত; দুঃখ নিবৃত্তির জন্য কাতরতা যখন হৃদয়ে জন্মে তখন কাতরে তাঁহাকে ডাকি, তাঁহাকে দয়াময় ভাবিয়াই ডাকি, নহিলে ডাকিব কেন? এই ডাকার নাম উপাসনা। এই কর্ম্মের ফল

ভগবানের দয়া।

হৃদয়ের দ্বার উন্মোচন। এই যে আমি তাঁহাকে দয়াময় বলিয়া থাকি, ইহা তিনি বুঝেন ও তাঁহার দয়া প্রকাশ করেন; এবং আস্তে আস্তে হৃদয়ের গ্রন্থি ছেদন করেন। আমার কাতরতা নিবন্ধন তাঁহার দয়া আসে। যেমন বৎস ক্ষুধিত হইলে গাভীর স্তনে দুগ্ধ আসে।

তাঁহার শরণ লওয়ারূপ যে কর্ম্ম সেই কর্ম্মের ফল মহৎ হৃদয়ে মিলিয়া যায়, এবং হৃদয়ই মহৎ হইয়া যায় এবং হৃদয়ে সমস্ত স্রোত শান্ত হইয়া যায়। ইহার নাম যোগ। ইহার নাম সমাধি। ইহাই রুদ্ধ পুরবাসী জীবের চরম ধাম।

৩য় প্রশ্ন।—মায়াবলে জীবের স্বভাবের কি অবস্থা হয়?

উত্তর।—জীব ও পরমাত্মার মধ্যে মায়ার আবরণ থাকায় আমি (জীব) এখন পরমাত্মাকে পৃথক্ বলিয়াই মনে করি। মায়ার আবরণের এক দিকে এক ব্রহ্ম, অন্য দিকে অনেক জীব। মায়ার একদিকে Unity আর একদিকে Diverstiy ইংরাজী Diversity শব্দের সংস্কৃত কথা 'প্রকার'। এই প্রকার যিনি করেন তিনি প্রকৃতি, সেই জন্য মায়াই প্রকৃতি। আপনি প্রশ্ন করিয়াছেন মায়ার আবরণে পড়িলে স্বভাবের কি পার্থক্য হয়! ইহার উত্তর এই—যতক্ষণ আমি মায়াবশে আছি ততক্ষণ "আমি তুমি তাঁহারা" এই ভেদজ্ঞানের মধ্যে আছি; ততক্ষণ আমরা পৃথক্ পৃথক্ অনেক জীব আছি। এই জ্ঞানে "আমার" তোমার এইরূপ ভেদজ্ঞান করি ইহার নাম 'মমতা' (মম+তা)। 'মমতাই' অনৈক্যভাব। মায়াবশে স্বভাবে অনৈক্য ভাব থাকে, মায়াতীত হইলে স্বভাবে ঐক্যভাব প্রকাশ হয়। এই ঐক্যভাবই ব্রহ্মভাব। দ্বৈতভাব শব্দের অর্থ অনৈক্যভাব; অদ্বৈতভাব শব্দের অর্থ ঐক্যভাব।

ঐক্য, বাক্য, অনৈক্য।

ছেলেবেলা দ্বিতীয়ভাগ বর্ণপরিচয় যখন পড়িয়াছিলাম তখন ঐক্য বাক্য অনৈক্য এই তিনটি কথা এক শব্দে শিখিয়াছিলাম; বেদান্ত পড়িতে গিয়াও ঐ তিনটি কথা এক শব্দে শিখিয়াছি।

ঐক্য—ব্রহ্মভাব অনৈক্য—জীবভাব বাক্য—জীব ও ব্রহ্মের সংযোজক। এই বাক্যের অপর নাম স্ফোট (Fohat) ইংরাজী কথাতে "বাক্য" শব্দের অর্থ thought. Through Thought the *One* produces the *Many* and through thought the *Many* merges into the *One*.

বহুত্বভাব যখন ঐক্যভাবে লয় হয় তখন thought বা বাক্যও লয় পাইয়া যায়, ঐ অবস্থার নাম সমাধি বা যোগ।

মায়াতীত হইলে চিত্ত যোগ অবস্থায় থাকে। মায়াধীন অবস্থায় চিত্তে প্রথম মমতা উদয় হয় তার পর রাগ দ্বেষ ও ভয় জনিত নানারূপ বাক্য (Thoughts) জন্মে, ইহাই জীবের সংসার চক্রের অধঃস্রোত; বাক্যের ঊর্দ্ধস্রোতে পড়িলে, অভয়, অদ্বেষ ও বিরাগ ক্রমে ক্রমে উদয় হয় ও শেষে "মমতা" ঐক্যভাবে লয় হইয়া যায়।

ভগবান পতঞ্জলি এই "মমতা"কে অস্মিতা নাম দিয়াছেন। অস্মি I am ! অস্মি + তা = I am ness) পাতঞ্জল সূত্র অনুসারে এই অস্মিতা হইতেই রাগ দ্বেষ ও ভয় জন্মে। যোগাঙ্গ অভ্যাসে এই অস্মিতা ক্রমে ক্ষীণ হইয়া, শেষে যোগের ঐক্যাবস্থাতে লয় হইয়া যায়। অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও ভয় ইহাদের নাম ক্লেশ। মায়াধীন স্বভাব এই ক্লেশযুক্ত স্বভাব, মায়াতীত স্বভাব ক্লেশ মুক্ত স্বভাব। এই মায়াতীত স্বভাবের স্বরূপ সচ্চিদানন্দ ভাব; ইহাই বেদান্তের অর্থ।

শ্রীঅনন্তরাম।

ভক্তজীবন। *

(১)

প্রকৃত শান্তি জীবনের বাহ্য ক্রিয়াকলাপের দ্বারা লাভ হয় না। ইহা সম্পূর্ণরূপে মানসিক প্রসন্নতার উপর নির্ভর করে। এই কথা বিস্মৃত হইয়া যখন আমরা বাহ্যাড়ম্বরে মত্ত হই, তখন শান্তির পরিবর্ত্তে ঘোর অশান্তি উপস্থিত হয়। যিনি জীবনে যত অধিক পরিমাণে দুঃখ কষ্ট সহ্য করিয়া, পরের জন্য আত্মোৎসর্গ করিতে সক্ষম হন, তিনি তত অধিক পরিমাণে জীবনের চরমলক্ষ্যে অগ্রসর হইতে পারেন। আমরা যদি ধর্ম্মের বাহ্যাকর্ষণে মোহিত হইয়া কেবল সেই বাহ্যাড়ম্বরকেই অভীষ্টপদার্থ বলিয়া গ্রহণ করি, তাহা হইলে কোনও না কোন সময়ে ইহার অসারত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়া আমা-

* শ্রীমতী মিঃ বেশান্তের Doctrine of the Heart এর অনুবাদ।

দিগকে হতাশ হইতে হইবে। প্রারব্ধের ফল রোধ করা দুঃসাধ্য; অতএব যত শীঘ্র তাহা ক্ষয় হইয়া যায়, ততই মঙ্গল। যেরূপ রোগ দূর করিতে হইলে তিক্ত ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয়, সেইরূপ দূষিত সংস্কার দূর করিবার জন্য অপ্রিয় উপায় অবলম্বনও আবশ্যক হয়। যখন সেই মহাত্মাদিগের পাদপদ্মপ্রসূত বিমল শান্তির অমৃতধারা প্রবাহিত হইয়া, প্রাণকে তাহার মধুর হিল্লোল সংস্পর্শে পুলকিত করে, তখন সংসারের যে কোন প্রকার বিপদই উপস্থিত হউক না কেন, কিছুতেই চিত্তকে সেই অমৃতময় অভয়পদ হইতে চ্যুত করিতে পারে না।

যেমন কোন কোন ইউরোপবাসী ব্রহ্মবিদ্যার আকর্ষণে ভারতে পদার্পণ করিয়াই আপনাকে মহাপুরুষগণের সমীপস্থ মনে করেন, সেইরূপ কোন কোন ভারতবাসীরও এরূপ ধারণা আছে যে, তুষারমণ্ডিত হিমাচলে যাইতে পারিলেই সিদ্ধপুরুষগণের সান্নিধ্য প্রাপ্ত হওয়া যায়; কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ ভ্রম। স্থূলদেহের গতির সাহায্যে মহাত্মাদিগের নিকট উপস্থিত হওয়া যায় না। যদি আমরা চিত্তশুদ্ধি সম্পাদন না করি, তাহা হইলে তীর্থ পর্য্যটনই করি, অথবা হিমাচলের দুরারোহ শিখরেই আরোহণ করি, কিম্বা দুর্গম গহ্বরেই প্রবেশ করি, কিছুতেই পুণ্যাত্মাদিগের সাক্ষাৎ ঘটিয়া উঠিবে না। যতদিন না পরের মঙ্গল-মন্দিরে আত্মবিসর্জ্জন করিতে শিখিব, যতদিন না পরার্থপরতার তীক্ষ্ণ কুঠারে স্বার্থবলি দিয়া প্রকৃত অভ্যন্তরীণ শুচিলাভে সমর্থ হইব, ততদিন মহাত্মাদিগের পাদপদ্মমূলে উপস্থিত হইতে পারিব না।

অনেকেই বলিতে পারেন, তবে আমরা তাঁহাদের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত জানি না কেন? তাঁহারাই বা পৃথিবীর জনগণের নিকট প্রকাশিত হন না কেন? ইহার উত্তরে তাঁহাদিগের কথায়ই বলা যাইতে পারে,—"হিংস্র সর্পের গর্জ্জনে বরং হিমালয়ের অনিষ্ট হইতে পারে, তথাপি অজ্ঞান তিমিরাচ্ছন্ন পৃথিবীস্থ লোকের নিন্দায় অথবা ভর্ৎসনায় তাঁহাদের কিছুমাত্র ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না।"

(২)

অনেক অশরীরী প্রাণী আছে, যাহারা নানা প্রকার মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া

এবং অনেক প্রকার আকাশবাণীর অনুকরণ করিয়া আমাদিগকে বিপথে লইয়া যাইতে চেষ্টা করে। আবার কতকগুলি বামমার্গী পুরুষ আছে, যাহারা প্রকৃত ব্রহ্মবিদ্যাপ্রার্থীদিগকে নানাপ্রকার ভয় প্রদর্শন এবং প্রতারণা করিয়া আনন্দ অনুভব করিয়া থাকে। উক্ত কথা যদি স্বীকার করা যায় (যাঁহাদের গুপ্তবিদ্যা সম্বন্ধে সামান্য মাত্র জ্ঞানও আছে, তাঁহারা সকলেই একথা স্বীকার করিয়া থাকেন) তাহা হইলে, ইহাও অবশ্য স্বীকার্য্য যে, অশেষ করুণার আকর ও পরম ন্যায়বান পরমেশ্বরের প্রদত্ত এরূপ কতকগুলি শক্তি মানুষের আছে, যাহা দ্বারা সে এই অশরীরী পুরুষগণের প্রতারণা এবং আমাদের মঙ্গলার্থ মহাপুরুষগণের উপদেশ—এতদুভয়ের পার্থক্য বিশেষরূপে বুঝিতে পারে। সত্য মিথ্যা ভালমন্দ বাছিয়া লইবার জন্য আমাদের শ্রেষ্ঠবৃত্তি যুক্তি, সহজজ্ঞান ও বিবেক আছে। বিবেক ও হিতাহিতজ্ঞান দ্বারা যাহা কিছু সত্য ও ভ্রমশূন্য বলিয়া আমাদিগের নিকট বোধ না হইবে, যাহা কিছু আমাদের নৈতিক আদর্শে উচ্চ বলিয়া অনুভব না হইবে, তাহা কখনও স্বার্থত্যাগী পরমঙ্গলান্বেষী তত্ত্বজ্ঞানী মহাপ্রভুগণের নিকট হইতে আসিতে পারেন না।

আমাদিগকে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, মহাপ্রভুগণ জ্ঞান ও করুণারত্নের অধিকারী। তাঁহাদিগের বাক্য আমাদিগের চিত্ত আলোকিত ও প্রশস্ত করে; কখনও বিক্ষিপ্ত অথবা উৎপীড়িত করে না। এই সকল বাক্যে চিত্ত প্রসন্ন হয়, উত্তক্ত হয় না; উচ্চতা লাভ করে, নীচতা প্রাপ্ত হয় না। যাহাতে আমাদের বিচার শক্তি ও সহজজ্ঞান দীনতা ও অবশতা প্রাপ্ত হয়, কখনই তাঁহারা সেরূপ উপায় অবলম্বন করেন না। করুণা ও জ্ঞানের আধার হইয়াও মহর্ষিগণ যদি শিষ্যদিগের অন্তরে তাহাদিগের সদসৎ বিবেচনা ও নৈতিক জ্ঞানের বিরুদ্ধ ভাব সন্নিবিষ্ট করিতে চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলে তাহাদিগের বিশ্বাস বুদ্ধিসঙ্গত না হইয়া অন্ধ বিশ্বাসে পরিণত হইত; ধর্ম্মভাব বর্দ্ধিত না হইয়া নৈতিক অবসাদে ক্রিয়াহীন হইত। সাধনমার্গাবলম্বী তাহা হইলে সহায়হীন হইত—পথ হারাইয়া তাহাকে নানা অপদেবতার আয়ত্তে পতিত হইতে হইত। সাধন পথ অবলম্বন করিয়া শিষ্য যতই অগ্রসর হইবে, তাঁহারাও তাহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া নানারূপ

বিপদ হইতে এবং অনিষ্টকারী অশরীরী জীবদিগের হস্ত হইতে সর্ব্বদা তাহাকে রক্ষা করিবেন।

শারীরিক দুর্ব্বলতা আধ্যাত্মিক উন্নতির অন্তরায় হইতে পারে কি না, অন্যান্য নানারূপ সন্দেহের মধ্যে এই সন্দেহও সাধকের মনে উপস্থিত হইয়া থাকে। আধ্যাত্মিক শক্তি সঞ্চয় করিয়া আত্মার পরিপুষ্টি করা শারীরিক শক্তির উপর নির্ভর করে না। শারীরিক যাতনা ও ক্লেশ সত্বে ও আধ্যাত্মিক উন্নতি হইতে পারে; কিন্তু উপবাস ও ক্লেশ দ্বারা শরীরকে কষ্ট প্রদান করিলেই যে আধ্যাত্মিক উন্নতি হয়, ইহা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। প্রকৃত জ্ঞানাভাবেই লোকে এই ভ্রমে পতিত হয়। পবিত্রতাময় মহাত্মাদিগের অভিপ্রায় যাহাতে সিদ্ধ হয়, তদ্বিষয়ে চেষ্টা করিলেই প্রকৃত উন্নতি লাভ হয়। আধ্যাত্মিক জ্ঞানলাভের সুসময় উপস্থিত হইলে, শরীরের অসুস্থতা অথবা দুর্ব্বলতার জন্য কোনও বিঘ্ন ঘটে না। শারীরিক অসুস্থতা জনিত বিঘ্ন মুহুর্ত্ত মধ্যেই দুরীভূত হইতে পারে। যাহাতে মহাত্মাদিগের শুভ ইচ্ছা পূর্ণ হয়, সেইরূপ কার্য্য করিলেই ক্রমে ক্রমে তাঁহাদিগের প্রকৃতিলাভ করিতে সমর্থ হইব। তাঁহাদিগের প্রিয়কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইলে কোন প্রকার কৃচ্ছ্রসাধ্য অনুষ্ঠানের বিশেষ আবশ্যকতা নাই।　　(ক্রমশঃ)

শ্রীমণিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

তন্ত্র ও ব্রহ্মবিদ্যা।

ওঁ নমঃ পরমদেবতায়ৈ।

তন্ত্র সম্বন্ধে আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে কতকগুলি ভ্রান্ত সংস্কার বদ্ধমূল হইতে আরম্ভ হইয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও মতে তন্ত্র ধর্ম্মের আবরণে ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিবার কৌশলস্বরূপ কতকগুলি ক্রিয়াকলাপের সমষ্টি মাত্র, এবং কাহারও কাহারও মতে তন্ত্র আসুরিক শক্তি লাভের উপায় ((Black Magic) মাত্র। উভয় মতেই তন্ত্র অস্পৃশ্য ও অশ্রদ্ধেয়।

দুঃখের বিষয় এই, তন্ত্র সম্বন্ধে যাঁহারা এইরূপ মত প্রকাশ করেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই তন্ত্র শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন নাই। আমাদের বিশ্বাস

যিনি তন্ত্রশাস্ত্র বিশেষ মনোযোগের সহিত অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহার মনে উল্লিখিত সংস্কার স্থান লাভ করিতে পারে না।

সত্য বটে, তন্ত্রে এমন অনেকগুলি অনুষ্ঠানের উল্লেখ আছে, যাহা অভিলাষ বর্জ্জিত হইয়া কেবলমাত্র দেবতার প্রীতির জন্য * না করিলে ইন্দ্রিয় চরিতার্থতায় পরিণত হইতে পারে; কিন্তু সে সমস্ত অনুষ্ঠান যে সে অধিকারীর † পক্ষে নহে। সাধনা দ্বারা যাঁহাদের পর্য্যাপ্ত পরিমাণে চিত্তশুদ্ধি ও ভাব শুদ্ধি হইয়াছে ও যাঁহারা নিষ্কাম কর্ম্মমার্গে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে অগ্রসর হইয়াছেন ও পর্য্যাপ্ত পরিমাণে যাঁহাদের চিত্তের স্থৈর্য্যলাভ হইয়াছে তাঁহাদের কাম ও বাসনা গ্রন্থি শীঘ্র শীঘ্র ভেদ করিবার জন্য তন্ত্রে সেই সমস্ত অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা আছে। তত্ত্বদর্শী গুরু শিষ্যের বলাবল পরীক্ষা করিয়া সেই সমস্ত অনুষ্ঠানের উপদেশ করিবেন; কিন্তু সেই সমস্ত অনুষ্ঠান মুক্তি লাভের একমাত্র উপায় নহে। তন্ত্রে মোক্ষ সাধনের বিবিধ উপায় কথিত ও উপদিষ্ট হইয়াছে। উল্লিখিত অনুষ্ঠানে যাহাকে তন্ত্রে কুলাচার বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহা সেই সমস্ত উপায়ের অন্যতম মাত্র।

এতদ্ভিন্ন তন্ত্রে কাম্যকর্ম্ম প্রকরণে কতকগুলি আভিচারিক ক্রিয়া ও বিবিধ মন্ত্রের কাম্যকর্ম্মে প্রয়োগের ব্যবস্থা আছে। তৎসমস্ত প্রয়োক্তার নিজের স্বার্থ ও পরের অনিষ্ট সাধনে প্রযুক্ত হইলে Black magic এ পরিণত হইতে পারে, কিন্তু তাহা তন্ত্রের একদেশ মাত্র, ও সেই সমস্ত সাধনের সঙ্কেত (keys) তন্ত্র গ্রন্থ হইতে অপসারিত হইয়াছে। কেবল অধ্যয়ন দ্বারা সে সঙ্কেত লাভ করা যায় না; সুতরাং তাহা দ্বারা বিপদের সম্ভাবনা অল্প।

তন্ত্রে উল্লিখিত বিষয়গুলি আছে বলিয়া তন্ত্র অস্পৃশ্য বা অশ্রদ্ধেয় নহে। তন্ত্র একটী সম্পূর্ণ শাস্ত্র। অধ্যাত্ম শক্তিসমূহের স্বরূপ সম্যকরূপে দেখাইতে হইলে তাহাদের ইষ্টকারিতা ও অনিষ্টকারিতা, তাহাদের মোক্ষসাধনতা ও কাম্যসাধনতা দুইই দেখাইতে হয়, এবং প্রকৃত শক্তিমানের পক্ষে এত-

---

* যঃ সেবেত সুখার্থায় মদ্যাদীনি স পাতকী।
প্রাশয়েৎ দেবতা প্রীত্যাহ্যভিলাষ বিবর্জ্জিতঃ ॥ কুলার্ণবম্

† তন্ত্রে অধিকারী সম্বন্ধে গন্ধর্ব্ব তন্ত্র বলিতেছেন,—আস্তিকোঽথ শুচির্দান্তো দ্বৈতহীনো জিতেন্দ্রিয়। ব্রহ্মিষ্ঠো ব্রহ্মবাদীচ ব্রহ্মী ব্রহ্ম পরায়ণঃ। সর্ব্বহিংসাবিনির্মুক্তঃ সর্ব্বপ্রাণি হিতে রতঃ। সোঽস্মিন্‌শাস্ত্রেঽধিকারী স্যাৎ তদন্যো ভ্রমসাধকঃ ॥

দুভয়েরই জ্ঞান থাকা আবশ্যক; নতুবা সেই সমস্ত শক্তিকে জগতের মঙ্গল সাধনের জন্য পরিচালনা করা কঠিন হইয়া উঠে। অতএব বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে দেখিলেও তন্ত্রে ঐ সমস্ত বিষয় আজ অনাবশ্যক নহে; উহার অভাবেই বরং তাহার অঙ্গহীনতা।

ব্রহ্মবিদ্যা বলিলে যাহা বুঝায় তন্ত্র সেই ব্রহ্মবিদ্যা। উপনিষদ্ গীতা, প্রভৃতি প্রচলিত ব্রহ্মবিদ্যা শাস্ত্রে ব্রহ্মবিদ্যা সাধনের অনুষ্ঠানাংশ (practical অংশ) তত পরিপুষ্ট ভাবে প্রদর্শিত নাই; কিন্তু তন্ত্রে তাহা আছে। ইহাই তন্ত্রের বিশেষত্ব; ও তন্ত্রে ব্রহ্মবিদ্যা সাধনের অনুষ্ঠানাংশ বিস্তৃতরূপে বর্ণিত আছে বলিয়াই তন্ত্র সাধারণের নিকট প্রকাশ্য নহে, ও তজ্জন্যই তন্ত্র গুপ্তশাস্ত্র বা Occult Scienc বটে, ও তজ্জন্যই তন্ত্রের গোপনীয়তা সম্বন্ধে "গোপনীয়ং প্রযত্নতঃ", "গুপ্তা কুলবধূরিব," "গোপয়েৎ মাতৃজারবৎ," প্রভৃতি বহুবিধ শাসনবাক্য প্রযুক্ত আছে।

এই প্রবন্ধে তন্ত্র ও ব্রহ্মবিদ্যার একত্ব প্রদর্শনার্থ কয়েকটী সাধারণ বিষয়ের উল্লেখ করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করা যাইবে, পরে প্রবন্ধান্তরে কোন এক একটী বিশেষ বিষয় লইয়া ব্রহ্মবিদ্যা সম্বন্ধে তন্ত্রের উপদেশ আলোচনা করা যাইবে।

প্রথমতঃ জগতের উৎপত্তি সম্বন্ধে তন্ত্রশাস্ত্রের উপদেশ কি, তাহা দেখা যাউক। এ সম্বন্ধে ব্রহ্মবিদ্যা শাস্ত্র ও তন্ত্রশাস্ত্রের উপদেশ একই। ব্রহ্ম বিদ্যা শাস্ত্রে উপদিষ্ট আছে সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র এক ও অদ্বিতীয় 'সৎ' পদার্থ বিরাজমান ছিলেন (সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবা দ্বিতীয়ম্—শ্রুতিঃ।) সেই 'সৎ' সৃষ্টি কামনা করিলেন (সোঽকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয়—শ্রুতিঃ।) সেই সৃষ্টিকামনা যাহাকে শ্রুতিতে ঈক্ষা ও তন্ত্রে সিসৃক্ষা * বলা হইয়া থাকে, সেই সৃষ্টি কামনা হইতেই প্রকৃতি পুরুষের বিভাগ হইল—অদ্বৈত হইতে দ্বৈতের বিকাশ হইল; ও সেই সৎ (পুরুষ) প্রকৃতির উপাধিতে নিজকে সীমাবদ্ধ করিয়া ঈশ্বরত্বে পরিণত হইলেন ও সেই ঈশ্বর হইতে ক্রমে জগৎ প্রপঞ্চের আবির্ভাব হইল।

---

* ত্বত্তোজাতং জগৎ সর্ব্বং পরব্রহ্ম সিসৃক্ষয়া।—মহানির্ব্বাণ তন্ত্রম্। "হে দেবি, পরব্রহ্মের সিসৃক্ষা হেতু তোমা (প্রকৃতি) হইতেই সমস্ত জগতের উৎপত্তি হইয়াছে।"

ব্রহ্ম বিদ্যা শাস্ত্রে এই 'সৎ'কে পরমাত্মা, পরব্রহ্ম, নির্গুণব্রহ্ম, ইত্যাদি, ও ঈশ্বরকে সগুণব্রহ্ম, পরমেশ্বর, প্রভৃতি আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে। তন্ত্রেও ঐ ঐ স্থলে ঐ সমস্ত আখ্যার প্রয়োগ হয়; কিন্তু তন্ত্রে সচরাচর ব্রহ্ম ও ঈশ্বরকে সদাশিব বা শিব আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে যথা,—সারদা তিলকে—

নির্গুণঃ সগুণশ্চেতি শিবো জ্ঞেয়ঃ সনাতনঃ।
নির্গুণঃ প্রকৃতেরন্যঃ সগুণঃ সকলঃ স্মৃতঃ॥

সনাতন শিব নির্গুণ ও সগুন। নির্গুণ শিব প্রকৃতির অতীত, ও সগুণ শিব কলা অর্থাৎ প্রকৃতি যুক্ত।

এই নির্গুণ ব্রহ্মের স্বরূপ নির্ণয় করা যায় না। শ্রুতি কহিতেছেন :—

নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা।
অস্তীতি ব্রুবতোঽন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে॥

তাঁহাকে বাক্য দ্বারা, মনের দ্বারা, চক্ষুর দ্বারা (অর্থাৎ *কোনও* ইন্দ্রিয়ের দ্বারা) প্রাপ্ত হওয়া যায় না। 'তিনি আছেন' এই কথা বলা ব্যতীত কিরূপে তাঁহার উপলব্ধি হইবে বা 'তিনি আছেন' এই কথা যিনি বলেন, তিনি ভিন্ন আর কে কিরূপে তাঁহার অস্তিত্ব উপলব্ধি করিবে?

তন্ত্রেও তৎসম্বন্ধে সেই একই কথা, যথা—মহা নির্ব্বাণে—

"স এক এব সদ্রূপঃ সত্যোঽদ্বৈতঃ পরাৎপরঃ।" তিনি পরাৎপর, দ্বৈতরহিত, সত্যস্বরূপ, এক এবং অদ্বিতীয় 'সৎ' স্বরূপ। সেইরূপ অন্যত্র "সত্তা মাত্রং নির্ব্বিশেষমবাঙ্মনস গোচরম্।" "সত্তা মাত্র, নির্ব্বিশেষণ বা বিশেষ অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার উপাধি বর্জ্জিত, বাক্য ও মনের অগোচর।"

নির্গুণ ব্রহ্মকে—সময়ে সময়ে সগুণ ব্রহ্মকেও গীতা ও উপনিষদে অক্ষর আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে। তন্ত্রেও ব্রহ্ম অক্ষর শব্দে অভিহিত হইয়া থাকেন, যথা—গন্ধর্ব্ব তন্ত্রে—

অক্ষরাৎ সর্ব্বমুৎপন্নং জগদেতচ্চরাচরং।
নিত্যমেকাক্ষরং ব্রহ্ম অক্ষরং পরমং পদম্।

"অক্ষর হইতেই সমস্ত চরাচর জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে ব্রহ্ম, নিত্য, এক ও অক্ষর, অক্ষরই পরম পদ।"

কিন্তু তন্ত্রে এই অক্ষর শব্দের একটু বিশেষ অর্থ আছে। তন্ত্রে বিশ্বকে "শব্দময়" ও বিশ্বের আদি ঈশ্বরকে "শব্দব্রহ্ম" ও ঈশ্বরেরও আদি পরব্রহ্মকে "শব্দের মূল অক্ষর" বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। কিরূপে পরব্রহ্ম হইতে বিন্দু নাদ ও বীজাত্মক শব্দব্রহ্মের উৎপত্তি ও তাহা হইতে কিরূপে জগৎ প্রপঞ্চের বিকাশ, তন্ত্রে তাহার সবিস্তার বর্ণনা আছে; কিন্তু তাহা অতিশয় দুর্ব্বোদ্ধ্য। তত্বজ্ঞ গুরুর উপদেশ ও সাধনা ব্যতীত তাহা ধারণা করা কঠিন।

এস্থলে একটী কথা বলা আবশ্যক। নির্গুণ ব্রহ্ম হইতে অভিব্যক্ত ঈশ্বর বা সগুণব্রহ্মকে Theosophical সাহিত্যে 'Logos বলা হইয়া থাকে। বোধ হয় 'Logos' শব্দের সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী প্রতিশব্দ 'শব্দব্রহ্ম'; রাধাতন্ত্রে এ বিষয় আরও একটু পরিস্ফুট ভাবে দেওয়া আছে, যথা;—অক্ষরং নির্গুণং ব্রহ্ম পরং ব্রহ্মেতি গীয়তে। সগুণং স্যাদ যদা ব্রহ্ম শব্দব্রহ্ম তদুচ্যতে।

সগুণ ব্রহ্মকে বিশ্লেষণ করিলে তিনটী বিষয়ের জ্ঞান হয়—পুরুষ (চৈতন্য) প্রকৃতি (জড়াত্মক বিশ্বের মূল) ও পুরুষ ও প্রকৃতির দ্বন্দবিধায়িকা শক্তি বা মায়া।

মায়াকে তন্ত্রে ঈশ্বরের শক্তি বলা হইয়া থাকে। এই শক্তিবলেই ঈশ্বর মূলপ্রকৃতিকে অবলম্বন পূর্ব্বক সৃষ্টি কার্য্যে সমর্থ। কুব্জিকা তন্ত্রে এই বিষয়ে সুন্দর বর্ণনা আছে।

ব্রহ্মাণী কুরুতে সৃষ্টিং ন তু ব্রহ্মা কদাচন।
অতএব মহেশানি ব্রহ্মা প্রেতো ন সংশয়ঃ॥
বৈষ্ণবী কুরুতে রক্ষাং ন তু বিষ্ণুঃ কদাচন।
অতএব মহেশানি বিষ্ণুঃ প্রেতো ন সংশয়ঃ॥
রুদ্রাণী কুরুতে গ্রাসং ন তু রুদ্রঃ কদাচন।
অতএব মহেশানি রুদ্রঃ প্রেতো ন সংশয়ঃ॥

"হে মহেশানি! ব্রহ্মাণীই সৃষ্টি করেন, ব্রহ্মা করেন না; অতএব ব্রহ্মা প্রেত বা নিষ্ক্রিয়; বৈষ্ণবীই রক্ষা করেন, বিষ্ণু করেন না; অতএব বিষ্ণু প্রেত; রুদ্রাণীই গ্রাস করেন, রুদ্র করেন না, অতএব রুদ্র প্রেত; তাহার কোন সংশয় নাই।

এই শক্তি কথনও ঈশ্বর হইতে ভিন্ন নহেন, শক্তি ও শক্তিমান একই এই বিষয়ে সময়াতন্ত্রে কথিত আছে।

ন শিবেন বিনা শক্তি র্ন শক্তি রহিতঃ শিবঃ।
অবিনাভাবসম্বন্ধস্তয়োরানন্দরূপয়োঃ॥

"শিব বিনা শক্তি থাকিতে পারেন না ও শক্তি বিনা শিব থাকিতে পারেন না, আনন্দরূপ শিব ও আনন্দরূপিনী শিবা ইহাঁদের অবিনা ভাব সম্বন্ধ।"

ব্রহ্ম বিদ্যাশাস্ত্রে এই মায়াকে দ্বিবিধা বলা হইয়াছে, মায়া ঈশ্বরাভিমুখী হইলে বিদ্যা বা মহাবিদ্যা, ও প্রকৃত্যভিমুখী হইলে অবিদ্যা বা মহামায়া আখ্যা প্রাপ্ত হয়েন। ঈশ্বরাভিমুখী হইলে মায়া ঈশ্বরের সহিত মিশিয়া তাঁহার সহিত অভেদ হয়েন ও প্রকৃত্যভিমুখী হইলে প্রকৃতির সহিত মিশিয়া তাঁহার সহিত অভেদ হইয়া যান *। তন্ত্রেও এই বিষয়ে সুন্দররূপ বর্ণনা আছে,—যথা সময়াতন্ত্রে :—

সদাশিবো মহা প্রেতো নির্গুণঃ পরমেশ্বরি।
তন্নিষ্ঠা পরমাশক্তি র্গুণাতীতা সুনির্ম্মলা॥
সত্বরজস্তম ইতি গুণানাং ত্রিতয়ং প্রিয়ে।
যদা সা পরমাশক্তি র্গুণাধিষ্ঠানমাচরেৎ॥
প্রকৃতিত্বং ভবেৎ তস্যাঃ পুরুষঃ স্যাৎ সদাশিবঃ।

"হে পরমেশ্বরি! সদাশিব নির্গুণ ও মহাপ্রেত। যে পরমাশক্তি তাঁহার অধিষ্ঠিতা আছেন, তিনিও গুণাতীতা ও সুনির্ম্মলা। যখন সেই পরমাশক্তি সত্ত্বরজস্তমঃ এই গুণ ত্রিতেয় (এই গুণ ত্রিতয়ের সাম্যাবস্থা প্রকৃতিতে) অধিষ্ঠান করেন, তথনই তাঁহার প্রকৃতিত্ব হয় ও তখন সদাশিব পুরুষ হইয়া থাকেন।" আবার সেই শক্তি যখন শিবোন্মুখী হয়েন তখন তাঁহার সহিত অভেদ হইয়া যান যথা—

শিবোন্মুখী যদা শক্তিঃ পুংরূপা সা ভবেৎ তদা।

---

*কাশী হিন্দুকলেজের Advanced Text Book on Hinduism এর প্রথম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

"সেই শক্তি যখন শিবোন্মুখী হয়েন, তখন পুংরূপা (পুরুষ অথবা চৈতন্ত স্বরূপিনী) হয়েন।"

এই শিবশক্তিসমন্বিত ঈশ্বর হইতে ক্রমে রুদ্র, বিষ্ণু ও ব্রহ্মার সমুদ্ভব হইল যথা— সদা শিবাদ্ভবেদীশঃ ততো রুদ্র সমুদ্ভবঃ।

ততোবিষ্ণুস্ততোব্রহ্মা তেষামেব সমুদ্ভবঃ॥

"সদাশিব (নির্গুণ ব্রহ্ম) হইতে ঈশ (সগুণ ব্রহ্ম) ও ঈশ হইতে রুদ্র ও তাঁহা হইতে বিষ্ণু ও তাঁহা হইতে ব্রহ্মা সমুদ্ভূত হইলেন।"

এই ত্রিমূর্ত্তির তিন শক্তি—ব্রহ্মার ব্রহ্মানী,—বিষ্ণুর বৈষ্ণবী,—রুদ্রের রুদ্রানী। ব্রহ্মা নিজের ব্রহ্মানী শক্তি প্রভাবে সৃষ্টি করেন, বিষ্ণু নিজের বৈষ্ণবী শক্তি প্রভাবে পালন করেন ও রুদ্র নিজের রুদ্রানী শক্তি প্রভাবে ধ্বংস করেন।

ব্রহ্মবিদ্যাশাস্ত্রে নির্গুণ ব্রহ্ম হইতে প্রথম অভিব্যক্ত ঈশ্বরকে 'সচ্চিদানন্দ' আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে, ও তন্মতে ঈশ্বরের ত্রিমূর্ত্তির মধ্যে রুদ্র "আনন্দ," বিষ্ণু 'চিৎ' ও ব্রহ্মা 'সৎ'। এই 'সৎ' হইতে "ক্রিয়া", চিৎ হইতে "জ্ঞান" ও 'আনন্দ' হইতে ইচ্ছা শক্তির উদ্ভব; এই জন্য ব্রহ্মা ক্রিয়াশক্তিসম্পন্ন, বিষ্ণু জ্ঞানশক্তি সম্পন্ন ও রুদ্র ইচ্ছাশক্তি সম্পন্ন। ভক্তিভাজন শ্রীমতী বেশান্ত ও তাঁহার Study in Consciousness নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন :—"Every Logos of a universe repeats this universal self-consciousness : in His activity, He is the creative mind, Kriya—corresponding to the universal Sat—the Brahma of the Hindu, the Holy spirit of the Christian, the Chochmah of the Kabbalist. In His wisdom, He is the preserving ordering Reason, Jnana—corresponding to the universal Chit—the Vishnu of the Hindu, the Son of the Christian, the Binah of the Kabhalist. In His Bliss, He is the dissolver of forms, the Will, Ichcha—corresponding to Ananda—the Shiva of the Hindu, the Father of the Christian, the Kepher of the kabbalist"—Study in Consciousness.—p. 8.

তন্ত্রেও প্রকৃত্যাধিষ্ঠিত পরমেশ্বরকে সচ্চিদানন্দ আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে, যথা শারদাতিলকে—সচ্চিদানন্দবিভবাৎ সকলাৎ পরমেশ্বরাৎ।

আসীচ্ছক্তি স্ততো নাদো নাদাদ্বিন্দু সমুদ্ভবঃ॥

"সেই সকল অর্থাৎ কলা—প্রকৃতি—যুক্ত পরমেশ্বর সচ্চিদানন্দবিভব (অর্থাৎ সচ্চিদানন্দই তাঁহার ঐশ্বর্য্য)। সেই সচ্চিদানন্দবিভব পরমেশ্বর হইতে শক্তি, শক্তি হইতে নাদ, ও নাদ হইতে বিন্দু সমুদ্ভূত হইল।"

ইচ্ছা ক্রিয়া তথা জ্ঞানং গৌরী ব্রাহ্মী তু বৈষ্ণবী।
ত্রিধা শক্তিঃ স্থিতা তত্র তৎপরং জ্যোতিরোমিতি॥

"ইচ্ছাশক্তি গৌরী, ক্রিয়াশক্তি ব্রাহ্মী, জ্ঞানশক্তি বৈষ্ণবী এই ত্রিবিধা শক্তি, এই শক্তির অতীত যে অবস্থা তাহা জ্যোতিঃ স্বরূপ ওঁ কার।" *

ঐশী শক্তির সাহায্যে মূল প্রকৃতি হইতে প্রথমতঃ বুদ্ধিতত্ত্ব, বুদ্ধিতত্ত্ব হইতে অহঙ্কার তত্ত্ব, অহঙ্কার তত্ত্ব হইতে আকাশ তত্ত্ব, আকাশ তত্ত্ব হইতে বায়ুতত্ত্ব, বায়ুতত্ত্ব হইতে তেজস্তত্ত্ব, তেজস্তত্ত্ব হইতে অপ্‌তত্ত্ব, অপ্‌তত্ত্ব হইতে ক্ষিতি তত্ত্বের উৎপত্তি। সাংখ্যে ও বেদান্তে যেরূপ, তন্ত্রেও ঠিক তাহাই; কিন্তু কোন কোন তন্ত্রে "মনস্‌কে" একটা পৃথক তত্ত্ব ধরা হইয়াছে, যথা গন্ধর্ব্বতন্ত্রে ধ্যান-যোগ প্রকরণে :—একমাসীৎ পরংব্রহ্ম নিত্যং সূক্ষ্মতীন্দ্রিয়ম্।

নিত্যানন্দময়ংধাম তেজোরূপং সনাতনম্।
তদেব প্রকৃতিঃ সা তু তেজোরূপা সনাতনী।
নিত্যানন্দবপুর্দ্দেবী তদ্রূপা তৎ প্রকাশিনী।
তয়োর্যোগাদভূদ্বৃষ্টিঃ পরমামৃতরূপিনী।
পরিপূর্ণমিদং দেবি সমস্তং প্লাবয়েৎ তু যা।

* * * *

প্রকৃতের্হি মহান্তং বৈ অহঙ্ক মহতস্তথা।
অহঙ্কারাৎ মনশ্চৈব মনসঃ খং সমুত্থিতং।
আকাশাদ্ বায়ুমারুহ্য বায়োস্তেজঃ সমুত্থিতং।
তেজসো জলমাসাদ্য জলাচ্চ পৃথিবীং স্মরেৎ॥

---

* এই ত্রিবিধা শক্তির স্বরূপ সম্বন্ধে মতভেদ আছে—কোন কোন মতে গৌরী—জ্ঞান শক্তি ব্রাহ্মী—ইচ্ছাশক্তি ও বৈষ্ণবী—ক্রিয়াশক্তি।

"সাধক এইরূপ চিন্তা করিবেন—নিত্য, সূক্ষ্ম, অতীন্দ্রিয়, নিত্যানন্দধাম, তেজোরূপ, সনাতন এক পরব্রহ্ম বিরাজ করিতেছিলেন। তাঁহারই সেই প্রকৃতি—তিনি তেজোরূপা সনাতনী, নিত্যানন্দবপু, দ্যোতনশীলা, তদ্রূপা (পরব্রহ্মরূপা) ও তৎ প্রকাশিনী (পরব্রহ্মকে প্রকাশকারিণী)। এই ব্রহ্ম ও প্রকৃতির যোগে পরমামৃতরূপিনী বৃষ্টি * হইল। * * * প্রকৃতি হইতে মহৎ, মহৎ হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে মনঃ, মনঃ হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে তেজঃ তেজঃ হইতে জল ও জল হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হইল।"

তন্ত্রে অহঙ্কারকে ত্রিবিধ বলা হইয়াছে—বৈকারিক, তৈজস ও ভূতাদি। বৈকারিক অহঙ্কার হইতে দিক্‌বাতার্ক প্রভৃতি দশ দেবতা, তৈজস অহঙ্কার হইতে ইন্দ্রিয়গণ ও ভূতাদিক অহঙ্কার হইতে তন্মাত্রযোগে পঞ্চভূত উৎপন্ন হইয়াছে। এইরূপ সৃষ্টি প্রক্রিয়া বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে, তৎসম্বন্ধে প্রমাণ উদ্ধার করা নিষ্প্রয়োজন।

ব্রহ্মবিদ্যা শাস্ত্রে জীবকে ব্রহ্মের অংশ বলা হইয়া থাকে,—যথা মুণ্ডক শ্রুতিতে।—　যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাদ্বিস্ফুলিঙ্গাঃ

সহস্রশঃ প্রভবন্তে স্বরূপাঃ।
তথাক্ষরাৎ বিবিধা সোম্য ভাবা
প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপি যান্তি॥

"হে সৌম্য, যেরূপ প্রদীপ্ত পাবক হইতে পাবকের সমানরূপ সহস্র সহস্র বিস্ফুলিঙ্গ উৎপন্ন হয়, সেইরূপ সেই অক্ষর ব্রহ্ম হইতে বিবিধ জীবের উৎপত্তি হয় ও সেই সময় জীব তাঁহাতেই বিলীন হয়।" গীতায়ও ভগবান্ বলিয়াছেন,—

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।

জীবলোকে আমারই অংশ সনাতন (সর্ব্বদা সংসারী) জীব।

তন্ত্রেও সেই এক কথা। বোধ হয় তন্ত্রে ইহা আরও পরিষ্কাররূপে আছে, যথা কুলার্ণবে:—অস্তি দেবি পরংব্রহ্মস্বরূপী নিষ্কলঃ শিবঃ।

সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্ব-কর্ত্তাচ সর্ব্বেশো নির্ম্মলোদয়ঃ।

* তন্ত্রে ইহাকে কারণবারি বলে। ইহা অতীব রহস্যময়।

অয়ং জ্যোতিরনাদ্যন্তো নির্ব্বিকারঃ পরাৎপরঃ।
নির্গুণঃ সচ্চিদানন্দস্তদংশা জীব সংজ্ঞকাঃ।
অসত্যবিদ্যোপহতা যথা যথাগ্নৌ বিস্ফুলিঙ্গকাঃ।
সর্ব্বাদ্যুপাধি ভিন্নাস্তে কর্ম্মাদিভিরনাদিভিঃ॥

"হে দেবি, পরব্রহ্মস্বরূপ নিষ্কল (প্রকৃতির অতীত) শিব বিরাজিত আছেন। তিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বকর্ত্তা, সকলের ঈশ্বর, নির্ম্মলোদয়। তিনি জ্যোতিঃস্বরূপ, অনাদি, অনন্ত, নির্ব্বিকার, পরাৎপর, নির্গুণ, সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ। জীব সমস্ত তাঁহারই অংশ। কেবল অসতী (illusory) অবিদ্যা কর্ত্তৃক উপহিত হইয়া, তাহারা পৃথক পৃথক প্রতীয়মান হয়। অগ্নিতে যেমন বিস্ফুলিঙ্গ * পরমাত্মায় তেমনি জীবাত্মা। এই সমস্ত জীব অনাদি কর্ম্মবশে প্রেরিত হইয়া বিভিন্ন উপাধিতে উপহিত হইয়া আছে।"

ঐ কুলার্ণব তন্ত্রে অন্যত্র—"পুং স্ত্রী রূপাণি সর্ব্বাণি আবয়োরংশ জানি হি।"

"হে দেবি, নিশ্চয়ই পুরুষ ও স্ত্রী সমস্তই আমাদের অংশজ।"

জীব ও শিব যে এক, তন্ত্রে ইহা বহুস্থানে বহু প্রকারে কহিয়াছেন, যথা :— ঐ কুলার্ণব তন্ত্রে অন্যস্থানে :—

পাশবদ্ধঃ স্মৃতোজীবঃ, পাশমুক্তঃ সদাশিবঃ।
তুষেণ বদ্ধো ব্রীহিঃ স্যাৎ, তুষাভাবে হি তণ্ডুলঃ।
কর্ম্মবদ্ধঃ স্মৃতোঃ জীবঃ, কর্ম্মমুক্তঃ সদাশিবঃ॥

"জীব ও শিব একই :পাশবদ্ধ থাকিলে জীবও পাশমুক্ত হইলেই সদাশিব। তুষদ্বারা আবদ্ধ থাকিলেই ধান্য, তুষমুক্ত হইলেই তণ্ডুল। কর্ম্মবদ্ধ হইলেই জীব, কর্ম্মমুক্ত হইলেই সদাশিব।" জীবকে এই পাশ—এই কর্ম্মবন্ধন ছেদন করিয়া শিবত্ব প্রাপ্ত হইতে হইবে। ইহাই তন্ত্র শাস্ত্রের উদ্দেশ্য।

এই উদ্দেশ্য সাধনার্থ উপনিষদে ও গীতায় যে ত্রিবিধ যোগ—জ্ঞানযোগ (তদঙ্গীভূত ধ্যানযোগ), কর্ম্মযোগ ও ভক্তিযোগের উল্লেখ আছে, তন্ত্রেও তাহাই।

* Lift thy head O Lanoo, dost thou see one or countless lights above thee, burning in the midnignt sky? I sense one Flaim O Gurudeva, I see countless undetached sparks shining in it. The flame is Iswara, His manifestation as the first Logos; the undetached sparks are human and other monads" —"Pedigree of Man."

প্রথমতঃ জ্ঞানযোগ সম্বন্ধে সামান্যরূপে কিছু আলোচনা করা যাউক।

সাধারণতঃ ব্রহ্মবিদ্যা শাস্ত্রে জীবাত্মা ও পরমাত্মার ঐক্য সমাধানই যোগ। তন্ত্রেও তাহাই, যথা কুলার্ণবে ও গন্ধর্ব্ব তন্ত্রে—"ঐক্য জীবাত্মনোরাহুর্যোগং যোগবিশারদাঃ।"

"জীব ও আত্মার অর্থাৎ জীবত্মা ও পরমাত্মার ঐক্য সমাধানই যোগশাস্ত্র বিশারদেরা যোগ বলিয়া থাকেন।" মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে—

যোগো জীবাত্মনোরৈক্যং পূজনং সেবকেশয়োঃ।
সর্ব্বাং ব্রহ্মেতি বিদুষো ন যোগো নচ পূজনম্॥

"জীবাত্মা ও পরমাত্মার ঐক্য সমাধানই যোগ এবং সেবক ও ঈশ্বরের (উপাসক ও উপাস্যের, ভক্ত ও তাঁহার ইষ্টদেবতার) ঐক্য সমাধানই পূজা। সমস্তই ব্রহ্ম, এই জ্ঞান যাঁহার হইয়াছে, তাহার যোগেই বা পূজার প্রয়োজন কি ?"

সংক্ষেপে পূজা শব্দের কেমন সুন্দর অর্থ করা হইয়াছে। সেবক ও তাহার ইষ্টদেবতার অভেদ সাধনই প্রকৃত পূজা। সমস্ত তন্ত্রে পূজার এই ভাব সুপরিস্ফুট।

জীবাত্মা ও পরমাত্মার ঐক্যকে তন্ত্রে ব্রহ্মজ্ঞান কহিয়াছেন। এই ব্রহ্মজ্ঞান সাধনের অন্যতম উপায়, জ্ঞানযোগ:—ইহা অষ্টাঙ্গ যোগ নামে অভিহিত হইয়াছে। অষ্টাঙ্গ যথা—যম, নিয়ম, আসন, প্রণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি। গন্ধর্ব্ব তন্ত্রে ইহার সুবিস্তার বর্ণনা আছে। এই অষ্টাঙ্গ যোগ সাধন দ্বারা দেহাভিমান গলিত হয় ও পরমাত্মার সমাধি হয়।

সেই অবস্থা কিরূপ তন্ত্রে তাহাও বলিতেছেন—

যদা ভূতানি সর্ব্বাণি স্বাত্মন্যেবাভিপশ্যতি
সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা।

যোগী যখন নিজের আত্মায় সর্ব্বভূতকে দর্শন করেন ও সর্ব্বভূতে নিজের আত্মাকে দর্শন করেন তখন ব্রহ্মলাভ হয়। গীতায়ও ভগবান বলিয়াছেন,—

সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানিচাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ।

সমাধি সাধনার সময়ে যোগীকে এই ভাবনা করিতে হইবে:——

নাহং দেহো নচ প্রাণোনেন্দ্রিয়াণি তথৈবচ।

ন মনো নৈব বুদ্ধিশ্চ নৈব চিত্তমহঙ্কৃতিঃ।
নাহং পৃথ্বী ন সলিলং ন চ বহ্নিস্তথানিলঃ।
নচাকাশে ন শব্দশ্চ নচ স্পর্শস্তথারসঃ।
নহি গন্ধো ন রূপঞ্চ ন মায়াহং ন সংসৃতিঃ।
সদা সাক্ষিস্বরূপাদ্বা ব্রহ্ম চৈবাস্মি কেবলঃ॥

* * *

অহং দেবো ন চান্যোঽস্মি ব্রহ্মৈবাহং ন শোকভাক্।
সচ্চিদানন্দরূপোঽহং শুদ্ধবুদ্ধিঃ স্বভাববান্॥

"আমি দেহ নহি, প্রাণ নহি, ইন্দ্রিয় নহি, মনঃ নহি, বুদ্ধি নহি, চিত্ত নহি, অহঙ্কার নহি; আমি পৃথ্বী নহি, জল নহি, বহ্নি নহি, বায়ু নহি; আমি শব্দ নহি, স্পর্শ নহি, রূপ নহি, রস নহি, গন্ধ নহি; আমি মায়া নহি, সংসার নহি, আমি নিত্য সাক্ষিস্বরূপ ব্রহ্ম, অন্য কিছুই নহি। * * আমি দেব; অন্য কিছু নহি, আমি ব্রহ্ম, আমি শোকভাজন নহি। আমি সচ্চিদানন্দ স্বরূপ, আমি শুদ্ধ বুদ্ধি; আমি নিজের স্বভাবে, নিজের চৈতন্য স্বরূপে অবস্থিত।"

সমাধি দ্বারা এই ধারণা পরিপক্ক হইলে ব্রহ্ম জ্ঞানলাভ হইবে। ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইলে অবিদ্যাবিক্ষেপ দূর হয়; যথা গন্ধর্ব্ব তন্ত্রে:——

এবং নিরন্তরং কৃত্বা ব্রহ্মৈবাস্মীতি ভাবনা।
হরত্যবিদ্যা বিক্ষেপান্ রোগানিব রসায়নং॥

"এইরূপে নিরন্তর 'আমিই ব্রহ্ম' এই ভাবনা অবিদ্যা বিক্ষেপকে হরণ করে; রসায়ন যেমন রোগ হরণ করে সেইরূপ।" তখন আর কর্ম্মে আবদ্ধ হইতে হয় না।

মন্ত্রৌষধি বলৈর্যদ্বদ্ জীর্য্যতে ভক্ষিতং বিষং।
তদ্বৎ সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি জীর্য্যন্তি জ্ঞানিনঃ ক্ষণাৎ। গন্ধর্ব্ব তন্ত্রম্

"ভক্ষিত বিষ যেমন মন্ত্রৌষধিবলে জীর্ণ হয় সেইরূপ জ্ঞানীদিগের জ্ঞান দ্বারা সর্ব্বকর্ম্ম জীর্ণ ও ভস্মীভূত হয়। গীতায় ও ভগবান্ কহিয়াছেন—

যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা॥

তন্ত্রে এই জ্ঞান যোগের অঙ্গীভূত ধ্যানযোগ অতি সুন্দর জিনিষ। কেবল

পাঠের দ্বারাই হৃদয়ের প্রসন্নতা বৃদ্ধি হয়। এই ধ্যান যোগ গন্ধর্ব্বতন্ত্রে সুন্দর রূপে বর্ণিত আছে। কর্ম্মযোগ সম্বন্ধেও গীতা ও তন্ত্রের একই উপদেশ ; যথা কুলার্ণবে :—

সর্ব্ব কর্ম্মাণি সংত্যক্তুং ন শক্যং দেহধারিণা।
ত্যজেৎ কর্ম্মফলং যো বা স ত্যাগীত্যভিধীয়তে।
স্বকার্য্যেষু প্রবর্ত্তন্তে করণানীতি বিচিন্তয়েৎ।
অহং ভাবমপাস্যৈব যঃ কুর্য্যাৎ স ন লিপ্যতে।
ক্রিয়মাণানি কর্ম্মাণি জ্ঞান প্রাপ্তেরনন্তরম্।
নচ স্পৃশতি তত্ত্বজ্ঞং জলং পদ্মদলং যথা ॥

"দেহধারী ব্যক্তিগণ সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ কখনও করিতে পারে না। যে কর্ম্ম-ফল পরিত্যাগ করিতে পারে, সেইই ত্যাগী বলিয়া কথিত হয়। যে ব্যক্তি "ইন্দ্রিয়গণ নিজে নিজে স্ব স্ব কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত হইতেছে, আমি নিজে তাহাদিগকে প্রবর্ত্তিত করিতেছি না" এইরূপ চিন্তা করেন, ও কর্ম্ম ও কর্ম্মফল হইতে অহংভাব কে (আমিত্বের অভিমান) অপসারিত করিয়া যিনি কার্য্য করিতে পারেন তিনি কর্ম্ম দ্বারা লিপ্ত-বদ্ধ হয়েন না। জল যেমন পদ্ম পত্রকে আর্দ্র করিতে পারে না, তত্ত্বজ্ঞান হইবার পর ক্রিয়মাণ কর্ম্ম সমূহ তেমনই তত্ত্বজ্ঞকে স্পর্শ করিতে পারে না।

ফলতঃ এই অহংভাব, এই মমত্বজ্ঞান জীবের বন্ধন হেতু ও তাহাকে পরিত্যাগ করিতে পারিলে পরমার্থ লাভ হয়, ইহাই সমস্ত তন্ত্রের সার কথা ও তন্ত্রে ইহা বারংবার নানাপ্রকারে কহিয়াছেন ; যথা কুলার্ণবে—

দ্বেপদে বন্ধমোক্ষায় মমেতি নির্ম্মমেতি চ।
মমেতি বধ্যতে জন্তুর্ন মমেতি বিমুচ্যতে ॥
তৎ কর্ম্ম যন্ন বন্ধায় বিদ্যা সা যা বিমুক্তয়ে।
আয়াসায়া পরং কর্ম্ম বিদ্যান্যা শিল্পনৈপুণম্ ॥

"মমতা ও নির্ম্মমতা বন্ধ ও মোক্ষের স্থান। মমতায় জীবকে বন্ধন করে ও মমতার অভাবই জীবকে মুক্ত করে। সেই কর্ম্মই কর্ম্ম যাহা বন্ধের কারণ হয় না, ও সেই বিদ্যাই বিদ্যা যাহা বিমুক্তির কারণ হয়। অন্যান্য যে সমগ্র কর্ম্ম তাহা কেবল পরিশ্রমের জন্য ও অন্য যে বিদ্যা সে কেবল শিল্প নৈপুণ্য।"

ভক্তি যোগ সম্বন্ধে তন্ত্রে বিশেষ কিছু বলিবার নাই। ভক্তির শাস্ত্রই তন্ত্র। তন্ত্র শাস্ত্র পড়িয়া এই প্রতীতি হয় যে জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয়ের মূলেই ভক্তি। দেবী ভাগবতে ভগবতী যাহা কহিয়াছেনঃ—ভক্তেস্তু যা পরাকাষ্ঠা সৈব জ্ঞানং প্রকীর্ত্তিতম্। [ভক্তির যাহা পরাকাষ্ঠা জ্ঞানই তাহাই] সমস্ত তন্ত্রেরও সেই কথা। তান্ত্রিক সাধকই কহিয়া থাকেন।

নিন্দন্তু বান্ধবাঃ সর্ব্বে ত্যজন্তু স্ত্রীসুতাদয়ঃ।
জনা হসন্তু মাং দৃষ্ট্বা রাজানো দণ্ডয়ন্তু বা॥
সেবে সেবে পুনঃ সেবে ত্বামেব পরদেবতে।
ত্বৎকর্ম্ম নৈব মুঞ্চামি মনোবাক্‌কায়কর্ম্মভিঃ॥

বন্ধুগণ আমাকে নিন্দাই করুক, স্ত্রী পুত্রগণ আমাকে পরিত্যাগই করুক, লোকে আমাকে দেখিয়া হাস্য করুক ; রাজা আমাকে দণ্ড প্রদানই করুন, কিন্তু হে পরদেবতে! আমি তোমারই সেবা করিব, আমি মনের দ্বারা, বাক্যের দ্বারা, শরীরের দ্বারা, কোন রূপেই তোমার কর্ম্ম কখনও পরিত্যাগ করিব না;"

যখন সাধকের নিজের কামনা, নিজের ফলাভিসন্ধান, দূরীভূত হইয়াছে, কেবল ইষ্ট দেবতার কর্ম্ম ব্যতীত সাধক আর কোন কর্ম্ম করিতে জানেন না, আর কোন কর্ম্ম দেখিতে পান না—তখনই তাঁহার অন্তস্থল ভেদ করিয়া শব্দ উত্থিত হয়। "ত্বৎকর্ম্ম নৈব মুঞ্চামি মনোবাক্‌কায়কর্ম্মভিঃ।"

তখনই ভক্তির পরাকাষ্ঠা ও তখনই জ্ঞান ও কর্ম্মের সংমিলন। ভগবান গীতাতেও বলিয়াছেন—মৎকর্ম্মকৃন্মৎ পরমো মদ্‌ভক্তঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ।
নির্ব্বৈরঃ সর্ব্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব॥

ফলতঃ জ্ঞানই বল, কর্ম্মই বল, আর ভক্তিই বল, যে পর্য্যন্ত কামনা পরিত্যাগ ও গুরুর করুণা না হইবে সে পর্য্যন্ত কিছুই হইবে না।

যাবৎ কামাদি দীপ্যেত যাবৎ সংসারবাসনা।
যাবদিন্দ্রিয়চাপল্যং তাবৎ তত্ত্বকথা কুতঃ॥
যাবৎ প্রযত্ন রোগোঽস্তি যাবৎ সংকল্পকল্পনা।
যাবন্ন মনসঃ স্থৈর্য্যং তাবৎ তত্ত্বকথা কুতঃ॥
যাবদ্দেহাভিমানশ্চ মমতা যাবদস্তি হি।
যাবন্ন গুরুকারুণ্যং তাবৎ তত্ত্ব কথা কুতঃ॥

"যে পর্য্যন্ত কামাদি দীপ্তি পায়, যে পর্য্যন্ত সংসার বাসনা থাকে, যে পর্য্যন্ত ইন্দ্রিয়চাপল্য দূর না হয়, সে পর্য্যন্ত তত্ত্বকথা কোথায়? যে পর্য্যন্ত প্রযত্নরূপ রোগ বর্ত্তমান থাকে, যে পর্য্যন্ত সংকল্প কল্পনার লোপ না হয়, যে পর্য্যন্ত মনের স্থৈর্য্য সাধিত না হয়, সে পর্য্যন্ত তত্ত্বকথা কোথায়? যে পর্য্যন্ত দেহাভিমান বর্ত্তমান থাকে, যে পর্য্যন্ত মমতার অন্ত না হয়, যে পর্য্যন্ত গুরুর করুণা না হয়, সে পর্য্যন্ত তত্ত্বকথা কোথায়?"

এক্ষণে একটী বিষয়ের উল্লেখ করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করা যাইতেছে। সাধারণতঃ লোকের বিশ্বাস তন্ত্রে ব্রহ্মোপাসনা বা ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধে বড় কিছুই নাই। শক্তির উপাসনাই তন্ত্রের সর্ব্বস্ব—ইহা কিন্তু ভ্রান্ত বিশ্বাস। তন্ত্রে ব্রহ্মসাধন ও ব্রহ্মোপাসনারই প্রাধান্য দিয়াছেন, যথা গন্ধর্ব্বতন্ত্রে:—

হৃদিস্থং পরমাত্মানং বিহায়ান্যৎ সমীহতে।
অহো মূঢ় বরারোহে বহির্ম্ম্যাতেহন্ধবৎ॥

* * * *

আত্মস্থাং দেবতাং ত্যক্ত্বা বহির্দেবং বিচিন্বতে।
করস্থং কৌস্তভং ত্যক্ত্বা বহির্দেবং বিচিন্বতে॥

* * * *

পরব্রহ্মণি সংপ্রাপ্তে সমস্তনিয়মৈরলং।
তালবৃন্তেন কিং কার্য্যং লব্ধে মলয় মারুতে॥

"যে ব্যক্তি হৃদিস্থ পরমাত্মাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য দেবতার সমাধির চেষ্টা করে, হে বরারোহে! সে মূঢ় অন্ধবৎ বাহিরে ঘুরিয়া মরে। যে ব্যক্তি আত্মস্থ দেবতাকে (পরমাত্মা) পরিত্যাগ করিয়া বাহিরে অন্য দেবতার অনুসন্ধান করে সে করস্থ কৌস্তভমণি ত্যাগ করিয়া কাচতৃষ্ণায় ঘুরিয়া বেড়ায়। পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইলে আর নিয়মে প্রয়োজন কি? মলয় মারুত লাভ হইলে, আর তালবৃন্তের প্রয়োজন হয় না।"

কিন্তু ব্রহ্মোপাসনা কঠিন বলিয়া, তন্ত্রে মুক্তিলাভের অপেক্ষাকৃত সহজ উপায় দ্বারা শক্তির উপাসনার উপদেশ করিয়াছেন। তন্ত্রের মতে ব্রহ্মোপাসনা ও শক্তির উপাসনার ফল একই। এই জন্য মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে প্রথমতঃ ব্রহ্মোপাসনার সবিস্তার উপদেশ দিয়া শেষে কহিয়াছেন—

অতস্তে কথিতং ভদ্রে ব্রহ্মমন্ত্রেণ দীক্ষিতঃ।
যৎ ফলং সমবাপ্নোতি তৎ ফলং তব সাধনাৎ ॥

অতএব ভদ্রে! তোমাকে কহিতেছি যে, ব্রহ্ম মন্ত্রে দীক্ষিত ব্যক্তি যে ফল লাভ করে তোমার সাধনাদ্বারাও সেই ফল লাভ হয়।" গীতায় ও ভগবান্ অব্যক্ত (অক্ষর ব্রহ্ম) ও ব্যক্ত (ঈশ্বর) এই উভয়ের উপাসনার উল্লেখ করিয়া উভয় উপাসনার ফল একরূপই কহিয়াছেন * কিন্তু সেই ঈশ্বরকে উপাসনা করিতে হইলে তাঁহার শক্তির—গীতায় যাঁহাকে দৈবী প্রকৃতি কহিয়াছেন, আশ্রয় ব্যতীত হইতে পারে না। গীতায় রাজ গুহ্যযোগ-প্রকরণে ভগবান্‌ও তাহার ঈঙ্গিত দিয়াছেন—

মাহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ।
ভজন্ত্যনন্য মনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্ ॥

"হে পার্থ, মহাত্মারা আমাকে সর্ব্বভূতের আদি ও অব্যয় জানিয়া আমার দৈবী প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া অনন্য মনে আমাকে ভজনা করেন।"

তন্ত্রে এই দৈবীপ্রকৃতির, এই শক্তির, উপাসনা বহুল পরিমাণে উপদিষ্ট হইয়াছে। ভগবানের এই শক্তি যিনি মহামায়াস্বরূপে জগৎকে সম্মোহিত করিয়া রাখিয়াছেন ও যিনি মহাবিদ্যা স্বরূপে জীবের মোহ বিদূরিত করিয়া তাহার মুক্তি বিধান করেন, সেই মহামায়া ও মহাবিদ্যা স্বরূপিণী পরমাশক্তির উপাসনায় জীব যেরূপ সহজে মুক্তিলাভ করিতে পারে, এমন আর কিছুতেই নহে। বুদ্ধিমান বঙ্গদেশ বহুপূর্ব্বেই সেই মুক্তিদাত্রীকে চিনিয়াছিল তাই বঙ্গদেশ তন্ত্রপ্রধান। তাই এখনও বঙ্গদেশে সেই জগদাহ্লাদজননী জগ-দ্রঞ্জনকারিণী, জগদাকর্ষণকরী, জগদ্রূপিণী, পরমানন্দময়ীর উদ্দেশে প্রতিদিন সহস্রকণ্ঠে গীত হয়ঃ—"ত্বমেকা গতির্ম্মে, ত্বমেকা গতির্ম্মে।" †

তুমিই আমার একমাত্র গতি, তুমিই আমার একমাত্র গতি। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরি ওঁ।

শ্রীশ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্য।

---

* "ময্যাবেশ্য যে মাং নিত্যযুক্ত উপাসতে" ইত্যাদি গীতা ১২শ অধ্যায়।

† মহাকাল সংহিতা—সুধাধার স্তব।

অসাধারণ শক্তি।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(২)

লাহোর হইতে প্রচারিত ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের ২৩এ এপ্রিল তারিখের সিবিল মিলিটারি গেজেটে প্রকাশ :—

ত্রিবাঙ্কুরের রাজধানী ত্রিবান্দ্রম্ নগরে কয়েক বৎসর হইল একজন যোগী আসিয়া তত্রত্য পদ্মতীর্থম্ নামক সরোবরতীরস্থ বটবৃক্ষমূলে আসন স্থাপিত করেন। কোথা হইতে আগমন, কোন জাতীয় বা কোন সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী, তাহা কেহ বলিতে পারে না। প্রথম অষ্টাহ মধ্যে তিনি দুই তিন বার মাত্র কিঞ্চিৎ দুগ্ধ ও দুই একটা রম্ভা পানাহার করেন; ক্রমে উপবাস-কাল বর্দ্ধিত হইয়া তিন চারি মাস পরে একেবারে অনশন ব্রতাবলম্বী হয়েন। এই ভাবে একটা অগ্নিকুণ্ডের সম্মুখে হাত পা গুটাইয়া তিন বৎসর কাল পড়িয়া ছিলেন। এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে একবারও উঠেন নাই, বসেন নাই কোন কথা কহেন নাই, কাহারও দিকে তাকান নাই; এমন কি স্বয়ং রাজ্যেশ্বর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া প্রশ্নাদি করাতেও কোন উত্তর দেন নাই। শীত, হিম, রৌদ্র, বৃষ্টি, ধুলি কর্দ্দমের মধ্যে একাবস্থায় ধীর স্থিরভাবে অবস্থান করতঃ বিলক্ষণ দ্বন্দসহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়া অল্পদিন হইল সন্ন্যাসী তনুত্যাগ করিয়াছেন। জীবিতকালে প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় সহস্র সহস্র লোক ইঁহাকে দণ্ডবৎ করিতে আসিত।

(৩)

পঞ্জাবের অমৃতসর নগর শিখ্‌দিগের প্রধান তীর্থ গুরুদ্বারার জন্য বিখ্যাত। তথায় সর্ব্বদা বহুবিধ সাধু সন্ন্যাসীর সমাগম হইয়া থাকে। ওমান সাহেব বলেন :—১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে যখন জলন্দর প্রদেশে ভয়ঙ্কর প্লেগের প্রাদুর্ভাব, তখন পঞ্জাবময় একটা বিভিষিকা উপস্থিত হয়। রোগের প্রভাবে যত না হউক সরকারী বন্দোবস্তের অত্যাচারের ভয়ে প্রজাকুল আকুল হইয়াছিল। সেই সময় অমৃতসরে একজন সাধু আসিয়া নগরের বাহিরে কোন সরোবরতীরে আসন স্থাপিত করিয়া সর্ব্বসাধারণের মধ্যে প্রচার করেন, যে অমৃতসরে যাহাতে প্লেগ না আসিতে পারে তজ্জন্য যত্ন করিতে তিনি তথায় উপস্থিত;

অতএব প্রত্যহ দীন দুঃখীদিগকে পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করাইবার ব্যবস্থা করা হউক, যেহেতু উহাই তাঁহার মতে প্লেগাসুরের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার প্রকৃষ্ট উপায়। তাঁহার কথামত কার্য্য হইয়াছিল এবং অমৃতসরে আর প্লেগ হয় নাই।

(৪)

১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের জুনমাসে কোন রজনীতে অমৃতসরের বাজারে একজন সন্ন্যাসী দোকানে দোকানে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছেন। কোন ধনমদমত্ত ক্ষেত্রী * বেনিয়ার দোকানের সম্মুখে উপস্থিত হইলে, তিনি রুক্ষবচনে বলিলেন, "গায়ে এমন ভাল কাপড় আবার ভিক্ষা কেন?" অপরাধের মধ্যে সেই দিবস কোন স্ত্রীলোক সন্ন্যাসীকে একখানি নূতন বস্ত্রদান করেন, তাহা দ্বারা তাহার অঙ্গ আবৃত ছিল। বেনিয়ার কটুবাক্যে সাধু ক্ষুণ্ণ হইয়া নিকটস্থ ময়রার দোকান হইতে একটু আগুন আনিয়া তাহার সম্মুখে গাত্র আবরণখানি দগ্ধ করাণান্তর প্রস্থান করিবামাত্র বেনিয়ার দোকানে আগুন লাগিয়া তাহা ভস্মসাৎ হয়, তৎসহ আরও কয়েকখানি দোকান, বিস্তর সম্পত্তি ও কয়জন মানুষ নষ্ট হয়। আগুণ লাগিল, আর ক্ষেত্রী ভায়ার চৈতন্য হইল; তখন সন্ন্যাসীকে খুজিতে চারিদিকে লোক ছুটাইলেন, কিন্তু কোথাও তাহাকে পাওয়া গেল না।

(৫)

আর এক সময় অমৃতসরের কোন পসারী বা গন্ধবণিকের দোকানে আসিয়া জনৈক সন্ন্যাসী, "বাবা! দেহ জ্বলিয়া যাইতেছে, এক ছিলিম চরস ভিক্ষা দিয়া শীতল কর।" বলিয়া নিবেদন জানাইলে পসারী উত্তর দিল, "যাও জ্বলিয়া মর;" প্রত্যুত্তরে সন্ন্যাসী কহিলেন, আমাকে কেন, তোমাকে অগ্নি অক্রমণ করুক।" ক্রোধভরে এই কথা কয়টী উচ্চারণ করিয়াই সাধু তথা হইতে প্রস্থান করেন; এবং তাঁহার অব্যবহিত পরেই পসারীর দোকানে অকস্মাৎ আগুণ লাগে। পসারীর ধ্রুব বিশ্বাস যে সন্ন্যাসীর অসন্তোষই এই বিপদের কারণ; সুতরাং সে অগ্নিনির্ব্বাপনের চেষ্টা না করিয়া তাঁহার অন্বেষণে ছুটিল; এবং চকের জনতার মধ্যে তাঁহাকে পাইয়া পদতলে

* ইঁহারা ক্ষত্রিয় নহেন, বণিক সম্প্রদায়ভুক্ত কোন শঙ্কর জাতি। ছোট বড় সকল প্রকার ব্যবসায় বৃত্তিতে ইঁহাদিগকে নিযুক্ত থাকিতে দেখা যায়; এই হেতু ইঁহাদের মধ্যে উচ্চনীচ বিস্তর বিভাগ; এক অপরের সহিত আদান প্রদান করেন না।

লুটাইয়া পড়িল। পসারীর নানাবিধ কাতরোক্তিতে সন্তুষ্ট হইয়া সন্ন্যাসী বলিলেন, "তোমার গৃহদাহ এখন অনিবার্য্য, কিন্তু যখন তুমি স্বীয় অপরাধ বুঝিতে পারিয়া অনুতপ্ত, তখন উহা দ্বারা তোমার লাভ বৈ লোক্‌সান হইবে না।" আশ্বস্তচিত্তে পসারী ফিরিয়া আসিয়া দেখিল সমস্ত দগ্ধ হইয়া গিয়াছে; অবশেষে অনুসন্ধান দ্বারা ভস্মস্তূপাবৃত একরাশি রৌপ্য আবিষ্কৃত হওয়ায় সন্ন্যাসীর বাক্যের স্বার্থকতা বুঝিতে পারিল। দোকানের গাছ-পালা শিকড় বাকড়ের সহিত দগ্ধ হইয়া এক চাঁই দস্তা রৌপ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল।

(৬)

কয়েক বৎসর হইল হিমালয় প্রদেশ হইতে একজন প্রকৃত সাধুচরিত্রের সন্ন্যাসী অমৃতসরে উপস্থিত হইয়া নগরের প্রান্তে কুটীর নির্ম্মাণ করতঃ অবস্থিতি করেন। ওমান সাহেবের পরিচিত কোন পাঞ্জাবী যুবা তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া সর্ব্বদা তাঁহার সেবাতে নিযুক্ত থাকে। নিতান্ত অনুগ্রহ দেখিয়া সন্ন্যাসী মধ্যে মধ্যে তাহাকে কিমিয়া প্রস্তুত রৌপ্য বিক্রয় করিতে দেন; তাহার মূল্য দ্বারা অন্যান্য দ্রব্যাদি সহ প্রত্যেক বার কিছু তাম্রমুদ্রা আনাইয়া লইতেন। একদা যুবাভক্ত কিমিয়া প্রক্রিয়া * শিক্ষা করিবার অভিলাষ প্রকাশ করায় সন্ন্যাসী বলেন' "ভারতে এক ব্যক্তি আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আছেন, আমি রাজা, তিনি মহারাজা; আমি তামাকে রূপা করিতে পারি তিনি রূপাকে সোণা করেন। পবিত্র চিত্ত পরার্থপর ব্যক্তি ভিন্ন অপরের পক্ষে এ বিদ্যা শুভকর নহে; তুমি এখনও তদপযুক্ত হও নাই! এ বিদ্যা লোপ পায় সেও ভাল তবু যেন অপাত্রে না যায়, ইহা আমাদের বিশেষ লক্ষ্য জানিবে।" রজনীযোগে প্রক্রিয়া হইত বলিয়া, যুবাকে রাত্রিতে কুটীরের নিকট থাকিতে দেওয়া হইত না; সুতরাং সে ব্যক্তি প্রত্যহ সন্ধ্যার পর নগরে গিয়া নিশিযাপন করিত, ও প্রাতঃকালে ফিরিত। একরাত্রি সে সহরের কোন বেশ্যার কুহকে পড়ে; পরদিন যথাসময়ে কুটীরে উপস্থিত হইলে সন্ন্যাসী তাহাকে অপবিত্র জানিয়া নিকটে আসিতে নিষেধ করেন। অলৌকিক শক্তি দ্বারা তিনি তাহার অপরাধ টের পাইয়াছেন, বুঝিয়া যুবা স্বীয় দোষ স্বীকার করতঃ বিশেষ কাকুতি-মিনতি সহকারে বারম্বার ক্ষমা প্রার্থনা করায় সন্ন্যাসী বিরক্ত হইয়া কুটীরে অগ্নিপ্রদান করতঃ হিমালয়ের

* Transmutation of metals by Alchemy.

দিকে অগ্রসর হন। যুবাও পশ্চাতে পশ্চাতে ছুটিতে থাকে; কিছুদূর গিয়া সন্ন্যাসী তাহাকে পশ্চাদ্ধাবিত দেখিয়া সুদীর্ঘ লৌহ-চিমটা-হস্তে তাড়া করেন। কাজেই যুবা-বেচারী প্রতিনিবৃত্ত হইতে বাধ্য হয়। সন্ন্যাসীকে আর কখন অমৃতসরে দেখা যায় নাই। (ক্রমশঃ)

শ্রীচন্দ্রশেখর সেন।

কর্ম্মের সহিত প্রাণের সম্বন্ধ।

পরিশিষ্ট।

জগতের আদি এবং মূল কারণ আমাদিগের নিকট অজ্ঞেয়। ঈশ্বরের ত্রিমূর্ত্তি কল্পনা করিয়া আমরা ব্যক্ত জগতের ভাবভঙ্গী অনেকটা বুঝিতে পারি। সাধারণের মনোরঞ্জনার্থ আমরা থিয়সফি-সাহিত্য হইতে কতকগুলি কথা সঙ্কলন করিলাম।

পরব্রহ্ম এবং প্রকৃতির ভাব আমাদিগের ক্ষুদ্র জ্ঞানাতীত। উভয়ের মধ্যে যাহা দ্বারা একটা সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়া এই কল্পিত জগত সত্য বলিয়া অনুমিত হইতেছে, এবং যাহাদ্বারা পুনরায় মিথ্যা বলিয়া সাব্যস্ত হইবে, তাহাকে আমরা শক্তি বলিয়া বুঝিয়া থাকি। মহামায়া আদ্যাশক্তি নানারূপে দেখা দিয়া থাকেন। ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়া তাঁহার তিনটী রূপ।

I know, I am, I will—মহাচৈতন্যের তিনটী অবস্থা বিশেষ। Being Knowing, Willing শক্তির তিনটী অবস্থা। অদ্বৈতবাদে প্রকৃতি মায়া ও শক্তি, সকলই ব্রহ্মের অন্তর্গত। কিন্তু সাধারণের নিকট দ্বৈতবাদই অদ্বৈতবাদের প্রথম সোপান বলিয়া বোধ হয়। ব্রহ্ম, প্রকৃতি, শক্তি, ত্রিবিধ কল্পনা করিয়া আমরা সপ্তরূপ পাই।

১।	প্রকৃতি	হইতে—স্থূল শরীর=	Not-self or that
২।	প্রকৃতি+শক্তি	„ বাসনা দেহ (মনোময় কোষের অন্তর্গত)	Not-self is: wills, and knows.
৩।	ব্রহ্ম+শক্তি+প্রকৃতি	„ জীব	I am, I will (desire), and I know that not-self.
৪।	ব্রহ্ম+প্রকৃতি	„ Physical intelligence. (জড় চৈতন্য)	The two poles I & Not-self.)
৫।	শক্তি	„ মায়া। কামরূপিনী	Being Willing. Knowing.
৬।	ব্রহ্ম+শক্তি	„ আত্মা	I know, I am, I will.
৭।	ব্রহ্ম	„ ঈশ্বর	Logos.

শক্তির তিনটী অবস্থা, যেমন চৈতন্যের তিনটী ভাব আমরা দেখি (I am, I know, I will) সেইরূপ উপাদানের দিকে লক্ষ্য করিলে আমরা তিনটী গুণ দেখিতে পাই।

ইচ্ছা——I will+matter=　　তমঃ

ক্রিয়া——I am+matter=　　রজঃ

জ্ঞান——I know+matter=　　সত্বঃ

অব্যক্ত অবস্থা হইতে ব্যক্ত অবস্থার প্রথম সোপান ইচ্ছাশক্তি। প্রাণের প্রথমরূপ। স্পন্দন ইহার সঙ্কেত। যদি অব্যক্ত অবস্থা কল্পিত বিন্দু হয়, তবে ইচ্ছাশক্তির ফলে নাদের উৎপত্তি। ইহার ফলে বহুবিন্দু। ইচ্ছা শক্তির দুইটী অবস্থা, আকুঞ্চন এবং প্রসারণ।—প্রসারণ এবং আকুঞ্চন। আকুঞ্চন এবং প্রসারণ এক একটী অনুস্বর (half note); উভয়ই I will। একটী পরিধি

কল্পনা করিলে উভয়ে তাহার Diameter.। ইহার উভয় দিকে দুইটী Pole, Positive এবং Negative কল্পিত হইতে পারে। উভয় Pole—পরা এবং অপরা প্রকৃতি।

থিয়সফি সাহিত্যে ইহাই Second Aspect of the Logos। এইরূপ জ্ঞানময়। "আমি জানি"। কি জান মায়াময় ? I know that I will। ইহাই তাঁহার উত্তর। তিনি স্বয়ম্ভূ। তিনি তাঁহারই সন্তান। বিন্দু হইতে রেখা। বিন্দুই তাঁহার ধাম। কত বড় রেখা ?

এই বিশ্ব যত বড় হইবে তাহারই মাত্রা। "তন্মাত্রা। দেশ ও কাল এই মহামাত্রার পরিব্যঞ্জক।

"Will aspect" হইতে "knowledge aspect" of consciousness এবম্বিধরূপে স্বতন্ত্রভাবে কল্পিত হওয়ায় সৃষ্টিতত্ত্ব অনেকটা বুঝা যায়। জ্ঞান এবং ইচ্ছা শক্তি উভয়েই প্রাণশক্তি। উভয়েই চৈতন্য শক্তি। উভয়েই মহামায়ার রূপ। উভয়েই একাধারে। উভয়েই এক। কেননা তখনও উপাদান ভেদ হয় নাই। কম্পিত হয় নাই।

অতঃপর দেখা উচিত অহঙ্কার এবং পঞ্চ তন্মাত্রা প্রভৃতির বিকাশ কিসে হয় ? বিন্দু হইতে নাদ এবং উভয় হইতে বিসর্গের উৎপত্তিই ইহাদিগের মূল।

ইহা বুঝিতে গেলে ক্রিয়াশক্তি কিংবা Third Aspect of the Logos কল্পনা করিতে হয়। যে রেখাগত শক্তি (Diameter) অর্দ্ধ পরিধিরূপ ধনুর্দ্দণ্ডকে অর্দ্ধচন্দ্রাকারে পরিণত করতঃ মধ্যস্থলে উভয়দিক ধারণা করিয়া থাকেন তাহা বিষ্ণুশক্তি। ইহাতে তখনও শর সংযোজনা হয় নাই। শর সংযুক্ত করে কে ? ক্রিয়া শক্তি।

শর যোজনা করিতে হইলে মধ্যস্থান হইতে কল্পিত বিন্দু টানিয়া কিছু দূরে লইয়া যাইতে হয়। এবং তথা হইতে লক্ষ্য করিতে হয়, অর্থাৎ At right-angles to the former vibration। খৃষ্টীয় ধর্ম্মে + cross ইহার সঙ্কেত। পুরাণে বিষ্ণুর নাভিপদ্ম হইতে ব্রহ্মার উৎপত্তি। পূর্ব্বে রেখার উভয় পার্শ্বস্থ দুই বিন্দু পরিধি স্পর্শ করিয়াছিল, এখন তিনটী বিন্দু পরিধিস্থ হইল।

I will, I know that, I will I am that I know and will.

ইহাই ইচ্ছা জ্ঞান এবং ক্রিয়া একাধারে। কিন্তু যতক্ষণ এই ত্রিশক্তি

equally ballanced ততক্ষণ সৃষ্টি প্রক্রিয়া আরম্ভ হয় না। লক্ষ্য কিংবা যোনি (মূল প্রকৃতি) ভেদ নাহইলে, অর্থাৎ Not-self এর মধ্যে প্রাণ (Life, Ideation) প্রতিষ্ঠা না হইলে ক্রিয়াশক্তির বিকাশ হইয়াছে বলা যাইতে পারেনা। রজোগুণের প্রাধান্যে ইহা হয়।

ইহারই গুণে একটী পরিধি ভাঙ্গিয়া দুইটা হয়। সরল রেখার উপর সমকোন ত্রিভুজ অঙ্কিত করিতে করিতেই পরিধি ভেদ কার্য্য আরম্ভ হইয়াছিল। তখন তাহার প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইল। I am that. উভয় পরিধিস্থ বিন্দু এখন বিসর্গ = ঃ

That = আমার প্রতিবিম্ব (অদ্বৈতবাদ) = আমার অংশ (দ্বৈতবাদ)

ইহাই প্রাণযজ্ঞ কিংবা জীব সৃষ্টি বলিয়া কথিত। হিরণ্যগর্ভ হইতে সৌর জগতের বিকাশ। আমাদের সনাতনধর্ম্মে সৃষ্টি প্রক্রিয়া ব্যাকরণ শাস্ত্র পর্য্যন্ত অধিকার করিয়াছে। বর্ণমালায় তাহার সঙ্কেত পাওয়া যায়।

বীজ—তন্মাত্রা—বর্গ—　　　　বিন্যাস

হং—আকাশ—ক　ক + অ, = ক, ক + হ্ = খ, খ + হ্ = গ　গ + হ্ = ঘ
ঘ + হং = ঙ

যং—বায়ু—চ　ছ, জ, ঝ, (ঐ রূপ) ঝ + হং = ঞ

বং—অগ্নি—ট, ঠ, ড, ঢ, „　ঢ + হং = ণ

রং—জল—ত, থ, দ, ধ, „　ধ + হং = ন

লং—পৃথিবী—প, ফ, ব, ভ, „　ভ + হং = ম

হংস বা সোহং

সকলের মধ্যেই প্রণব বা ইচ্ছা, জ্ঞান এবং ক্রিয়া শক্তির পরম অক্ষর বর্ত্তমান। উপরোক্ত বর্ণসঙ্কেত গুলির মধ্যে সোহং কিংবা প্রণবই প্রাণরূপে বিরাজমান। ইহা মানব দেহের প্রত্যেক কোষে কিংবা Plane এ ক্রিয়াশীল, সামান্য অনুধাবনা করিলেই বুঝা যায়, প্রাণ হইতেই ইচ্ছা, প্রাণ হইতেই জ্ঞান, প্রাণ হইতে ক্রিয়া। সকলের মধ্যেই প্রাণ বর্ত্তমান। সকলিই চৈতন্য। চৈতন্যই প্রাণ, প্রাণই শক্তি। অথচ উপাদানের দিকের দৃষ্টিপাত করিলে রূপ (aspect) আসিয়া পড়ে। ইহার মধ্যে মাত্রাভেদ এবং সংখ্যা ভেদ মাত্র। সকলেই একেবারে আত্মচৈতন্যবস্থা অনুভব করিতে

চাহে। খুদিরাম যখন শুঁড়ির দোকানে চারি আনা পয়সা লইয়া গিয়াছিল, তখন পয়ঃপ্রণালীতে (নর্দ্দামায়) অচৈতন্য অবস্থায় মাতাল শ্যামচাঁদকে দেখিয়া আহ্লাদে গলিয়া গেল, এবং তৎপ্রতি লক্ষ্য করিয়া শুঁড়িকে বলিল "দাদা, মালটা যেন এইরূপ হয়।" এখন চারি আনা পয়সার মালটায় চৈতন্য হইবে, এমত আমরা আশা করিয়া থাকি বটে, কিন্তু সেটা দুরাশা। কাজেই মহামায়া একটা উপাধি বিশেষে আমাদিকে অন্ন দিতেছেন, তাই খাইয়া আমাদিগের প্রাণ। এই ক্ষুদ্রপ্রাণ আবার আর একটি উপাধি অধিকার করে (Etheric Double)। তাহাকে জড়াইয়া আবার মনোময় কোষ। প্রাণবায়ুগুলি কোষ হইতে ডালপালা বিস্তৃত করিয়া স্নায়ুরূপে স্থূল দেহে বিরাজ করিতেছে। ইহারই মধ্যে আবারই ইচ্ছাশক্তি বাসনারূপে (Kamic body) অন্য একটি দেহ সৃষ্টি করিয়াছেন। প্রত্যেক কোষের মধ্যে এক এক রূপ বিকার।

যতদিন সমীকরণ না হয় ততদিন আমরা প্রাণ ও জ্ঞানকে পৃথক বলিয়া ভাবি। এ জ্ঞান পরিচ্ছিন্ন জ্ঞান। ইহা গত মাসের পন্থায় "ম" এবং "তৃষ্ণাতুরস্য" সুন্দর ভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু সমীকরণ না হইলে প্রাণকে প্রজ্ঞা বলা হয় না। আমরাও তাহাই বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। জড়বাদ, এবং দ্বৈতবাদের সামঞ্জস্য অদ্বৈতবাদেই হইয়া থাকে, অথচ জড়বাদের শক্তিসাতত্য অবলম্বন না করিলে আমরা কিছুতেই এক পদ অগ্রসর হইতে পারি না। কাজেই আমরা জড়বাদীর পথ অবলম্বন করিয়া প্রথমতঃ বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলাম, যে প্রাণ নামক নিম্নবৃত্তি হইতেই জ্ঞান নামক চিত্তবৃত্তি কিরূপে বিকাশ পাইয়া থাকে। আমরা যাহা বলিয়াছিলাম তাহার কিয়দংশ আবার পুনরায় একত্র করিলে আমরা পরে যাহা বলিব তাহার ভাব অনেকটা বুঝা যাইবে।

পন্থা, আষাঢ়—

জড়বাদ—	শাস্ত্র।
১০৭ খৃঃ-কর্ম্ম হইতে চৈতন্য হয়	প্রাণযজ্ঞই কর্ম্ম, ঈশ্বরের প্রাণ-যজ্ঞে জীবের চৈতন্য।

পন্থা, আষাঢ়—

	জড়বাদ—	শাস্ত্র।
১০৯ „	প্রাণশক্তি ব্যয় করিয়া যাহা লাভ হয় তাহার নাম জ্ঞান। ইহা প্রাণ ব্যয় করিয়া পাইলাম।	অবশ্য তাহাই, কিন্তু জ্ঞানেন্দ্রির দ্বারা মনোময় কোষে।
১০৯ „	—ক্রিয়াই জ্ঞানের পরিমাণ।	মনোময় কোষের তন্মাত্রা যত বিস্তৃত, ততই আমার জ্ঞান।
শ্রাবণ।		
১৩৮ „		প্রাণযজ্ঞে ব্রহ্মই অর্পণ, ব্রহ্মই বিষয় অগ্নি ও ব্রহ্ম (জ্ঞান) অদ্বৈতবাদ।
১৩৮ „		মনদেহের যজ্ঞ করিয়া আমরা পরমাত্মাকে দেখিতে পাই। জ্ঞানই (প্রজ্ঞা) বাসনাকে (নিম্ন দেহস্থ ইচ্ছা রূপী প্রাণ) দগ্ধ করে। নচেৎ কামদেহজাত (ভূল ক্রমে "জ্ঞানেন্দ্রিয়"জাত লিখিত হইয়াছিল) পরিত্যাগ করা বড়ই কষ্টকর
পৌষ		
৩৩১ „	পরমাণুগত শক্তিই প্রাণ।	যে শক্তি তাহাদিগকে ধারণ করে তাহাই জীবের প্রাণ শক্তি।
৩৩৪ „		অনুভূতি ও ইহার লক্ষণ (চৈতন্য) ইহার অন্তরালে আরও বৃহৎ প্রাণের মত একটা একটা কি আছে তাহা দ্বারা জীব উন্নত হয় (জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার সম্বন্ধ দ্বৈতভাব)।

মাঘ

„ ৩৭৪ „ যাহাকে বেদ এবং উপানিষৎ প্রাণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাই যে জড়বাদীগণের শক্তি, তাহা নহে। আপাততঃ আমরা দ্বৈতভাবে যাইব, কেন না মূলশক্তি গুলির সত্বা এক হইলেও প্রথমতঃ ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে আলাদা করিয়া লইতে হয়, নচেৎ আমরা ধারণা করিতে পারি না।

ঐ

উপরোক্ত কথাগুলি স্মরণ করিয়া দেখিলে আমাদিগের কথিত "জ্ঞানের" পরিচ্ছিন্ন অর্থ কি জন্য ব্যবহৃত হইয়া ছিল, তাহা বুঝা যাইবে। কিরূপে খণ্ড-চৈতন্য আত্মচেতন্যে পরিণত হয় তাহাই বুঝাইবার উদ্দেশ্য ছিল। সুতরাং সেস্থলে "প্রজ্ঞা" ও জ্ঞান এক নহে। মনোময় কোষের আকুঞ্চন এবং প্রসারণ উভয় বৃত্তিই আছে। একটার ফল অন্যটার বিপরীত। একটা জ্ঞান, অন্যটা অজ্ঞান। প্রত্যেক কোষেই প্রাণের কার্য্য এই রূপ। অথচ কেবল আকুঞ্চণ করিয়া ও আমরা থাকিতে পারি না এবং কেবল প্রসারণ করিয়াও থাকিতে পারি না। উভয় বৃত্তিলব্ধ খণ্ডজ্ঞানগুলিকে আমরা ক্রমে যুক্ত করি। কি করিয়া? একটার মাত্রা অন্যটার দ্বিগুণ করিয়া, কিংবা যথা ক্রমে বাড়াইয়া, কমাইয়া। এইরূপ প্রাণের অবস্থা কিংবা স্পন্দন বারটি রাশি অতিক্রম করিলে একটি উচ্চাবস্থা (higher sub-plane) পাইয়া থাকে। প্রাণ ও জ্ঞান যে মাত্রাভেদ মাত্র, তাহা সত্য। কিন্তু ইহার মধ্যে অজ্ঞানকে আময়া জ্ঞান রূপে দেখিয়া থাকি, তাহাও বিস্মৃত হওয়া উচিত নহে। এবং এই বিপরীত ভাবে একই অদ্বিতীয় জ্ঞান প্রবাহমান, তাহাও সত্য। তাই আমরা পরে বলিয়াছিলাম,

পন্থা	জড়বাদ	শাস্ত্র।
৩৭৫		চৈতন্যের সংখ্যা বাড়িয়াও জীব যখন মূল কারণ দেখিতে পায়, তখন অন্য দিকে (অন্তর্মুখী) যাহা লব্ধ হয় তাহার নাম "জ্ঞান" (প্রজ্ঞা)

পন্থা	জড়বাদ	পাস্ত্র।
৩৭৬—		দেহের প্রাণের সহিত অন্তরের প্রাণ যুক্ত করিয়া আমরা আত্মা বুঝি।
৩৭৭—	মানুষ এবং পশুর প্রাণ এক।	মানুষের এবং পশুর প্রাণের প্রভেদ জ্ঞান দিয়া।
৪৬৪	প্রাকৃতিক কর্ম্ম অদৃষ্ট।	মনোময় কোষের স্পন্দন প্রাকৃতিক, এবং তজ্জাত জ্ঞান প্রাকৃতিক, যে হেতু কর্ম্মজ ; এই জ্ঞানই অদৃষ্টাদির হেতু।
৪৬৫	প্রাণের পরিণাম (physical nervous system) এ হয়।	আমরা প্রাণের পরিণাম ছোট বড় করিতেছি। ইহা মন দেহে হইয়া থাকে এই আমার কর্ম্ম পৌরুষের বলিয়া থাকে (দৈবী প্রকৃতি) ইহা evolution এর হেতু কিন্তু বাস্তবিক ইহা জীবনের স্বধন এবং স্বতন্ত্র ধন নহে।

উপরোক্ত কথাগুলি আমাদিগের প্রবন্ধে বোধ হয় অক্ষুটভাবে পরিব্যক্ত হইয়াছিল, সেই হেতু বোধ হয় "ম"এবং "তৃষ্ণাতুরস্য" সুন্দর কথায় বুঝাইয়া দিয়াছেন। ভীষ্মের ন্যায় মহাপুরুষের ও উপর ভগবান ধর্ম্মক্ষেত্রে সত্যের খাতিরে রথচক্র ঘুর্ণায়মান করিয়াছিলেন। তাহা কেবল করুনারই প্রতিচ্ছবি। আমাদিগের ন্যায় ক্ষুদ্র জীবের পক্ষে বিশ্বের প্রথম পটে জ্ঞান ও প্রাণের aspect স্বতন্ত্র বলিয়া স্বতঃই অনুমিত হইতে পারে এবং তাহা মার্জ্জনীয়। আমরা প্রথমতঃ অদ্বৈতবাদের দিকে যাই নাই। উহা কথায় অতি সোজা, কিন্তু প্রাণ দিয়া বুঝিতে হয়। সে উচ্চাসনের অধিকারী আমরা নহি। প্রথম সোপানে আমাদিগের নিকট সবই অদৃষ্ট। সবই সত্য ; অদৃষ্ট সত্য, মায়াও সত্য ; কেহই সম্পূর্ণ মিথ্যা বলে না। কেহই সম্পূর্ণ সত্য বলে না। উভয়েরই মধ্যে একটী সম্পূর্ণ সত্য আছে, তাহা মিথ্যাও নহে ও আমাদিগের কল্পিত সত্য নহে। দেশী ও বিলাতী নেশার তারতম্য

আছে, কিন্তু অচৈতন্য হইলেই মালের গুণ জানিতে পারা যায়, নচেৎ নয়।
আপাততঃ আমরা বিলাতী চুলাই (Science and Theosophy) অবলম্বন করিয়া যে সকল কথা বলিয়াছিলাম, তাহা অন্য বারে "সাধনা নামক প্রবন্ধে ব্যক্ত করিবার ইচ্ছা থাকিল।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মজুমদার এম, এ।

শ্রীরামচন্দ্র।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ভরদ্বাজের নিকট অযোধ্যার সমস্ত কুশল অবগত হইয়া, রামচন্দ্র হনুমানকে গুহক ও ভরতকে তাঁহার আগমন সংবাদ জ্ঞাপনার্থ প্রেরণ করিলেন। পবনাঙ্গজ দ্রুততর প্রস্থান করিলেন। গুহক রামচন্দ্রের পুনরাগমন সংবাদ শ্রবণে আনন্দে অধীর হইলেন। তথা হইতে হনুমান নন্দীগ্রামে গিয়া ভরতকে রামাগমন সংবাদ প্রদান করিলেন। ভরত সেই সংবাদ শ্রবণে যার পর নাই আনন্দিত হইয়া গদ গদ স্বরে বলিলেন

"দেব কি মানব যেবা হও মহাজন,
কৃপা করি মোর প্রতি হেথা আগমন
যেই সুমঙ্গল আজি করিলে প্রদান
তার অনুরূপ কিবা দিব মতিমান।

তৎপরে হনুমান সমুদায় বৃত্তান্ত সবিস্তারে বর্ণন করিলেন, ভরত চিরপিপাসিতবৎ তাহার বাক্যসুধা পান করিতে লাগিলেন। এবং যখন শুনিলেন যে, রামচন্দ্র পরদিন প্রভাতেই অযোধ্যায় উপস্থিত হইবেন, তখন আর আনন্দের অবধি রহিল না, তিনি আনন্দে অধীর হইয়া বলিলেন—

"পূর্ণ মনোরথ মম এতদিন পর।"

তৎপর আনন্দ কোলাহল আরম্ভ হইল। ভরত রামচন্দ্রের শুভাগমন উদ্দেশে বিবিধ আয়োজন করিবার আদেশ করিলেন। কৌশল্যা প্রভৃতি দশরথের মহিষীগণ অযোধ্যা হইতে নন্দীগ্রামে আগমন করিলেন। ভরত রামচন্দ্রের পাদুকা মস্তকে ধারণ পূর্ব্বক প্রত্যুদ্গমনার্থে চলিলেন। তাঁহারা

কিছুদূর যাইতে না যাইতেই পুষ্পক দৃষ্টিগোচর হইল। সকলেই—"শ্রী রামচন্দ্র আগমন করিলেন" বলিয়া আনন্দধ্বনি করিয়া উঠিলেন। আহা! সে আনন্দ সম্মিলন কি মধুর! তাহা বর্ণনার নয়—হৃদয়ে অনুভব করিলে করা যাইতে পারে। ভরত রামচন্দ্রের চরণতলে লুটাইয়া পড়িলেন, রামচন্দ্র তাঁহাকে উত্তোলন করিয়া সাদরে বক্ষে ধারণ করিলেন। আনন্দের আর সীমা নাই—সুগ্রীব পঞ্চম ভ্রাতা বলিয়া গৃহীত হইলেন। রামচন্দ্র তাঁহার জননী ও বিমাতাগণের পদ-বন্দনা করিলেন। ভরত তাঁহার চরণে পাদুকা প্রদান করিলেন,—বলিলেন "এই আপনার রাজ্য আপনি গ্রহণ করুন, এতদিন এ দাসকে রক্ষা করিবার ভার দিয়াছিলেন, আমি যথাসাধ্য রক্ষা করিয়াছি। এখন কোষাগার প্রভৃতি পর্য্যবেক্ষণ পূর্ব্বক আমাকে ভারমুক্ত করুন।" লোকে রাজ্য পাইয়া যত না আনন্দিত হয়, ভরত রাজ্য প্রত্যর্পণ করিয়া তদনুরূপ আনন্দিত হইলেন।

অবিলম্বে রামচন্দ্র সদলে অযোধ্যাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। আহা! চতুর্দ্দশ বর্ষ পূর্ব্বে ইঁহাদের ভাগ্যে যে ঘটনা ঘটিয়াছিল, আজিকার ঘটনা তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। রামচন্দ্র ও তাহার ভ্রাতৃগণ আবার রাজ-বেশে সজ্জিত হইলে, জানকী ও বানরসেনাপতিগণে পত্নীগণর বিবিধ রত্না-লঙ্কারে ভূষিতা হইলেন। পরদিন প্রভাতে রামচন্দ্রের অভিষেক হইল। রামচন্দ্র সীতার সহিত স্বর্ণ সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন। সকলে আনন্দধ্বনি করিতে লাগিল। বশিষ্টদেব রামচন্দ্রকে পুণ্যসলিলে অভিষিক্ত করিলেন, রত্ন-মুকুট তাঁহার শিরে অর্পিত হইল। দেবগণ তাঁহার জন্য মালা প্রেরণ করিলেন। গন্ধর্ব্বগণ গান করিতে লাগিল, অপ্সরাগণ নৃত্য করিতে লাগিল, পৃথিবী শস্য-শালিনী হইলেন। জগতে আনন্দের আর সীমা রহিল না।

অভিষেক সময়ে রামচন্দ্র জানকীকে বহুমূল্য রত্নহার প্রদান করিয়াছিলেন। রামচন্দ্রের অনুমতি লইয়া সীতা সেই হার হনুমানকে অর্পণ করিলেন। লক্ষণ রামচন্দ্রের মস্তকে ছত্র ধারণ করিলেন, ভরত ও শত্রুঘ্ন ব্যজন করিতে লাগিলেন।

(ক্রমশঃ)
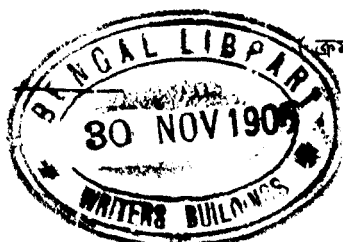
সমালোচনা।

পৌরাণিক কথা।—শ্রীপূর্ণেন্দু নারায়ণ সিংহ এম, এ, বি, এল, প্রণীত। ২৮।২ নং ঝামা পুকুর "অধ্যাত্ম গ্রন্থাবলী প্রচার" কার্য্যালয় হইতে শ্রীঅঘোর নাথ দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ১॥০ দেড় টাকা। যে মহাপুরাণ সাগর মন্থনে পণ্ডিত দয়ানন্দ সরস্বতীর ভাগ্যে অশ্রদ্ধারূপ কাল-কূট উৎপন্ন হয়; যে মহাসাগরের গভীরতা পরিমাণ দেহাত্মবাদরূপ সূত্রের সাহায্যে করিবার জন্য ভাষাতত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণ কেবল বিফল মনোরথ হইয়া, গালাগালির আড়ম্বরে আপনাদের মূর্খতা ঢাকিবার চেষ্টা করেন, সেই পুরাণ-সাগর-মন্থনে আমাদের সুহৃদবর শ্রদ্ধাভাজন পূর্ণেন্দু বাবু যে অমৃত ও মণিরত্ন মালা উদ্ধার করিয়াছেন, তাহা আজ জন সমাজে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল। পুরাণ ও তন্ত্র এই দুইটী বিভাগে হিন্দুধর্ম্মের মূল তথ্য সকল প্রচ্ছন্ন ভাবে রক্ষিত হইয়াছে। বেদে যে সকল বিষয় কেবল ইঙ্গিত মাত্রে বর্ণিত, যাহার একদেশ মাত্র উপনিষদে জ্ঞানযোগের ভিতর দিয়া অস্পষ্ট ভাবে দেখা যায়, সেই সেই সকল নিগূঢ়তম আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক রহস্য আপাতঃ প্রতীয়মান আজগুবী গল্পের ভিতর দিয়া পুরাণে প্রকট হইয়াছে; এই জন্যই বেদার্থের পূরক বলিয়া এবং পুরাণ বা অতীত কল্পাদির ইতিহাস বলিয়া, এই শাস্ত্র পুরাণ নামে কথিত। নিগূঢ় তত্ত্ব সকলের পরিব্যঞ্জক পুরাণের মধ্যে ভাগবত পুরাণ শ্রেষ্ঠতম। হিন্দুর চক্ষে আত্মাই সত্য পদার্থ। রাম, শ্যাম, মায়িক ও অলীক; সেইজন্য হিন্দু ব্যক্তিবিশেষের বা জাতি বিশেষের ইতিহাস লিখেন নাই। কিরূপে আত্মা স্বীয় স্বভাব অবলম্বনে জগদ্রূপে প্রতিভাসিত হয়, সেই ইতিহাসই হিন্দুর আদরের সামগ্রী। ব্যক্ত জীবের ক্রিয়া কলাপ সেই অব্যক্ত ও নিত্য আত্মার শক্তির সাহায্যে প্রকাশিত হয়; সুতরাং দেশকালপরিচ্ছিন্ন ব্যক্ত পদার্থের বিবরণ না লিখিয়া হিন্দু আত্মার ক্রমোভিব্যক্তির ইতিহাস লিখিয়া গিয়াছেন। এই নিগম কল্পতরুমধ্যে শ্রীভগবানের লীলাব্যঞ্জক ভাগবত পুরাণ অতি উপাদেয়। রসিক শেখর পূর্ণেন্দু বাবু স্বীয় আস্বাদিত মধুর রসের সাহায্যে এই ভাগবত পুরাণ অবলম্বনে এই রহস্যময় গ্রন্থের প্রণয়ন করিয়াছেন। এগ্রন্থে পুরুষ বা Logos তত্ত্ব, অবতার রহস্য, ব্রহ্মার সৃষ্টি, প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদের দ্বারা সপ্ত সমুদ্র ও সপ্তদ্বীপের বিভাগ রহস্য, ভরত রাজার বিবরণ প্রভৃতি বিষয় অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। দত্তজা প্রমুখ বিকৃতমস্তিষ্ক পণ্ডিতগণ (!) যাহা গাঁজাখুরী গল্প বলিয়া প্রমান করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, সেই সকল বিষয়ের মূলে কি নিগূঢ় তত্ত্ব রহিয়াছে, তাহা এই পুস্তক পাঠে হৃদয়ঙ্গম হয়। তৎপরে পূর্ণেন্দু বাবু শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব প্রকট করিয়াছেন। যে "কানু বিনা গতি নাই", যাঁহার ছবি লক্ষ লক্ষ নর নারীর হৃদয়ে প্রতিভাত হইয়া সকলকেই সেই চরমলক্ষ্যের পথে লইয়া যাইতেছে, সেই বেদবেদ্য পরমতত্ত্বের লীলা বর্ণনা করিয়া গ্রন্থকার জীবন সার্থক করিয়াছেন। এই বিবরণে প্রক্ষিপ্তবাদের অবতারণা নাই, ও ইহাতে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার শ্রাদ্ধ করা হয় নাই। অনুরাগপূর্ণ, জ্ঞানাগ্নিবিশুদ্ধ, হৃদয়ে শ্রীভগবানের অলৌকিক লীলা মাহাত্ম্য যেরূপে উদ্ভাসিত হয়, এই পুস্তক পাঠে তাহা জানিতে পারা যায়। রাস পঞ্চাধ্যায়ে "কুরুচির" আতঙ্ক নাই। গোপীগণ শুধুই আধ্যাত্মিক তত্ত্ব নহে; অথচ নিকুঞ্জমিলন যে কেবল ইন্দ্রিয়বৃত্তির অনুশীলন তাহাও নহে। রাস অভিসার সত্য ও নিত্য। কাত্যায়নী পূজার দ্বারা পরিষ্কৃত চিত্তে হ্লাদিনী শক্তির বিকাশে, জীবব্রহ্মের যে নিত্য রমণ হয়, রাসলীলা যে সেই অপার্থিব, অলৌকিক সম্মিলন, পূর্ণেন্দু বাবু বিশদ রূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন। পরিশেষে "তখন ও এখন" অধ্যায়ে সেই ব্রহ্মবিদ্যাধর্ম্মের অধঃপতন বর্ণনা করিয়া প্রকৃত বৈষ্ণবদিগের কর্ত্তব্য নির্ণয় করিয়াছেন, এবং বর্ত্তমান কলিযুগে "দেবাপি" ও "মরু" কিরূপে সেই ধর্ম্মের পুনরুত্থানের সহায়তা করিতেছেন, তাহা বর্ণিত আছে। বাঙ্গালা ভাষায় এরূপ মর্ম্মস্পর্শী ও নিগূঢ় রহস্যের দ্বার উদ্ঘাটনকারী, অথচ মধুর ভক্তিরসের অবভাবক, মৌলিকগ্রন্থ দ্বিতীয় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মুদ্রাঙ্কন অতি সুন্দর হইয়াছে, এবং মূল্যও অতি সামান্য। আমরা এক বাক্যে পাঠকবৃন্দকে এই পুস্তক পাঠ করিতে অনুরোধ করি। শ্রীরাজেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায়।

নবম ভাগ। { আশ্বিন ও কার্ত্তিক। } ৬ষ্ঠ ও ৭ম সংখ্যা।

দেবী স্তুতিঃ।

(শ্রীশ্রীচণ্ডী হইতে গৃহীত।)

(১)

দেবি প্রপন্নার্ত্তিহরে প্রসীদ
প্রসীদ মাতর্জ্জগতোঽখিলস্য।
প্রসীদ বিশ্বেশ্বরি! পাহি বিশ্বং
ত্বমীশ্বরী দেবি! চরাচরস্য॥
জগত-জননি! দেবি দুর্গতিহারিণি!
প্রসন্ন হও গো মাতঃ বিশ্বপ্রসবিনি!
তুমি গো মা! চরাচর জগত ঈশ্বরী
বিশ্বেশ্বরি! বিশ্বরক্ষা কর কৃপা করি॥

* শ্রীগোবিন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত "স্তুতিকুসুমাঞ্জলি" হইতে উদ্ধৃত।

(২)

আধারভূতা জগতস্ত্বমেকা
মহীস্বরূপেণ যতঃ স্থিতাসি ।
অপাং স্বরূপস্থিতয়া ত্বয়ৈত—
দাপ্যায়্যতে কৃৎস্নমলঙ্ঘ্যবীর্য্যে ॥

জগতের একমাত্র আধার-রূপিনী
তুমি মা ! ধরণীরূপে জগতধারিণী,
অপার মহিমা তব কে করে বর্ণন
বারিরূপে স্নিগ্ধ কর এ বিশ্বভুবন ॥

(৩)

ত্বং বৈষ্ণবীশক্তিরনন্তবীর্য্যা
বিশ্বস্য বীজং পরমাসি মায়া ।
সম্মোহিতং দেবি ! সমস্তমেতৎ
ত্বং বৈ প্রসন্না ভুবি মুক্তিহেতুঃ ॥

তুমি মা বৈষ্ণবী-শক্তি অনন্ত-শকতি
বিশ্ববীজ-স্বরূপিনী পরমা প্রকৃতি,
তোমার মায়ায় মুগ্ধ নিখিল ভুবন
তুমি তুষ্ট হ'লে ঘুচে এ ভব বন্ধন ॥

(৪)

বিদ্যা সমস্তাস্তব দেবি ! ভেদাঃ
স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু ।
ত্বয়ৈকয়া পূরিত মম্বয়ৈতৎ
কা তে স্তুতিঃ স্তব্যপরা পরোক্তি ॥

হে দেবি ! সমস্ত বিদ্যা তোমার মূরতি
জগতে সকল নারী তব প্রতিকৃতি,
মাতৃরূপে তুমি একা ব্রহ্মাণ্ডব্যাপিনী
কি বলে তোমার স্তুতি করিব না জানি ॥

(৫)

সর্ব্বভূতা সদা দেবি স্বর্গমুক্তিপ্রদায়িনী
ত্বং স্তুতা স্তুতয়ে বা ভবন্তু পরমোক্তয়ঃ ॥
তুমি দেবি ! সর্ব্বভূতে কর অধিষ্ঠান
ভক্তজনে স্বর্গমুক্তি কর মা ! প্রদান।
সাধন স্তবনে তুষ্টি হইলে তোমার
স্তুতি করিবার বাকী কি রহিল আর ?

(৬)

সর্ব্বস্য বুদ্ধিরূপেন জনস্য হৃদি সংস্থিতে।
স্বর্গাপবর্গদে দেবি ! নারায়ণি ! নমোস্তুতে ॥
সর্ব্বজীবহৃদে তুমি বুদ্ধিস্বরূপিনী
সবাকার তুমি স্বর্গমুক্তিপ্রদায়িনী,
নমি দেবি নারায়ণি ! শ্রীপদে তোমার
প্রণমি, প্রণমি, মাগো ! নমি অনিবার ॥

(৭)

কলাকাষ্ঠাদিরূপেণ পরিণামপ্রদায়িনী
বিশ্বস্যোপরতৌ শক্তে নারায়ণি নমোস্তুতে ॥
কলাকাষ্ঠারূপে কাল করি পরিমাণ
তুমি গো মা ! পরিণাম করিছ প্রদান ;
বিনাশিতে এই বিশ্ব শকতি তোমার
নারায়ণি ! তব পদে নমি অনিবার ॥

(৮)

সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে !
শরণ্যে ত্র্যম্বকে ! গৌরি ! নারায়ণি ! নমোস্তুতে ॥
সর্ব্বশুভ সুমঙ্গলমঙ্গলকারিকে !
কল্যাণদায়িনি ! শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে !
সবার শরণ্যে মাগো ! গৌরি ত্রিনয়নি !
শ্রীপদকমলে তব নমি, নারায়ণি !

দুটী মনের কথা।

১।—প্রকৃত আধ্যাত্মিকতা।

"হরি তোমায় ভালবাসি কৈ, আমার সে প্রেম কৈ।

তোমায় যদি বাসতেম ভাল, (তবে) জানতেম না আর তোমা বৈ" ॥

প্রায়ই মনে হয় যে আমাদের বিশ্বাস নাই, ভক্তি নাই ও আধ্যাত্মিকতা নাই। নিজেকে আধুনিক শিক্ষিত সমাজের মধ্যে গণ্য করি, অন্যেও করে। কিন্তু শিক্ষিত সমাজের বিশ্বাস কতদূর? আজ কাল সর্ব্বদেশে, এই স্থূল শরীরের ভিতর দিয়া প্রকাশিত মনুষ্যজীবনের অতিরিক্ত সূক্ষ্মভাবেস্থিত অন্য জীবন আছে, একথা শিক্ষিতসমাজ অল্পাধিক পরিমাণে বিশ্বাস করেন; সুতরাং আমরাও করি। সূক্ষ্মলোক সম্বন্ধে আমাদের বিশিষ্ট জ্ঞান না থাকিলেও, প্রায় সকলেই স্বীকার করি যে, "আমার আমি" মরিবার পরও বর্ত্তমান থাকিবে, এবং মৃত্যুর পর পারে এক অনির্দ্দেশ্য ভাবে অস্তিত্বের প্রকাশ আছে। এই ত গেল বিশ্বাসের কথা। কিন্তু দার্শনিক বেন্ (Bain) সাহেবের মতে এই বিশ্বাসের পরিমাণ করিতে গেলে, দেখিতে পাই যে আমাদের পরজীবনে বিশ্বাসের মূল্য কিছুই নহে। বেন সাহেব বলেন যে, কার্য্যই বিশ্বাসের পরিমাণ, এবং যে পরিমাণে কোনও "মত" (theory) আমাদের জীবনে পর্য্যবসিত হয়, কেবল সেই পরিমাণেই তাহাতে আমাদের বিশ্বাস আছে বলা যায়। জীবনে কার্য্যকারিতাই বিশ্বাসের পরিমাণ। এ কোষ্টি পাথর লইয়া আমাদের পরজীবনে বিশ্বাস পরিমাণ করিতে গেলে, স্পষ্টই প্রতীত হয় যে আমাদের বিশ্বাসের দৃঢ় ভিত্তি নাই। আমরা পরিদৃশ্যমান স্থূলজগৎকে একমাত্র জগৎ ও কার্য্যক্ষেত্র বলিয়া বিশ্বাস করি; ও আমাদের সমস্ত আশা ও ভরসা, চিন্তা ও কার্য্য, স্থূল বিষয়ে ও স্থূল অস্তিত্বে ন্যস্ত। এমন কি, যদি কেহ স্থূলাতীত সূক্ষ্মবিষয়ে জীবনকে কেন্দ্রীভূত করিতে চাহেন, তাঁহাকে আমরা কথঞ্চিৎ পরিমাণেও বিকৃতমস্তিষ্ক বলিয়া গণ্য করি। আমার বাটীতে কোন প্রিয়জন উৎকটরোগাক্রান্ত হইয়া আছে; রোগে বিকলাঙ্গ ও বিকৃতধী। রোগীর জীবন কেবল দারুণ যন্ত্রণা মাত্রে পরিণত। সকলেই

জানি যে, ওরূপ বিকৃতউপাধিগ্রস্ত জীবনে অনন্ত প্রকৃত ভাবপ্রকাশ হইতে পারে না, ও রুগ্নশরীর বহন করিতে করিতে আত্মোন্নতি হইতে পারে না। সকলেই জানি যে, দেহী জীর্ণবস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া মৃত্যুর পরপারে গমনপূর্ব্বক নূতন ও উন্নতির পক্ষে বিশেষসহায়কারী শরীরগ্রহণ করিয়া পুনরায় ফিরিয়া আসিবে। কিন্তু তত্রাপি ডাক্তার, কবিরাজ ও আত্মীয়বর্গ সকলেই কি প্রকারে সেই প্রসুপ্তপ্রায় চৈতন্যশক্তিকে বীর্য্যবান ঔষধ, ব্লিষ্টার, (Blister) প্রভৃতির কঠোরকশাঘাতে পুনরুদ্দিপ্ত করিয়া তাহার স্থূলদেহের মমতা জাগাইয়া দিতে পারি, ও কিরূপে ভগ্নপ্রায় শরীর হইতে অপসারিত জীবকে রোগের অজ্ঞান অবস্থা হইতে অশান্তিময় রুগ্নশরীরে পুনরায় বদ্ধ করিতে পারি, এবং দুই এক দিনের জন্যও, ক্লিষ্ট ও বিকৃত শরীরের সহিত তাহার সংযোগ বজায় রাখিতে পারি, সেই চেষ্টাতেই মত্ত। এই ঘটনা সর্ব্বত্রই প্রতিনিয়ত ঘটিতেছে ; এবং দেখিয়া মনে হয় যে, আমাদের পরজীবনে বিশ্বাস কেবল "মত" ভিন্ন আর কিছুই নহে। যদি মৃত্যুর পর জীবন আছে বিশ্বাস করিতাম, যদি পুনর্জ্জন্মে দৃঢ় আস্থা থাকিত, যদি আত্মার অবিনশ্বরত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতাম, যদি ঐশী শক্তির করুণাময়ী অভিব্যক্তিতে বিশ্বাস থাকিত, তাহা হইলে কখনই এ প্রকার ব্যবহার করিতে পারিতাম না।

সকলেই জানি অর্থ অনর্থকর। কিন্তু দুঃখভারে প্রপীড়িত হইয়া যে উপায়ে অর্থ উপার্জ্জনের চেষ্টা করি, তাহা পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টই বোধ হয় যে "মোহমুদ্গরের" মুদ্গরত্ব যুগধর্ম্মে লুপ্ত হইয়া আসিয়াছে। অধিক কি, নিজ দৈনন্দিন কার্য্যকলাপ বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে আমাদের স্থূলজীবনই যে একমাত্র সম্বল ইহা প্রমাণিত হয়। ইউরোপ ও প্রতীচ্যখণ্ডে স্থূলদেহাতীত জীবনে বিশ্বাস একেবারে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এদেশেও কৃত-বিদ্য শিক্ষিতসমাজে ঐ বিশ্বাস একেবারে বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে। যাহা কিছু আছে, সে কেবল কতকগুলি অর্দ্ধশিক্ষিতা বা অশিক্ষিতা ও কুসংস্কাররূপ-কুজ্ঝটিকায় আচ্ছন্না স্ত্রীলোকদিগের এবং স্ত্রীস্বভাবাপন্ন, অকর্ম্মণ্য, বিকৃতমস্তিষ্ক পুরুষদিগের মধ্যে। বিজ্ঞানের আলোক না পাইয়া ঐ শ্রেণীর ব্যক্তিগণ এখনও দেহাতীত জীবনে বিশ্বাস করে, ও ব্রহ্মচর্য্য, ব্রত, তপস্যাদির দ্বারা পরজীবনের উপযোগী হইবার জন্য প্রয়াস করে। বাস্তবিকই দেখিতে গেলে, এই আয়াস-

সাধ্য ব্রতজপাদির দ্বারা আমরা স্থূল বস্তু ও স্থূল ভাব অল্পে অল্পে ত্যাগ করিতে শিখি, ও সেই পরিমাণে সূক্ষ্ম জীবনে আত্মজ্ঞান বজায় রাখিবার ভিত্তিস্থাপন করি।

সূক্ষ্ম জীবনের উপর ও তাহার ক্ষেত্ররূপ সূক্ষ্মজগতের উপর আমরা যে আস্থাহীন হইয়াছি, তাহার কারণ কি? তাহার কারণ এই যে, উপযোগী শক্তির অভাববশতঃ মানবের সহিত সূক্ষ্ম জগতের কোন নিত্য সম্বন্ধ নাই। সে দিন পন্থার "জ্ঞান ও প্রাণ" শীর্ষক প্রবন্ধটি কোন শিক্ষিত বন্ধুর নিকট পড়িতে যাই। তিনি একেবারে বলিয়া উঠিলেন "ও পুরাণ কথা, ঐ Cognition এবং Conation বা Will।" ইংরাজী দর্শনে "জ্ঞান" ও "প্রাণ" অর্থে স্থূলজ্ঞান ও স্থূলজগতেক্রিয়োপযোগী বহির্মুখী শক্তি ভিন্ন আর কিছু নহে। কিন্তু জ্ঞান অর্থে যে সূক্ষ্মতর জগতের জ্ঞান, এমন কি আত্মজ্ঞান হইতে পারে, এবং প্রাণের বিকাশ যে সূক্ষ্মতর লোকেও থাকিতে পারে, এ কথা বন্ধু ভায়ার মনে উদয় হয় নাই। মানবের ভিতর এমন কোন শক্তি নাই যদ্দ্বারা সূক্ষ্ম জগৎ সকল প্রত্যক্ষ করা যায়, এই বিশ্বাস অলক্ষ্য ভাবে মানবের মর্ম্মস্থান অধিকার করিয়াছে। চৈতন্য অর্থে জাগ্রত চৈতন্য; কারণ বৈজ্ঞানিকগণ স্বপ্নজগৎ স্থূলজীবনের মিথ্যাভূত প্রতিচ্ছায়া বলিয়া বর্ণনা করেন। সূক্ষ্ম জীবন নাই, সূক্ষ্ম ভাব নাই, ও সূক্ষ্ম শক্তি নাই, এই ত্রিসত্য আধুনিক সভ্যতার জয় পতাকা! কাজেই সর্ব্ব দুঃখের, কি রাজনৈতিক, কি সামাজিক দুঃখের, একমাত্র ঔষধ স্থূলশরীরে ক্রিয়া ও "গলাবাজী।" বিজ্ঞানের উন্নতি কেবল আমাদের স্থূলপারিপার্শ্বিক জীবনের উন্নতির জন্য। বুদ্ধি সাহায্যে যে সকল শিল্প পুরাকালে প্রস্তুত হইত, সে সকল এখন কলের সাহায্যে হয়; কাজে কাজেই "দরে সস্তা"। আমরা একবারও ভাবি না, যে কল কারখানা হইয়া এবং বুদ্ধিবিকাশের অন্য উপায় না থাকাতে, সাধারণ মানব ক্রমে জড়ভাবাপন্ন হইয়া উঠিতেছে। বিলাসটুকু চাই, অথচ সস্তায় হওয়া চাই। কিন্তু সস্তায় জিনিস পাইতে গেলে, আমার ভ্রাতৃস্থানীয় কতকগুলি মানব যে ক্রমে বুদ্ধি পরিমার্জ্জন অভাবে পশুত্ব প্রাপ্ত হইতেছে, ইহা একবারও ভাবি নাই। * পরজীবনে, কর্ম্মেরনিয়মে এবং ঈশ্বরে

* Fortnightly Review, May 1905, "Price of cheapness". দ্রষ্টব্য।

মানবজাতির একতায় বিশ্বাস থাকিলে, আমরা শুধু স্থূল ভোগ্য বস্তুতে আমাদিগের জীবন ব্যাপ্ত করিতে পারিতাম না।

কেবল অন্য জীবন যে আছে ইহা ভাবিলেও চলিবে না। প্রতিক্ষণেই সূক্ষ্ম জগৎ সকলের অনুভব হওয়া চাই ; ও স্বজ্ঞানে,এক সময়ে, স্থূল,সূক্ষ্ম,কারণ এই তিন জগতে কার্য্য করিতে হইবে। যতদিন এই তিন জগৎ আমাদের নিকট প্রত্যক্ষ না হয়, ততদিন অদৃশ্য জগৎ কেবল মাত্র কথার কথা।

এখন "প্রত্যক্ষ" কাহাকে বলে ? যখন মানবের চিচ্ছক্তি অবিকৃতভাবে, আত্মজ্ঞানকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া বস্তুবিশেষকে গ্রহণ করিতে পারে, তখনই ঐ বস্তু আমাদের প্রত্যক্ষ। "অবিকৃত ভাবে"র অর্থ এই যে, আমরা যে ভাবেই থাকি না কেন স্থূলজগতস্থ বস্তুসকল এক ভাবে গ্রহণ করিতে পারি। আমি শোকার্ত্ত বা রাগত হইলে, আমার সম্মুখস্থ বৃক্ষটির কোন তারতম্য হয় না, এবং যে ভাবেই থাকি না কেন, স্থূলজগতের প্রতি বুদ্ধিবৃত্তির প্রয়োগ করিতে পারি। যখন বস্তুবিশেষ আমার আভ্যন্তরীণ ভাবেরদ্বারা পরিবর্ত্তিত না হয়, পরন্তু আমার ভাবের অপেক্ষা না করিয়া এক ভাবেই অবস্থান করে, এবং যখন আমার আমিত্বজ্ঞান তৎসমক্ষে অটুট্ থাকে, অর্থাৎ বস্তুবিশেষে আমার আমিত্বজ্ঞান হারাইয়া না ফেলি, তখনই বলা যায় যে বস্তুটি প্রত্যক্ষ। জনসাধারণ মাত্রেই, মনুমেণ্টকে মনুমেণ্ট ভাবে দেখিতে পারে ও তৎপ্রতি চিন্তাশক্তির প্রয়োগ করিতে পারে, ইহাই মনুমেণ্টের বস্তুত্বের কারণ। যে পদার্থ মানব এইরূপে স্বাধীন ভাবে গ্রহণ করিতে পারে না, এবং যাহাতে আমাদের আত্মজ্ঞানের লোপ হয়, তাহা আমাদের প্রত্যক্ষ নয়। স্বপ্নরাজ্যে বস্তু সকলের নিকট আমাদিগের প্রকৃতি ও আত্মজ্ঞান বিকৃত হইয়া যায় এবং স্বাধীনভাবে পূর্ণস্মৃতির সহিত, সকল বস্তু গ্রহণ করিতে পারি না বলিয়াই, স্বপ্নলোক অনুভূতির পদার্থ হইলেও অলীক। যে বিচারশক্তির সাহায্যে স্থূলজগতের কার্য্য করি, স্বপ্নজগতে ঐ শক্তি বিলুপ্ত হইয়া যায়। প্রত্যেক লোক এক ভাবে স্বপ্ন দেখিতে পারে না। ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, স্বপ্নে-প্রকটিত বস্তু সকল কথঞ্চিৎ পরিমাণেও আমাদের ব্যক্তিগত বাসনার অধীন। উপরন্তু, আমরা স্বাধীনভাবে ইচ্ছামাত্রেই স্বপ্নজগতের বস্তু সকল দেখিতে পারি না ; আমাদের সেরূপ ইন্দ্রিয়ের অভিব্যক্তি হয় নাই। যেমন

চক্ষু উন্মীলন করিলে সম্মুখস্থ বস্তু দেখিতে হইবেই, তদ্রূপ আমরা এখনও এরূপ কোন ইন্দ্রিয় বা শক্তি ধারণ করি না যদ্দ্বারা ইচ্ছামাত্রে স্বপ্নলোকের বস্তু সকল দেখিতে পাই। আমাদের পক্ষে ঐ সকল বস্তু বাসনাবিজৃম্ভিত; আমাদের মানসিক ভাবের অতিরিক্ত সত্তা নাই। কিন্তু যখন বাসনা জয়ের দ্বারা আত্মজ্ঞান পরিষ্কৃত হয়, এবং সাধনা দ্বারা সূক্ষ্ম দৃষ্টিশক্তি নির্ভিন্ন হয়, তখন স্বপ্নরাজ্য ভুবর্লোক বলিয়া প্রত্যক্ষ করা যায়। এইরূপ অবস্থাপন্ন দুই জন লোক ভুবর্লোকে গিয়া একই পদার্থ একই ভাবে দেখিতে পারে ও তদুপরি মানসিক এবং সূক্ষ্মতর শক্তির প্রয়োগ করিতে পারে, এবং স্থূল শরীরে আসিবার সময় ভুবর্লোকে অনুভূত বস্তুর ভাব বা জ্ঞান পরিশুদ্ধ ভাবে নামাইয়া আনিতে পারে। সূক্ষ্মলোকের জ্ঞান হইবার অগ্রে আত্মজ্ঞান পরিষ্কৃত ও নির্ম্মল করা চাই, ও সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ের অভিব্যক্তি হওয়া চাই! উপযুক্ত ইন্দ্রিয় বা করণশক্তির উদ্ভব না হইলে, কোন প্রকার "লৌকিক" জ্ঞান সম্ভবে না।

এই নিয়ম ইহ জগতে যেমন সত্য, সূক্ষ্ম জগতেও সেইরূপ। যাহার চক্ষুরিন্দ্রিয় নাই তাহার নিকট রামধনুর মনোরম বর্ণবিন্যাসও অসত্য; রামধনুর বিশদ বর্ণনাও তাহার চিত্তে পূর্ণভাবে উহার অস্তিত্বে বিশ্বাস উৎপন্ন করিতে পারে না। যাহার সঙ্গীতরস গ্রহণে ক্ষমতা নাই, তাহার নিকট মৃত নত্ত্যাখাঁর স্বর্গীয় সঙ্গীত কেবল "কালোয়াতী গলাবাজী" বলিয়া বোধ হয়। সেইরূপ অতীন্দ্রিয় জগৎ সকলের সত্তা আমাদিগের প্রত্যেক কার্য্য ও ভাবের ভিতর দিয়া প্রতিক্ষণ প্রতিবিম্বিত রহিয়াছে, কিন্তু ঐ ভাবগ্রহণের ক্ষমতা বা ইন্দ্রিয় নাই বলিয়া উহা আমাদের নিকট অসত্য বলিয়া বোধ হয়। যতক্ষণ সূক্ষ্মভাব গ্রহণের শক্তি না জন্মিবে, ততক্ষণ অদৃশ্য জগতের রূপবর্ণনাসত্ত্বেও উহা আমাদের নিকট অলীক। মহাভারতে ও রামায়ণে অতীন্দ্রিয় জগতের রূপবর্ণনা "দত্তজা" প্রমুখ পণ্ডিতাভিমানী ব্যক্তিগণের নিকট কবিকল্পনা বলিয়া বোধ হয়। দেবদেবীর রূপ বর্ণনাও হয় সাঙ্কেতিক, নয় ত কেবল উত্তপ্ত মস্তিষ্কের ফল বলিয়া বোধ হয়।

তাহা হইলে কি অতীন্দ্রিয় লোক সকল কখনও প্রত্যক্ষ রূপে দৃষ্ট হয়? মানবের ভিতর কি এমত কিছু লুক্কায়িত শক্তি আছে, এমত প্রসুপ্ত অতীন্দ্রিয়

ইন্দ্রিয়ের বীজ আছে, যদ্দ্বারা অদৃশ্য জগৎকে দৃশ্য বা প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করা যায়? যাঁহাদিগকে সিদ্ধ বা মহাপুরুষ বলা হয়, তাঁহাদিগের কি এই অতীন্দ্রিয় শক্তি সকলের বিকাশ হইয়াছে? যদি হইয়া থাকে, তবে কি উপায়ে? এই সকল প্রশ্ন আমাদের বিবেচ্য।

উপরোক্ত প্রশ্ন সকল সমাধানের দুইটি উপায় আছে। প্রথমতঃ, ইতিহাস—সাহায্যে অতীত কালের মানবজীবন বিশ্লেষণ করিয়া, অতীন্দ্রিয় শক্তি সকলের কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়, দ্বিতীয়তঃ আমরা আপন আপন প্রকৃতি বা স্বভাবের বিশ্লেষণ করিয়া ঐ সকল বীজ তাহাতে অন্তর্নিহিত আছে কি না দেখিতে পাই। প্রথম উপায়ে ইহা স্পষ্টরূপে দেখা যায় যে, পুরাতনেরা, আমাদের পূর্ব্বজেরা, পরিদৃশ্যমান জগৎকে কূটস্থ বা অব্যক্ত শক্তির ছায়া মাত্র বলিয়া জানিতেন। পুরাতন মিশরের পণ্ডিতগণ ব্যবহারিকজগৎকে সত্য, অপরিণামী ও দৈবজগতের প্রতিচ্ছায়া বলিয়া মানিতেন। ভারতে সংসার সৎপদার্থের মায়ীক অভিব্যক্তি বলিয়া স্বীকৃত হইত; "সংসার মায়া পরিকল্পিতোঽসি।" নিত্য, শুদ্ধ, নিরঞ্জন পদার্থ মায়াশক্তির সাহায্যে জগৎরূপে প্রতিভাসিত। ইহুদি জাতির ধর্ম্মপুস্তকে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ঈশ্বর সর্ব্বপ্রথমে ভাবময় (Ideal) জগৎ প্রকট করিয়া, পরে তদনুরূপ স্থূল জগৎ প্রস্তুত করেন। পণ্ডিতবর ফাইলো (Philo) বলেন যে, ঈশ্বর প্রথমে অদৃশ্য জগৎকে নির্ম্মাণ করিয়া, পরে স্থূলজগৎকে নির্ম্মাণ করেন। টালমুড (Talmud) নামক ধর্ম্মপুস্তকে আছে যে, মানব দৃশ্যজগতের সাহায্যে অদৃশ্যজগতকে বুঝিতে পারে। মহাত্মা পিথাগোরাস (Pythagoras)এর মতে, মহত্তত্ত্বে (Universal mind) সকল বস্তু ভাবময়রূপে নিহিত থাকে, এবং পরে ব্যক্ত হইয়া স্থূলজগৎরূপে প্রতীত হয়। প্লেটো (Plato) ও ঐ কথা বলেন। সর্ব্বত্রই, সর্ব্বশাস্ত্রেই, নিত্য, সত্য, কোন অদৃশ্য পদার্থ হইতে এই অনিত্য বা প্রাতিভাসিক জগৎ উৎপন্ন, ইহা উপদিষ্ট আছে। অব্যক্তই নিত্য, ব্যক্তই পরিণামী। অব্যক্তই মানবের সত্য এবং পূর্ণভাব;—"তৎত্বমসি শ্বেতকেতো।"

ইহাতে বুঝা গেল যে, আমাদের পূর্ব্বজেরা সূক্ষ্মভাবেপ্রকটিত শক্তি ও তদনুরূপ জগতে বিশ্বাস করিতেন। এক্ষণে সমস্যা এই যে, তাঁহাদের বর্ণিত

সূক্ষ্মজগৎ কি সুধু কাল্পনিক; না, ইহার মূলে কিছু সত্ত্বা আছে? উহা কাল্পনিক হইতে পারে না, কারণ পুরাতন সূক্ষ্মদর্শীগণের ভিতরে ঐক্যতা দেখিতে পাওয়া যায়। বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন সমাজে, বিভিন্ন সভ্যতাকালে এরূপ ঐক্য "আকস্মিক" বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না। পরন্তু আমাদিগের সময়ে যাঁহারা সূক্ষ্মদৃষ্টিসম্পন্ন, তাঁহারাও এখন পর্য্যন্ত, "পুরাতনদিগের" বর্ণিত বিষয় সকল একভাবেই দর্শন করেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমার পরিচিত এক-জন মুসলমান ভদ্রলোকের কথা মনে পড়িল। তিনিও সাধনাকালে হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তিসকল দেখিতে পাইতেন, এবং তাঁহার বর্ণনার সহিত শাস্ত্রোক্ত বর্ণনার বিভিন্নতা দৃষ্ট হইত না। দৃষ্ট মূর্ত্তিসকল যে সংস্কারের ফল, একথা এ ক্ষেত্রে বলা যায় না। Society for Psychical Research দ্বারা প্রকা-শিত বিবরণাবলী পাঠ করিলে, সূক্ষ্ম বস্তুসকলকে বিভিন্ন মানব যে একভাবে দেখিতে পায়, ইহা স্পষ্টই প্রতীত হয়। অতএব সূক্ষ্মজগৎ ও সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় শক্তি স্বীকার না করিয়া থাকা যায় না। আমাদের পক্ষে কি উল্টা ভাব; সূক্ষ্ম মাত্রেই অলীক। কোথায় দৃশ্য অলীক হইবে, তাহা না হইয়া অদৃশ্য মূল-জগৎ বা উচ্চস্তরের সত্ত্বাসকল আমাদের নিকট মিথ্যা বলিয়া মনে হয়।

পুরাকালে মানব অর্থে যে অপরিণামী অক্ষর চৈতন্য, সূচিত হইত, তাহা বুঝা গেল। ঐ চৈতন্য স্বীয় শক্তির প্রভাবে প্রাপ্ত আবরণ হইয়া, Matter বা প্রকৃতিরূপে স্থূলতর পরিণতির সহিত ক্রমে বদ্ধভাব ধারণ করে। এই চৈতন্যই ভগবদাংশ জীব; ও জীবের সহিত ভাবময় মূলজগতের যেরূপ সম্বন্ধ, এই স্থূলভাবাপন্ন অথচ অলীক জগতের সহিত তদ্রূপ নহে। প্রতি ক্ষেত্রেই জগৎ জীবের বহিরঙ্গভাব, এবং এই অভিন্নতা, জীবের স্থূলতর অভি-ব্যক্তির সহিত ক্রমে, দেশ, কাল ও কার্য্য, ও কারণভাবদ্বারা আমাদের নিকট ব্যক্ত হইতেছে। আর একটু প্রভেদ আছে। জীব স্বরূপতঃ নিত্য, কিন্তু জগৎ প্রবাহরূপে নিত্য। এই জন্য জগৎকে ব্যবহারিক বা প্রাতিভাসিক জগৎ বলে; এবং মানব ক্রমোন্নতির সহিত স্থূল হইতে সূক্ষ্মতর জগতে আপনার ভাব স্থাপন করিয়া, সেই সেই জগৎকে ও আপনাকে একীকৃত করিয়া ক্রমে পরমপদে উপনীত হয়। সৃষ্টি বা প্রকাশ কালে, জীব সত্যলোকে আবির্ভূত হইয়া, পরে মনোময়কোষে আবৃত হয়, ইহাই "মানব জন্ম"। পরে স্থূলতরভাবে

ইন্দ্রিয়াদির সহিত স্থূলজগতে প্রকাশ হয়, ও জগৎকে প্রকাশ করে। স্থূল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা স্থূল জগৎ, সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় দ্বারা সূক্ষ্ম জগৎ প্রকটিত হয়। এইরূপে আত্মস্থ হইলে আধ্যাত্মিক জগৎ প্রকাশিত হয়। প্রবৃত্তিমার্গে, জীব আপন অংশদ্বারা সূক্ষ্ম জগৎকে অনুপ্রাণিত করিয়া অবশেষে স্থূলশরীরে স্থূলভাবে স্বীয় অভ্যন্তরস্থ জগৎ প্রকাশ করে। নামিবার ক্রম শ্রীভাগবতে এইরূপ বর্ণিত আছে :—　　স এষ জীবো বিবরপ্রসূতিঃ

প্রাণেন ঘোষেণ গুহাং প্রবিষ্টঃ।
মনোময়ং সূক্ষ্মমুপেত্য রূপং
মাত্রা স্বরো বর্ণ ইতি স্থবিষ্ঠঃ॥ ১১-১২-১৭

"বিবরের মধ্যে যাঁহার প্রকাশ, সেই অপরোক্ষ পরমেশ্বর নাদসম্পন্ন প্রাণের সহিত গুহায় প্রবেশ পূর্ব্বক, সূক্ষ্ম মনোময়রূপ প্রাপ্ত হইয়া, মাত্রা, স্বর ও বর্ণ এইরূপে অতি স্থূল হইয়া থাকেন। এই শ্লোকের অর্থ অত্যন্ত নিগূঢ়। আপাততঃ এইটুকু বুঝিলেই হইবে যে, জীব ও জগৎ ভাবরূপে গ্রথিত, অর্থাৎ জীবের যে ভাব প্রবল হয়, তদুপযুক্ত জগৎভাবও প্রকাশ হয়। এই ভাবগুলি বুদ্ধি, মন, অহঙ্কার, ইন্দ্রিয়াদি প্রভৃতির বিভিন্নরূপে বর্ণিত হয়। এই প্রথম কথা। দ্বিতীয় কথা এই, যে মনোময় ভাব প্রাপ্ত হইবার পর মাত্রা, স্বর ও বর্ণরূপে জীব জগৎভাবে প্রকাশিত হয়।

আমাদের মনোময় পরিচ্ছেদে তিনটী স্তর আছে। ভাগবতে উক্ত আছে যে, মনের দেব, ইন্দ্রিয় ও ভূতময় এই তিন ভাবে অভিব্যক্তি হয়।* তন্মধ্যে দেবতা আধ্যাত্মিক, ইন্দ্রিয় আধিদৈবিক ও ভূত সকল আধিভৌতিক বিকাশ। দেবতারূপ আবরণের সাহায্যে মানবচিত্ত স্বর্লোকে বিষয় সকল প্রত্যক্ষ করে; ও সূক্ষ্ম ও স্থূল ইন্দ্রিয় সাহায্যে যথাক্রমে ভুবর্লোক ও ভূর্লোক প্রকটিত হয়। ভূতময় চক্ষুগোলক না থাকিলে আমরা স্থূল জগৎকে দেখিতে পাইতাম না। প্রত্যেক জগৎই স্বরূপানুযায়ী ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষীভূত হয়। তবে আজ কাল মানবের স্থূলত্বনিবন্ধন স্থূল বা আধিভৌতিকভাবে স্থূল ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে মনের ক্রীড়া। যেমন যেমন সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্মতর ইন্দ্রিয় শক্তি বিকশিত হইবে, সেইরূপে, সেই পরিমানে সূক্ষ্ম জগৎ সকলও প্রত্যক্ষের বিষয় হইবে।

* ৩য় স্কন্ধ ৫ম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

এই উপদেশ শাস্ত্রে অনেক স্থলে আছে। সূক্ষ্ম জগতের প্রকাশের সহিত সূক্ষ্ম জগতে অবিশ্বাস একেবারে দূর হইয়া যাইবে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, সাধারণে নিদ্রাবস্থায় আত্মজ্ঞান হারাইয়া ফেলে। স্বপ্নাবস্থায় জ্ঞান থাকিলেও, স্বরূপজ্ঞান ও বিবেকজ্ঞান প্রায়ই থাকে না। কিন্তু শিষ্য, গুরুর অধীনে থাকিয়া শিক্ষিত হইলে বিশিষ্ট অনুশীলনসাহায্যে আত্মজ্ঞান প্রসারিত হইলে এবং বৈরাগ্য সাধনে বাহ্যবস্তু ও তন্নিষ্ঠতা চিত্ত হইতে অপসারিত হইলে, নব প্রকটিত সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে সূক্ষ্মলোকে স্বজ্ঞানে থাকিতে পারেন। তদুপরি, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক প্রভৃতি ভাবসকল কিরূপে মনিগণের ন্যায় ভগবদ সূত্রে বা শক্তি সূত্রে গ্রথিত, এই তথ্য পূর্ণরূপে অভ্যস্ত হইবার পর, মানব এককালে তিন জগতে ক্রিয়া করিতে পারে, অথচ বাস্তবিক পক্ষে তাহার চিত্ত স্বরূপে অবস্থিত। এই সূক্ষ্ম জগতে প্রকাশ-ক্ষমতাকেই ও সূক্ষ্মভাবাপন্ন হওয়াকেই অনেকে, অনেক ধর্ম্ম সম্প্রদায়ে, মানব অস্তিত্বের নিত্যত্ব উপলব্ধি কার্য্য বলা হয়, এবং অনেকে ইহা-কেই পরমার্থ বা পুরুষার্থ বলিয়া গণ্য করেন। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। ভেদাত্মক ভাবে অবস্থান মাত্রেই মায়ীক। অনেকে সূক্ষ্মভাবাপন্ন অস্তিত্ব লাভের জন্য প্রয়াস করেন। কিন্তু এ অবস্থা মায়ীক হইলেও সাধারণ জীবের পক্ষে দুষ্প্রাপ্য। সুতরাং সূক্ষ্মভাবেস্থিত অস্তিত্বের প্রমাণ সংগ্রহ করিলেই হইবে না।

মানবের যে সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়সকল সূক্ষ্ম জগতের সহিত কি সম্বন্ধে সম্বদ্ধ, এতদ্বিষয়ে প্রতীচ্য জগতে অনুসন্ধান চলিতেছে, এবং যথেষ্ট প্রমাণ সংগ্রহও হইতেছে। Society for Psychical Research প্রমুখ সমাজের সাহায্যে সূক্ষ্ম দৃষ্টি, সূক্ষ্ম শ্রবণ, সূক্ষ্মদেহে অবস্থান এবং স্বপ্ন মধ্যে সূক্ষ্ম জগতের সূক্ষ্ম শক্তির ক্রিয়া সকল প্রমাণিত হইয়াছে। চতুর্দ্দিকে সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ের অভ্যুদয়ের লক্ষণ দৃষ্ট হইতেছে। Mesmerism এবং Hypnotism "ছেলে খেলার" অবস্থা অতিক্রম করিয়া মনোবিজ্ঞানশাস্ত্র প্রমাণের প্রধান উপায় বলিয়া গণ্য হইয়াছে। এমন কি সম্প্রতি Colonel De Roche সাহেব Mrs Annie Besant (বেশান্তের) উপদেশে Mesmerism সাহায্যে পূর্ব্ব-জন্মের লুপ্তস্মৃতির উদ্ধার সাধন করিয়া জগৎকে স্তম্ভিত করিয়াছেন। ঐ অবস্থায় প্রকাশিত ঘটনাবলী পর্য্যালোচনা করিলে, আমাদের চিন্তা

শক্তি যে স্থূল মস্তিষ্কের অনুসঙ্ঘাত উৎপন্ন বলিয়া আর স্বীকার করা যায় না। কারণ, trance বা মোহপ্রাপ্ত অবস্থায় স্থূলমস্তিষ্কে দূষিত রক্ত সঞ্চারিত হওয়াতে, উহা জড়তা প্রাপ্ত হয়; সুতরাং ঐরূপ মস্তিষ্কে অনু-সঙ্ঘাত বা অনুবিন্যাশ সম্ভবে না। অথচ দেখা যায় যে, ঐ অবস্থাতেই মানবের ভিতর প্রসুপ্তশক্তি সকলের কিছু কিছু অভিব্যক্তি হয়। উহা আমরা কৌতুকোদ্দীপক বলিয়া মনে করি। সেই সকল mesmeric ঘটনাবলীর ভিতরে অনুসন্ধান করিলে, মানবের চিচ্ছক্তির অদ্ভূত প্রকাশ ও শক্তি দৃষ্ট হয়। Spiritualistic বা প্রেতের পুনরাগমনসম্বন্ধীয় ঘটনাবলী পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করিলে, স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, চক্র বা circle স্থিত ব্যক্তিগণের জ্ঞান ও সংস্কারের বহির্ভূত অদ্ভূত চিচ্ছক্তির ক্রিয়া হয়। Automatic writing বা "হস্তলিপির" ঘটনাবলী ভাবিয়া দেখিলে স্পষ্টই বোধ হয় যে, মানবের ভিতর এমন চৈতন্য পদার্থ আছে, যাহা স্থূলমস্তিষ্কগত চৈতন্যের (brain consciousness) অতীত। এই শক্তি স্থূলপ্রজ্ঞার অজ্ঞাতসারে লেখকের হস্ত স্ববসে আনিয়া, অননুভূত ও অজ্ঞাত বিষয় সকল লিখিতে পারে। স্থূল যন্ত্রাদি না হইলেও মানবের চিন্তা যে বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়, এবং অন্যান্য মস্তিষ্কে চিন্তারূপে পুনরায় প্রতিভাত হইতে পারে এই তথ্য এখন তর্কাতীত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। প্রতিদিন অদৃশ্য শক্তি সকল বিবিধ উপায়ে স্থূল দৃষ্টিশক্তির অন্তর্ভূত হইতেছে। দৃশ্য অর্থে এখন শুদ্ধ স্থূল জগৎ নহে। সূক্ষ্ম জগতের কিয়দংশও ইহার অন্তর্ভূত হইয়া পড়িয়াছে ও আমাদের দৃষ্টির সীমা এখন অদৃশ্যকেও অনুশীলনের বিষয় করিতেছে। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া, আর জড়বাদের অবকাশ থাকে না; এবং মানব মৃত্যুর পরও যে সূক্ষ্মভাবে অবস্থান করিতে পারে, তাহা কিয়ৎপরিমানে সিদ্ধ হয়।

এই সকল অত্যদ্ভুত ঘটনাবলীর মধ্যে বারেক স্থির হইয়া দেখা যাউক। এই সকল ঘটনাবলীর দ্বারা কি প্রমানিত হইতেছে, তাহা বুঝা যাউক। মানব যে নিত্য অবিকারী, সচ্চিদানন্দ পদার্থ, এতদ্দ্বারা ইহা প্রমানিত হয় না। কেবল মাত্র স্থূল বা জাগ্রত অবস্থার সীমা বা পরিধি বৃহত্তররূপে প্রতীত হয়। ঐ সকল শক্তি উদ্ভব হইলে কি আমাদের ভেদাত্মক, স্থূলাভিমানী, বহির্মুখী প্রবৃত্তি, এবং অহংজ্ঞান দূর হয়? না, কখনই না। বিশিষ্ট প্রক্রিয়ার সাহায্যে

বিশিষ্ট স্থানে চিত্ত ধারণ করিলে প্রেতলোক দৃষ্ট হয় বটে কিন্তু; দ্রষ্টার ভেদাত্মক অহং জ্ঞান ও ক্ষুদ্র অহংভাব এবং বহির্মুখীভাব থাকাতে ঐ জ্ঞান ও স্থূল, পার্থিব রঙএ রঞ্জিত। নিত্য অবিনাশী, অপরিনামী এবং সর্ব্ব-কালে একভাবেস্থিত:স্বরূপ বা অস্তিত্ব, পরিণামী‌ও সসীম ও ভেদাত্মক বহির্মুখী ব্যবহারিক ত্রিলোকসম্বন্ধিনী জ্ঞানের বা ঘটনাবলীর দ্বারা প্রকাশিত হইতে পারে না। অত্যাশ্চর্য্য আবিষ্কারসকল দ্বারা এই মাত্র সিদ্ধ হয় যে, আমি শুদ্ধ স্থূলশরীরে, স্থূলঘটনাবলীর দ্বারা বদ্ধ নহি; পরন্তু আমার চিচ্ছক্তি সূক্ষ্ম জগতেও বিরাজিত। যেমন স্থূলজীবনে ভেদাত্মকভাবে, ধর্ম্মাধর্ম্ম ও সুখ, দুঃখ প্রভৃতি বিভিন্নরূপেঅবস্থিত ভাবগুলির দ্বারা, আমার একত্ব ও অবিনাশীত্ব সিদ্ধ হয় না, যেমন এই বিভিন্ন ভাবের মধ্যে আমার ভাবগ্রহণ ক্ষমতা মাত্র প্রমানিত হয়, কিন্তু আমি কে, কি ও ঐ সকল ভাব না থাকিলেও থাকিতে পারি কি না, এই সকল প্রশ্নের সমাধান হয় না, তদ্রূপ অত্যাশ্চর্য্য ঘটনাবলীর দ্বারা সূক্ষ্ম শক্তিসকলের অস্তিত্বমাত্র প্রমানিত হয়। আমি যে আত্মা এবং অবিনশ্বর, এই ভাব অসিদ্ধ রহিয়া যায়। পরন্তু এই ঘটনাবলী কেবল বস্তুর বহির্দ্দেশস্থিত। পরিবর্ত্তনশীল ও মায়ীক ভাব দ্বারা অভেদাত্মক আত্মজ্ঞান সিদ্ধ হয় না। বস্তুর বহুত্ব ত দূরের কথা আত্মার উপাধিত্রয়ের যে প্রকাশস্বভাব শক্তিকেন্দ্র (centres of consciousness) আছে, এবং যাহার দ্বারা এই পরিণামী শরীর সকল উৎপন্ন হয়, ঐ কেন্দ্রস্থ জ্ঞানও অলীক। সেই জন্য শ্রীমৎ ভাগবতে আছে:—

যাবন্নানার্থধীঃ পুংসো ন নিবর্ত্তেত যুক্তিভিঃ।
জাগর্ত্ত্যপি স্বপন্নজ্ঞঃ স্বপ্নে জাগরণং যথা॥
অসত্ত্বাদাত্মনোঽন্যেষাং ভাবানাং তৎকৃতাভিদা।
গতয়ো হেতবশ্চাস্য মৃষা স্বপ্নদৃশো যথা॥ ১১-১৩-৩০—৩১

"যতদিন যুক্তিদ্বারা পুরুষের নানাত্ব বুদ্ধি নিবৃত্ত না হয়, ততদিন স্বপ্নে জাগরণের ন্যায়, সম্যক্ দর্শন না হওয়ায় তিনি জাগিয়াও নিদ্রা যান; আত্মা হইতে বিভিন্ন বস্তু নাই বলিয়া দেহাদি পদার্থ সমূহের তৎকৃত ভেদ, গতি এবং কারণ সকল স্বপ্নদর্শনকারীর ন্যায় ইহার অপেক্ষাও অলীক।"

ইহাতে বুঝা গেল যে নানাত্বজ্ঞানমূলক ভেদভাবশীল ঘটনাবলী পর্য্যা-

লোচনা করিলে প্রকৃত আত্মভাব উৎপন্ন হইতে পারে না। যেরূপ দৈহিক বল ও অত্যুৎকৃষ্ট মানসিকতা থাকিলেও আত্মার একত্ব ভাব উৎপন্ন হয় না, যেরূপ যাহা কিছু স্থূলভাবে জ্ঞাত বা গৃহীত হয়, তাহার মধ্যে ভেদভাব নিহিত থাকায় উহা হইতে একত্ব ভাব উৎপন্ন হয় না, সেইরূপ সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্মাতীত ইন্দ্রিয় বা মানসিক শক্তি পর্য্যাপ্তপরিমাণে থাকিলেও আত্মস্বরূপে অবস্থান ঘটে না। ভেদদর্শী পুরুষ বিদ্বান হইলেও ঐ বিদ্যা অপরা ভিন্ন আর কিছুই নহে। আত্মা, অকার্য্য ; কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড সমষ্টি করিলেও আত্মার স্বরূপের অভি-

ব্যক্তি হয় না। সেই জন্য বেদ বলিয়াছেন,

পাদস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতংদিবি।   পুরুষসূক্ত, ৩

আত্মার এক পদে বা অবস্থায় সমগ্র ব্যক্তব্রহ্মাণ্ড রহিয়াছে, কিন্তু আর ত্রিপাদ অপ্রকাশিত,এবং উহাতেই প্রকৃত অমৃতত্ব আছে। এই জন্যই গীতা বলিয়াছেন :—

বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥ ১০।৪২

আত্মার একাংশেস্থিত জগৎ ত মায়ীক, এবং সেই মায়ীক জগতের অসংখ্য প্রকাশ। ঐ প্রকাশের একদেশস্থিত দুই চারিটি অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা দ্বারা প্রকৃত অমৃতত্ব কখনই সিদ্ধ হইতে পারে না। দেশ, কাল, কার্য্য ও কারণ, অবয়ব ও অবয়বী, প্রভৃতি ভাবের দিয়া আত্মা রহিয়াছেন সত্য, কিন্তু আমাদের দৃষ্টি যতক্ষণ বহির্মুখী থাকিবে ততক্ষণ রূপ ও শক্তির খেলায় মত্ত হইয়া অমৃতময় পদ হারাইয়া ফেলিব। সুতরাং অত্যাচর্য্য ঘটনা সংকলনে, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম শক্তির বিকাশ পর্য্যালোচনে প্রকৃত আধ্যাত্মিকতার উদ্ভব হইতে পারে না।

তাই বলিয়া যে পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক ভাবে সূক্ষ্মলোকের অনুসন্ধান ও সূক্ষ্মতর ভাবে প্রকটিত দৈবীশক্তি বিকাশের অনুশীলন প্রভৃতিকে আমরা নিন্দা করিতেছি তাহা নহে। ইহা দ্বারা স্থূল শরীরের মৃত্যুর পর জীবের অবস্থিতি প্রমাণিত হয়। তাই উপনিষদে আছে :—

অবিদ্যায়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়া মৃতমশ্নুতে। ঈশ—১১

অবিদ্যাসাহায্যে সূক্ষ্মতর রূপ ও শক্তিতে চিত্ত সমাধান করিলে স্থূলশরীরাতিরিক্ত জীবনের প্রমাণ হয়। কিন্তু কেবল মাত্র একত্ব প্রতিপাদক ব্রহ্মবিদ্যার সাহায্যেই অমৃতত্ব লাভ হয়। সুতরাং ভেদাত্মক ভাবে ইন্দ্রিয়ের সূক্ষ্মতা সাধন করিলে মানব কেবলমাত্র স্বীয় ক্ষুদ্র স্থূলদেহ জ্ঞান অতিক্রম করিতে পারে। অত্যাশ্চর্য্য

ঘটনাবলীর দ্বারায় এইটুকু মাত্র উপকার সাধিত হয়। কিন্তু এই জ্ঞানও ভ্রমাত্মক ; ইহার ভিতরেও মোহের বীজ আছে। ইহা ইন্দ্রিয়জ ও ভেদধর্ম্মী।

ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান অপেক্ষা আমাদের অনেক উচ্চস্তরের জ্ঞান ও বিজ্ঞান আছে। স্থূলজগতে যে প্রকারে শুদ্ধ ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান আমাদের বিশেষ উপকারে আসে না তদ্রূপ সূক্ষ্মতরলোক সম্বন্ধেও সূক্ষ্মেন্দ্রিয় ও মানসিকজ্ঞান মানবের পারমার্থিক জীবনে অতি নিম্নতম স্তর অধিকার করে। আমাদের স্থূলজীবন অনুশীলন করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে শুদ্ধ ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানবিশেষ কোন কাজে আসে না। যদি আমাদের স্মৃতিপথ হইতে বিষয়ের সূক্ষ্মসংস্কার সকল অপসারিত করা যায়, যদি কোন যাদুবলে অন্তরেন্দ্রিয় মন, বুদ্ধি প্রভৃতিকে স্তম্ভিত করিয়া শুদ্ধ বাহ্য ইন্দ্রিয়সকলকে জাগরিত করা যায়, তাহা হইলে আমাদের কি প্রকার জ্ঞান হয়, দেখা যাউক। শুদ্ধ চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সাহায্যে সম্মুখস্থিত অন্য মানবকে দর্শন করিলে একটি অস্পষ্ট রূপ মাত্র অনুভূত হইবে। মানবশিশু অতি শৈশবাবস্থায় যে ভাবে বাহ্যজগৎ দর্শন করে, শুদ্ধ চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সাহায্যে দর্শন তাহা হইতেও নিম্নস্তরের। কারণ শিশুজীবনেরও পশ্চাতে সমষ্টি মানবজাতীর চক্ষুরিন্দ্রিয়ের উন্নতির ফলও বর্ত্তমান, এবং উহার ভিতরেও মানসিক প্রভৃতি সংস্কারের বীজ রহিয়া যায়। দার্শনিকেরা পরীক্ষা করিয়াছেন যে শিশুর প্রথম দৃষ্টিতে অদৃষ্টবস্তুর দূরত্ব বা নৈকট্য, গভীরত্ব, ভিন্ন ভিন্ন অংশের পরস্পর সামঞ্জস্য, বস্তুর রূপনির্দ্ধারণ, প্রভৃতি মানসিক ভাব গুলিও থাকে না। অর্থাৎ, এক কথায়, কেবল মাত্র অস্পষ্ট বর্ণ ও অস্ফুট অনির্দ্দিষ্ট আকৃতির মত "কি একটা" মাত্র থাকিবে। ঐ ভাব অন্য ইন্দ্রিয়শক্তি হইতে বিশ্লিষ্ট এবং সম্পর্ক রহিত। ঐ ভাবটি যেন কতকটা রবী বাবুর "কি যেন কিসের মত" অনুরূপ। তাই বা কি করিয়া? "কে", "কি" জ্ঞানও আমাদের ভেদাত্মক অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন। এই প্রকার প্রতিচ্ছবি হইতে আমাদের কোন প্রকার ভাবের উদয় হয় না। কেবল মাত্র রূপ দৃষ্ট হয় ; তাহাও অস্পষ্ট। মনের সংকল্পবিকল্পশক্তির সাহায্যে বিশেষ জ্ঞান কিয়ৎপরিমাণ উৎপন্ন হয়। তাহাও এক্ষেত্রে নাই। সুতরাং স্থূলপদার্থ দর্শনেও মন, বুদ্ধি প্রভৃতি উচ্চস্তরের করণের ক্রিয়া না হইলে, কোনও জ্ঞানের অভিব্যক্তি হয় না। ইন্দ্রিয়াদি ও মন এবং বুদ্ধির সাহায্যে আমরা বহির্জগৎকে বিশেষিত, নির্দ্দিষ্ট

ভাবে দেখি। সুতরাং শুদ্ধ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা "প্রত্যক্ষ" জ্ঞানও উৎপন্ন হয় না। লোকে যাহাকে প্রত্যক্ষ বলে, তাহার ভিতর বহুকাল অর্জ্জিত মানসিক ও বুদ্ধির সংস্কারের ক্রিয়াই অধিক। শুধু তাহাই নহে; আত্মপদার্থেরই কিরণ রশ্মিতে সমস্ত জগৎব্রহ্মাণ্ড প্রতিভাসিত। মোহপ্রাপ্তব্যক্তি উৎকৃষ্ট দূরবীক্ষণ সাহায্যেও সূর্য্যমণ্ডলের কিছুই দেখিতে পায় না। মন ও বুদ্ধি, এবং ততোধিক ভাবে আত্মার সহিত বিচ্যুতসম্বন্ধ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বহির্জগতের জ্ঞান উৎপন্ন হয় না।

মানব শিশুও ব্যষ্টি এবং সমষ্টিভাবে জীবশক্তির দ্বারা সঞ্চিত মানসিক ও উচ্চতর সংস্কারের বশে ইন্দ্রিয়জ দৃষ্টিকে সজীব করিয়া "বস্তু" ভাবে প্রত্যক্ষ করে। ইন্দ্রিয়শক্তি অপেক্ষা পূর্ব্বসংস্কারে বল অধিক। "পূর্ব্বসংস্কার" অর্থ কি? পূর্ব্বসংস্কার যে শুদ্ধ ব্যক্তিগত জন্মান্তরীণ সংস্কার তাহা নহে। ইহার ভিতর ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা দেবতাগণের পূর্ব্ব কল্পার্জ্জিত সংস্কারও আছে, ইহার ভিতর সমগ্র মানবজাতির সমষ্টিচৈতন্যের অর্জ্জিত সংস্কারের ক্রিয়া আছে, ইহার ভিতর পশু শরীরের ভিতর দিয়া যে ক্রমাভিব্যক্তি অনুসারে স্থূল ইন্দ্রিয় সকল প্রকট হয়, সেই প্রক্রিয়ারও সংস্কার আছে। ইহার ভিতর পিতৃগণের সংস্কার লুক্কায়িত আছে। যেরূপ এক বিশিষ্ট ক্ষণের ঘটনা, প্রকৃতভাবে বুঝিতে গেলে সমগ্র ভূত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবনের শক্তি সকলের বিচার করা আবশ্যক, সেইরূপ একটি বৃক্ষকে দেখিতে গেলে সমগ্র বিশ্বের কোটীকল্পব্যাপী সংস্কারের পরিমান করা চাই। সকল পদার্থই অনন্ত ভাব হইতে উৎপন্ন হইয়া অনন্তভাবে অবস্থান করিয়া পুনরায় অনন্তভাবে মিশিতে চলিতেছে। ব্যক্ত পদার্থকে সমগ্র বিশ্ব হইতে বিচ্যুত করিয়া ভাবিতে গেলে, আমাদের জ্ঞান ঐকদেশিক হইবেক। বিশ্বভাব ত দূরের কথা, সমস্ত পদার্থই সেই অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ, অব্যয় আত্মার অভিব্যক্তি। আত্মাতেই তাহার প্রকাশ, আত্মাতেই স্থিতি ও আত্মাতেই লয়। কবি টেনিসন (Tenneyson) মৃত বন্ধুকে স্মরণ করিয়া দুঃখে গাহিয়াছেন :—

"Known and unknown ; human devine."

গীতা ও বলিয়াছেন :—

অব্যক্তাদিনী ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত॥
অব্যক্ত নিধানান্যেব তত্র কা পরিবেদনা॥ ২।১৮

সেই কূটস্থও সর্ব্বদা অব্যক্ত আত্মা হইতে বিচ্যুত করিয়া দেখিতে গেলে, যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাহা মায়ীক। সুতরাং যখন বিশ্বই মায়া ও স্বপ্নের ন্যায়, তখন শুধু ইন্দ্রিয়ের পরিমার্জ্জনের দ্বারা বা, তাহাদিগকে সূক্ষ্ম করিয়া বাহ্য বা অন্তঃ পদার্থের স্বরূপ নির্দ্ধারণের পূর্ব্বে দেহজ, সামাজিক, ইন্দ্রিয়জ, কামজ, মানসিক, বুদ্ধিজ প্রভৃতি ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত প্রসুপ্তপ্রায় সংস্কারগুলিকে চিনিতে হইবে, ও তাহাদের পরিমান বা শক্তি জ্ঞাত হইয়া তাহাদিগকে আত্ম-জ্ঞান সাহায্যে পরিষ্কৃত করিয়া, এইরূপে তন্নিহিত মোহ অতিক্রম করিতে হইবে। যেমন বৈজ্ঞানিক দূরবীক্ষণ সাহায্যে সুদূরস্থিত গ্রহনক্ষত্রাদি দর্শন করিবার সময়,দূরবীক্ষণের কাচের refractive বা বিক্ষেপ এবং isochromatic বা রং উৎপাদনের ক্ষমতা জানিয়া ও বুঝিয়া, দূরবীক্ষণসংগৃহীত ছবি হইতে ঐ শক্তিগুলির ক্রিয়া বাদ দিয়া দৃষ্টবস্তুর স্বরূপ কতকটা অনুভব করেন, সেই-রূপে প্রকৃত যোগী পরমাত্মায় চিত্ত সমাহিত করিয়া শরীর, ইন্দ্রিয়গণ, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার এবং অবিদ্যার Coefficient of refraction বা বিক্ষেপ পরিমানকে স্বরূপতঃ জানিয়া, তাহা বাদ দিয়া বস্তুর স্বরূপ নির্ণয় করেন। তাঁহাকেই ত্রিকালদর্শী, অভ্রান্ত "আপ্ত" বলা হয়। পার্থিবসংস্কারাচ্ছন্ন জীব ভুবঃ, বা স্বঃলোক গমন করিলে তথাকার বিষয় সকল ও পৃথিবীর ভেদাত্মক রংএ রঞ্জিত দেখেন এবং আশ্চর্য্য এই যে সেই রঞ্জিত ভাবগুলিকে সত্য বলিয়া অন্য লোকের বিশ্বাস উৎপাদনের চেষ্টা করেন। অনেকে আবার প্রেতাত্মা সাধন করিয়া সেই কামলোকবাসী বাসনারজ্জুতে আবদ্ধ জীবের মুখবিনির্গত বিষয় সকল সার সত্য বলিয়া মনে করেন। অনেকে স্থূল বুদ্ধি বৃত্তির সাহায্যে সূক্ষ্ম জগতের বিষয় সম্বন্ধে গম্ভীরভাবে গবেষণা করিতে ছাড়েন না। তাঁহারা একবারও ভাবেন না, যে বদ্ধ জীবে উপাধিগত ও শক্তিগত বিক্ষেপ শক্তিদ্বারা সৎ পদার্থের অভিব্যক্তি কিরূপে বিকৃত হইয়া যায়। তাই স্থূল সংস্কারের বশ হইয়া অনেকে সাবয়ব এবং সূক্ষ্মভাবে অবস্থানকে "গোলকেস্থিতি" বলিয়া বিশ্বাস করেন। অহঙ্কার ও ব্যক্তভাব ত্যাগ করিতে পারি না বলিয়া পরমাত্মা সকাশে ব্যক্তি-

গত অবস্থিতিকে "পরাভক্তি" বলিয়া বর্ণনা করি। শেষোক্ত সাধকেরা বুঝেন না যে সম্পূর্ণরূপে অহঙ্কার নাশ করা কি ভয়ানক পদার্থ, এবং অহঙ্কার বিনষ্ট না হইলে, সাধক শরীরধারী হইয়া আত্মাতে অবস্থান করিতে পারেন না। ধ্যান, ধারণাকালেও আমরা আপনাকে এবং পরমাত্মাকে বিভিন্ন না ভাবিয়া থাকিতে পারি না। শুধু তাই নহে; হস্তপদবিশিষ্ট "বিশেষ" শরীরধারী বলিয়া পরমাত্মার কল্পনা করি। কেহ বা মানসিক ভাবের সাহায্যে ঈশ্বরকে সগুণ ও আমাদের আপনাদিগের মনোমত করিয়া, ব্রহ্মোপাসনা করি। এই ত আমাদের ক্ষমতা, অথচ সকলেই আপন আপন পরিচ্ছন্ন জ্ঞানকে স্বয়ং পরমাত্মার বিকাশ বলিয়া স্পর্দ্ধা করি।

অতএব বুঝা গেল যে কেবল ইন্দ্রিয় পরিমার্জ্জন দ্বারা ও এমন কি মন, বুদ্ধি প্রভৃতি কারণ সকলকে সূক্ষ্ম করণদ্বারা অমরত্ব সিদ্ধ হয় না। যতক্ষণ ভেদাত্মক দেহ ও দেহী, আমি ও জগৎ, জীব ও ব্রহ্ম, জ্ঞান চিত্তকে রঞ্জিত করে, ততক্ষণ প্রকৃত অমরত্ব কি তাহা বুঝা যায় না। সেই জন্য কাহারও মতে ঐশীশক্তি সঞ্চয়, কাহারও মতে বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা, কাহারও মতে আমার "অনু"ভাবে অবস্থানকে অমরত্ব বলিয়া গণ্য হয়। কিন্তু পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে এ সকল ভাব ও মায়ীক, সেই জন্যই শ্রীমৎ শ্রীশঙ্করাচার্য্য গাহিয়াছেন :—

ব্রজেশং রমেশং মহেশং সুরেশং
দিনেশং নিশীথেশ্বরং বা কদাচিৎ;
ন জানামি চান্যং সদাহং শরণ্যো
গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি॥

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর কিংবা দিবাকর
ইন্দ্র চন্দ্র আদি আছে যতেক অমর,
তোমা বিনা অন্য কারে কভু নাহি জানি
ভবে একমাত্র গতি তুমি ভবরাণি॥

সেই জন্যই অন্যত্র বলিয়াছেন যে ব্রহ্মা, পুরন্দর ও দিনকর প্রভৃতি সকলেই মায়ীক সুতরাং বিনাশশীল। প্রকৃত অমৃতত্বে মায়ার লেশ নাই, দেহভাব ও বহির্মুখী ভাব নাই; বিশিষ্ট আমি ভাব বা আমিত্বের নির্দ্দেশ নাই। যাহা কিছু দৃষ্ট ও যাহাতে "বিশেষ" আছে তাহাই অলীক। প্রকৃত অমৃতত্ব আনিতে

গেলে জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি এই তিন অবস্থার অভিব্যক্ত সৎপদার্থকে এক বলিয়া জানিতে হইবে। দৃষ্টির তারতম্যে প্রকৃত অমৃতত্ব ও ভেদাত্মক অস্তিত্ব এই দুই ভাব যথাক্রমে প্রকাশিত হয়। যখন চিচ্ছক্তি বিশেষ ভাব পরিত্যাগ করিয়া অমৃতময় অবিশেষ ভাব গ্রহণে সমর্থ, তখনই প্রকৃত সাধনার আরম্ভ, কিন্তু যখন আমাদের দৃষ্টি নাম ও রূপ লইয়া মত্ত, যখন বিশেষ ভাব ত্যাগ করিতে আমরা অসমর্থ, তখন অমৃতত্বের আশা কোথায়? সাধনার দ্বারা আমরা ভূ হইতে ভুবঃ, ভুবঃ হইতে স্বঃ ও তদুপরিস্থ লোকে গমন করিতে পারি, কিন্তু সেইরূপ গমনের ফল কি?

পদব্রজে না গিয়া "Motor car"এ আরোহণ করিয়া গমন করিলেই আর আমাদের স্থূল বদ্ধভাব দূর হয় না। যেমন স্থূল জগতে বহির্মুখী ভাবে বিষয় গ্রহণ করিলে কেবল মাত্র পরস্পরবিরোধী মূর্ত্তিমান বিশৃঙ্খলা ও ভেদাত্মক, ব্যক্তিগত, স্থূল অসীমতা দৃষ্ট হয় এবং কতকগুলি বিষয় বুঝিতে পারিলেও ব্যক্ত অসীম জগতের অবশিষ্টাংশ অননুভূত রহিয়া যায়, তদ্রূপ দ্বৈতভাবে উচ্চলোকে গমন করিলেও তত্রস্থ ব্যক্ত ও পরিচ্ছিন্ন সত্তা সকলের পরিমাণ করিতে করিতে দিন কাটিয়া যায়, তবুও পরিমাণ শেষ হয় না। যেখানে যাই রূপের ও শক্তির অভিব্যক্ত অসীমতা, চতুর্দ্দিকে বিস্তীর্ণ হইয়া রহিয়াছে। সাগরের ঊর্ম্মিমালা গণনা করা বরং সম্ভব, পৃথিবীর ধূলিকণা সংখ্যা নির্ণয় বরং করিতে পারা যায়, কিন্তু অসীম অনন্ত আত্মার, দেশ ও কাল, নাম ও রূপ কার্য্য ও কারণের ভিতর দিয়া যে অভিব্যক্ত অসীমতা জগৎরূপে প্রকাশিত হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা কে করিতে পারে। বহির্মুখী বৃত্তিতে জ্ঞান লাভ হইতে পারে, কিন্তু আত্মজ্ঞান ঘটে না। অনেকে আবার অহঙ্কারের কুহকে মোহিতবুদ্ধি হইয়া মনে করেন, যে অসীমতা অর্থে "আমি" পদার্থের ভেদাত্মক একদেশতা; তাঁরা ভাবেন যে আমি পদার্থকে বাহিরের বস্তুর সহিত মিলিতে না দিয়া, ভেদাত্মক ভাবে স্থাপনা করিতে পারিলেই আমিত্ব সিদ্ধ হয়। আমি শোক হইতে অতিরিক্ত, আমি সুখ হইতে অতিরিক্ত এইরূপ কল্পনা করিয়া তাঁহারা আমিত্বের চারিদিকে একটী ভেদাত্মক দুর্ভেদ্য গণ্ডি দিয়া বসিয়া থাকেন। তাঁরা ভাবেন না যে পরমাত্মা আমাদের ভিতরে আমিরূপে প্রকাশিত হইলেও সে "আমি" অনির্দ্দেশ্য। নির্দ্দেশ করিতে যাইলেই বিভিন্নতা বা

ভেদ-জ্ঞানের উৎপত্তি হয় ; ইহাই অহঙ্কারের কার্য্য। তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, অয়মাত্মা ব্রহ্ম, "সত্য বটে—" কিন্তু "অয়মাত্মা"র অর্থ কি তাহা বুঝিতে গেলে সর্ব্ব প্রথমে সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম এই ভাব সম্যক্‌রূপে বুঝিতে হইবে। Light on the Path নামক রহস্যময় গ্রন্থে উক্ত আছে যে, ভিতরে, বাহিরে এবং সর্ব্বশেষে এতদুভয়ের অতিরিক্ত ভাবে আত্মাকে বুঝিতে হইবে।

সুতরাং অহঙ্কারে মগ্ন হইয়া জগৎরূপে প্রতিভাসিত স্বপ্নের ন্যায় অলীক, জগদ্বস্তুর ভিতরে, সূত্ররূপে অবস্থিত পরমাত্মার দর্শন না হইলে আত্মজ্ঞান পূর্ণ হয় না।

মহাপুরুষগণ বলেন যে, নাম রূপের দিকে চাহিলে, শক্তির খেলা দেখিতে গেলে, বিশুদ্ধ আত্মজ্ঞান লাভ হয় না। ইন্দ্রিয়াদি করণ সকলের পরিমার্জ্জন যেমন হউক না কেন, তাহাদিগের শক্তির বিকাশক্ষেত্র যতই বড় হউক না কেন, তাহাদিগের দ্বারা কেবলমাত্র বাহ্য, পরিচ্ছিন্ন, মূর্ত্ত ও ক্ষণপরিবর্ত্তনশীল ভাবেরই জ্ঞান লাভ হইতে পারে। সুতরাং কেবল পরিচ্ছিন্ন ইন্দ্রিয় ও মন এবং বুদ্ধির দ্বারা সেই পরম অদৃশ্য, এক, অদ্বিতীয় সৎপদার্থকে নির্ণয় করা যায় না। সেই জন্যই রাজা পরীক্ষিৎ বলিয়াছিলেন,

ব্রহ্মণ ব্রহ্মণ্য নির্দ্দেশ্যে নির্গুণে গুণবৃত্তয়ঃ।
কথং চরন্তি শ্রুতয়ঃ সাক্ষাৎ সদসতঃ পরে ॥ ভাগবত। ১০।৮৭।১

ব্রহ্মণ ! যাঁহাকে প্রত্যক্ষরূপে নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় না, যিনি নির্গুণ, এবং কার্য্য, ও কারণ সকলের অস্পৃষ্ট, সগুণ শ্রুতি সকল সেই অগুণ পরব্রহ্মের স্বরূপ কিরূপে বর্ণনা করেন ?

প্রকৃত সাধক হৃদয়-ক্ষেত্রে আপনার আমির মধ্যে পরমাত্মার স্বরূপ অবগত হইয়া সর্ব্ববস্তুতে, সর্ব্বভাবে, আত্মস্বরূপ দেখিতে পান। সেই জন্যই জগৎ মিথ্যা হইলেও পরমাত্মার বিভূতি বলিয়া তাঁহার নিকট আদরণীয়।

শ্রীমৎভাগবত বলেন ঃ—

সদিব মনস্ত্রিবৃৎ ত্বয়ি বিভাত্যসদামনুজাৎ
সদভিমৃশন্ত্য শেষমিদমাত্মতয়াত্মবিদঃ।
নহি বিকৃতিং ত্যজন্তি কনকস্য তদাত্মতয়া
স্বকৃতমনুপ্রবিষ্ট মিদমাত্মতয়াহবসিতম ॥ ১০।৮৭।২৬

"মনোমাত্রবিলসিত এই ত্রিগুণাত্মক জড়জীবপ্রপঞ্চ, প্রকৃত পক্ষে অসত্য হইলেও আপনাতে অধিষ্ঠিত বলিয়া আপনার সত্যতা প্রযুক্ত সত্যবৎ প্রতীয়মান হয়; আর আত্মতত্ত্ববেত্তাগণ 'প্রপঞ্চও আত্মা হইতে ভিন্ন নহে' জানিয়া আত্মাস্বরূপেই ইহাকে সত্য মনে করেন; আত্মা যখন স্বপরিচিত এই জগতে কারণরূপে প্রবিষ্ট, তখন ইহা ত আত্মস্বরূপে অবধারিত হইতেই পারে; মনে কর—সুবর্ণার্থী ব্যক্তি, সুবর্ণকার কুণ্ডলাদি প্রাপ্ত হইলে, তাহার মধ্যে সুবর্ণ আছে বলিয়াই তাহাকে আদর করে, কেবল রূপের জন্য নহে। যতক্ষণ মন, বুদ্ধি প্রভৃতিকে আত্ম ব্যতিরিক্ত বলিয়া জ্ঞান থাকিবে, ততক্ষণ উহাদের দ্বারা আত্মনির্ণয় হইতে পারে না; যতক্ষণ ভিতরে ভেদাত্মক অহঙ্কার ক্রিয়াশীল রহিবে, ততক্ষণ অভেদজ্ঞানের অবকাশ নাই।

আমাদের ভিতরে প্রসুপ্ত ভাবে আত্মাশক্তি বা ভগবদ্‌শক্তি নিহীত আছেন। সেই মহাযোগিনী শক্তির জন্যই ভেদাত্মক ইন্দ্রিয়াদি দ্বারাও জ্ঞান বা একত্ব ভাব উৎপন্ন হয়। যাহাকে আমরা "বস্তু" জ্ঞান বলি, তাহার বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে উহার ভিতর অভেদাত্মক একটি সাম্য ভাব আছে, এবং ঐ সাম্য ভাব থাকাতেই বাহিরের বস্তু, ভিতরের আত্মার সহিত সংশ্লিষ্ট হয়, অর্থাৎ চিত্তক্ষেত্রে বস্তুর স্বরূপ জ্ঞান হয়। যাহার মন ও বুদ্ধি এই সাম্য ও একতাবর্দ্ধনকারিণী ভগবৎ শক্তি বা মহাবিদ্যার সহিত সংলগ্ন, তিনিই ভেদাত্মক সৃষ্টি অতিক্রম করিয়া সাম্য বা একত্বভাবে অবস্থান করিতে পারেন। সেই জন্য গীতায় বলিয়াছেন—

ইহৈব তৈর্জ্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ। ৫।১৯

চক্ষু যেরূপে অলোকস্পন্দন গ্রহণ করিতে পারে, কর্ণ যেরূপ শব্দস্পন্দন গ্রহণ করে, অহঙ্কার যেরূপ অহঙ্কারের প্রতিচ্ছবি গ্রহণ করিতে পারে, সেইরূপ অন্তর্নিহিত অথচ সর্ব্বভাবে সর্ব্ববস্তুর অন্তস্তমস্তরে প্রকাশিত সেই শুদ্ধ সচ্চিদানন্দময়ী আত্মশক্তির দ্বারাই আত্মার আত্ম বা সাম্য ভাব গৃহীত হইতে পারে। সেই আনন্দময়ী জাগ্রত হইলে জীব সর্ব্ববস্তুতে আর নাম ও রূপ না দেখিয়া সেই একত্ব ও শিবত্ব ভাব গ্রহণে সমর্থ হয়। তখনই জীব—

সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্।
বিনশ্যৎস্ব বিনশ্যন্তং * * * *॥ (গীতা ১৩।২৭)

পরমেশ্বরকে দেখিতে পায়। সেই জন্য সেই আনন্দময়ী মহাযোগিনীকে জাগাইতে হইবে। তাই প্রকৃত ব্রাহ্মণ ব্রহ্ম ভাবনার পূর্ব্বে,

আয়াহি বরদে দেবি ত্র্যক্ষরে ব্রহ্মবাদিনি।
গায়ত্রি ছন্দাংসমাত ব্রহ্মযোনি নমোস্তুতে॥

ইত্যাদি মন্ত্রে সেই ব্রহ্মময়ীকে আবাহন করেন। সেই জন্যই ষট্‌চক্র-ভাবে স্থিত নিম্নতর প্রাকৃতিক ছয়টি লোক সামরসগুণে একীকরণ প্রয়াসে সাধক গাহিয়াছেন :—

জাগ মা কুলকুণ্ডলিনী।

সেই জন্যই ভ্রমপ্রমাদময় নানাত্ব দ্বারা অন্ধ হইয়া সাধক গাহিয়াছেন :—

উঠ মা আনন্দময়ী খোল মা কুটিরদ্বার
আঁধারে হেরিতে নারি, এ সংসার। * * *

মা! তোমার সাহায্য ব্যতীত পুরুষত্তমও স্থাণুবৎ। তোমার সাহায্য ব্যতীত তাঁহার জ্যোতি জীবহৃদয়ে প্রবেশ করিতে পারে না। "মা যোগমায়ে! আত্মারাম, মহাযোগেশ্বর, সাক্ষাৎমন্মথমন্মথ, ও মায়াতীত পুরুষে তুমিই লীলার ভান করাইয়াছিলে।" সেই জন্যই বিয়োগবিধুরা, শ্রীভগবান জন্তু-জীবনা, গোপবালাগণ তোমার পূজা করিয়া প্রার্থনা করে :—

কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিণ্যধীশ্বরি।
নন্দগোপসুতং দেবী পতিং মে কুরুতে নমঃ॥

পরমাত্মার স্থিরভাবের নাম ব্রহ্ম বা ঈশ্বর। তাঁহার যে ভাবে 'সূত্রে মণি গণাইব' পরিদৃশ্যমান জগৎ গ্রথিত হইয়া রহিয়াছে, যে ভাবে ভেদাত্মক ব্যক্ত জগতের মধ্যে ও সর্ব্ব বস্তুর ভিতর সেই অভেদাত্মক একত্ব-প্রাপ্তি বা জ্ঞানের শক্তি রহিয়াছে, তাঁহারই নাম যোগমায়া। তিনিই আনন্দময়ী, ব্রহ্ম-সূত্ররূপে জগৎকে এক করিয়া রাখিয়াছেন।

এই মহামায়ার নামই বিদ্যা। ইনি এক্ষণে ব্রহ্মবিদ্যারূপে প্রকাশিত, ইনিই সেই পুরাতন ক্ষুরধারবৎ সুতীক্ষ্ণ মার্গ; ইনিই জীবের প্রসূতী,

"জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ।"

ইনিই ভগবদাংশ জীবকে অন্তরতম, বিশুদ্ধ, আত্মজ্ঞান এবং ফলাভি-সন্ধি রহিত প্রেমরজ্জু দ্বারা সেই পরম পদার্থে সর্ব্বদা, সর্ব্বক্ষণে সংযোজিত

করিয়া আত্মার মৌলিক একত্ব সংরক্ষণ করিতেছেন। যেরূপ সূর্য্যের আলোকশক্তির দ্বারা বিভিন্ন উপাধিতে সূর্য্যের প্রতিবিম্ব উৎপন্ন হয়, তদ্রূপ মহামায়ার সাহায্যে ভগবান জীবরূপে যেন প্রতিবিম্বিত হন। লৌহখণ্ডে প্রসুপ্ত তড়িচ্ছক্তি জাগ্রত হইলে যেরূপ দুই ভাব বা pole প্রকট করে ও সর্ব্বক্ষণ আপাতঃ প্রতীয়মান বিভিন্ন ভাবদ্বয়কে ব্যক্তভাবে ধারণ করে, এবং প্রতিক্ষণে ব্যক্ত ক্রিয়াশীল (kinetic) ভাবদ্বয়কে অব্যক্ত অক্রিয় (static), ভাবে মিশাইয়া দিতে চেষ্টা করে সেইরূপ সেই ব্রহ্মময়ী এক, অদ্বিতীয় অব্যক্ত পরমপদার্থকে, জীবাত্মা ও পরমাত্মা, জীব ও ঈশ্বর, ব্রহ্ম ও জগৎ, ভগবান ও ভক্ত এই আপাতঃ প্রতীয়মান বিভিন্নভাবে প্রকাশিত করিয়া জগৎ প্রকট করিয়াছেন। আবার সেই আত্মাশক্তিই নিদ্রা, মোহ, কামনা, বিদ্যা, তৃষ্ণা প্রভৃতি বিভিন্ন ভাবে জীব ও জগৎকে একত্রে ধরিয়া আছেন।

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু তৃষ্ণারূপেন সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥

আবার সেই আনন্দময়ীই মোক্ষদাত্রীরূপে প্রকট হইয়া জীব ও শিবকে মিশাইয়া দিয়া সেই পরম অভেদাত্মক স্বরূপভাব প্রকট করেন।

সর্ব্বস্য বুদ্ধি রূপেন জনস্য হৃদি সংস্থিতে।
স্বর্গাপবর্গদে দেবি! নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥
সর্ব্বজীব হৃদে তুমি বুদ্ধি স্বরূপিনী
সবাকার তুমি স্বর্গ মুক্তি প্রদায়িনী;
নমি দেবি নারায়ণি! শ্রীপদে তোমার
প্রণমি, প্রণমি, মাগো! নমি অনিবার॥

প্রকৃত আত্মজ্ঞান ও যাহাকে চলিত ভাষায় আত্মজ্ঞান বলে তাহার পার্থক্য কিয়ৎ পরিমানে বুঝা গেল। এখন কি উপায়ে আত্মজ্ঞান লাভ হয় তাহার অনুশীলন কর্ত্তব্য। বহির্ম্মুখী বা দেহীভাব ত্যাগ না হইলে সেই আনন্দময়ী জগন্মাতার একীকরণ চেষ্টা আমাদের নিকট কঠোর ও মূর্ত্তভাবের ত্রাসকারী ভয়ঙ্করী শক্তি বলিয়া বোধ হয়। আমি দেহ জ্ঞানে অন্ধ, কিন্তু মহামায়ার কৃপা হইলে, সর্ব্ব প্রথমেই দেহজ্ঞানটি ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিবে।

তখন অমৃতময়ী ঐশী শক্তিকে ভয়ঙ্করী ভাবে ভিন্ন অন্য ভাবে বুঝিতে পারিব না। সেই জন্যই সর্ব্ব প্রথম জ্ঞান ও বৈরাগ্য সাধনের দ্বারা আমার দেহী ও পরিচ্ছন্ন ভাব দূর করা চাই। সেই জন্যই সার্ব্বজনীন প্রেম ও ভ্রাতৃ-ভাব সাধনের দ্বারা, পরিচ্ছিন্ন অহঙ্কার ও দেহেরমোহ নাশ করিয়া কিয়ৎ পরিমানে একত্ব অনুভব করা উচিত। যদি আমাদের দৃষ্টি সর্ব্বদা প্রকৃত আত্ম-স্বরূপ নির্ণয়ে ব্যাপৃত থাকে, যদি সর্ব্বভূতে, সর্ব্বভাবে, নিরহঙ্কার হইয়া সেই আত্মপদার্থের অনুভব লাভে হৃদয়দ্বার খুলিয়া বসিয়া থাকি, তাহা হইলে আনন্দময়ী হৃদয়ক্ষেত্রে প্রকাশিত হইয়া, আমাদিগকে অল্পে অল্পে শিখাইতে আরম্ভ করেন। তাহা হইলে আর সূক্ষ্ম জগতে যাইয়া, তত্রস্থ "নুড়িগুনিতে" ইচ্ছা হয় না। পরন্তু সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বকালে একভাবে স্থিত, সৎপদার্থের প্রতি মন, প্রাণ সমর্পণ করিলে মোহেরও আর সম্ভাবনা থাকে না। যোগসিদ্ধি-লাভে আয়াস করিতে হয় না; সমরসগুণে একতাপ্রাপ্ত হৃদয়ে সর্ব্বসিদ্ধি একেবারে প্রকটিত হয়। সিদ্ধি সম্বন্ধে দুই একটি কথা বারান্তরে বলিব, তবে এখানে এইমাত্র বলিয়া ক্ষান্ত হইব যে, যে দূরদৃষ্টি ও দূর-শ্রবণ, বদ্ধ-ভাবাপন্ন ভ্রান্তজীব বহু আয়াসে ও প্রযত্নে আয়ত্ত করিতে পারে না, স্বার্থহীন প্রেমেরবশে, নিরক্ষরা জননী সেই সমস্ত সিদ্ধিই অনায়াসে লাভ করিতে পারেন। সিদ্ধি বা শক্তি মাত্রই একত্ব জ্ঞানের মায়ীক অবভাসক। এই একত্ব জ্ঞান যখন হৃদয়ে প্রকৃত জ্ঞান ও প্রেমরূপে প্রকটিত হয়, তখন সর্ব্বজীবই আমার সঙ্গে অদ্ভুত প্রেমরসে একত্রিত হয়। বস্তু, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি মায়ীক জ্ঞান, স্বার্থশূন্য প্রেমের উত্তাপে অল্পে অল্পে গলিয়া পড়িয়া যায়। আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি আমাদের পরিচ্ছিন্ন আত্মজ্ঞানকে ঘনীভূত করিয়া মায়া ও মোহের সৃষ্টি করে; কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতির উত্তপ্ত প্রস্রবণে, মায়ীকভাব চিত্ত হইতে অপ-সারিত হয়, এবং ক্রমে ক্রমে ভেদাত্মক অহংজ্ঞানও আনন্দময়ীর আনন্দ স্রোতে হারাইয়া যায়। তখন মানব বুঝিতে পারে যে, "আমি" অর্থে বিশিষ্ট নাম-রূপধারী কোন পদার্থ নহে; আমি সেই চিদানন্দরূপই শিবস্বরূপ; এবং আমিই ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, ভূতাদিপর্য্যন্ত সমস্ত ব্যক্তভাবের ভিতরে অনুস্যূত সেই ব্রহ্ম পদার্থ :—

সর্ব্বেন্দ্রিয় গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয় বিবর্জ্জিতম্।
অসক্তং সর্ব্বভৃচ্চৈব নির্গুণং গুণভোক্তৃচ॥
বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেবচ।
সূক্ষ্মত্বাত্তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ॥
অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিবচ স্থিতম্।
ভূতভর্ত্তৃ চ তজ্জ্ঞেয়ং গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ॥ গীতা ১৩।১৪-১৬।

কস্যচিৎ তৃষ্ণাতুরস্য।

মহিম্ন স্তব।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

হরিস্তে সাহস্রং কমলবলিমাধায় পদয়ো-
র্যদেকোনে তস্মিন্ নিজমুদহরন্নেত্র-কমলম্।
গতো ভক্ত্যুদ্রেকঃ পরিণতিমসৌ চক্রবপুষা,
ত্রয়াণাং রক্ষায়ৈ ত্রিপুরহর! জাগর্ত্তি জগতাম্॥ ১৯।

সম্প্রতি ভক্তিমহিমানং দর্শয়তি,হরিরিতি। হে ত্রিপুরহর! ত্রিতাপনাশন! হরির্বিষ্ণুঃ সহস্রেণ সহস্র সংখ্যয়াসম্পাদ্যং সাহস্রং কমলানাং বলিং পদ্মোপহারং তে পদয়োরাধারভূতয়োঃ আধার ক্রমেণ দত্বা তস্মিন্ বলৌ একেন উনে সতি সহস্রতম বলিদান কালে ভব মায়য়া একেন হীনে সতি নিজং স্বকীয়ং নেত্রমেবকমলং যদ্ উদহরৎ শিরসঃ যদুৎপাটয়ামাস পূজাভঙ্গভয়াদিতি-শেষঃ,অসৌ ভক্ত্যুদ্রেকঃ উদ্রিক্ত ভক্তিকৃতনেত্রকমলোদ্ধারঃ। কার্য্যকারণয়োরভেদাৎ লক্ষণয়া ভক্ত্যুদ্রেকশব্দেন উদ্ধৃতনয়নমিত্যর্থঃ। চক্রবপুষা সুদর্শন চক্ররূপেণ পরিণতিং গতঃ সন্ ত্রয়াণাং জগতাং রক্ষায়ৈ জাগর্ত্তি জগদ্রক্ষার্থং সর্ব্বদাপ্রমাদরহিতো ভ্রমতীত্যর্থঃ। জগদ্দর্শনার্থং তদ্রক্ষার্থঞ্চ হরেঃ সুদর্শন প্রাপ্তিস্তদ্ভক্তি জনিতয়া তবৈব কৃপয়েতি ভাবঃ। পুরাকিল জগদ্রক্ষায়াং বিনিযুক্তো হরিঃ সর্ব্বশক্তি নিদানং ত্বাং সহস্রসংখ্যকপদ্মোপহারৈঃ পূজয়ন যদা পদ্মগণমায়ামপ্যসমর্থং স্বংনয়নং বহুবিনিন্দ্য তদেব ভবৎপূজাভঙ্গভয়াদুৎপাট্য নেত্রকমলং সহস্র সংখ্যায়াঃ পূরণমকরোৎ। অথত্বং তদা ভক্তিমন্তং সত্তমং হরিং স্বকর্ম্মণি দৃঢ়ং নিপুণঞ্চাবলোক্য

প্রীতঃসন্ হেলয়া ত্রিভুবনদর্শনসমর্থং ক্রিয়াসাধনঞ্চ সুদর্শনোনাম সুদর্শনং-তস্মৈ দদিথ। তেনৈব সুদর্শনেন স জগতাং রক্ষণে সমর্থ ইতি মহার্থোপৌরাণিকী প্রবৃত্তিঃ। আদিকবের্বচনন্তু হরিঃ (সূর্য্যান্তরস্থঃ পুরুষঃ) তবৈব মহিম্না যৎ পদ্মানি বিকাসয়তি তবৈব পদে বলিং দদাতীতি। পুনঃ স সহস্রকরতয়া করসহস্রৈঃ প্রত্যহং পদ্মসহস্রাণি বলিং দদাতীতি। সহস্র শব্দস্তত্র বহুবোধকঃ। তস্যাক্ষয়স্বর্গপ্রাপ্তিরপি কবিনা প্রৌঢ়োক্তিমুখেনোক্তঃ; একদা মায়াবশং স জগৎকার্য্যরূপং পরমাত্মকার্য্যং আত্মকর্ত্তৃকমেব কিমপিহীন-মপশ্যৎ, অথ যদা স পূর্ব্বকৃত তপোবলাৎ আত্মানমপি পরমাত্মার্থং অবগম্য তৎকার্য্যে নিয়োজয়ামাস তদা আত্মনোঽস্বাতন্ত্র্যজ্ঞানরূপে পরমব্রহ্মজ্ঞানে উদ্ভূতে তস্য স্বর্গপ্রাপ্তির্জগৎপ্রভুত্বঞ্চেতি। অদ্যাপি স স্বকীয় করসহস্রৈঃ পদ্মানি বিকাস্য প্রভুপূজাং করোতি। য সূর্য্যাস্থানভূতং সূর্য্যমণ্ডলং তৎ কদাচিদ্বিষ্ণোঃ সুদর্শনাখ্যঃ চক্রমিতি, কদাচিৎ তদ্বক্ষঃস্থ নক্ষত্রহীরহার-মধ্যগঃ কৌস্তুভাক্ষ্যমধামণিরিতি কদাচিদ্বা শ্রীবৎসলাঞ্ছনমিত্যপি গীয়তে। স পুরুষশ্চ কদাচিন্মহাবিষ্ণোঃ পরমভক্তঃ, কদাচিৎ পরমযোগী কদাচিদ্বা চেতনানাং অমিততেজসাঞ্চ রাজ্ঞোঞ্চাদি পুরুষ ইতি বহুশো গীয়তে। ১৯।

যদ্যপিবেদাদিষু গুণভেদেন সূর্য্যএব ব্রহ্মা, প্রজাপতিঃ, সর্ব্বলোকপিতামহঃ সূর্য্যএব রুদ্রঃ,ঈশানঃ,শঙ্করঃ, মহাদেবঃ, সূর্য্যএব ইন্দ্রঃ মেঘবাহনঃ, সহস্রলোচনঃ সহস্রপাৎ, সহস্ররশ্মিঃ, অদিতিপুত্রঃ, হরির্বিষ্ণুরিত্যাদি শব্দেন কথ্যতে, সূর্য্যস্য প্রচারস্থানমাকাশঞ্চ বিষ্ণুপদশব্দেনোচ্যতে। তৈনৈবচ ক্ষিত্যপ্-তেজোমরুদ্ব্যোমাত্মকং প্রাণিময়ং জগৎ প্রপঞ্চীকৃতং রক্ষিতঞ্চ দৃশ্যতে জগতি সর্ব্বত্র ক্রিয়া, জ্ঞানং বুদ্ধির্মনোবৃত্তয়শ্চ তেনৈব প্রচোদ্যন্তে ইতি সিদ্ধং তথা-প্যেষঃ সূর্য্য সর্ব্বব্যাপিনো মহাবিষ্ণোরংশ স্তচ্ছক্ত্যাচ শক্তিমানেবেতি প্রতিপাদয়ন্ কবির্বিচিত্র পুরাণোক্তনেত্রোৎপাটনকথামবলম্ব তস্মিন্নেব সূর্য্যস্য মণ্ডলে দৃষ্টিগোচরে হরের্নেত্রত্বং তস্মিন্নপি নেত্রে পুনঃ সুদর্শন চক্ররূপত্বমারো-পিতম্। বস্তুতস্ত্বীশ্বরগুণসম্পন্নে জগন্নেতরি সবিতরি সর্ব্বমেতদুৎপন্নমেব তথাহি গায়ত্র্যর্থে যোগিযাজ্ঞবল্ক্যাদি বচনেষু বিবিধশাস্ত্রবচনেষু চ তদেব প্রতিপন্নম্। এবম্ভূতস্যাপি সূর্য্যনারায়ণস্য যোঽধিষ্ঠাতা প্রেরকশ্চ তস্য কিয়ান্ মহিমেতি মহিম্নঃ পরমোৎকর্ষঃ সূচিতঃ।

ভক্তি মহিমাহেতুক বিষ্ণুর বিষ্ণুত্বপদপ্রাপ্তি বর্ণনা করিতেছেন।

হে মোক্ষপ্রদ; সহস্র কমল কুসুমে তোমারে পূজা শেষ করিতে সংকল্প করিয়া হরি যখন সহস্রতম কমল তোমার চরণে উপহার দিবার নিমিত্ত হস্ত প্রসারিত করিয়া দেখিলেন আর কমল নাই, তখন পূজা অঙ্গহীন হয় দেখিয়া তিনি সাতিশয় কাতর হইলেন। তিনি জানেন নাই যে তুমিই তাহা উপহার দিবার অগ্রেই স্বয়ং হরণ করিয়াছ। অবশেষে স্বীয় নেত্রকমল উৎপাটন করিয়া তোমার পূজা সমাপ্ত করিলেন। তাঁহার সেই অতিশয় ভক্তিহেতু উৎপাটিত দর্শনই তোমার প্রসাদে সুদর্শন চক্র হইল।* সেই সুদর্শন বলে হরি অপ্রমাদে সমস্ত জগৎ দর্শন ও রক্ষা করিতেছেন। ১৯।

যদিও বেদাদিতে সূর্য্যই প্রজাপতি ব্রহ্মা, পিতামহ, রুদ্র, ঈশান, শঙ্কর, ইন্দ্র, মেঘবাহন, সহস্রাক্ষ, সহস্রপাং, সহস্ররশ্মি, অদিতি পুত্র, হরি, বিষ্ণু ইত্যাদি শব্দদ্বারা কথিত হন, এবং সূর্য্যের প্রচারস্থান আকাশ বিষ্ণুপদ শব্দে কথিত হয়, এবং সূর্য্যই তাপ ও আলোকদ্বারা ক্ষিত্যপতেজো-মরুদ্ব্যোমাত্মক প্রাণিময় জগৎপ্রপঞ্চিত, পরিরক্ষিত ও সংহৃত করিতেছেন। সর্ব্ব-ভূতের সৃষ্টি ও তাহাদিগের আশ্রয় ও অন্নাদি যাবতীয় উপভোগ্য প্রস্তুত করিতেছেন; তিনি ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশেতে বর্ত্তমানরূপে অবস্থান করাইয়া জগতের সমস্ত কার্য্য করাইতেছেন ও তাহাদিগের সমুদয় ক্রিয়া জ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তি সমেত মনোবৃত্তি সমুদায়কে পরিচালিত করিতেছেন ইহা দৃষ্ট হইতেছে। তথাপি ঐ সূর্য্য মহাবিষ্ণুর অংশ মাত্র ইহাই প্রতিপাদ-নার্থ কবি পুরাণ বর্ণিত নেত্রোৎপাটন কথা অবলম্বন করিয়া প্রৌঢ়োক্তিদ্বারা পরিদৃশ্যমান সূর্য্যমণ্ডলকে বিষ্ণুর নেত্রস্বরূপ বর্ণনা করিয়া পশ্চাৎ সেই নেত্রকে আবার সুদর্শন চক্ররূপে বর্ণনা করিয়াছেন। ফলতঃ এই সূর্য্যই জগতে

---

* সুন্দররূপ দর্শন যাহা দ্বারা হয়, তাহা সুদর্শন। এবং রক্ষার্থ যাহা কার্য্যসাধন হয় তাহা চক্র। সুদর্শনই চক্র। এস্থলে সূর্য্যমণ্ডলই জগৎ পর্য্যবেক্ষণ ও রক্ষণার্থ হরির সুদর্শন চক্র ইহাই বলা হইয়াছে। ফলতঃ হরি ব্রহ্মের কার্য্যকর এবং মহান্ অংশ; ইহার আবির্ভাব যেমন সূর্য্যমণ্ডলে, তেমনি সর্ব্বভূতে আছে। এই হরির অপেক্ষাও উৎকর্ষ বর্ণনা করায় পরমেশ্বরের পরমোৎকর্ষ সূচিত হইয়াছে।

আমাদের প্রধানতম পরমশক্তি বিশিষ্ট দৃশ্য বস্তু। ইন্দ্রিয় বিষয়ভূত পদার্থ মধ্যে আমাদিগের বুদ্ধ্যাদির দ্যোতক, প্রাণাদির রক্ষক হওয়ায় আমাদের পূজ্যতম পদার্থ। পরমেশ্বর প্রেরণে আমাদের অনুকূল পাঞ্চভৌতিক পুরুষ যদি পূজ্য হন, তবে ইনি কেনই বা না হইবেন। ইহার শরীরকে কেবল পূজা করিতেছি, না তত্রত্য ব্রহ্মকেই পূজা করিতেছি।   (ক্রমশঃ)

৺প্যারিমোহন সেন গুপ্ত কবিভূষণ।

শ্রীরামচন্দ্র।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

রাম রাজ্যের ন্যায় রাজত্ব জগতে আর হয় নাই। এই সময়ে সর্ব্বত্র শান্তি বিরাজিত ছিল, পৃথিবী শস্যপূর্ণা ছিলেন, প্রজাগণের হৃদয় আনন্দে পূর্ণ ছিল। রাজ্যে কেহ বিধবা ছিল না, শিশুগণ মৃত্যুমুখে পতিত হইত না; সকলেই বৃদ্ধবয়স পর্য্যন্ত জীবিত থাকিত। দুর্ভিক্ষ, জ্বর, চৌর্য্য, হত্যা প্রভৃতি দোষ ছিল না; রৌদ্র ও বৃষ্টি উপযুক্ত সময়েই হইত। দেশে দারিদ্র্য, চিন্তা, ভয়, কষ্ট ছিল না। রামরাজ্য স্বর্গতুল্য, কারণ লক্ষ্মী নিজে সীতারূপে রামচন্দ্রের বামে বিরাজিতা ছিলেন।

বাল্মিকী প্রণীত রামায়ণের এই শেষ। সেই জন্য তিনি যুদ্ধকাণ্ডের শেষেই আশীর্ব্বচন উচ্চারণপূর্ব্বক গ্রন্থ সমাপ্ত করিয়াছেন।

যদিও উত্তরকাণ্ড রামায়ণের পরিশিষ্টরূপে যোজিত, কিন্তু ইহা উপদেশে পরিপূর্ণ। ইহাতে কর্ম্মসূত্রের তত্ত্ব সুচারুরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। কর্ম্মের সার্ব্বজনীনত্ব এই কাণ্ডের প্রধান শিক্ষা। দৃশ্যমান জগতের কিছুই কর্ম্মসূত্রের অতীত নহে। দেবতা মনুষ্য, রাক্ষস, অসুর সকলেই কর্ম্মসূত্রে বাঁধা; কারণ ইহা বিধিলিপি। এই বিচিত্র ব্রহ্মাণ্ডকাণ্ডে কল্পের পর কল্প এই সূত্রে গ্রথিত রহিয়াছে। সকলেই ইহাতে জীবিত আছে ও কার্য্য করিতেছে; কাহারই ইহা অতিক্রম করিবার সামর্থ নাই। ইহাই শিক্ষা দিবার জন্য বিষ্ণু ও লক্ষ্মী, রাম ও সীতারূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহারা বই এই কর্ম্মচক্রের সূক্ষ্ম উদাহরণরূপে আর কে কার্য্য করিতে সক্ষম।

যখন রামচন্দ্র অযোধ্যার রাজা হইলেন, সেই সময় একদা মহর্ষি অগস্ত্য, রাজসভায় আগমনপূর্ব্বক রাবণবধকারী অপেক্ষা, ইন্দ্রজিতের বিনাশ-কর্ত্তারই অধিক প্রশংসা করিলেন। রাবণের জন্ম বৃত্তান্ত প্রসঙ্গে তিনি বলিলেন, প্রজাপতির পুত্র পুলস্ত্য, অপ্সরাগণ কর্ত্তৃক নিরন্তর উত্ত্যক্ত হইয়া বলিয়াছিলেন যে, "যে কোনও নারী আমার আশ্রম সমীপে উপনীত হইবে, সেই গর্ভবর্তী হইবে।" একদা একটি বালিকা সেই আশ্রমে পুষ্পচয়ন করিতে আগমন করিয়া গর্ভবতী হইলে, তাহার পিতা পুলস্ত্যকে ঐ কন্যা বিবাহ করিতে অনুরোধ করেন। ঐ বালিকার গর্ভে বিশ্রবার জন্ম হয়। তিনি ভরদ্বাজের কন্যাকে বিবাহ করেন ও তাঁহার অংশে বৈশ্রবণ কুবেরের জন্ম হয়। তিনি ব্রহ্মার বরে যক্ষগণের অধিপতি হইলেন। বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মিত লঙ্কাপুরী ও পুষ্পক রথ তিনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

সুমালীরাক্ষসের কন্যা কৈকশী পুত্রলাভ মানসে বিশ্রবার অগ্নিহোত্র কালে তাঁহার নিকট আগমন করেন। তাহার গর্ভে তিনটি পুত্র হয়, দশানন, কুম্ভকর্ণ ও বিভীষণ। বিভীষণ ধার্ম্মিক হইয়াছিলেন। একদা কৈকশী বৈশ্রবণকে প্রদর্শনপূর্ব্বক রাবণকে বলিলেন, "বৎস ঐ তোমার ভ্রাতা বৈশ্রবণ, তুমি উহার তুল্য হইবার জন্য যত্ন কর।" তদনুসারে রাবণ তপস্যা আরম্ভ করিলেন, তাঁহার ভ্রতাগণও তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। দশানন একে একে নয়টি মস্তক আহুতি প্রদান করিলেন; দশম মস্তক ছেদন করিতে উদ্যত হইলে, ব্রহ্মা আবির্ভূত হইয়া বরপ্রদান করিতে চাহিলেন। রাবণ অমর বর প্রার্থনা করিলেন। ব্রহ্মা অপর বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। রাবণ বলিলেন "তবে এইবর প্রদান করুন, যেন পক্ষী, সর্প, দেব, যক্ষ, দৈত্য, দানব বা রাক্ষস হস্তে মৃত্যু না হয়।" ঘৃণাপ্রযুক্ত নর বা বানর প্রভৃতি জন্তুগণের নাম উল্লেখ করিলেন না। ব্রহ্মা সেইবর প্রদান করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত তিনি যথেচ্ছা মূর্ত্তি ধারণ করিতে পারিবেন, এ বরও ব্রহ্মা প্রদান করিয়াছিলেন। তদ্ব্যতীত তাঁহার ছিন্ন মস্তকগুলিও পুনরুদ্ভূত হইয়াছিল। বিভীষণকে বর প্রর্থনা করিতে বলায় তিনি বলিলেন, "আমি যেন সৎপথে থাকিতে পারি এই বর প্রদান করুন।" ব্রহ্মা তাঁহাকে সেই বর প্রদানপূর্ব্বক স্বেচ্ছায় অমর বরও

প্রদান করিয়াছিলেন। কুম্ভকর্ণকে বর প্রার্থনা করিতে বলা হইলে, বাগীশ্বরী তাহার বাক্য আশ্রয় করিয়া বলাইলেন যে, সে নিরবচ্ছিন্ন একাদিক্রমে বহুবৎসর নিদ্রা যাইতে ইচ্ছা করে। তিনিও এই বর প্রাপ্ত হইলেন; এবং তিনি যেরূপ গাঢ় নিদ্রা উপভোগ করিতেন, তাহা অবগত হওয়া গিয়াছে।

যে সময় বৈশ্রবণ লঙ্কা নগরী অধিকার করেন, সে সময় ঐ নগর শূন্য ছিল বটে, কিন্তু তৎপূর্ব্বে উহা রাক্ষসদিগের অধিকৃত ছিল। দশানন স্বীয় মাতামহ সুমালীর উপদেশ মত বৈশ্রবনের নিকট ঐ নগরী প্রার্থনা করিলেন। বৈশ্রবণ স্বীয় ভ্রাতা রাবণকে উহা অর্পণ করিয়া কৈলাস পর্ব্বতে স্বীয় আবাস নির্ম্মাণ করিলেন। তৎপরে ময়দানবনন্দিনী মন্দোদরীর সহিত রাবনের বিবাহ হয়। মন্দোদরীর গর্ভে মেঘনাদের জন্ম হয়। ঐ মেঘনাদ ইন্দ্রেকে জয় করিয়া ইন্দ্রজিৎ নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রাবণ বর দর্পে দর্পিত হইয়া জগতের উপর বড়ই অত্যাচার আরম্ভ করিল। তাহার ভ্রাতা বৈশ্রবণ এরূপ কার্য্য অকর্ত্তব্য বলিয়া নিষেধ করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। এজন্য রাবণ তাঁহার দূতকে বিনষ্ট করিলেন, এবং অবিলম্বে কৈলাসে গমনপূর্ব্বক ভ্রাতাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া, তাঁহার পুষ্পকরথ অপহরণ করিয়াছিলেন। রাবণ যখন পুষ্পক লইয়া কৈলাশ হইতে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন, সেই সময়ে হঠাৎ তাহার রথের গতিরোধ হইল। তিনি আশ্চর্য্য হইয়া চাহিয়া দেখিলেন সম্মুখে শঙ্করানুচর নন্দীকেশ্বর। নন্দী বলিলেন, "এক পার্শ্ব দিয়া প্রস্থান কর, কারণ শঙ্কর এক্ষণে এই পর্ব্বতে ক্রীড়া করিতেছেন।" রাবণ দর্পভরে বলিল, "শঙ্কর কে?" এই বলিয়া সে পর্ব্বতে আগমন করিল, এবং নন্দীকেশ্বরের বিকৃত মুখদর্শন করিয়া বানর বলিয়া উপহাস করিল। নন্দীকেশ্বর শাপ প্রদান করিলেন "তোমার বংশ, বানরবংশ দ্বারা ধ্বংস হইবেক।" অনন্তর রাবণ কৈলাশকে তল হইতে উৎপাটন মানসে ধারণ করিল, কিন্তু মহাদেব অঙ্গুষ্ঠের চাপ দিয়া পর্ব্বত এরূপ চাপিয়া ধরিলেন, যে তাহার বাহু নিপীড়িত হইল, এবং সে উচ্চরবে চীৎকার করিয়া উঠিল। অনন্তর নীলকণ্ঠের কৃপায় মুক্ত হইয়া আপন নগরাভিমুখে প্রস্থান করিল। সেই দিন হইতে মহেশ্বর দশাননকে "রাবণ" নাম প্রদান করিয়াছিলেন।

ইহাতেও রাবনের চেতনা হইল না, সে, পৃথিবী উৎসন্ন দিতে লাগিল। একদা হিমবান পর্ব্বতে আগমন করিয়া রাবণ একটি সুন্দরী তাপসীকে দর্শন করিল ; তিনি বিষ্ণুর উদ্দেশে নিবেদিতা। তাঁহাকে দর্শন করিয়া রাবণ তাঁহাকে অসদভিপ্রায়ে ধারণ করিল। তিনি কষ্টে রাবণের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া অগ্নিকুণ্ডে দেহ ত্যাগ করিলেন। প্রাণত্যাগ সময়ে বলিয়া গেলেন, আবার তিনি অযোনিসম্ভবা হইয়া ধরায় নারীদেহ লাভ করিবেন ; সেই জন্মে তিনিই রাবণের মৃত্যুর কারণ হইবেন। ঐ ঘটনা সত্যযুগে ঘটিয়াছিল। তিনিই ত্রেতাযুগে সীতারূপে জনক রাজার যজ্ঞভূমিতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন।

রাবণ দিগ্বিজয় জন্য মত্ত হইল। সে পৃথিবীর প্রায় সমস্ত রাজাকে অধীনতা স্বীকার করাইয়াছিল। অযোধ্যাধিপতি ইক্ষ্বাকুবংশীয় অসবন্য ভূপতি রাবণের সহিত যুদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ সময়ে বলিয়াছিলেন, "আমার বংশে রাম নামে কোন বীরপুরুষ জন্মিয়া তোমায় বিনাশ করিবেন।" সেই সমস্ত কর্ম্মফলেই রাবণকে সীতার জন্য নরবাণরের হস্তে নিহত হইতে হইয়াছিল।

একদা রাবণ দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে ভ্রমণ করিতে করিতে, দেবর্ষি নারদের সাক্ষাৎলাভ করিলেন। দেবর্ষি বলিলেন "সামান্য মানুষ-গুলাকে জয় করিয়া কি হইবে ? যমকে জয় করাই পুরুষার্থ।" এ প্রস্তাব রাবনের মন্দ বোধ হইল না। রাবন সেই দণ্ডেই যমালয়ে উপনীত হইয়া যমদূতগণকে হতাহত করিতে আরম্ভ করিল। তখন যম নিজে দণ্ড হস্তে লইয়া মৃত্যু ও কালের সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। সপ্ত দিবারাত্রি ক্রমান্বয়ে যুদ্ধ চলিল। অবশেষে যম রাবণকে বধ করিবার জন্য দণ্ড উত্তোলন করিলেন। এমন সময় ব্রহ্মা অবির্ভূত হইয়া বলিলেন ঃ—

ক্ষান্ত হও ধর্ম্মরাজ, তুমি দশাননে
এই কালদণ্ডে নাশ না কর এক্ষণে।
ওই দুষ্ট দশানন সুরাসুর করে
না মরিবে, হেন বর দিয়াছি যে ওরে।
কাজে কাজে এবে ওরে করিলে বিনাশ
শুন যম, বাক্য মম হইবে নিরাশ।

কিম্বা যদি নাহি মরে, তবে মোর কৃত॥
এ দণ্ডও মিথ্যা বলি হইবে ঘোষিত॥
এই হেতু এই দণ্ডে এই কালদণ্ড,
প্রতিসংহারিয়া ত্বরা বাঁচাও ব্রহ্মাণ্ড।

যম, ব্রহ্মার কথা রক্ষা করিলেন, এবং যুদ্ধ স্থল হইতে অন্তর্দ্ধান করিলেন রাবণ যমকে পরাস্ত ভাবিয়া যমালয় হইতে প্রত্যাগমন করিলেন। তৎপরে রাবণ দৈত্যগণের সহিত বর্ষব্যাপী যুদ্ধ করিয়া অবশেষে তাহাদের সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়াছিল। তৎপরে বরুণের সহিত যুদ্ধ করিতে গমন করেন। তখন বরুণ স্থানান্তরে ছিলেন। বরুণের পুত্রগণের সহিত রাবণের যুদ্ধ হয়। রাবণ হস্তে তাহারা হত হয়। তৎপরে বলির সহিত যুদ্ধ করিতে গমন করে। বলি তাহাকে দর্শন করিয়া শিশুবৎ গ্রহণ পূর্ব্বক নিজ ক্রোড়ে বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস! তোমার কি প্রয়োজন।" রাবণ বলিল "বিষ্ণু তোমাকে বদ্ধ করিয়া পাতালে রাখিতেছে, আমি তোমায় মুক্ত করিব।" বলি সহাস্যাস্যে বলিলেন "ঐ যে জলন্ত চক্র দেখিতেছ, ঐটি আনয়ন কর দেখি।" রাবণ আনিতে গেল কিন্তু স্থানান্তরিত করিতে পারিল না, পুনরায় চেষ্টা করাতে তাহার দেহ রক্তাক্ত হইল। বলি বলিলেন "ঐটি তাহার পূর্ব্বপুরুষ হিরণ্যকশিপুর কর্ণ ভূষণ। বিষ্ণু তাহাকে নৃসিংহরূপে বিনষ্ট করেন। সেই বিষ্ণুই হরি, নারায়ণ; তিনিই আমার দ্বারী, তিনিই ত্রিলোকের রক্ষক।" রাবণ বিষ্ণুর সহিত যুদ্ধ করিতে গমন করিল। কিন্তু, বিষ্ণু ব্রহ্মার বর অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য রাবণকে তখন বধ করিবেন না বলিয়া অদৃশ্য হইলেন। একদা রাবণ ভ্রমন করিতে করিতে একটী সুন্দরী রমণীকে দেখিতে পাইয়া, তাহাকে গ্রহণ করিতে উদ্যত হয়, কিন্তু সেই রমণী বলিল "আমি আপনার ভ্রাতৃপুত্রের অভীপ্সিত রমণী; আমায় পরিত্যাগ করুণ।" রাবণ সেকথা শ্রবণ না করিয়া তাহাকে গ্রহণ করিয়াছিল; সেইজন্য বৈশ্রবণনন্দন তাহাকে এই অভিশাপ প্রদান করেন যে, অতঃপর কোনও রমণীর প্রতি বলপ্রয়োগ করিলেই তদ্দণ্ডে তাহার প্রাণ নষ্ট হইবেক। সেই ভয়েই রাবণ সীতার প্রতি অত্যাচার করিতে সাহস করে নাই।

তৎপরে রাবণ দেবগণকে জয় করিতে গমন করেন। তাঁহার পুত্র মেঘনাদও

তাঁহার সঙ্গে গমন করিয়াছিলেন। তুমুল যুদ্ধ হইয়াছিল। রাক্ষসগণ পরাজিত হয় হয়, এমন সময়ে মেঘনাদ মায়া অন্ধকার সৃষ্টি করিয়া স্বর্গ আচ্ছাদন করিল। সেই অন্ধকারে দেবগণকে আক্রমণ করাতে তাঁহারা বিধ্বস্ত হইলেন; পুলোম-দৈত্য ইন্দ্রপুত্রকে হরণ করিয়া লইয়া গেল। অনন্তর ইন্দ্র নিজে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। তিনি প্রথমতঃ রাবণকে আক্রমণ করিয়াছিলেন; কিন্তু মেঘনাদ তাহাকে আক্রমণ করাতে, মেঘনাদের সহিতই তাঁহার যুদ্ধ হইল। মেঘনাদ মায়া প্রভাবে অদৃশ্য হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন; কাজেই ইন্দ্রকে জয় করা বড় কঠিন হইল না। মেঘনাদ ইন্দ্রকে জয় করিয়া বন্দী করিলেন, এবং তাঁহাকে লঙ্কায় আনয়ন করিলেন। অনন্তর ব্রহ্মা দেবগণের সহিত লঙ্কায় আগমণ পূর্ব্বক, মেঘনাদকে ইন্দ্রজিৎ নামদিয়া ইন্দ্রকে উদ্ধার করিলেন। ইন্দ্রজিৎ অমরত্ব প্রার্থনা করিয়াছিলেন, কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে এই বর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, যে নিকুম্ভিলায় যজ্ঞ করিতে প্রতিবার যজ্ঞান্তে, রথ ও অশ্ব উৎপন্ন হইবেক, সেই রথে আরোহন করিয়া যুদ্ধ করিলে কেহই তাহাকে পরাস্ত করিতে পারিবে না। কিন্তু যজ্ঞ সম্পূর্ণ না করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে তাহার মৃত্যু হইবেক।" এইরূপে ইন্দ্রজিৎ আপনার মৃত্যুর বীজ রোপন করিয়াছিলেন। আবার ইন্দ্রও ইন্দ্রজিতের হস্তে পরাভূত হইয়া গুরুপত্নী অহল্যাকে হরণ জনিত পাপ হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন।

এ পৃথিবীতে কার্য্যকারণচক্র অনিবার ঘুরিতেছে। যাহা এখন কার্য্য, তাহার কারণ একটা ছিল; আবার এই কার্য্যই কার্য্যান্তরের কারণ। এইরূপে কর্ম্মচক্র অবিরত ঘুরিতেছে।

একদা জানকী সন্ধ্যার সময় সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপ্তির পর রামচন্দ্র সমীপে উপনীত হইলে, রামচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তাঁহার কি প্রিয় কার্য্য আছে যাহা রামচন্দ্র সম্পন্ন করিতে পারেন। সীতা গঙ্গাতীরবর্ত্তী মুনিগণের আশ্রম দর্শনের অভিলাষ করিলেন। রামচন্দ্র স্বীকার করিলেন পরদিন সীতা ঐসকল আশ্রম দর্শন করিতে পাইবেন। অনন্তর রামচন্দ্র তাঁহাকে প্রস্তুত হইতে বলিয়া সভায় গমন করিলেন। তথায় ভদ্র নামক একজন চর তাঁহার সম্মুখে আগমন করিলে। তিনি পুরবাসীগণ তাঁহার সম্বন্ধে কিরূপ আন্দোলন করেন, তাহা জানিতে চাহিলেন। ভদ্র বলিল, প্রজাগণ ভাল কথাই বলিয়া থাকে, এবং

তাহারা রাবণ বধের কথা সর্ব্বদা আন্দোলন করে। রামচন্দ্র তাহাকে ভাল মন্দ সমুদায়ই বিশেষ করিয়া বলিতে বলিলেন। তখন ভদ্র বলিল:—

"বনে, উপবনে, পথে, চত্বরে, আপনে
ভাল মন্দ যাহা বলে তব প্রজাগণে,
সমস্তই বলিতেছি, করহ শ্রবণ,
কোন কথা না করিব তোমারে গোপন।
বলে সবে "মহারাজ রাম রঘুবর
সেতুবন্ধ করিলেন সাগর উপর!
একার্য্য দুষ্কর অতি; শুনিনি কখন;
পূর্ব্বে হেন কার্য্য কেহ করিল সাধন?
সবংশে রাবণে রাম করিলা নিহত
রক্ষ ঋক্ষ কপিগণে কৈলা বশীভূত।
রাবণ বধের পরে রাম রঘুবর
সীতারে উদ্ধার করি আনিলেন ঘর।
জানিনা রামের প্রাণে কেমন করিয়া
সীতা সম্ভোগের সুখ উঠিল জাগিয়া।
সীতারে তুলিয়া কোলে সবলে রাবণ
সিন্ধু পারে লঙ্কাপুরে করিল গমন।
এহেন নারীরে রাম না করিল ঘৃণা,
ঘৃণা দূরে থাক, রাম মরে সীতা বিনা।
এর পর আমাদের স্ত্রীর এইরূপ
ব্যতিক্রম হ'লে মোরা না হব বিরূপ।

রামচন্দ্র স্থিরভাবে শুনিলেন, বুঝিলেন তিনি যে আশঙ্কা করিয়া সীতাকে অগ্নিসাৎ করিয়াছিলেন, সীতার অগ্নি পরীক্ষাতেও সে আশঙ্কা দূর হয় নাই। তিনি ভ্রাতৃগণকে জিজ্ঞাসিলেন "তোমরা রামের জীবন, বল, বুদ্ধি ভরসা, বল ভাই! এ বিপদ সাগরের কূল কোথায়? প্রাণ অপেক্ষা মান প্রিয়তর। সীতা যে সীতা, তাহা তিনি তখনও জানিতেন এখনও জানেন; কিন্তু তবু সীতাকে ত্যাগ করা কর্ত্তব্য। লক্ষ্মণ, তুমি সীতাকে মহর্ষি বাল্মিকীর

আশ্রমে রাখিয়া আইস। সীতা তপোবন দর্শনে যাইবেন বলিয়াছিলেন।” লক্ষণ প্রতিবাদ করিতে ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু রাম বলিলেন “আমায় কিছু বলিও না, আমি সব জানি, কিন্তু সীতাকে ত্যাগ করা বই উপায় নাই সীতাকে বনে রাখিয়া আইস।” রামচন্দ্র আত্মত্যাগ করিলেন।

অনেকেই তাঁহার এই কার্য্যকে অন্যায় বলিয়া নিন্দা করেন। কিন্তু তাঁহার সীতার প্রতি প্রেমের অভাব ছিল না। তিনি সীতাকে উদ্ধার করিতে যে কষ্ট সহ্য করিয়াছিলেন, তাহাই তাহার যথেষ্ট প্রমাণ। কিন্তু তিনি রাজা! প্রজাদের প্রতি তাঁহার যে কর্ত্তব্য তাহার তিনি উপেক্ষা করিতে পারেন না। রাম সীতা রাজা ও রাণী তাহাদের দেখিয়া প্রজারা শিখিবে।

“স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে।”

তিনি বরং হৃৎপিণ্ড ছিন্ন করিয়া অনলে আহুতি দিতে পারেন, কিন্তু প্রজাদিগকে অসদাচরণ দেখাইতে পারেন না। রাম সীতা বিচ্ছিন্ন হইলে তাঁহাদের প্রেমের বিচ্ছেদ সম্ভব নহে। কিন্তু তাঁহাদের একত্রাবস্থানে সমাজের অমঙ্গল সম্ভাবনা। সীতার বর্জ্জন হইল। সীতা বর্জ্জনের কারণ জানিয়া রামের উপর ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি কেবল বলিয়াছিলেন—

“প্রাণ যদি যায় মোর তাহে ক্ষতি নাই,
কিন্তু রাম অপযশে বড়ই ডরাই
প্রজাদের পাশে তাঁর হয়েছে অযশ
ক্ষালন করুন তাহা প্রজা হ'ক বশ।
পতিই পরম গতি স্ত্রীলোকের হয়;
পতি বন্ধু পতি গুরু জানি তা নিশ্চয়
তুচ্ছ প্রাণ দিলে যদি ঘটয়ে স্বামীর
সুমঙ্গল, সমুচিত তাহা রমণীর।”

সীতা মহর্ষি বাল্মিকীর আশ্রমে থাকিয়া কুশ ও লব নামে দুটি পুত্র প্রসব করিয়াছিলেন। শিশু দুটি ঋষিকুমারগণের সঙ্গে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

প্রত্যাগমন সময়ে সুমন্ত্র লক্ষণকে বলিলেন, বহুদিন পূর্ব্বে মহর্ষি দুর্ব্বাসা রাজা দশরথকে বলিয়াছিলেন, যে রামচন্দ্র তাঁহার পত্নী ও ভ্রাতা পরিত্যাগ করিবেন। কিন্তু রাজা দশরথ আমায় গোপন রাখিতে বলিয়া-

ছিলেন। রাজা দশরথ মহর্ষি দুর্ব্বাসাকে পুত্রগণের ভবিষ্যত জিজ্ঞাসা করেন। দুর্ব্বাসা বলিয়াছিলেন, কোনও সময়ে দেবাসুরে যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, অসুরগণ মহর্ষি ভৃগু পত্নীর নিকট লুক্কায়িত হন। বিষ্ণু ক্রোধে ভৃগুপত্নীর মস্তক ছেদন করিয়াছিলেন; তাহাতে ভৃগু শাপ দিয়াছিলেন তুমিও তোমার পত্নী হইতে বিচ্ছিন্ন হইবে। তিনি রামরূপে অবতীর্ণ তদনুসারে তাহাতে পত্নী বিয়োগ সহ্য করিতেই হইবেক। রামচন্দ্র এগার হাজার বৎসর রাজত্ব করিয়া সীতার দুই পুত্রকে রাজ্য দিয়া স্বর্গারোহণ করিবেন। ইহা শ্রবণ করিয়া লক্ষণ বড়ই প্রীত হইলেন।

কিছুদিন পরে শত্রুঘ্ন লবণ নামক অসুরকে বিনাশ করিয়া মধুবনে রাজা হইলেন। মধুবনে গমন সময়ে যেদিন তিনি মহর্ষি বাল্মিকীর আশ্রমে অবস্থান করেন, সেই দিন সীতার পুত্রদ্বয় ভূমিষ্ট হয়। দ্বাদশবর্ষ মধুবনে অবস্থানের পর শত্রুঘ্নের রামদর্শন জন্য একান্ত উদ্বেগ হয়। তিনি অযোধ্যাভিমুখে আসিবার সময় আবার বাল্মিকীর আশ্রমে গমন করেন। আহারের পর শত্রুঘ্ন বাল্মিকীর শিষ্যগণের মুখে রামায়ণ গান শ্রবণ করিলেন। শত্রুঘ্ন বালক দুটীকে দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হইয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন নাই। পরদিন অযোধ্যায় আসিয়া তিনি রামচন্দ্রের সমীপে থাকিবার জন্য আগ্রহাতিশয় প্রকাশ করেন; কিন্তু রামচন্দ্র তাঁহাকে একসপ্তাহের অধিক থাকিতে দেন নাই।

কিছুদিন পরে রামচন্দ্র অশ্বমেধযজ্ঞ করিলেন। মহর্ষি বাল্মিকী শিষ্য সঙ্গে যজ্ঞ দর্শনে আগমন করিলেন, লবকুশ রাজসমীপে রামায়ণ গান করিলেন। রামচন্দ্র ঐ গান শ্রবণ করিয়া লক্ষণকে, অষ্টাদশসহস্র সুবর্ণ গায়কদ্বয়কে দিতে বলিলেন। কিন্তু তাহারা বলিলেন আমরা বনবাসী, আমরা অর্থ লইয়া কি করিব? রামচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন এই কাব্য কে রচনা করিয়াছেন। তাঁহারা বলিলেন ইহা মহর্ষি বাল্মিকীর রচিত। রামায়ণ শ্রবণের পর বাল্মিকীর অনুরোধে রামচন্দ্র সীতাকে পুনগ্রহণে সম্মত হইলেন। সীতা সভাতলে আনীতা হইলেন। আবার পরীক্ষার কথা। সীতা বলিলেন।

"মহারাজ রাম ছাড়া যদি অন্যজনে
স্থান নাহি দিয়া থাকি আমার এ মনে

তাহলে পৃথিবী দেবী সেই পুণ্য ফলে
বিদীর্ণ হউন, আমি প্রবেশি পাতালে”
“রাম বই আর আমি কারেও না জানি।”
যদি আমি বলে থাকি এই সত্যবাণী
তাহলে পৃথিবী দেবী সেই পুণ্যফলে
বিদীর্ণ হউন আমি প্রবেশি পাতালে।

তখনি পৃথিবী বিদীর্ণ হইয়া এক দিব্য সিংহাসন সভাতলে আবির্ভূত হইল। ধরাদেবী সেই সিংহাসন হইতে সীতাকে ক্রোড়ে লইয়া পাতালে প্রবেশ করিলেন। দেবগণ সর্গ হইতে পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন।

সীতা অদৃশ্য হইলে রামচন্দ্র অনেক বিলাপ করিলেন; তখন ব্রহ্মা বলিলেন রামচন্দ্র আপনি বিলাপ করিবেন না। আপনি বিষ্ণু অবতার, সীতা স্বভাব সতী। আবার আপনাদের স্বস্থানে মিলন হইবেক।

রামচন্দ্র আরও কিছুকাল রাজ্য শাসন করিলেন। তিনি স্বর্ণময়ী সীতা মূর্ত্তি দ্বারা সস্ত্রীক হইয়া যজ্ঞাদি কার্য্য করিতেন। অবশেষে তিনি স্বস্থানে গমনের আয়োজনে ব্যস্ত হইলেন। ভরত ও লক্ষণের পুত্রগণকে নিকটস্থ রাজ্যে অভিষিক্ত করা হইল। এমন সময়ে কাল, ছদ্মবেশে তাঁহার নিকট উপনীত হইলেন। তিনি বলিলেন, আমি গোপনে আপনার সহিত কথোপ-কথন করিব, যে কেহ সে সময়ে তথায় উপস্থিত হইবে, আপনি তাহাকে জন্মের মত ত্যাগ করিবেন প্রতিজ্ঞা করুন। উভয়ে কথোপকথন আরম্ভ হইল। লক্ষণ দ্বারী হইলেন। এমন সময় মহর্ষি দুর্ব্বাসা রামচন্দ্রের দর্শনার্থ উপনীত। তিনি লক্ষণকে সংবাদ দিতে বলিলেন। লক্ষণ ক্ষণেক বিলম্ব করিতে বলিলেন। কিন্তু সে কথা কে শোনে, দুর্ব্বাসা তদ্দণ্ডেই দর্শন করিবেন। কাজেই লক্ষ্মণ সংবাদ দিতে গমন করিলেন; দুর্ব্বাসার দর্শন হইল। লক্ষ্মণ বর্জ্জিত হইলেন। তিনি সরযূজলে দেহ বিসর্জ্জন করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। লক্ষ্মণবর্জ্জনের পর রামচন্দ্র রাজ্যত্যাগ ও দেহত্যাগ মানসে, লবকুশকে রাজ্যাভিষিক্ত করিলেন। শত্রুঘ্ন স্বীয় পুত্রের উপর রাজ্যভার অর্পণ করিয়া অযোধ্যায় আসিলে, সুগ্রীব রাজা অঙ্গদকে কিষ্কিন্ধ্যারাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া আসিলেন। বিভীষণ, হনুমান, জাম্ববান অন্যান্য কপিসৈন্যও

উপস্থিত হইল। রামচন্দ্র হনুমান ও বিভীষণকে কল্পান্ত পর্য্যন্ত পৃথিবীতে থাকিতে বলিলেন; এবং জাম্ববানকে কলিযুগের অন্ত পর্য্যন্ত থাকিতে বলিলেন। তৎপরে ভ্রাতৃত্রয় সুগ্রীব ও অন্যান্য নরবানর ও ঋক্ষ সঙ্গে তিনি নিজস্থানে প্রস্থান করিতে প্রস্তুত হইলেন।

পরদিন প্রভাতে বশিষ্টদেব পরলোক গমনের উপযোগী কার্য্য সমুদায় সম্পন্ন করিলেন, রামচন্দ্র সজন পরিবৃত্ত হইয়া সরযূতীরে গমন করিলে, দেবগণের সহিত ব্রহ্মা উপনীত হইলেন। ব্রহ্মা বলিলেন—

"হে বিষ্ণু! হে রাম! স্বর্গে কর আগমন।
অনুরূপ ভ্রাতৃগণ সহিত এখন
বৈষ্ণবী মূর্ত্তিতে কিম্বা আকাশ শরীরে
যে শরীরে ইচ্ছা তব পশহ অচিরে।
তুমিই লোকের গতি অজর অমর
অনাদি অনন্ত তুমি অব্যয় ঈশ্বর।
বস্তু পরিচ্ছেদ আর কলা পরিচ্ছেদ
নিয়তই তোমা হতে থাকয়ে প্রভেদ।
বিশাললোচনা মায়া প্রকৃতি তোমায়
মায়া বই তোমারে হে কেবা চিনে আর?
মহাতেজ এবে তব যেবা ইচ্ছা হয়।
সে শরীরে প্রবেশ করহ মহাশয়।

রামচন্দ্র বৈষ্ণবী মূর্ত্তিতে ভ্রাতৃগণের সহিত মিশিয়া গেলেন, সকলে তাঁহার পূজা করিল। সর্ব্বত্র শান্তি হইল। যাঁহারা তাঁহার সহিত আসিয়াছিল তাহাদের প্রতি তিনি স্নেহ দৃষ্টি করিলেন। এবং ব্রহ্মাকে তাঁহাদের জন্য সুখময় স্থান নির্দ্দেশের আদেশ করিলেন, বলিলেন "তাহারা আমার ভক্ত আমার জন্য তাহারা আত্মত্যাগ করিয়াছে, অতএব তাহারা সম্মান প্রাপ্তির উপযুক্ত।" সকলে আনন্দ লাভ করিল। ইহাই চরম।

বিচার সাগর।

(পূর্ব্বপ্রকাশিত সংখ্যার পর)

ক্ষুধা ও পিপাসা প্রাণের ধর্ম্ম। ব্রহ্মজ্ঞান বিনা প্রাণ ও তদ্ধর্ম্মের বাধ হয় না; সুতরাং পিপাসার ব্যবহারসত্তা। ব্রহ্মজ্ঞান বিনাই মরুস্থলের জ্ঞান দ্বারা জলের বাধ হয়; সুতরাং সেই জলের প্রতিভাসসত্তা। সুতরাং পিপাসা ও মরুস্থল—জলের সমসত্তা নহে বলিয়া, সেই জল হইতে পিপাসা নাশ হয় না। এই প্রকারে দৃষ্টান্ত বিষয়ে বাধক বেদগুরু ও বাধ্য সংসার দুঃখের সমসত্তা, এবং দৃষ্টান্ত বিষয়ে জল ও পিপাসার বিষমসত্তা, অর্থাৎ সত্তাভেদ। সুতরাং দৃষ্টান্ত বিষম, অর্থাৎ দৃষ্টান্তের সম নহে।

শিষ্য।—ব্রহ্ম ভিন্ন মিথ্যা সব আপনি কহিলে।

তবে সে মিথ্যা ভেদ কিহেতু রাখিলে॥ ১৪৯॥

[টীকাঃ—গুরুদেব! আপনি কহিলেন যে ব্রহ্মভিন্ন সকল পদার্থই মিথ্যা। সেই মিথ্যা পদার্থ সমূহে ব্রহ্মজ্ঞান বিনাই শুক্তিরজত রজ্জুসর্প মরুস্থলজল আদির বাধ হয়, এবং ব্রহ্মজ্ঞান অনন্তর সংসার দুঃখের বাধ হয়, এরূপ প্রভেদ কেন রাখিলেন, তাহা বলুন।]

গুরু।—মিথ্যা যত দেখ সব অবিদ্যা কল্পনা।

নাহিক তাহাতে শিষ্য সত্য এক কণা॥

অজ্ঞান হইতে যার যে বস্তু উদ্ভবে।

তার জ্ঞান হতে বাধ তাহার সম্ভবে॥ ১৫০

[টীকাঃ—হে শিষ্য! যদিও ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন সকল পদার্থই অবিদ্যার কার্য্য, অতএব মিথ্যা এবং তাহাতে কণামাত্র সত্য নাই, তথাপি যাহার অজ্ঞানে যে বস্তু উদ্ভব হয়, তাহার জ্ঞানে সেই বস্তুর বাধ হয়। শুক্তি রজ্জু মরুস্থল আদির অজ্ঞান হইতে রজত, সর্প ও জলাদির উদ্ভব, সুতরাং শুক্তি আদি জ্ঞান হইতে রজত আদির বাধ হয়। ব্রহ্মের অজ্ঞান হইতে জন্ম মরণাদির সংসার দুঃখ উৎপন্ন হয়, ও ব্রহ্মজ্ঞান হইতে সে দুঃখের বাধ হয়।]

শিষ্য।—ব্রহ্মের অজ্ঞান হতে উপজে সংসার।
ভগবন কহ মোরে কিবা ক্রম তার॥
গুরু।—স্বপনের মত দেখ ক্রম নাই যার।
ভ্রম হতে ভাসে শিষ্য অলীক সংসার॥
জানিতে পর্য্যায় তার ইচ্ছয়ে যে জন।
মরুস্থল জলসিক্ত নিচুড়ে বসন॥ ১৫২
জগৎ উৎপত্তি কথা অনেক প্রকার।
বেদান্তে বহুধা শিষ্য করেছে নির্দ্ধার॥
ইহাই শুনহ শিষ্য অভিপ্রায় তার।
চৈতন্য হইতে ভিন্ন সকলি অসার॥ ১৫৩॥

[টীকা :—উপনিষদে জগতের উৎপত্তি নানা প্রকারে কথিত হইয়াছে। সংরূপ পরমাত্মা হইতে অগ্নি, জল পৃথ্বী পর্য্যায়ক্রমে উদ্ভব হইয়াছে—ছান্দোগ্যে এইরূপ বর্ণিত আছে। তৈত্তিরীয় উপনিষদে আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথ্বী পর্য্যায়ে পঞ্চভূতের উৎপত্তি কথিত হইয়াছে। কোথাও এরূপ কথিত হইয়াছে যে, পরমেশ্বর সর্ব্বপদার্থের সৃষ্টি করিয়াছেন। এই রীতিতে ক্রম বিনাও উৎপত্তি কথিত হইয়াছে। জগৎ উৎপত্তি বেদে এইরূপ নানা প্রকার বর্ণিত হইয়াছে। সে স্থলে বেদের অভিপ্রায় এই যে জগৎ মিথ্যা। যদি জগৎ কোন পদার্থ হইত, তবে তাহার উৎপত্তি নানা ভাবে কথিত হইত না। অনেক প্রকারে জগৎ উৎপত্তি কথনে উৎপত্তি প্রতিপাদন বেদের অভিপ্রেত নহে, পরন্তু অদ্বৈত ব্রহ্ম সাক্ষাৎকরণ উদ্দেশে জগন্নিবৃত্তিহেতু কোন রীতিতে মিথ্যা জগতের আরোপ করিয়াছে মাত্র। দৃষ্টান্ত; চিত্তবিনোদন হেতু উড়াইবার হস্তীর আকার ঘুঁড়ির কান ও পুচ্ছ বাঁকা থাকিলে তাহা সোজা করিবার জন্য কেহ যত্ন করে না। সেইরূপ অদ্বৈতজ্ঞান নিমিত্ত নিবৃত্তিহেতু প্রপঞ্চের আরোপ মাত্র। সুতরাং প্রপঞ্চ-উৎপত্তি ক্রম একরূপ করিতে বেদে যত্ন করা হয় নাই। বেদের অভিপ্রায় প্রপঞ্চ নিবৃত্তি, প্রপঞ্চ উৎপত্তি নহে।

সূত্র ও ভাষ্যের দ্বিতীয় অধ্যায়ে শ্রুতিবচনের বিরোধভঞ্জনপূর্ব্বক তৈত্তিরীয় অনুসারে সর্ব্ব উপনিষদের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া যে জগৎ উৎপত্তি

নিরূপণ করা হইয়াছে, তাহা অধম জিজ্ঞাসুর জন্য। উপনিষদে নানা-বিধ উৎপত্তি প্রকার বর্ণন দেখিয়া অধম জিজ্ঞাসু উপনিষদের পরস্পর বিরোধ ভাবিয়া ভ্রমে পতিত হয়। সেই ভ্রম বিদূরিত করিবার জন্য সর্ব্ব উপনিষদের অভিপ্রায় উক্তরূপ ব্যক্ত করা হইয়াছে। ব্রহ্মবিচার দ্বারা যাহার যথার্থ জ্ঞান হয় নাই, তাহার লয় চিন্তনের নিমিত্ত উৎপত্তিক্রম বলা হইয়াছে। যে ক্রমে উৎপত্তি কথন হইয়াছে, তাহার বিপরীত ক্রমে লয় চিন্তন। সেই লয়চিন্তন দ্বারা অদ্বৈতে বুদ্ধি স্থিত হয়। সেই লয় চিন্তনের বিধি বার্ত্তিককার সুরেশ্বরাচার্য্য পঞ্চীকরণে বলিয়াছেন। শুদ্ধ ব্রহ্ম হইতে জগৎ উৎপত্তি হয় না। কারণ শুদ্ধ ব্রহ্ম অসঙ্গ ও অক্রিয়। পরন্তু মায়া বিশিষ্ট ঈশ্বর হইতে জগতের উৎপত্তি হইয়া থাকে।]

জীব ঈশ ভেদহীন স্বরূপ চৈতন্য।
তাহার আশ্রিত মায়া সান্ত আদি শূন্য॥
সদসৎ হতে ভিন্ন স্বরূপ মায়ার।
অবিদ্যা অজ্ঞান নাম কহয়ে তাহার॥
অবিদ্যা বিরোধী নহে সামান্য চেতন।
মায়ার সাধক তেঁই সত্তার স্ফুরণ॥
অন্তর আরূঢ় বৃত্তি উপহিত চিৎ।
বিরোধী মায়ার সেই জ্ঞান সুনিশ্চিত॥
মায়া, ছায়া, অধিষ্ঠান, এ তিন মিলন।
ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ সেই জগৎ কারণ॥ ১৫৪॥

[টীকাঃ—মায়া, জীব ঈশ্বর ভেদরহিত শুদ্ধ চৈতন্যের আশ্রিত। সেই মায়া অনাদি, অর্থাৎ উৎপত্তি বিহীন। এই প্রপঞ্চ মায়ার কার্য্য। সুতরাং সেই প্রপঞ্চ হইতে, পুত্র হইতে পিতৃবৎ মায়ার উৎপত্তি সম্ভবে না। চৈতন্য হইতে মায়ার উৎপত্তি অসম্ভব। জীবভাব ও ঈশ্বরভাব মায়ার কার্য্য, সুতরাং তাহা হইতে মায়ার উৎপত্তি হইতে পারে না। শুদ্ধচৈতন্য অসঙ্গ, অক্রিয় ও নির্ব্বিকার। সুতরাং তাহা হইতে মায়ার উৎপত্তি কথনে শুদ্ধ-চৈতন্য বিকারী হইয়া যায়। শুদ্ধচৈতন্য হইতে মায়ার উৎপত্তি হইলে, মোক্ষ অবস্থায় পুনরায় মায়ার উদ্ভব হইত। সুতরাং মোক্ষ নিমিত্ত সাধনও

নিষ্ফল হইত। এই রীতিতে মায়া উৎপত্তি রহিত, সুতরাং অনাদি ও এক। সান্ত অর্থে অন্ত বা অবচ্ছেদ বিশিষ্ট। জ্ঞান দ্বারা মায়ার অন্ত হইয়া থাকে। মায়া সদসৎ হইতে বিলক্ষণ। ত্রিকালে ও যাহার প্রতীতি হয় না, তাহা শশশৃঙ্গ, বন্ধ্যাপুত্র, আকাশকুসুম আদিবৎ অসৎ। জ্ঞানের পূর্ব্বে মায়া ও তাহার কার্য্য প্রতীত হয়। জাগ্রৎ অবস্থায় "আমি অজ্ঞানী, ব্রহ্মকে জানি না" এই রীতিতে মায়া প্রতীত হয়। স্বপ্নাবস্থায় যে নানা পদার্থ প্রতীত হয়, মায়া তাহার উপাদান করণ।

"আমি সুখসুপ্ত ছিলাম, কিছুই জানিতে পারি নাই", সুষুপ্তি অনন্তর এই রীতিতে অজ্ঞানের স্মৃতি হয়। অজ্ঞাত বস্তুর স্মৃতি হয় না, সুতরাং সুষুপ্তিকালে অজ্ঞানের প্রতীতি হয়। সেই অজ্ঞান ও মায়া একই পদার্থ উভয়ে প্রভেদ নাই। এইরূপে অবস্থাত্রয়ে মায়ার প্রতীতি হয়। সুতরাং মায়া অসৎ হইতে বিলক্ষণ। এই রীতিতে মায়া সদসৎ হইতে বিলক্ষণ। মায়ার কার্য্যও সদসৎ হইতে বিলক্ষণ। (অদ্বৈতবাদে এই সদসৎ হইতে বিলক্ষণকে মিথ্যা ও অনির্ব্বচনীয় কহে।) সুতরাং, মায়া ও তাহার কার্য্য হইতে দ্বৈত-সিদ্ধি হয় না। কারণ, যেমন চৈতন্য সৎরূপ, তেমন মায়া ও তাহার কার্য্য সৎরূপ হইলে দ্বৈতত্ব সম্ভবে। সদসৎ হইতে বিলক্ষণ বলিয়া সেই মায়া ও তাহার কার্য্য মিথ্যা। মিথ্যা পদার্থ হইতে দ্বৈতত্ব হয় না। যেমন স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থ মিথ্যা বলিয়া দ্বৈত নহে।

মায়া, জীব ও ঈশ্বর বিভাগরহিত শুদ্ধ চৈতন্যের আশ্রিত। সেই মায়া শুদ্ধ ব্রহ্মকেই আবরণ করে। যেমন গৃহাশ্রিত অন্ধকার গৃহকে আবরণ করে। ইহাকে স্বাশ্রয় স্ববিষয় পক্ষ কহে; অর্থাৎ শুদ্ধ ব্রহ্মই আশ্রয় ও শুদ্ধ ব্রহ্মই বিষয়। বিষয় অর্থে মায়ায় আবৃত। সংক্ষেপ শারীরকবিবরণ, বেদান্ত মুক্তাবলী, অদ্বৈতসিদ্ধি, অদ্বৈতদীপিকা আদি গ্রন্থে স্বাশ্রয় স্ববিষয়ই অজ্ঞান কথিত হয়।

বাচস্পতি মতে—"অজ্ঞান জীবের আশ্রিত ও ব্রহ্মকে বিষয় করে। 'আমি অজ্ঞানী, ব্রহ্মকে জানি না' এই প্রতীতি হইতে 'আমি' শব্দের অর্থ জীব। 'অজ্ঞানী' কথনে অজ্ঞানের আশ্রয় প্রতীতি হয়। 'ব্রহ্মকে জানি না' এই বাক্যে ব্রহ্ম অজ্ঞানের বিষয় প্রতীত হয়। এই রীতিতে, অজ্ঞান জীবের

আশ্রিত ও ব্রহ্মকে বিষয় অর্থাৎ আচ্ছাদন করে। সেই অজ্ঞান এক নহে, পরন্তু অনন্ত। কারণ, অজ্ঞান এক মানিলে, এক জ্ঞান দ্বারা সেই এক অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইলে; অপর অজ্ঞান ও তাহার কার্য্য সংসার প্রতীত হইত না। যিনি বলেন যে "আজ পর্য্যন্ত কাহারো জ্ঞান হয় নাই।" তবে পূর্ব্বেও কাহারো জ্ঞান হয় নাই। সুতরাং শ্রবণাদি নিষ্ফল হইয়া যায়। সুতরাং অনন্ত-জীবন-আশ্রিত অজ্ঞান অনন্ত, অনন্ত জীবনের অনন্ত অজ্ঞান কল্পিত ঈশ্বর অনন্ত; এবং ব্রহ্মাণ্ডও অনন্ত। যে জীবের জ্ঞান হয়, তাহার অজ্ঞানকল্পিত ঈশ্বর ও ব্রহ্মাণ্ডেরও নিবৃত্তি হয়। যাহার জ্ঞান হয় না, তাহার বন্ধ থাকিয়া যায়।" বাচস্পতির এই মত সমীচিন নহে, কারণ, "ঈশ্বর জীবের অজ্ঞান কল্পিত" কথন শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণ বিরুদ্ধ। "ঈশ্বর অনন্ত, এবং জীব জীবে সৃষ্টির ভেদ" ইহাও বিরুদ্ধ কথন। সুতরাং নানা অজ্ঞানবাদ অসঙ্গত নহে। কারণ জীব, ঈশ্বর, প্রপঞ্চ, অজ্ঞান কল্পিত। অনন্ত অজ্ঞান মানিলে, প্রত্যেক অজ্ঞান কল্পিত জীবের ন্যায় ঈশ্বর প্রপঞ্চ ও অনন্ত। এই হেতু বাচস্পতি অনন্ত ঈশ্বর ও অনন্ত সৃষ্টি করিয়াছেন। সুতরাং "অজ্ঞান এক" এই মত সমীচিন।

সেই এক অজ্ঞান ও জীবের আশ্রিত নহে, পরন্তু শুদ্ধ ব্রহ্মের আশ্রিত। কারণ জীবভাব অজ্ঞানের কার্য্য। সেই অজ্ঞান কভু স্বতন্ত্র ভাবে থাকে না। সুতরাং নিরাশ্রয় অজ্ঞান হইতে জীবভাব সম্ভবে না। প্রথমতঃ অজ্ঞান কাহারো আশ্রিত হইলে, অজ্ঞানের কার্য্যে জীবভাব হয়। জীবত্বের ন্যায় ঈশ্বরত্বও অজ্ঞানের কার্য্য। অজ্ঞান ঈশ্বরের আশ্রিত নহে। পরন্তু অনাদি অজ্ঞান শুদ্ধ ব্রহ্মের আশ্রিত। অনাদি চৈতন্য ও অনাদি অজ্ঞানের সম্বন্ধও অনাদি। সেই অনাদি সম্বন্ধ হইতে জীব ঈশ্বরভাবও অনাদি। পরন্তু জীব ঈশ্বরভাব অজ্ঞানের অধীন বলিয়া অজ্ঞানের কার্য্য কহে। যদিও "আমি অজ্ঞানী" এই বাক্যে অজ্ঞান জীবের আশ্রিত বলিয়া প্রতীতি হয়, তথাপি শুদ্ধ ব্রহ্মের আশ্রিত অজ্ঞানের অভিমান ("আমি অজ্ঞানী" এই বাক্যে) জীবের হয় মাত্র। জীব অজ্ঞানের কার্য্য, সুতরাং জীব অজ্ঞানের অধিষ্ঠানরূপ আশ্রয় হইতে পারে না। পরন্তু শুদ্ধ ব্রহ্মই অজ্ঞানের অধিষ্ঠানরূপ আশ্রয়। শুদ্ধ ব্রহ্ম আশ্রিত অজ্ঞান সেই ব্রহ্মকেই আচ্ছাদন করে। তদনন্তর "আমি

অজ্ঞানী” এই রীতিতে জীব অজ্ঞানের অভিমানীরূপ আশ্রয় হয়। এই প্রকারের অজ্ঞান স্বাশ্রয় ও স্ববিষয়।

সেই অজ্ঞান এক ও জ্ঞান হইতে নিবৃত্ত হয়। পরন্তু যে অন্তঃকরণে অজ্ঞান আছে, জ্ঞান দ্বারা সেই অন্তঃকরণ-অবচ্ছিন্ন চৈতন্যস্থিত অজ্ঞান অংশের নিবৃত্তি হয়। তাহাই মুক্ত হয়। যে অন্তঃকরণে জ্ঞান হয় না; তথায় অজ্ঞানের অংশও বন্ধ রহিয়া যায়। এই রীতিতে এক অজ্ঞান পক্ষে বন্ধমোক্ষ ব্যবহার সম্ভবে। বাচস্পতির রীতি অনুসারে যদি কাহারো বুদ্ধিতে নানা অজ্ঞানবাদই প্রবেশ করে, তাহাও অদ্বৈতঃ জ্ঞানের উপায়। তাহার খণ্ডনে কোন প্রয়োজন নাই। যে রীতিতে জিজ্ঞাসুর অদ্বৈত বোধ হয়, তাহাতেই সে বুদ্ধিস্থিতি করুক। * শুদ্ধ ব্রহ্ম আশ্রিত মায়াকে অবিদ্যা বা অজ্ঞান কহে। (অঘটন ঘটন পটীয়সী অচিন্ত্য শক্তি ও যুক্তি-অসহনা † বলিয়া মায়া কহে। বিদ্যা দ্বারা বিনাশ প্রাপ্ত হয় বলিয়া অবিদ্যা কহে। স্বরূপের আবরণ বলিয়া অজ্ঞান কহে।) যাহা চৈতন্য-আশ্রিত, সামান্য চৈতন্য তাহার বিরোধী নহে, পরন্তু সামান্য চৈতন্য মায়ার সাধক, সত্তাস্ফূর্তি প্রদান করে। অন্তঃকরণবৃত্তি আরূঢ় (স্থিত) চৈতন্য, অথবা চৈতন্য সহিত অন্তবৃত্তি মায়ার বিরোধী।

“মায়া ছায়া, অধিষ্ঠান,” ইত্যাদি—শুদ্ধসত্বগুণ সহিত মায়া, ছায়া অর্থাৎ মায়ার চৈতন্যাভাস, ও মায়ার অধিষ্ঠান চৈতন্য এই তিনের মিলকে ঈশ্বর কহে। সেই ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ এবং জগতের হেতু বা কারণ। কারণ দ্বিবিধ (১) উপাদান কারণ ও (২) নিমিত্ত কারণ। কার্য্যের স্বরূপে যাহা প্রবিষ্ট, ও যাহা বিনা কার্য্যে স্থিতি হয় না, তাহাকে উপাদান কারণ কহে। যেমন মৃত্তিকা ঘটের উপাদান কারণ। মৃত্তিকা ঘটের স্বরূপে প্রবিষ্ট, ও মৃত্তিকা বিনা ঘটের স্থিতি হয় না। যাহা কার্য্যের স্বরূপে প্রবিষ্ট নহে, পরন্তু যাহা কার্য্য হইতে পৃথকভাবে স্থিত, ও যাহার বিনাশে কার্য্য নষ্ট হয় না, তাহাকে নিমিত্ত কারণ কহে। যেমন কুলাল, দণ্ড, চক্র আদি ঘটের নিমিত্ত কারণ।

---

* যয়া যয়া ভবেৎ পুংসাং ব্যুৎপত্তি প্রত্যগাত্মনি।
সা সৈব প্রক্রিয়েহস্যাৎ সাধ্বী সাচ বাবস্থিতি

† যুক্তির আচ টুকু সহিতে পারে না।

ঘটের স্বরূপে তাহারা প্রবিষ্ট নহে, ঘট হইতে পৃথকভাবে স্থিত ও তাহাদের বিনাশে ঘটের নাশ হয় না।

ঈশ্বরই জগতের উপাদান ও নিমিত্ত এই দ্বিবিধ কারণ, যেমন একই ঊর্ণনাভ জালের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ। যিনি কহেন যে ঊর্ণনাভের জড়শরীর জালের উপাদান কারণ, ও তাহার শরীরে চৈতন্য ভাগ তাহা নিমিত্ত কারণ। সুতরাং, এক ঈশ্বর উপাদান ও নিমিত্ত কারণ কথনে কোন দৃষ্টান্ত নাই।" ঊর্ণনাভের ন্যায় ঈশ্বরের শরীর জড়মায়া জগতের উপাদান কারণ, ও চৈতন্যভাগ নিমিত্ত কারণ। এই রীতিতে একই ঈশ্বর জগতের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ। এস্থলে, মুখ্য দৃষ্টান্ত স্বপ্ন। যে সময় জীবগণের কর্ম্মফলদান সম্মুখীন না হয়, তখন প্রলয়, ও যে সময়কর্ম্মফল দান সম্মুখীন হয়, সে সময় সৃষ্টি হয়। এই রীতিতে সৃষ্টি জীবকর্ম্ম অনুসারে হয়।

(ক্রমশঃ)

চৈতন্যকথা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

বুদ্ধদেব।

বুদ্ধদেবের আবির্ভাব হইতে চৈতন্যদেবের আবির্ভাব পর্য্যন্ত যে প্রকাণ্ড ধর্ম্ম অভিনয় হয়, তাহার প্রতি অঙ্ক ঘটনাপূর্ণ, প্রতি অঙ্ক পরস্পর সাপেক্ষ। প্রতি অঙ্কের নায়ক একজন অসাধারণ ধর্ম্মবীর। তবে উপক্রম ও উপসংহারের নায়ক দুইজন তাঁহাদের ভক্তদিগের নিকট অবতার। বুদ্ধদেবের সমকালীন লোক তাঁহাকে অবতার বলিয়া সম্বোধন করে নাই। তিনি "বুদ্ধ" বলিয়া নিজের পরিচয় দিতেন; তাঁহার ভক্তগণ বুদ্ধ বলিয়াই তাঁহাকে বিশ্বাস করিত। অন্যে তাঁহাকে একজন শ্রমণমাত্র বলিয়া জানিত। কিন্তু তাঁহার মহানির্ব্বাণের পর হিন্দুমাত্রেই তাহাকে অবতার বলিয়া বিশ্বাস করিত। চৈতন্যদেবকে তাঁহার ভক্তগণ অবতার বলিয়া জানিত। তিনিও ভক্তগণকে নিজের ভগবত্তার অনেক পরিচয় দিতেন। কিন্তু তাঁহার অন্তর্ধানের পর ব্যাসদেব আর পুরাণ রচনা করেন নাই। তাই কোন পুরাণ গ্রন্থে অবতার বলিয়া তাঁহার উল্লেখ নাই।

বুদ্ধদেব মনুষ্য শক্তির অবতার। চৈতন্যদেব ভগবৎ শক্তির অবতার। মনুষ্য শক্তির বিকাশ না হইলে, ভগবৎ শক্তির বিকাশ হইতে পারে না। বুদ্ধদেবের অনুসরণ না করিলে, চৈতন্যদেবের অনুসরণ করিতে পারা যায় না। মহাশ্রমণ গোতম বুদ্ধ, তোমায় অবহেলা করিয়া কি মহাপঙ্কে নিমগ্ন হইয়াছিলাম। ধিক্ আমার বৈষ্ণব অভিমান। ধিক্ আমার সনাতন ধর্ম্মজ্ঞান। নিষ্কাম কার্য্যদ্বারা চিত্তবলের নাশ, সে কেবল মাত্র বৃথা বাক্যালাপ। ভক্তি, উপাসনা রিপুর পোষক কি শোষক তাহা জানি না। ত্রিপুরারি মহাদেবের অনন্ত ললাট কতবার ধ্যান করিয়াছি। কই, একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গও ত কামের গাত্রদাহ করে নাই। আর সখা কৃষ্ণ—তার ত কথাই নাই। সখা আমার মনটি না পেলে কথা কন্ না। মনটি তাঁর কাছে ধরে দিলে, তবে তিনি চুরি করেন। এমন চোরও দেখি নাই। এমন সাধুও দেখি নাই।

মনে মনে করিতাম, স্রোতে গা ঢেলে দিলেই হল। মনে মনে করিতাম আমার 'তিনি' বুঝি এখনি টেনে লবেন। এতদিনে জানিলাম, সেটা বড় ভুল। এতদিনে জানিলাম পায়ে হেঁটে যেতে হবে।

ভক্ত, ভক্তির ঢেউ দেখে ভুলে যেওনা। ভাই, অনেকে ত গা ঢেলে দিয়েছে; কিন্তু ভেবে দেখ তাহারা প্রায় যেখানে ছিল সেইখানে আছে। স্থির জলে গা ঢেলে লাভ কি। বড় জোর, ভাসতে থাকবে। যখন স্রোতে পড়বে, তখন আগিয়ে যাবে। কিন্তু কতকদূর, সাঁতরে যেতেই হবে। হাবুডুবু খেতেই হবে।

ভাব্‌লে কি হবে! "তাঁর" বৃথা অনুযোগ কর্‌লে কি হবে? নিজের কর্ম্মদোষ দিলেই বা কি হবে!

কিছুই কর, হাত পা নেড়ে সন্তরণে পারদর্শী হতেই হবে। ভবে মনে মনে বুদ্ধদেবকে গুরু বলে স্বীকার কর। সেই দেবতা জানিনা, ঈশ্বর জানিনা, জানি কেবল আত্মবল, জানি কেবল যোগবল,—সেই গরবে উড্ডীয়মান ব্রহ্মাণ্ডভেদী মনুষ্যপক্ষীকে একবার স্মরণ কর। যিনি শঙ্করাচার্য্যে প্রচ্ছন্নরূপে অবস্থিত হইয়া, পাইথাগোরাস্‌কে গ্রীসে পাঠাইয়া, যীশুখ্রীষ্টের দেহে আবিষ্ট হইয়া, তিব্বতে ও চীনে শিষ্য পরম্পরা রাখিয়া; জগদ্‌গুরু হইয়া আছেন, সেই মনুষ্যগুরু, দেবগুরু, বুদ্ধ অবতারের প্রবল মহিমা ধ্যান কর। তিনি না

থাকিয়াও আছেন। তিনি ব্রহ্মাণ্ডের পারে গমন করিয়াও করুণার রসে ব্রহ্মাণ্ড সিক্ত করিতেছেন, যোগের বলে ঋষিদিগকে দৃঢ় করিতেছেন, ও জ্ঞানের আলোকে জগৎ উদ্ভাসিত করিতেছেন। একবার তাঁহাকে স্মরণ করিয়া দেখ। একবার ধর্ম্মপদ পাঠ করিয়া দেখ। সূক্তগুলির শিক্ষা একবার বিচার করিয়া দেখ। দেখিবে কাম দূরে পলায়ন করিবে। দেখিবে মনুষ্যত্বের প্রবল স্রোত হৃদয় অধিকার করিবে। হৃদয়বল, যোগবলের অঙ্কুর সহজে বুঝিতে পারিবে। আমি বুদ্ধদেবের নিকট অত্যন্ত অপরাধী। আমার স্বদেশও সেইরূপ অপরাধী। তাই একবার মনভরে বুদ্ধদেবের যশঃ কীর্ত্তন করিব। অপরাধের ক্ষমা প্রার্থনা করিব!

ভগবান্ বুদ্ধদেবের বর্ণনা করা মনুষ্যের সাধ্য নয়। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ যোগীর যে আদর্শ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা বুদ্ধদেবের সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ দেখা যায়।

বাহ্যস্পর্শেষসক্তাত্মা বিন্দত্যাত্মনি যৎ সুখম্।
স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা সুখমক্ষয়মশ্নুতে॥
যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে।
আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ॥
সক্নোতীহৈব যঃ সোঢ়ুং প্রাক্‌শরীরবিমোক্ষণাৎ।
কামক্রোধোদ্ভবং বেগং স যুক্তঃ স সুখী নরঃ॥
যোঽন্তঃসুখোঽন্তরারামস্তথান্তর্জ্যোতিরেব যঃ।
স যোগী ব্রহ্মনির্ব্বাণং ব্রহ্মভূতোঽধিগচ্ছতি॥
লভন্তে ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃষয়ঃ ক্ষীণকল্মষা।
ছিন্নদ্বৈধা যতাত্মানঃ সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ॥
কামক্রোধবিমুক্তানাং যতীনাং যতচেতসাম্।
অভিতো ব্রহ্মনির্ব্বাণং বর্ত্ততে বিদিতাত্মনাম্॥

গীতা পঞ্চম অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন,—উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈবহ্যাত্মনোবন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ॥
বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য যেনাত্মৈবাত্মনা জিতঃ
অনাত্মনস্তু শত্রুত্বে বর্ত্তেতাত্মৈব শত্রুবৎ॥

বুদ্ধত্ব লাভ করিয়া ভগবান্ গৌতমদেব মগধ হইতে বারাণসী গমন করিতেছিলেন। পথিমধ্যে একজন ব্রহ্মচারী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কাহার শিষ্য। কিরূপে এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলেন?"। উত্তরে ভগবান্ বলিয়াছিলেন—

"আমি নিজ হইতে নিজ দ্বারা অষ্টাঙ্গে মার্গ লাভ করিয়াছি। আর এখন নাশ করিবার কিছুই নাই, আমাকে অপবিত্র করিতে পারে এমন আর কিছুই নাই। পার্থিব অনুরাগের অবধি হইয়াছে। কামজাল আমি নাশ করিয়াছি। কোন গুরুর অপেক্ষা করি নাই। আমি নিজ হইতে এই অবস্থা লাভ করিয়াছি। আর এখন আমার রক্ষক কি অভিভাবকের প্রয়োজন নাই। আমি একক, আমার সহকারী কেহ নাই; এই একমাত্র লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়া, আমি বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াছি। এই একমাত্র লক্ষ্য দ্বারা আমি পরম পবিত্রতা লাভ করিয়াছি।"

বাস্তবিক গোতম বুদ্ধের সহায়ক কেহই ছিল না। দেবতারা পর্য্যন্ত তাঁহার বল পরীক্ষার জন্য প্রতিকূল আচরণ করিয়াছিলেন। গোতম বুদ্ধও ভুলিয়া দেবতা, কি ঈশ্বর, কি শাস্ত্র, কি বেদ এ সকলের নামও লন্ নাই। কেবল চরিত্র সংগঠনের উপর লক্ষ্য রাখিয়া, কাম ক্রোধ সম্পূর্ণরূপে জয় করিয়া, আত্ম জ্যোতির অনুসরণ করিয়া তিনি "বোধি"রূপ অপূর্ব্ব আলোক লাভ করিয়াছিলেন। সেই আলোকের বলে দুঃখের হেতু তিনি প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়াছিলেন, ব্রহ্মাণ্ডের সকল পদার্থই তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন। এবং যে ধর্ম্ম নিজে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, করুণার অবতার বুদ্ধদেব জগৎকে সেই ধর্ম্ম শিখাইবার জন্য জগতের গুরু হইয়াছিলেন। সে ধর্ম্ম তাঁহার নিজের প্রত্যক্ষ ধর্ম্ম। তাঁহার দেখিতে সময় হয় নাই, জানিতে ইচ্ছা হয় নাই, যে সে ধর্ম্মের প্রতিধ্বনি শাস্ত্রে আছে কিনা। তাই প্রচলিত শাস্ত্রীয় শব্দ তিনি ব্যবহার করেন নাই। এই জন্যই শঙ্করাচার্য্যের দেহে তাঁহাকে পুনরায় অবতরণ করিতে হইয়াছিল।　　(ক্রমশঃ)

শ্রীপূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ।

---

* Beale's Texts from the Buddhist Canon (The Theosophical Publishing Society) Page 131.

সনাতন ধর্ম্ম।

তৃতীয় অধ্যায়—পঞ্চম প্রস্তাব।

পুনর্জন্ম।

সর্ব্বজীবে সর্ব্বসংস্থে বৃহন্তে তস্মিন্ হংসো ভ্রাম্যতে ব্রহ্মচক্রে।
পৃথগাত্মানং প্রেরিতারং চ মত্বা জুষ্টস্ততস্তেনামৃতত্বমেতি॥" (শ্বেতাশ্বতর ১।৬)

ব্রহ্মচক্রই সকল জীবের সুবৃহৎ উৎপত্তি ও স্থিতিস্থান। হংস, আপনাকে ও সর্ব্বশাসককে স্বতন্ত্র জ্ঞান পূর্ব্বক তথায় নিরন্তর ভ্রমণ করিতে বাধ্য আছে। যখনই অভেদ জ্ঞান জন্মিয়া যুক্ত হয়, তখনই অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়।

এই শ্লোকে পুনঃ পুনঃ জন্ম মরণ ও তাহার নিবৃত্তির বিষয় সুস্পষ্ট বর্ণিত আছে। মানব যতদিন আপনাকে ঈশ্বর হইতে স্বতন্ত্র বোধ রাখে, ততদিন তাহাকে এই চক্রে বারবার পরিভ্রমণ করিতে হয়। অদ্বৈতত্বের উপলব্ধি ঘটিলেই মুক্তিলাভ হয়।

শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ ও ইতিহাস মধ্যে মানবের আত্মাকে ব্রহ্ম হইতে অভেদ বলিয়া বারম্বার উল্লেখ করা হইয়াছে।

"ততঃ পরং ব্রহ্ম পরং বৃহন্তং যথা নিকায়ং সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ং।
বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারং ঈশং তং জ্ঞাত্বামৃতা ভবন্তি॥

*　　　*　　　*　　　*

অঙ্গুষ্ঠমাত্রং পুরুষোঽন্তরাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।

(শ্বেতাশ্বতর ৩।৭,১৩)

সর্ব্বভূতমধ্যে গূঢ়রূপে অবস্থিত, বিশ্বের একমাত্র পরিবেষ্টিতা অতি মহৎ পরব্রহ্ম ঈশকে অবগত হইয়া অমৃতত্ব লাভ করে। "সেই অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ, সকলের অন্তরাত্মা মানবগণের অন্তরে অবস্থিতি করিতেছেন।" "স বা অয়মাত্মা ব্রহ্ম।" (বৃহদারণ্যক ৪।৪।৫)

"স বা এষ মহানজ আত্মা যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু য এ চোঽন্তর্হৃদয় আকাশঃ।" (বৃহদারণ্যক ৪।৪।২২।) "সেই এই মহান্ অজ আত্মা যিনি বিজ্ঞানময় ও প্রাণীগণের মন্তর্হৃদয়ে আকাশ।"

"স বা এষ মহানজ আত্মাঽজরোঽমরোঽমৃতোঽভয়ো ব্রহ্মাভয়ং।" (বৃহদারণ্যক ৪।৪।২৫।) সেই, এই মহান অজ্ অজর অমর, অমৃত অভয়আত্মা-ই অভয় ব্রহ্ম।" অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় ব্রহ্মস্ফুলিঙ্গ স্বরূপ জীবাত্মা উপযুক্ত ইন্ধন পাইয়া প্রাণীমধ্যে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যেমন বীজ বর্দ্ধিত হইয়া স্বীয় জনক বৃক্ষের ন্যায় মহাবৃক্ষে পরিণত হয়, সেইরূপ জীবাত্মাবীজও বর্দ্ধিত ও পুষ্ট হইলে স্বীয় জনক ব্রহ্মস্বরূপ লব্ধ হয়। জীবাত্মা আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারিবে বলিয়াই এই সংসার চক্র। বৃক্ষে ও বীজে যে সম্পর্ক, ব্রহ্মে ও জীবাত্মায় সেই সম্পর্ক। জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশানীশৌ।" (শ্বেতাশ্বতর ১৯)

"জ্ঞ ও অজ্ঞ, ঈশ ও অনীশ এই দুই অজ।" জীবাত্মা অজ্ঞ ও অনীশ হইলেও বিবর্ত্তক্রমবশে জ্ঞ ও ঈশ হইবার অধিকারী। এই বিবর্ত্তক্রম জন্মমরণ চক্রানুগত।

এই যাতায়াত, "ট্রান্‌সমাইগ্রেসন" নামে কথিত হইয়া থাকে, অর্থাৎ জীবাত্মা এক দেহ ছাড়িয়া অপর দেহ আশ্রয় করেন। যখন একটি দেহ জীর্ণ ও অকর্ম্মণ্য হয়, তখন অন্য দেহ গ্রহণের প্রয়োজন হয়।

"বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্লানি নরোঽপরানি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা
অন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥
জীর্ণ বাস ত্যজি যথা নর নব বস্ত্র পরে।
তেমনি শরীর জীর্ণ ছাড়ি নব দেহ ধরে॥

আজি কালি, পুনর্জ্জন্ম "রি-ইনকার্নেশন" শব্দে অনূদিত হইয়া থাকে, তাহাদ্বারা যে দেহের পুনরুদ্ভব হয়, তাহা বোধ হয়; অর্থাৎ জীবাত্মা যে নবদেহরূপ নূতন আবরণ গ্রহণ করে তাহাই উল্লিখিত হয়।

জীবাত্মা যে ক্রমে অজ্ঞতা হইতে জ্ঞানময় হয়, দুর্ব্বলতা হইতে ক্রমে অশেষ শক্তির আধার হয়, এই তত্ত্ব শ্রুতিনিচয়ে পরিস্ফুট ভাবে বিবৃত আছে। এই তত্ত্বজ্ঞান মানবের সচ্চরিত্রতা ও জীবন গঠনের প্রধান সহায়। মানব একদিনে উৎপন্ন হয় নাই; আজ পৃথিবীতে উৎপন্ন হইয়াছে, দুদিন পরে

চিরদিনের জন্য চলিয়া যাইবে। কিন্তু মানব অজ অমর, ক্রমে তাহার স্বস্বরূপ উপলব্ধি করিবে, এবং নিজ শক্তি বুঝিতে পারিবে। তাঁহার মধ্যেই সমুদায় বর্ত্তমান রহিয়াছে। কেবল বিকাশের প্রয়োজন। জীবন ও মরণ সেই বিকাশের সহায়। মানব প্রকৃতির এই তত্ত্বজ্ঞান তাহার জীবনে মহত্ত্ব, শক্তি, ও মিতাচারের উদয় করিয়া থাকে। এই তত্ত্ব সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে মনীষিগণ এক বাক্যে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। গৌতমের ন্যায়সূত্রের বাৎসায়ন ভাষ্যে এই তত্ত্ব বিচার দ্বারা প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছে।

পাশ্চাত্য রাজ্য সমূহে মধ্যে জ্ঞানের চর্চ্চা লুপ্ত হইয়াছিল। অজ্ঞানান্ধকারে বহুদিন থাকিবার পর পাশ্চাত্যগণ আজকাল ঐ গুহ্যতত্ত্ব বিস্মৃত হইয়াছে। তাহার ফলে, তাহাদের অন্তরে মানব আত্মা সম্বন্ধে নানা অযৌক্তিক ও কাল্পনিক ভাব উদিত হইয়াছে। তাহারা আত্মার স্বরূপ ও গতিরহস্য এবং ঈশ্বরপ্রেমরহস্য বিস্মৃত হইয়াছে।* জীবাত্মার অনন্ত সত্তাকা অন্তর্নিহিত। কিন্তু প্রকৃতি সাহচর্য্যে পঞ্চাত্মকরূপ স্বীকারের পর সেই সমস্তই লুপ্ত ভাব প্রাপ্ত হইয়াছে। জীবাত্মা অসংখ্য ধাতব, ঔদ্ভিদ ও প্রাণী দেহ গ্রহণপূর্ব্বক ক্রমে উদ্ভিজ স্বেদজ, অণ্ডজ হইয়া অবশেষে জরায়ুজ হয়।

এই সমুদায় জন্ম গ্রহণ করিতে করিতে এক একটি করিয়া ঐ সমুদায় লুপ্তশক্তি প্রকাশিত হইতে থাকে। এই সময় দ্বিবিধ বিবর্ত্ত চলিতে থাকে, জীবাত্মার অনন্ত বিবর্ত্তনে ক্রমে স্বশক্তির বিকাশ হইতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে দৈহিক উন্নতিও লক্ষ হইতে থাকে। কারণ ভৌতিক দেহেও পূর্ব্ব গৃহীত ভৌতিক দেহের উন্নত পরিণামরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে। যদিও বর্ত্তমান ভৌতিক দেহের সহিত পূর্ব্ব পূর্ব্ব ভৌতিক দেহের সম্পর্ক অতি অল্পই বলিয়া সহসা মনে উদয় হইতে পারে, তথাপি তাহা যে, পূর্ব্বজ অন্য কোনও ভৌতিক দেহের অংশ বিশেষ দ্বারা গঠিত, তাহা সহজেই উপলব্ধ হইবেক। সেই পূর্ব্বজ দেহের

* পাশ্চাত্য রাজ্যেও অধ্যাপক Huxleyর মতে পণ্ডিতগণ আজ কাল আত্মার অনশ্বরত্ব ও দেহান্তর গ্রহণ স্বীকার করিয়াছেন ; তাঁহার উক্তি এই—Like the doctrine of evolution itself that of *transmigration has its roots in the world of reality* ; and it may clain such support as the great argument from analogy is capable of supplying—Evolution and Ethics. P. 16.

গুণাদি অবশ্যই ইহাতে সংক্রামিত হইয়া থাকে। জীবাত্মা তখন স্বতন্ত্রভাবে আত্মোন্নতির জন্য সংসারে প্রবিষ্ট হয়। পিতামাতা হইতে লব্ধ অংশে পিতামাতার গুণ কিয়ৎ পরিমাণে গ্রহণ করিয়া ভূমিষ্ঠ হয়। এবং সেই দেহ-বদ্ধ জীবাত্মা যদি পূর্ব্বজন্মসংস্কারাদিবশে উন্নত হয়েন, তবে পিতা মাতা অপেক্ষা নিশ্চয়ই উন্নত হইয়া থাকেন। কিন্তু পূর্ব্ব কর্ম্মফলে হীনসংস্কারাদিবদ্ধ জীবাত্মা যদি ঘটস্থ হইয়া ভূমিষ্ঠ হন, তবে সেই মানব পিতা মাতা হইতে নিকৃষ্ট গুণসম্পন্নই হইয়া থাকে। কারণ যদিও সকল জীবাত্মা ধীরে ধীরে উন্নতি পথে অগ্রসর হইতেছে বটে, তথাপি তরঙ্গের উত্থান পতনের ন্যায় কর্ম্মক্ষেত্রেও উত্থান পতন আছে। এক দেহ হইতে উৎপন্ন অপর দেহে যে সকল দোষ গুণ সংক্রামিত হয়, তাহাকে বিজ্ঞান heredity বলে। কিন্তু বিজ্ঞ বৈজ্ঞানিক-গণ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, মানসিক বা নৈতিক শক্তি বংশপরম্পরায় সংক্রামিত হইতে দেখা যায় না। তাঁহারা এই জটিল রহস্যের মীমাংসায় সমর্থ হন নাই। জন্মান্তর স্বীকার না করিলে এই রহস্যের মীমাংসা হওয়াও দুঃসাধ্য। কারণ দৈহিক উন্নতির জন্য যদি শুক্র শোনিতের বিশুদ্ধি এবং জনকজননীর নিরোগীতাদির প্রয়োজন হয়, তবে মানসিক ও নৈতিক উন্নতির জন্য তদন্তরস্থ জীবাত্মার জন্মান্তরীন, উন্নত সংস্কারাদিরও একান্ত প্রয়োজন সন্দেহ নাই। জীবাত্মার পূর্ব্বজন্মজ সংস্কারাদির বিষয় চতুর্থ অধ্যায়ে বিস্তৃতভাবে বিবৃত হইয়াছে। জীবাত্মা, আপনার পূর্ব্বজন্মের সংস্কারাদির অনুরূপ দেহলাভ জন্য উপযুক্ত ক্ষেত্র অনুসন্ধান করিয়া থাকেন, এবং উন্নত পিতামাতার আশ্রয়ই গ্রহণ করিয়া থাকেন। যখন দেহ জীর্ণ হয় তখন জীবাত্মা তাহা ত্যাগ করিয়া অন্য দেহ গ্রহণ করিয়া থাকেন; ইহা পূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে। যখন পশ্বাদি দেহ বিচরণ শেষ হয়, তখন দেহী কর্ম্মানুরূপ নরদেহ গ্রহণে উদ্যত হয়। ঈশ্বরের শক্তিত্রয়ের অনুরূপ শক্তিসম্পন্ন দেহ তখন বিকশিত হইতে আরম্ভ হয়। মানব জীবাত্মা এইরূপ জ্ঞানশক্তি, ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি সম্পন্ন হইতে আরম্ভ হয়। এই শক্তিত্রয় চিরদিনই জীবাত্মাতে প্রসুপ্তাবস্থায় ছিল, এখন ক্রমে প্রবুদ্ধ হইতে আরম্ভ হইল। জীবাত্মার সর্ব্বপ্রথমে অহঙ্কার স্ফূর্ত্তি হয়। তখনই তাহার আত্মানাত্ম জ্ঞান স্ফূর্ত্তি হইতে থাকে। পশুপক্ষ্যাদি জীবদেহে যে বাসনার স্ফূর্ত্তি আরম্ভ

হইয়াছিল, তাহা ক্রমে অধিকতর শক্তিশালী হয়। ক্রমে ইহা, মনকে স্বীয় দাসত্বে আবদ্ধ করে; এবং তাহার সাহায্যে অনবরত নিজ অভীষ্ট সাধন করিতে থাকে। ক্রমে মন যত বলবান হইতে থাকে, জীবাত্মা ততই দুর্দ্দমনীয় বাসনার ফলস্বরূপ যাতনা অনুভব করিতে থাকে। তখন জীবাত্মা মনকে সংযত করিয়া বাসনার নাশে বদ্ধ পরিকর হয়; তখন মন ও জীবাত্মার মধ্যে তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হয়। জীবাত্মা ক্রমে আপনার ঐশ্বরিক শক্তি সমূহ এবং নিজ উপাধির কামময় উপাদান সমূহ অনুভব করিতে থাকে। এই সম্বন্ধে কঠোপনিষদে লিখিত আছে—

"আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু।
বুদ্ধিং তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেবচ॥
ইন্দ্রিয়ানিহয়ান্যাহুর্বিষয়াংস্তেষু গোচরান্।
আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণঃ॥
যস্ত্ববিজ্ঞানবান্ ভবত্যযুক্তেন মনসা সদা।
তস্যেন্দ্রিয়াণ্যবশ্যানি দুষ্টাশ্বা ইব সারথেঃ॥
যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি যুক্তেন মনসা সদা।
তস্যেন্দ্রিয়াণি বশ্যানি সদশ্বা ইব সারথেঃ॥
যস্ত্ব বিজ্ঞানবান ভবত্যমনস্কঃ সদাহ শুচিঃ।
ন স তৎপদমাপ্নোতি সংসারং চাধিগচ্ছতি॥ (কঠ ১।৩।৩-৭)

আত্মা রথী দেহরথ বুদ্ধি সে সারথি।
মন রশ্মি ইন্দ্রিয় নিচয় অশ্ব তথি॥
বিষয় প্রদেশে রথ করে বিচরণ।
আত্মা ভুঞ্জে সঙ্গেতে ইন্দ্রিয় আর মন॥
জ্ঞানীগণ এই কথা বলেন সদাই।
অজ্ঞানীর মনের সংযম শক্তি নাই॥
কদশ্ব যেমন করে কুপথে গমন।
যায় তথা কুপথে ইন্দ্রিয় আর মন॥
জ্ঞানী সেই যার মন সংযত সতত।
ইন্দ্রিয় নিচয় সদা তার অনুগত॥

সারথির সদশ্ব সুপথে যথা যায়।
জ্ঞানীর ইন্দ্রিয় মন সুপথেতে ধায়॥
জ্ঞানহীন জন সদা অমনস্ক অতি।
অশুচি হইয়া করে সংসারেতে গতি॥

পার্থিব জীবনের অবসান হইলে, জীবাত্মা ভৌতিক দেহ পরিহারপূর্ব্বক সূক্ষ্মদেহ অবলম্বন করিয়া অদৃশ্য দেশে প্রবেশ করে। পার্থিব কর্ম্মফল তাহাকে আশ্রয় করিয়া থাকে। যে যে স্থানে সেই সকল ফল ভুক্ত হইতে পারিবে, সেই সেই স্থানে জীবাত্মা কর্ম্মফলভোগ করিবার জন্য গমন করে।

বৃহদারণ্যকে লিখিত আছে জীবাত্মা দেহত্যাগ সময়ে সঞ্চিত সংস্কার ও কর্ম্মফল সঙ্গে লইয়া গমন করে। যথা—

"তদ্‌যথা পেশস্কারো পেশসো মাত্রামুপদায়ান্যন্নবতরং কল্যাণতরং রূপং তনুত, এবমেবায়মাত্মেদং শরীরং নিহত্যাবিদ্যাং গময়িত্বা ন্যন্নবতরং কল্যাণ তরং রূপং কুরুতে॥" (বৃহদারণ্যক ৪।৪।৪)

যেমন স্বর্ণকার স্বর্ণখণ্ড লইয়া নূতন এবং সুন্দরতর পদার্থ প্রস্তুত করে, তেমনি আত্মা এক দেহ পরিত্যাগ করিয়া এবং তদাশ্রিতা অবিদ্যা ত্যাগ করিয়া নূতন সুন্দরতর দেহ প্রস্তুত করিয়া লয়। এই দেহ অবলম্বন পূর্ব্বক সেই আত্মা, আপনার উপযুক্ত অদৃশ্য লোকান্তরে গমন করে; সেই তত্ত্ব ষষ্ঠ অধ্যায়ে বিবৃত হইবে। ঐ উপনিষদে ইহাও কথিত হইয়াছে যে ঐ অদৃশ্য লোকে,—

"প্রাপ্যান্তং কর্ম্মণস্তস্য যৎকিঞ্চেহকরোত্যয়ং।
তস্মাল্লোকাৎ পুনরেত্যস্মৈলোকায় কর্ম্মণ ইতিনু কাময়মানঃ॥"

এই কর্ম্মভূমে যে সমস্ত কার্য্য করিয়াছিল, তথায় তাহার ফল ভোগের পর, পুনরায় এই কর্ম্মভূমিতে আগমন করে। ইহাই সকাম লোকগণের যাতা-য়াতের ইতিবৃত্তি।" জীব যতদিন বাসনার দাস থাকে ততদিন এইরূপ পুনঃ পুনঃ ঘটিয়া থাকে। কারণ জীব জনমমরণচক্রে এই বাসনা পাশে আবদ্ধ। দেবীভাগবতেও এই কথা লিখিত আছে—

"পূর্ব্বদেহং পরিত্যজ্য জীবঃ কর্ম্মবশানুগঃ।
স্বর্গং বা নরকং বাপি প্রাপ্নোতি স্বকৃতেন বৈ॥

দিব্যং দেহঞ্চ সংপ্রাপ্য যাতনাদেহমর্থজং।
ভুনক্তি বিবিধান্ ভোগান্ স্বর্গে বা নরকেঽথবা॥
ভোগান্তে চ যদোৎপত্তে সময়স্তস্য যায়তে।
* * * *
তদৈব সঞ্চিতেভ্যশ্চ কর্ম্মভ্যঃ কর্ম্মভিঃ পুনঃ।
যোজয়ত্যেব তং কালঃ * (৪।২১।২২—২৫)
পূর্ব্ব দেহ পরিহরি জীব স্বীয় কর্ম্মবশে।
কর্ম্ম ফল ভোগ তরে স্বর্গ বা নরকে পশে॥
দিব্য দেহ পায় কিম্বা দেহ সে যাতনাময়।
স্বর্গে বা নরকে তাহে কর্ম্মফল ভোগ হয়॥
ভোগান্তে যখন পুন দেহলাভ কাল আসে।
সঞ্চিত কর্ম্মের কিছু লয়ে আসে ভব বাসে॥"

মানব বিবর্ত্তের প্রধান কার্য্য জীবাত্মার বিকাশ, চিৎশক্তি ও ইচ্ছাশক্তির মালিন্য পরিহার, এবং মনের ও বুদ্ধি পোষণ দ্বারা তাহার গতিপথ চিহ্নিত। মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে মনু ও বৃহস্পতি সংবাদে মানবপ্রকৃতির বিকাশ বর্ণিত আছে। তাহার ভাবার্থ নিম্নে প্রকটিত হইতেছে:—

আত্মাই মনুষ্য। জীবাত্মা পরব্রহ্মের সহিত সমধর্ম্মী। অক্ষর ব্রহ্ম হইতে বুদ্ধি, বুদ্ধি হইতে মন উৎপন্ন হয়, তাহার সহিত ইন্দ্রিয়গণ যুক্ত হইলে দেহী মানব পূর্ণ হয়। দেহ পঞ্চভূতে বিনির্ম্মিত। ইন্দ্রিয়নিচয় দেহ আশ্রয়ে বহির্জগতের সহিত সম্পর্কিত হয়। ইন্দ্রিয়গণ, বহির্জগত হইতে লব্ধ জ্ঞান মনের নিকট উপনীত করে, মন সেই অনুসারে মানসমূর্ত্তি গঠিত করে ও সেইগুলি বুদ্ধির সমীপস্থ করে; বুদ্ধি সেই সমুদায়ের তথ্য নির্ণয় করে ও জীবাত্মার তজ্জনিত বোধ হয়। এতদনুরূপ কার্য্য জীবাত্মা প্রবৃত্তিমার্গে সম্পন্ন করে।

বিবর্ত্তের প্রথম কার্য্য ইন্দ্রিয়জনিতজ্ঞান। এই হেতু মনকে "ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়" বলা হয়। কারণ মন অপর পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের জ্ঞানকে, ধারণ করে, এবং বহির্জগতের সহিত ঐ ইন্দ্রিয়শক্তির সাহায্যে সম্পর্কিত হইয়া কার্য্য করে।

গীতায় লেখা আছে:—"মনঃ ষষ্ঠানীন্দ্রিয়নি" অথবা যখন জ্ঞান ও কর্ম্মেন্দ্রিয়

এবং মন গ্রহণ করা যায় তখন একাদশ ইন্দ্রিয়ঃ—"ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ"। এই অবস্থায় মন কামের কিঙ্কর এবং কামনার দ্রব্যের উপভোগজনিত সুখ দ্বারা নিজের পোষণ করে। ঋষিগণের উপদিষ্ট উপায়ে উন্নতি সত্বরে সাধিত হইতে পারে। তাঁহারা দেবোদ্দেশে সমস্ত কার্য্য করিতে উপদেশ দিয়াছেন। তদ্বারা ইহলোকে পার্থিব সম্পদ, ও লোকান্তরে স্বর্গসুখ ভোগ হয়।

বিবর্ত্তের দ্বিতীয় অবস্থায় মনের সহিত কামের অনবরত যুদ্ধ হইতে থাকে; কারণ মন ক্রমে উপলব্ধি করিতে থাকে যে;—

"যেহিসংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এবতে" (গীতা ৫।২২)

"যে সকল ভোগ ইন্দ্রিয়সম্পর্কজনিত তাহা সমুদায়ই দুঃখের হেতু।"

ইহা বুঝিতে পারিলেই মন ক্রমে ভোগ্যবস্তুর অনুসন্ধানে বিরক্ত হইতে থাকে। এই কামের সহিত যুদ্ধে ধীরে ধীরে মনের বল বৃদ্ধি হইতে থাকে, ও কামনার বিষয়ে বিরাগ হইতে ক্রমে কামের শুদ্ধি হইতে থাকে। তখন উচ্চতর ইচ্ছা শক্তির বিকাশ হইতে আরম্ভ হয়। ইচ্ছাশক্তি শিবশক্তি, উহার দ্বারা কাম ভস্ম হয়। কাম বিষ্ণু ও লক্ষ্মীর পুত্র *।

বিবর্ত্তের তৃতীয় স্তরে মনের উচ্চতর জ্ঞানশক্তিসমূহের বিকাশ হয়। এখন মন আর কামের কিঙ্কর নহে। এখন আর উভয়ে যুদ্ধ নাই। এখন মন ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়া নিজ সাধনলব্ধ ভাবরাজ্যে প্রবেশ করিয়াছে। জীবাত্মা আর এখন সংস্পর্শজ ভোগে তুষ্ট নহেন; এমন কি ঐ সকল বিষয়ের কল্পনাও তাহার অসুখকর। এখন আত্মানাত্ম বিচার। রূপ পরমানন্দকর ব্যাপারে তিনি ব্যাপৃত। এইবার বুদ্ধির বিবর্ত্ত আরম্ভ হয়। বুদ্ধিই জ্ঞানশক্তির বিকাশ। তাহা জ্ঞানে আর প্রেমে মিলনের দ্বারস্বরূপ। এই জ্ঞান এখন আত্মানন্দ। গীতায় লিখিত আছে—

শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াৎ যজ্ঞাৎ জ্ঞানযজ্ঞ পরন্তপ।
সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে॥

*　　*　　*　　*

যেন ভূতান্যশেষেণ দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথো ময়ি॥ (গীতা ৪। ৩৩-৩৫)

---

* ধর্ম্ম বিষ্ণুর জ্ঞানশক্তি হইতে উৎপন্ন, ও কাম ইচ্ছাশক্তি হইতে। এই দুইটি মানবের পার্থিব বিষয় সাহায্যে পুষ্ট হইবার প্রয়োজন। এই জন্য প্রবৃত্তিমার্গে ধর্ম্ম কাম ও অর্থ এই ত্রিবর্গ সাধনের ব্যবস্থা আছে।

দ্রব্যময় যজ্ঞ হইতে জ্ঞান যজ্ঞ শ্রেষ্ঠ, হে! পরন্তপ পার্থ, সর্ব্ববিধ কর্ম্মই জ্ঞানে পরিসমাপ্ত হয়; সেই জ্ঞান দ্বারা সমস্ত ভূত আত্মাতে ও আমাতে দৃষ্টি করিবে।

যখন জীবাত্মা এই অবস্থায় উপনীত হইবেন তখনি তিনি মুক্তির দ্বারস্থ হইবেন। তিনি বহুদিন পূর্ব্ব হইতেই "বিরতো দুশ্চরিতাৎ" দুষ্কৃত হইতে বিরত হইয়া শান্ত, সমাহিত ও শান্তমানস হইয়াছেন।

"যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি সমনস্ক সদা শুচিঃ।
সতু তৎপদমাপ্নোতি যস্মাৎ ভূয়ো ন জায়তে॥ (বৃহদারণ্যক ৪।৪।১৯)
যে জন বিজ্ঞান লভি সমনস্ক শুচি হয়।
জনম না হয় তার তৎপদেই হয় লয়॥

কারণ জীবাত্মার জন্মমৃত্যু চক্র অনন্ত নয়। বাসনার বশ হইতে আবদ্ধ হইয়া, বাসনা নাশ পর্য্যন্তই তাহাকে বদ্ধ থাকিতে হয়। অবিদ্যাবশে বন্ধন, অবিদ্যার নাশে মোক্ষ। কেবল,—

"মৃতয়োঃস মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি।' (বৃহদারণ্যক ৩।৮)
"যে দেখে অনেক সেই মৃত্যু হতে মৃত্যু পায়।
"যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদিশ্রিতাঃ।
অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে॥"
বিলুপ্ত হইবে যবে হৃদিস্থ কামনা চয়।
ব্রহ্মানন্দে মগ্ন মর্ত্ত্য তখনি অমৃত হয়॥'

"তস্মাদেবং বিচ্ছান্তো দান্ত উপরতস্তিতিক্ষুঃ সমাহিতো ভূত্বাত্মন্যেবাত্মানং পশ্যতি, সর্ব্বং আত্মানং পশ্যতি, নৈনং পাপ্মা তরতি, সর্ব্বং পাপ্মানং তরতি, নৈনং পাপ্মা তপতি, সর্ব্বং পাপ্মানং তপতি, বিপাপো বিরজো বিচিকিৎসো ব্রহ্মণো ভবত্যেষ ব্রহ্মলোকঃ।"

অতএব, এইরূপ বিৎ (জ্ঞানী) শান্ত, দান্ত, উপরত, তিতিক্ষু ও সমাহিত হইয়া, আত্মাকে আত্মায় দর্শন করেন, চরাচর আত্মার দর্শন করেন; তখন পাপ তাহাকে অভিভূত করিতে পারে না তিনিই পাপকে অভিভূত করেন, পাপ তাহাকে তাপ দিতে পারে না; তিনিই পাপকে উপতাপিত করেন; এবং বিপাপ, বিরজ বিচিকিৎস ব্রহ্ম হন। এই ব্রহ্মলোক।

ইতিপূর্ব্বে মহাভারত হইতে প্রবৃত্তিমার্গ বর্ণিত হইয়াছে, এইখানে নিবৃত্তি মার্গের সংক্ষিপ্তসার সংগৃহীত হইতেছে।

ইন্দ্রিয়নিচয়কে বহির্বিষয় হইতে বিনিবৃত্ত করিলে শান্ত হয়। মনও সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রিয় সম্পর্ক হইতে সংগৃহীত হইয়া শান্ত হয়। বুদ্ধিও ইন্দ্রিয়-জনিত কার্য্য বিচার ত্যাগ করিয়া শান্ত হয়। তখন আত্মাই প্রত্যক্ষ হয়েন। যতদিন মন ইন্দ্রিয় সম্পর্কে ব্যাপৃত থাকে, ততদিন সে দুঃখের ভাগী থাকে, কিন্তু বুদ্ধিকে আশ্রয় করিলেই আনন্দরূপ শান্তিলাভ করে।

এই নিবৃত্তি মার্গে জীবাত্মা সংসার ভ্রমণ হইতে প্রত্যাগমন ও আপনার গৃহে আগমন করে। উহাই অনন্ত। পথেই প্রবৃত্তির ঋণ পরিশোধ হয়।

আত্মদর্শনই জ্ঞান। আত্মপ্রেমই ভক্তি। আত্মকর্ম্মই কর্ম্ম। জ্ঞান ভক্তি ও কর্ম্ম এই তিনটি মোক্ষের মার্গ। যে সকল মানবে চিৎশক্তির আধিক্য তাঁহারা জ্ঞান মার্গ অবলম্বন করেন। যাঁহাদের ইচ্ছাশক্তির আধিক্য আছে তাহারা ভক্তি মার্গে প্রবেশ করেন। আর যাঁহাদের ক্রিয়া শক্তির প্রাধান্য থাকে তাহারাই কর্ম্ম মার্গে গমন করেন। কিন্তু তিনি যে পথেই গমন করুণ না কেন, প্রত্যেকেরই এই ত্রিবিধ শক্তির স্ফূর্ত্তি হয়। জ্ঞানীতে শেষে ভক্তি ও ক্রিয়ার বিকাশ অবশ্যম্ভাবী। ভক্তের সাধনার সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান ও ক্রিয়া শক্তির স্ফূর্ত্তি হইবেই। কর্ম্মীরও শেষে জ্ঞান এবং ভক্তি অবশ্যই লব্ধ হইবেক। এই মার্গত্রয় শেষে একই। যোগের সাহার্য্যে আত্মদর্শন লব্ধ হয়, এবং প্রেমের উদয় হয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

"সাংখ্যযোগৌ পৃথক্ বালা প্রবদন্তি নপণ্ডিতাঃ।
একমপ্যাস্থিতঃ সম্যক্ উভয়ো র্বিন্দতে ফলং॥
যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্‌যোগৈরপিগম্যতে।
সাংখ্য যোগ দুই বলে বালকে পণ্ডিতে নয়।
যেটির সাধনা কর উভয়েরই ফল হয়॥
সাংখ্যে যেই পদ পাবে যোগে তাই সুনিশ্চয়॥

মুক্ত, ত্রিভুবন মধ্যে কর্ম্মী বা কর্ম্মত্যাগী রূপে থাকিতে পারেন। ঋষি-গণ মুক্ত হইয়াও জগতের পালন ও শাসন জন্য ব্যাপৃত আছেন। রাজর্ষি জনক মুক্তাত্মা হইয়াও রাজ্য শাসন করিতেন। তুলাধার মুক্তাত্মা ছিলেন, তথাপি তিনি স্বজাতীয় ব্যবসায় করিতেন। ইতিহাসে এরূপ অনেক মুক্তাত্মার বিবরণ বর্ণিত আছে। কারণ মুক্তাত্মা হওয়া জীবাত্মার একটি অবস্থান্তর

মাত্র। তাহা দ্বারা বহির্ব্যাপারের কোনও ব্যত্যয় সম্ভাবনা ন্যাই। উহা কেবল জীবাত্মার আত্মানাত্মজ্ঞান সম্বন্ধীয় অবস্থাভেদ।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, যদিও বিবর্ত্তবশে জীবাত্মা উর্দ্ধগামীই হইতেছে, তথাপি সময়ে সময়ে কর্ম্মফলে প্রত্যাবর্ত্তনও হয়। এজন্যই বহু প্রাচীন আর্য্য গ্রন্থে নীচযোনি প্রাপ্ত্যাদি সম্বন্ধে অনেক কথা দেখা যায়। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন "নরাধমেরাই আসুরীযোনীতে" গমন করে। কথা এই মানব কর্ম্মবশে আপনাকে হীন যোনির উপযুক্ত করে, তবে দেহান্তরগ্রহণ সময়ে তাহার ইতরপ্রাণী দেহও লাভ করিতে হয়। তখন আবার ঐ কর্ম্মফল শোধ না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাকে তৎ তৎ যোনী ভ্রমণপূর্ব্বক মানব দেহের উপযোগী হইতে হয়। কোনও জীব বিশেষে আত্যন্তিক আশক্তি হইতেও, তৎ তৎ জীবদেহ লাভ সম্ভব।

এই অধ্যায়ে যে সমুদায় বিষয় আলোচিত হইল তাহার মধ্যে এই কয়টি বিশেষ রূপে স্মরণ করিয়া রাখা কর্ত্তব্য।

১। বৃক্ষের সহিত বীজের যে সম্পর্ক, জীবাত্মা ও ব্রহ্মে সেই সম্পর্ক। জীবাত্মা যে পর্য্যন্ত আত্মাস্বরূপ উপলব্ধি করিতে না পারে, সেই পর্য্যন্ত সংসারচক্রে ভ্রমণ করিবে।

২। সেই সমূহ ক্রম সম্বদ্ধ, পুরাতনদেহ হইতে নূতন উৎপন্ন হইয়া স্বতন্ত্র ভাবে থাকে। প্রত্যেক জীবাত্মা অনন্তজীবনযুক্ত।

৩। জীবাত্মা দেহ স্বীকার পূর্ব্বক, কার্য্য করিয়া অব্যবহার্য্য হইলেই উহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক, অদৃশ্য লোকে কর্ম্মফল ভোগ করে ও পরে এই জগতে পুনরাগমন করে।

৪। আত্মকৃত কলুষবশে জীবাত্মার পুনরায় হীনযোনী লাভ সম্ভব।

৫। মনকে, কাম কিঙ্কর হইয়া, কামের সহিত যুদ্ধ করিয়া পরে কামজয় পূর্ব্বক, উন্নতি লাভ করিতে হয়।

৬। বুদ্ধির উন্নতির দ্বারা মোক্ষ লাভ হয়।

৮। জ্ঞান, ভক্তি ও ক্রিয়া মুক্তির এই তিন পথ। শেষে তিনটী মিলিত হইয়াছে।

মহামায়ার দয়া।

ক্ষুদ্র জীবনের ক্ষুদ্র ইতিহাস।

(১)

সাধুগণ সেবিত শ্রীশ্রীবিষ্ণুক্ষেত্র নৈমিষারণ্যের অনতিদূরে মানবসমাগমশূন্য একটী বন আছে। বৃক্ষসমূহ এত ঘন সন্নিবিষ্ট যে অপরিচিত লোকে ভিতরে প্রবেশ করিবার পথ দেখিতে পায় না। বিশেষ নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলে এক হস্ত প্রশস্ত একটী অপ্রসর গ্রাম্য পথের নিদর্শন মাত্র দেখিতে পাওয়া যায়। নির্ভীক পথিক সাহসে বুক বাঁধিয়া যদি সেই পথে অগ্রসর হন, তাহা হইলে প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া, অবশেষে ক্ষতবিক্ষত দেহে বনমধ্যস্থ একটী প্রান্তরে উপনীত হইবেন। প্রান্তরটী বন হইতে উচ্চ। দক্ষিণ পার্শ্বে একটী সচ্ছসলিল পূর্ণ গভীর সরোবর ; তীরগুলি পাথরে বাঁধান, কিন্তু কালের পরাক্রমে স্থানে স্থানে পাথরগুলি খসিয়া পড়িয়াছে। পাথরে বাঁধা ঘাটটীও ভগ্নপ্রায়। স্বচ্ছসলিল আকাশের নীলিমায় রঞ্জিত, এবং প্রস্ফুটিত কমলের স্নিগ্ধ তুষার ধবল সৌন্দর্য্যে সুশোভিত।

ঘাটের অপর পারে একটী মন্দির ; উহা আধুনিক ভাবে গ্রথিত নহে— দেখিতে অনেকটা একটী গৃহের ন্যায়। সম্মুখে একটী অপ্রশস্ত দালান ; পূর্ব্বমুখী হইয়া দালানে উঠিতে হয়, এবং দ্বারদেশ অতিক্রম করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলে সম্মুখেই,—

"মহামেঘপ্রভাংঘোরাং মুক্তকেশীং চতুর্ভুজাং

জগৎজননীকে বিরাজিতা দেখিতে পাওয়া যায়। কি আশ্চর্য্যের বিষয়, মায়ের পদতলে শিবমূর্ত্তি নাই!! মা একাই রহিয়াছেন! এরূপ মূর্ত্তি ত কখনই দেখা যায় না। মায়ের একি ভাব?

প্রতিমার সম্মুখে পঞ্চদশবর্ষীয়া এক লাবণ্যময়ী ভৈরবী মূর্ত্তি নিশ্চলভাবে গভীরধ্যানে মগ্না। ব্রহ্মচর্য্যার তেজে চতুর্দ্দিক আলোকিত—যেন স্বয়ং ব্রহ্মময়ী ভক্তরূপে স্বীয় রসাস্বাদনে আপনাকে ভৈরবীভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। প্রান্তর ও মন্দির ব্যাপিয়া যে শান্তি বিরাজিতা, তাঁহাকে দেখিলে সেই শান্তিরই বিকাশ বলিয়া বোধ হয়।

*　　*　　*　　*

ভৈরবীর ধ্যান ভঙ্গ হইল। তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন—"মা তোর কি নিদারুণ আজ্ঞা। আজীবন তোর সেবায় প্রাণ মন সবই দিয়াছি; কিন্তু পাষাণী! তোর একি আদেশ? আবার সংসার!! আবার উদ্বাহ বন্ধন!! না মা! আর মায়ার ছলনে—মোহের কুহকে পাঠাইয়া বিধিবাঞ্ছিত শ্রীচরণ হইতে বঞ্চিত করিস্ না। তোমারই ইচ্ছায় ঐ যুবকের সহিত সম্মিলন; তোমার আদেশ মতই তাহার সঙ্গে মিশিলাম। তবে কেন আবার ভীষণ সংসারে পাঠাইতে চাহিস্? যোগিনী কাঁদিতে কাঁদিতে কিয়ৎক্ষণ পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া ধ্যান্ মগ্না হইলেন।

* * * *

আবার তাঁর ধ্যান ভঙ্গ হইল। তিনি বলিতে লাগিলেন:—"কি বলিলি মা! এখনও আমার সংসারব্রত উদ্‌যাপন হয় নাই? আমার ভালবাসা কি এখনও অসম্পূর্ণ—এখনও বহির্মুখী—এখনও প্রতিদান চায়? এ ভালবাসায় এখনও কি ব্যক্তিগত ভাব আছে,—মূর্ত্তভাব ও ভেদের কালিমা আছে। এখনও কি সর্ব্বক্ষণে একভাবে অনুস্যূত নির্ব্বিকার অক্ষর সত্তা হৃদয়ে গ্রহণ করিতে ক্ষমতা নাই? মূর্ত্ত ও প্রকাশশীল ব্যক্ত পদার্থকে এই অব্যয় সত্তার ন্যাস্ করিয়া যে একভক্তি উৎপন্ন হয়, তবে কি সে ভাব এখনও আমি গ্রহণ করিতে সমর্থ নহি? কেমন করিয়া জানিব মা! অজ্ঞান শিশু কি করিয়া সে ভাব বুঝিবে। মূর্ত্তিবাদ দিলে কি আর আমাদের প্রেম থাকে? বলিলি, বহির্মুখীপ্রেম লালসা মাত্র? কিন্তু অব্যয় সত্তায় কি প্রেম থাকে? চিনি হওয়া অপেক্ষা কি চিনি খাওয়া ভাল নহে? ও ভাব ধারণা করিতে পারি না। শুনিয়াছি মা তুমিই সব; কিন্তু মা আমরা এখনও "সব" মানে বিভিন্ন ভাবকে দেশ, কাল ও পাত্র, কার্য্য ও কারণ, এই সকল ভাবের দ্বারায় একীকৃত করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করি। কিন্তু তাহার ভিতর যে বিভিন্নতা থাকিয়া যায়; তাহার ভিতর যে ভেদ রহিয়া যায়। আমাদের "সব" যে কথা মাত্র, ভাষায় খেলা মাত্র। বস্তু ও অবস্তু ব্যাপিয়া যে পদার্থ বা সত্তা আছে, তাহা কি ক্ষুদ্র হৃদয়ে পরিস্ফুট হয়? এবং সেই অপরিস্ফুট, অব্যক্ত, সদা অনির্দ্দেশ্য স্বত্তাতে কি ভালবাসা জন্মে? এ অসাধ্য কিরূপে সাধিত হইবে, মা তুই জানিস্। সংসার মায়ায় ডুবিয়া যেন শ্রীপদ না হারাই এই মাত্র প্রার্থনা।" * * কাঁদিতে কাঁদিতে

সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত পূর্ব্বক যোগিনী মন্দির হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া অন্ধকারে মিশাইয়া গেলেন।

(২)

হুগলীর গঙ্গাতীরে একটী ক্ষুদ্র দ্বিতল ভবনে এক পরমাসুন্দরী পঞ্চদশ বর্ষীয়া বালিকা মৃত্যু শয্যায় শয়ানা। কাশ রোগে দেহ অস্থিচর্ম্মসার, উঠিতে সামর্থ্য নাই; তথাপি প্রভাত সময়ের চন্দ্রিমার ন্যায় মলিন সৌন্দর্য্যে কক্ষ আলোকিত। বালিকা আপন মনে গুণ গুণ স্বরে একটী গান গাহিতেছে—

"উঠমা আনন্দময়ী খোল মা কুটীর দ্বার।
আঁধারে হেরিতে নারি পথ বড় দুর্নিবার॥
তার স্বরে ডাকি তোমা, তারা! তোমায় বারেবার
দয়াময়ী হয়ে মাগো, এ কি হেরি ব্যবহার॥
সন্তানে রাখি বাহিরে, আপনি মা অন্তঃপুরে
কাঁদিয়া হইনু মাগো দেহ অস্থিচর্ম্মসার।
খেলায় মত্ত ছিলাম বলে, অধমেরে ফাঁকি দিলে
লহ মা সন্তান বলে, খেলিতে যাব না আর॥"

* * * *

গানটী শেষ হইল। বালিকা অনেকক্ষণ চক্ষু বুজিয়া নিস্তব্ধ ভাবে রহিল; পরে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল "কাকা! আর আমি বাঁচিব না। এত কাঁদিয়া যদিও মার দেখা পাইলাম, কিন্তু তিনি নির্দ্দয় ভাবে বলিয়া গেলেন, "কেন তুই মিছামিছি আমায় বিরক্ত করিতেছিস্। তোর জীবনের আশা নাই।" বাস্তবিকই মা কি পাষাণী! স্নেহময়ীর একি ব্যবহার। ডাকিতে ডাকিতে বুকের পাঁজর ভাঙ্গিয়া গেল, তবু মা! তোর কঠিন প্রাণে দয়ার সঞ্চার হইল না। মা! এই নূতন জীবন! কত সাধ! কোন আশাই ত মিটিল না; তার উপর রোগের যন্ত্রণা। মা দীন জননী! তবুও তোর পাষাণ প্রাণে দয়া হইল না।" রুগ্না বালিকা কাঁদিতে লাগিল।

পাঠকের অবগতির জন্য এই অবসরে বালিকার পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। হুগলীর নিকটস্থ কোন গ্রামে বীরেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় নামে গৃহস্থের কন্যাই, এই বালিকা। বীরেন্দ্র বাবু আধুনিক শিক্ষিত; সুতরাং ধর্ম্মাধর্ম্মের ও

অন্যান্য কুসংস্কারের ধার ধারেন না। এই স্থূল জীবনই এক মাত্র জীবন এবং যাহাতে এই জীবন সুচারুরূপে অতিবাহিত হয়, তাহাই মানবের এক প্রশ্ন। তিনি আবশ্যক মতও "ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পীবেৎ" প্রভৃতি মতের সমর্থন করিয়া বক্তৃতাও দিয়া থাকেন,ও তিনি কঙ্গরসের একজন প্রধান পাণ্ডা। স্বাভাবত তিনি যে মন্দ লোক তাহা নহে; তবে অনুকরণনিপুণ, দুর্ব্বলচিত্ত শিক্ষিত বাঙ্গালীর হৃদয়ে নিরীশ্বর ও বাহ্য চাকৃচিক্যময় পাশ্চাত্য শিক্ষায় যে ফল ফলে, বীরেন্দ্র বাবুরও তাই ঘটিয়াছিল। তাঁহাকেই বা দোষ দিই কেন? আমাদের মধ্যে কয় জন প্রকৃত প্রস্তাবে হিন্দুজীবন গ্রহণে সক্ষম। বিলাতী দোকানদারী ভাব, ধর্ম্মের নামে অর্থ উপার্জ্জন ও খ্যাতি লাভ, আপনাকে যোগভ্রষ্ট মহাপুরুষ বলিয়া মান্য করা, এবং নিজ অভিনেতৃত্বে নূতন ধর্ম্ম সম্প্রদায় স্থাপন প্রভৃতি ভাব আমাদের ধর্ম্মজীবনে প্রবেশ করিতেছে। "অমানী মানদ"ভাবে কয়জন নামজাদা ধার্ম্মিক মহোদয়েরা ধর্ম্মাচরণ করিতেছেন। বাস্তবিক ধর্ম্ম কেবল নামরূপে পরিণত জীবনশূন্য পদার্থ হইয়া পড়িয়াছে। রাজনৈতিক আন্দোলনে ধর্ম্মের বড়াই; কিন্তু নিজ জীবনে সুখই পরমার্থ হইয়া উঠিয়াছে।

বীরেন্দ্র বাবু নিজে যেমন নাস্তিক ও আলোকপ্রাপ্ত, তাহার পত্নী উমাশশী ঠিক সেইরূপ কুসংস্কারাপন্না ও ধর্ম্মপ্রাণা ছিলেন। বাল্যকাল হইতে ৺ষষ্ঠি, মাকাল প্রভৃতির পূজা আরম্ভ করিয়া উদ্বাহ জীবনেও সেই পুরাতন ভাবগুলি ছাড়িতে পারেন নাই। বীরেন্দ্র বাবুর চেষ্টা ও উপদেশ সত্ত্বেও উমাশশী আলোক গ্রহণ করিতে পারেন নাই। তিনি জপ, তপ, পূজা লইয়াই ব্যাপৃতা; এবং সাংসারিক জীবনে তাঁহার প্রত্যেক কার্য্যই ভগবানে ন্যস্ত। তাহার উপর আবার স্বামীকে দেবতা জ্ঞানে পূজা ও সংসারের সকল ব্যক্তিকে সেবা করিতেন।

বিবাহের এক বৎসর গত না হইতেই উমাশশীর শ্বশ্রু ঠাকুরাণী পৌত্র মুখ দর্শনে নরক হইতে আপনাকে উদ্ধার কামনা করিতে লাগিলেন। এমন কি বধুমাতাকে তাঁহার এই মহৎকার্য্যে সহায়তা করিতে অক্ষম বিবেচনা করিয়া পুত্রের দ্বিতীয়বার দার গ্রহণে ইচ্ছুক হইলেন। কাজে কাজেই পিতৃ মাতৃহীনা উমাশশীকে বিশেষ বিপন্না হইয়া ৺জগন্মাতার শরণাপন্ন

হইতে হইল। তাহার ফলে এক কন্যা হইল, এবং ৺কাত্যায়নীর দ্বারে লব্ধ বলিয়া তাহার নাম কাত্যায়নী রাখা হইল।

বীরেন্দ্র বাবুর বাটীতে আর একজন বিকৃতমনা ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার ছোট ভ্রাতা ব্রজেন্দ্র আর এক মাত্রা চড়াইয়া ধর্ম্মজীবনের সুর বাঁধিয়া ছিলেন। তিনি থিয়সফিষ্ট দলে যোগদানে ক্ষান্ত না হইয়া, সর্ব্বদাই যোগলাভে ব্যস্ত ছিলেন। তিনি ইহজীবনের মূলে এক অবিকারী সূক্ষ্মাতীত জীবন আছে বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, এবং সেই অব্যক্ত জীবনের সহিত একসুরে ইহ জীবনকে বাঁধিতে চেষ্টা করিতেন। লেখা পড়া শিখিয়া এরূপ অধঃপতন খুব কমই দেখা যায়।

মাতা ও কাকার সহবাসে অতি শৈশবাবস্থা হইতেই কাত্যায়নী ধর্ম্মপ্রাণা হইয়া উঠিলেন। দান, সংযম, আত্মত্যাগ ও শ্রীভগবানে নির্ভর প্রভৃতি দোষ গুলি শৈশবাবস্থা হইতেই তাঁহাতে দেখা যাইতে লাগিল। বিশেষতঃ বালিকা যেন ভালবাসার কাঙ্গাল; কেবল ভালবাসিয়া ও ভালবাসা পাইলেই সে যেন তৃপ্ত। কিন্তু শিক্ষিত পিতা ভালবাসাকে Sentiment বলিয়া জানিতেন। Bain, Mill প্রভৃতি পাঠ করিয়া তাহার ধারণা যে ভালবাসা আমাদের চরিত্রমূলক দুর্ব্বলতা মাত্র, এবং ইহাতে আমাদের পুরুষত্বের হানি হইতেছে। সুতরাং কোমলপ্রাণা কাত্যায়নী পিতাকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিয়াও কঠোর শাসন ভয়ে, ভালবাসা লুকাইতে শিখিয়াছিল। মাতার নিকটও তাহার ভালবাসা প্রকাশবৃত্তি অতৃপ্ত থাকিত; কারণ উমাশশী সদাই পূজা ও সংসারের সেবায় ব্যাপৃতা থাকিতেন। কেবল "ব্রজেন" কাকাই কাত্যায়নীর ভালবাসার একমাত্র প্রকাশ ক্ষেত্র ছিল।

একাদশ বর্ষে বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত বালিকার বিবাহ হইল। বসন্তকুমারের ন্যায় ধর্ম্মপ্রিয় অথচ বিদ্বান যুবক অতি বিরল। তিনি কাত্যায়নীকে প্রাণসম ভাল বাসিতেন; কিন্তু ভাগ্যক্রমে তাঁহার পিতা বিপত্নীক। পুত্র পাছে নশ্বর ভালবাসায় পড়িয়া স্বধর্ম্মচ্যুত হয়, এই ভয়ে উষানাথ বাবু প্রথম হইতেই কাত্যায়নীর উপর বড়ই নারাজ হইলেন।

উষানাথবাবু বড় ধার্ম্মিক এবং শাস্ত্র বিশারদ; সুতরাং তিনি শাসন দণ্ড প্রয়োগ ব্যাপার বিশেষ ভাল বুঝিতেন। প্রথমা পত্নীর বিয়োগের সময় তাঁহার পুত্র ও কন্যা

গুলি নিতান্ত অল্প বয়স্ক ছিল না ; সকলেরই বিবাহ হইয়াছিল। কিন্তু উষানাথ বাবু জানিতেন যে সস্ত্রীক না হইলে ধর্ম্মাচরণ হয় না, যোগাভ্যাস ত হইতেই পারে না ; বিশেষতঃ সন্তানদিগকে একটী স্নেহের পাত্র দেওয়া চাই। এইরূপ অনেক বিচারের পর কেবল গৃহস্থের ধর্ম্ম সংরক্ষণ ও সামাজিক ধর্ম্মজীবনকে অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য, নিজের সুখ ত্যাগ করিয়া, তিনি দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন।

তিনি সর্ব্ব কর্ম্মই শাস্ত্র অনুসারে করিতেন। লোকে—এরূপ নিন্দুক সর্ব্বত্রই আছে—তাঁহাকে কৃপণ ও স্বার্থপর বলিত। কিন্তু জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি মনু প্রভৃতি হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া গৃহস্থের পক্ষে সঞ্চয় ধর্ম্ম বিশেষরূপে প্রতিপাদন করিয়া দিতেন। ধৃষ্টতা বশতঃ কেহ দান সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় আদেশ উল্লেখ করিলে, তিনি গীতা হইতে সাত্বিক দানের ব্যবস্থা উদ্ধার করিয়া, Political Economy হইতে দানের বিষময় ফল দেখাইয়া প্রতিপক্ষকে স্তব্ধ করিয়া দিতেন। বদ্‌লোকে ভাল লোকেরই নিন্দা করে ; বড় গাছেই ঝড় লাগে।

ধর্ম্ম সভা ও সমিতি স্থাপনে উষানাথ বাবু বিশেষ পটু। শুনা যায় তিনি এক অজ্ঞাতনামা মহাযোগীর শিষ্য হইয়া আত্মজ্ঞান লাভ করেন। তিনি প্রায়ই বলিতেন "কি জান ভাই আমরা মহাপুরুষের চেলা ; আমাদের কর্ত্তব্য অনেক"। লোকে বলে উক্ত মহাপুরুষ ইংরাজী বর্ণমালার তৃতীয় স্বরবর্ণ ভিন্ন আর কেহই নহে।

তিনি দারপরিগ্রহ করিয়া নিজ সংসারে দুইটী নিয়ম জারী করেন। শক্তি সাধনা ভিন্ন জীবের গত্যন্তর নাই, ইহা বুঝাইবার জন্য সংসারে পত্নীকে দেবীভাবে বরণ করেন। "স্ত্রীয়াসমস্তা সকলা জগৎসু" ইহা তিনি প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করেন। একে সহধর্ম্মিণী, তাহার উপর "উত্তম" অর্দ্ধাঙ্গী ; কাজেই তিনি কায়মনোবাক্যে "বদসি যদি কিঞ্চিদপি" সুরে, প্রেম এবং স্বার্থত্যাগের দৃষ্টান্ত সংস্থাপনে বদ্ধ পরিকর হইলেন। পত্নীও অল্প দিন মধ্যে মহাযোগিনী হইয়া উঠিলেন। এমন কি স্বামীর সহিত পূজার সময় দিব্য মহাপুরুষ ও দেবতা সন্দর্শন লাভ করিতে আরম্ভ করিলেন। কাজে কাজেই অতি অল্প সময়ের মধ্যে, সহধর্ম্মিণীর সাহায্যে, উষানাথ বাবু পূর্ব্বপত্নীর সন্তানসন্ততির

উপর বীতরাগ হইয়া পরম বৈরাগ্যধর্ম্ম পরায়ণ হইলেন।

স্বধর্ম্মপ্রীতি নিবন্ধন তাঁহার আর একটী নিয়ম ছিল। তিনি ভোগের বিরোধী; কারণ ভোগেই লালসা, এবং লালসাতেই বন্ধন। পরিজনবর্গের ভোগ লালসা কমাইবার জন্য, তাহাদিগকে অল্প আহারে রাখা হইত। স্থূল শরীরের অনুস্পন্দন না কমাইলে সূক্ষ্ম শরীরের স্ফূর্ত্তি হয় না, ইহা তিনি ভাল বুঝিতেন। স্থূল স্পন্দন কমাইতে গেলে স্বল্পাহার প্রভৃতি অভ্যাস আবশ্যক। স্থূলস্পন্দন দমন করিতে অভ্যাস আবশ্যক; সেজন্য বলপ্রয়োগ করিয়া ক্ষুধা প্রভৃতি বৃত্তি সকল দমন করিতে হয়। তিনি যোগশাস্ত্র পাঠে উক্ত প্রকারের জ্ঞান লাভ করেন।

এই উভয়বিধ শাসনের মধ্যে পড়িয়া কাত্যায়ণীর ক্ষুদ্র জীবনতরু অল্পে অল্পে রসশূন্য হইতে লাগিল। অবশেষে চতুর্দ্দশ বৎসর বয়ঃক্রমে একটী সন্তান প্রসব করিয়া দেহ একেবারে ভাঙ্গিয়া গেল। বহুকষ্টে পিত্রালয়ে গিয়া একটু সুস্থ হইলেন; কিন্তু রোগ সম্পূর্ণ উপশম হইবার পূর্ব্বেই তাহাকে শ্বশুর বাড়ী যাইতে হইল। প্রথমতঃ যোগীর সংসারে বসন্তকুমারের বড় কষ্ট। যোগের তীব্র কঠোরতা তাহার ধাতে সহিত না। সেজন্য, স্বামীর সেবার জন্য কাত্যায়ণী কাতর হইয়া উঠিল। তাহার উপর শ্বশুর মহাশয়ের হঠাৎ মনে পড়িল যে, পুত্রবধূ কাছে না থাকিলে তাঁহার সংসারধর্ম্ম রক্ষা হয় না। একে তাহার নিজের সেবা; তাহাতে আবার ধর্ম্মপ্রাণা প্রিয়তমা কতকগুলি শিশু সন্তান লইয়া ব্যতিব্যস্ত। সুতরাং বিনা সাহায্যে সংসার চলিতে পারে না। তাহার উপর আজকাল চাকর চাকরাণী প্রভৃতির জাতির ঠিক নাই এবং তাহাদিগকে বিশ্বাস করা যাইতে পারে না। বিশেষতঃ বাঙ্গালীর ঘরে স্ত্রীলোকের জীবন, কেবল সেবার জন্য। স্ত্রী, শূদ্রের ধর্ম্মই সেবা।

শ্বশুর বাড়ী যাইয়া ধর্ম্মের তেজে কাত্যায়ণীর ভগ্নপ্রায় শরীর একবারে ভাঙ্গিয়া গেল। জ্বর দেখা দিল। কিন্তু উষানাথ বাবু ঔষধ ও ডাক্তারে বিশ্বাস করিতেন না। প্রথমতঃ ভোগের দ্বারা কর্ম্ম ক্ষয় করা চাই; অন্য উপায় নাই। দ্বিতীয়তঃ প্রারব্ধ লইয়াই ভোগ। সুতরাং ডাক্তারে কি করিবে? তবে যে শুক্লপক্ষের সন্তানদের জন্য ডাক্তার আনয়ন, সে কেবল ধর্ম্মপ্রাণা পত্নীর মানসিক শান্তির জন্য। মানস ব্যাপারে পুরুষকারের স্থান আছে।

চিকিৎসা ও সেবার অভাবে কত্যায়ণীর জ্বর কাশরোগে পরিণত হইল। সেবা করে কে? বসন্তকুমার ছেলেমানুষ; সে যথাসাধ্য সেবা করিতে লাগিল। কাত্যায়ণীর পিতা মাতা অনেক দূরে। তাঁহারা ব্রজেন্দ্রকে পাঠাইলেন; কিন্তু গৃহকর্ত্তার অমতে চিকিৎসা করাইতে পারিলেন না। কন্যাকে আনিতে চাহিলেন, তাহাতেও অমত। কিন্তু কাশরোগ সাব্যস্ত হইবামাত্রই, উষানাথ বাবুর মত বদলাইয়া গেল, এবং বধূকে পাঠাইতে সম্মত হইলেন। "আহা! মার ছেলে মার কাছে যাক্, কিন্তু তুমি সেখানে গিয়া কি করিবে" এই বলিয়া পুত্রকে বুঝাইতে লাগিলেন। বসন্তকুমার সেকথা না শুনিয়া কাত্যায়ণীকে অতিকষ্টে হুগলীতে লইয়া আসিলেন।

কাত্যায়ণীকে হুগলী আনয়নের পর রোগের চিকিৎসা আরম্ভ হইল; কিন্তু কিছুতেই রোগ উপশম হইল না। দিন দিন রোগ বৃদ্ধি হইতেছে দেখিয়া ব্রজেন্দ্র প্রিয় ভ্রাতৃষ্পুত্রীকে নিজে দীক্ষা দিতে সংকল্প করিলেন। তিনি দিন রাত্রি কাত্যায়ণীকে ভগবানে নির্ভরতা ও আত্মনিবেদন শিখাইতে লাগিলেন, এবং এইরূপে চিত্তক্ষেত্র কথঞ্চিৎ নির্ম্মল হইলে নিজে দীক্ষা দিলেন। কাত্যায়ণীও প্রাণ মন সমর্পণ করিয়া ৺জগন্মাতার শরণ গ্রহণ করিলেন। ব্রজেন্দ্র জানিতেন যে রোগ অসাধ্য, কিন্তু একেবারে আশা ভঙ্গ করিলে আধ্যাত্মিক অবসাদ আসিতে পারে। এই বলিয়া জীবনের জন্য প্রার্থনা করিতে কাত্যায়ণীকে শিখাইয়া দেন। এই প্রকার শিখাইবার পরদিনই পূর্ব্ববর্ণিতভাবে কাত্যায়ণীর ৺দেবী সন্দর্শন ঘটে।

* * * *

দেবতা মুখ বিনির্গত মৃত্যুবারতা শুনিয়া কাত্যায়ণী অধীর হইয়া উঠিলে, ব্রজেন্দ্র ও উমাশশী বিষম সংকটে পড়িলেন। নিরাশা স্রোতে চিত্তের অবসাদ, এবং অবসন্নচিত্তে ধ্যান প্রভৃতি অসম্ভব। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া ব্রজেন্দ্র পরজীবনের সত্যতা এবং পরজীবন যে ইহ জীবন হইতে মহত্তর, ইহা প্রমাণ করিয়া রোগীর বিশ্বাস স্থির করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। গীতা হইতে দেহ ও দেহীর প্রভেদ কাত্যায়ণীকে বুঝাইয়া দিয়া, তাহাকে বলিলেন "এবার মার সঙ্গে দেখা হইলে তোমাকে সূক্ষ্ম শরীরে লইয়া যাইবার জন্য প্রার্থনা করিও। মার কৃপা হইলে তুমি বিছানায় শুইয়া অনায়াসে সমস্ত তীর্থ

ভ্রমণ করিতে পার।” ব্রজেন্দ্র মনে মনে ভাবিলেন যে, যখন সেই সর্ব্বনাশী দেহ-পাত না করিয়া ক্ষান্ত হইবে না, তখন তাঁহার অনুকম্পায় যদি আত্মজ্ঞান ফুটিয়া উঠে, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা মঙ্গল।

একজন্মে শরীর বিসর্জ্জন দিয়া যদি এ অমূল্য ধন লাভ হয়, তাহা অপেক্ষা অধিক সুখের বিষয় কি হইতে পারে। অশীতিলক্ষ যোনি ভ্রমণ করিয়া যে দেহাত্মজ্ঞান ক্ষয় হয় না, বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়, একবার দেহ বিসর্জ্জন দিলে যদি তাহা দূর হয়, তদপেক্ষা মানবের কি পরমার্থ আছে।

কার্য্যেও তাহাই ঘটিল। করুণাময়ী বিশ্বরূপিণী অল্পে অল্পে কাত্যায়ণীর অজ্ঞান তিমির দূর করিতে লাগিলেন। আজ ৺কাশীধাম, কল্য ৺শ্রীবৃন্দাবন এইরূপে সূক্ষ্মশরীরে রোগীকে ভিন্ন ভিন্ন তীর্থস্থানে লইয়া যাওয়া চলিতে লাগিল। পাছে সন্দেহ কীট বিশ্বাসকে নষ্ট করে এই আশঙ্কায়, এবং স্থূল মস্তিষ্ক সূক্ষ্মভাব গ্রহণে যাহাতে সমর্থ হয়, এই ভাবিয়া ব্রজেন্দ্র Leadbeater কৃত Man, Visible and Invisible গ্রন্থ হইতে মানবের সূক্ষ্ম শরীরের চিত্রগুলি রোগীকে দেখাইতে লাগিলেন; এবং বিভিন্ন তীর্থস্থানের Photo আনাইয়া দিলেন। প্রতিক্ষণই এই প্রকার আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক ভাবের ঘটনা সঙ্ঘটিত হইতে লাগিল। রোগী যাহা ইচ্ছা করে তাহাই ঘটিয়া যায়। এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া সকলেই বিস্ময়ান্বিত হইল; সকলেই রোগীর আসন্ন মৃত্যু ভুলিয়া মহামায়ার দয়া ভাবিতে ভাবিতে তদ্গত হইল। সমস্ত বাটী ব্যাপিয়া এক অপরূপ শান্তি বিরাজিত হইল।

দুই চারিদিন পরে কাকাকে ডাকিয়া কাত্যায়ণী বলিল,ঃ—

“কাকা আমাদের কি ভ্রম, সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র ও বদ্ধভাবাপন্ন শরীরকে আমি জ্ঞান করিয়া কি মোহজালে পড়িয়া রহিয়াছি। জেলের কয়েদী ও আমাদিগের অপেক্ষা জ্ঞানী; কিন্তু আমরা এই ক্ষুদ্র কারাগার হইতে বৃহত্তর ও মহত্তর জীবনের প্রবেশের দ্বারকে মৃত্যু বলিয়া জানিয়া ভীত হই। আমরা জানিনা যে সেই প্রকৃত জীবনের সহস্রতমঅংশও স্থূল দেহের ভিতর দিয়া প্রকাশিত হয় না। করুণাময়ীর করুণার প্রকাশরূপ সংহরণকে আমরা সংহার বলিয়া ভয় করি। মহাযোগিণীর যে যোগশক্তিবলে দেহগত বদ্ধ চৈতন্য দেহাতীত মহৎ চৈতন্যে লয় হয়, তাহাকেই আমরা মৃত্যু বলিয়া

ভয় করি। আর আমি ঔষধ খাইব না, 'মা'র যা ইচ্ছা তাই "হউক।"

এইরূপে বিশ্বাসবলে বলবতী হইয়া কাত্যায়নী ভগবৎ আরাধনে সময় অতিবাহিত করিতে লাগিল। আশ্চর্য্য এই যে, যখন রোগের যন্ত্রণা অতিশয় বৃদ্ধি হইত, তখন রোগীর নিকট ভগবানের মহিমাব্যঞ্জক গীত বা স্তোত্র পাঠ করিলে, সমস্ত কষ্ট দূর হইয়া যাইত।

তারপর অল্পে অল্পে রোগী বুঝিতে পারিল যে, তুমি আমি কেহই নহে। সর্ব্বভূতে এক সচ্চিদানন্দ পদার্থ বিদ্যমান, ও তাহারই সত্ত্বা অধিষ্ঠানে নাম রূপের খেলা চলিতেছে। তখন স্বামীকে ডাকিয়া কাত্যায়নী বলিল :— "আমার দেহপাতে তোমার দুঃখিত হইবার কোন কারণ নাই। দেহাত্মজ্ঞান হইতে উৎপন্ন ক্ষুদ্র মায়িক অহঙ্কারকে আমি বলিয়া ভাবিলে ফলে দুঃখ ও মোহের উৎপত্তি হয়। কিন্তু ভাবিয়া দেখ আমার "আমি" কে। দেহ মন প্রভৃতি সকলেই পরিবর্ত্তনশীল, সুতরাং তদ্দ্বারা আমাদের নিত্যপ্রত্যক্ষ স্থির অবিনাশী "আমি জ্ঞানের" উৎপত্তি সম্ভবে না। কায়মনোবাক্যে ও প্রতিক্ষণে মৃত্যু সম্মুখে আছে এই ভাবিয়া ভগবানের শরণ গ্রহণ করিলে, এবং মন হইতে সর্ব্বপ্রকার স্বার্থ দূর করিয়া, সর্ব্ব প্রাণীতে ভগবানের প্রকাশ রহিয়াছে তাহা জানিলে, আমাদের প্রকৃত "আমি" কে তাহা জানিতে পারিবে। * * *

"আমরা সকলেই সেই "আমিতে" রহিয়াছি ; কিন্তু ক্ষুদ্র অহঙ্কারে মগ্ন হইয়া প্রকৃত "আমিকে" হারাইয়া ফেলি। সেই জন্যই পিতা, মাতা, পুত্র, কন্যা, স্বামী, স্ত্রী ইত্যাদি বিভিন্ন পদার্থে সেই প্রকৃত "আমি" পদার্থের ছায়া অস্পষ্ট ভাবে দেখিতে পাইয়া, উক্ত পদার্থগুলিকে আপন বলিয়া বুকে ধরিতে চেষ্টা করি। কিন্তু আমাদের চিত্ত নাম ও রূপ সাগরে মগ্ন বলিয়া, সেই সৎপদার্থের মায়িক ভাব মাত্র গ্রহণ করিতে পারে। সেই জন্যই লৌকিক ভালবাসায় তৃপ্তি নাই। সে প্রাণের তৃষ্ণা নামরূপ রসে নিবৃত্তি হয় না। এই তৃষ্ণাই প্রকৃত "আমির" শক্তি। কিছুতেই এই তৃষ্ণা মিটে না বলিয়াই মানব ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হইয়া সর্ব্বশেষে ভগবানের শ্রীচরণ আশ্রয় গ্রহণ করে।"

বসন্ত কুমার বুঝিতে পারিল এবং নীরবে প্রকৃত হইতে চেষ্টা করিল।

* * * *

ক্রমে কাল পূর্ণ হইয়া আসিল। কিন্তু রোগী বরাবর নির্ভীকচিত্ত। মৃত্যুর

একদিন পূর্ব্বে সে পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি লাভ করিল। সেই দিনই ৺জগৎ-জননীর দর্শন লাভ করিয়া মৃত্যুকাল সন্নিকট জানিয়া মাতাকে গৈরিক বসন পরাইতে বলিল। পরে মহামায়াকে স্মরণ করিয়া বলিল "মা আমার ঘুম ঘোর ভাঙ্গিয়াছে, আর খেলিতে যাইব না; এখন শ্রীচরণে স্থান দাও।"

দুই তিন ঘণ্টার মধ্যে প্রফুল্ল বদনে কত্যায়ণী ইহজীবন ত্যাগ করিল। ৺মহামায়া তাপিত সন্তানের মোহনাশ করিয়া তাহাকে কোলে তুলিয়া লইলেন। কাত্যায়ণীর চিত্ত চিরদিনের জন্য রূপরাগ অতিক্রম করিয়া ভগবানের অব্যক্ত-ভাব গ্রহণ করিতে শিখিল। দেহজ মোহকলিল তাহাকে আর অভিভূত করিতে পারিবে না। দীনতারিণী এইরূপে দয়া প্রকাশ করিয়া ভক্তকে পরিষ্কৃত করিয়া লন। সেই ধন্য যাঁর উপর জগন্মাতার এরূপ দয়া হয়, যিনি ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম ত্যাগ করিয়া, সর্ব্বদা অব্যক্ত অথচ একমাত্র সৎ অক্ষর পদার্থে চিত্ত সমাহিত করিতে সক্ষম। কাত্যায়ণী! মা তুমিই ধন্য!!!

* * * *

দেখিয়া শুনিয়া পরিজনের মধ্যে কেহ কেহ বুঝিতে পারিল। কেহ বা বুঝিয়াও ভুলিয়া গেল। অন্য কেহ ঘটনা গুলিকে রোগীর প্রলাপ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিল।

বীরেন্দ্র বাবু দেখিয়া শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া আজ কাল শাস্ত্রালোচনা করিতেছেন। ব্রজেন্দ্র ও উমাশশী যথা পূর্ব্ব ধর্ম্মাচরণ করিতেছেন। উমানাথ বাবু পুনর্ব্বার পুত্রের বিবাহ দিয়া কিছু লাভ করিতে ইচ্ছুক। কিন্তু বসন্ত কুমার এখন ভুলিতে পারিতেছে না। ধর্ম্মজীবনের সত্যতা তাঁহার সম্মুখে জ্বলন্ত ভাবে বিরাজিত। আশা করা যায় যে আনন্দময়ী আনন্দকণা দানে, তাহার তাপিত হৃদয় শীতল করিয়া, তাহাকে নিজ পথে টানিয়া লইলেন।

শ্রীশরৎচন্দ্র ঘোষ।

আমি ও আমার দেহ।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

অন্নময় কোষ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

ইহলোকের নামই ভূর্লোক। প্রচলিত প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে ইহারই বিষয় আলোচিত হইয়া থাকে। অপর সকল জগৎ অপেক্ষা এই জগৎ স্থূল। কিন্তু ইহার সকল উপাদানগুলি সমান স্থূল নহে। স্থূলত্ব বা সূক্ষ্মত্ব অনুসারে এই উপাদানগুলিকে সাত ভাগে ভাগ করা যায়। স্থূলতম হইতে সূক্ষ্মতম পর্য্যন্ত তাহাদের যথাক্রমে নাম,—ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, অনুপাদক*, আদি †। †† এই সাত প্রকারের উপাদানের মধ্যে প্রথম তিন প্রকার, অর্থাৎ ক্ষিতি, অপ, ও তেজঃ লইয়া যে দেহ গঠিত হইয়াছে তাহাকেই আমরা সাধারণতঃ দেহ বলিয়া চিনি ও জানি। শাস্ত্রকারেরা ইহারই নাম দিয়াছেন অন্নময় কোষ। †††

ক্ষিতি, অপ, প্রভৃতি শব্দের অর্থ একটু পরিষ্কার করিয়া রাখা আবশ্যক। অনেকে ক্ষিতি অর্থে মাটি, অপ অর্থে জল, তেজঃ অর্থে অগ্নি বলেন। কিন্তু এ সকল অর্থ ঠিক শাস্ত্রসম্মত নহে। উপনিষৎ স্পষ্টই বলিয়াছেন, যাহা কিছু কঠিন তাহাই ক্ষিতি, যাহা কিছু দ্রব তাহাই অপ, যাহা কিছু উষ্ণ তাহাই তেজঃ। * সুতরাং জড়ের কঠিন অবস্থার নাম ক্ষিতি, তরল অবস্থার নাম অপ, এবং বাষ্পীয় অবস্থার নাম তেজঃ; কারণ জড়ের উষ্ণ অবস্থাই বাষ্পীয় অবস্থা। † বরফ যতক্ষণ বরফ থাকে ততক্ষণ তাহা ক্ষিতি, তাহার পর যখন গলিয়া জল হয় তখন তাহা অপ। আবার জল উষ্ণ হইয়া বাষ্পে পরিণত

---

* সাংখ্যমতে অহঙ্কার। † সাংখ্যমতে মহৎ তত্ত্ব।

†† আমরা ভূর্লোককেই ক্ষিতিতত্ত্বমূলক বলিয়া এতদিন জানিতাম। রা. মু

††† Dense Physical body.

* "তত্র যৎ কঠিনং সা ক্ষিতিঃ যদ্ দ্রবং তদ্ আপঃ যদ্ উষ্ণং তৎ তেজঃ"—গর্ভোপনিষৎ।

† ইংরাজী বিজ্ঞানের ভাষায়,—ক্ষিতি=Solid matter, অপ=liquid matter, তেজঃ=Gaseons matter

হইলে তাহাকে তেজঃ বলা যায়। এক খণ্ড মাংসের কঠিন অংশের নাম ক্ষিতি, জলীয় অংশের নাম অপ, এবং বাষ্পীয় অংশের নাম তেজঃ। এইরূপ ক্ষিত্যপ্‌তেজোময় মাংস, অস্থি, রক্ত, মজ্জা প্রভৃতি লইয়া আমাদের এই অন্নময় কোষ রচিত হইয়াছে।

বস্ত্র যেমন সূত্রের সমষ্টি, অট্টালিকা যেমন ইষ্টকের সমষ্টি, মালা যেমন পুষ্পের সমষ্টি, জাতি যেমন ব্যক্তির সমষ্টি, অন্নময় কোষ সেইরূপ কোষাণুর সমষ্টি। অন্নময় কোষের চর্ম্ম মাংস, স্নায়ু, শিরা, ধমনী, অস্থি, মজ্জা প্রভৃতি যে কোন অংশ অণুবীক্ষণ সাহায্যে পরীক্ষা করা যায়, সেই অংশই বহুসংখ্যক কোষাণু সহযোগে গঠিত হইয়াছে দেখা যায়। এইরূপ কোটি কোটি বিভিন্ন প্রকারের ও বিভিন্ন আকারের কোষাণু একত্রে গ্রথিত হইয়া আমাদের অন্নময় কোষ নির্ম্মাণ করিয়াছে। কোষাণুগুলি এত ক্ষুদ্র যে অণুবীক্ষণের সাহায্য ব্যতিরেকে সেগুলি স্বতন্ত্রভাবে দৃষ্টিগোচর করা অসম্ভব। অথচ প্রত্যেক কোষানুই একটী স্বতন্ত্র জীব। অপরিষ্কার নালার জল তুলিয়া তাহা অণুবীক্ষণ দ্বারা পরীক্ষা করিলে "এমিবা" নামে এক প্রকার অতি ক্ষুদ্র জীব দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের মুখ, চোখ, নাক, হাত পা প্রভৃতি কিছুই নাই। একটু মাত্র কোষাণু ইহাদের সর্ব্বস্ব; অথচ ইহারা প্রত্যেকে স্বচ্ছন্দে স্বাধীনভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ করে ঃ—আহার, বংশ বৃদ্ধি প্রভৃতি কোন বিষয়েই ত্রুটি লক্ষিত হয় না। অন্নময় কোষের প্রত্যেক কোষাণু এইরূপ এক একটী স্বতন্ত্র স্বাধীন জীব; কিন্তু তাহারা সকলে একত্রিত হইয়া পরস্পরের সাহায্যে সমষ্টিভাবে মানবদেহরূপ এক মহত্তর জীবের সৃষ্টি করিয়াছে ঃ—বিন্দু মিলিয়া সিন্ধু হইয়াছে। প্রত্যেক কোষানু আবার বহু সংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণুর সমষ্টি, এবং প্রত্যেক অণু ক্ষুদ্রতর পরমাণু সমূহের সহযোগে উৎপন্ন। পরমাণু গুলির জীবনসমষ্টিই অণুর জীবন; অণুগুলির জীবন একত্র করিয়াই কোষাণুর জীবন।

কার্য্যের সহিত ক্ষয়ের নিত্য সম্বন্ধ। কয়লা পুড়িয়া ছাই হয়, তবে কল চলে, রন্ধনাদি কার্য্য নিষ্পন্ন হয়। যে কোন দ্রব্য ব্যবহার করা যায়, তাহাই ক্রমশঃ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। আমাদের এই দেহস্থিত কোষাণুগুলি কার্য্য করিতেছে—আমাদের দেহযন্ত্রকে চালাইতেছে; সুতরাং তাহারা নিত্য ক্ষয়

প্রাপ্ত হইতেছে। এইরূপে প্রত্যহ অসংখ্য কোষাণু বিনষ্ট হইয়া শরীর হইতে ঝরিয়া পড়িতেছে। এঞ্জিনের কয়লা পুরিয়া গেলে যেমন নূতন কয়লা দিয়া তাহাদের স্থান পূরণ করিয়া দিতে হয় তবে এঞ্জিন চলে, আমরাও সেইরূপ আহারাদি করিয়া নূতন কোষাণু সৃষ্টির উপায় করিয়া দিলে তবে আমাদের এই দেহ রক্ষা হয়। এইরূপে বহির্জগতের সহিত অমোদের শরীরের নিয়ত আদান প্রদান চলিতেছে;—ভিতরের অণু বাহিরে যাইতেছে, বাহিরের অণু আসিয়া তাহাদের স্থান অধিকার করিতেছে। এইরূপে প্রতি মুহূর্ত্তে কত অণু দেহের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে, কত অণু দেহ হইতে বাহির হইয়া যাইতেছে তাহার ইয়ত্তা করা সহজ নয়। আবার সকল অণু গুলিরই গুণ এক নহে;—কোনটা দেহের পক্ষে হিতকর, কোনটা বিলক্ষণ অনিষ্টকর, কোনটা ইহাকে উন্নতির পথে লইয়া যাইতেছে, কোনটা অবনতির দিকে টানিতেছে। সুতরাং এই অণুর গমনাগমনের সহিত আমাদের অন্নময় কোষের ভাবি মঙ্গলামঙ্গলের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে।

সংস্কৃত দেহ সিদ্ধিলাভের উপায়, অসংস্কৃত দেহ তাহার অন্তরায়। মরিচা ধরা অব্যবহার্য্য যন্ত্রের ন্যায় অসংস্কৃত দেহ কোন কাজেই আসে না, কেবল জঞ্জাল স্বরূপ হইয়া আমার অগ্রগমনে বাধা দেয়। সুতরাং দেহের সংস্কার অগ্রে প্রয়োজন।

অন্নময় কোষের সংস্কার করিতে হইলে—ইহাকে পরিষ্কৃত করিয়া সাধনোপযোগী যন্ত্রে পরিণত করিতে হইলে—ইহার উপাদানের দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে; কারণ যে যন্ত্রের উপাদান অপকৃষ্ট, সে যন্ত্রের দ্বারা কখন উৎকৃষ্ট ফললাভের আশা করা যাইতে পারে না। যে অণুগুলি প্রতিনিয়ত অন্নময় কোষের মধ্যে প্রবেশলাভ করিয়া ইহার পোষণ ও বর্দ্ধন করিতেছে, এবং ইহাকে নূতন ভাবে গড়িয়া তুলিতেছে, সেগুলিই ইহার উপাদান। যেমন অন্নময় কোষ লইয়াই জন্মগ্রহণ করি না কেন, কিছুদিন পরে তাহার কণামাত্র অবশিষ্ট থাকে না, একে একে তাহার সমস্ত অণুগুলি ঝরিয়া যায়, এবং বাহিরের অণু আসিয়া তাহাদের স্থান অধিকার করে। পুরাতন যাইতেছে, নূতন আসিতেছে, এইরূপ ক্রমাগত হইতেছে। যে গুলি আসিতেছে সেইগুলি দ্বারা আমার বর্ত্তমান দেহ গঠিত হইতেছে, সুতরাং সেই

গুলির প্রতি দৃষ্টি রাখা বিশেষ প্রয়োজন। কিন্তু কয়জন এই দৃষ্টি রাখিয়া থাকেন ?

অধিকাংশ লোকই "যা পান তাই খান", কিন্তু ইহা সুবুদ্ধির লক্ষণ নহে। খাদ্যই অন্নময় কোষের প্রধান উপাদান। অন্নের দ্বারা এই দেহের আপাদ-মস্তক গঠিত বলিয়াই ইহার নাম অন্নময় কোষ। অন্ন শব্দের অর্থ শুদ্ধ ভাত নয়। অদ্ ধাতু হইতে অন্ন শব্দের উৎপত্তি। অদ্ শব্দের অর্থ ভক্ষণ করা, যাহা কিছু ভোজন করা যায় তাহারই নাম অন্ন। আমরা যা খাই তাহারই কিয়দংশ রক্ত মাংস ইত্যাদিতে পরিণত হইয়া আমাদের অন্নময় কোষের জীর্ণ অণুগুলির স্থান অধিকার করিয়া তাহাকে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিতেছে। যিনি বুদ্ধিমান তিনি কখন খারাপ মাল মশলা দিয়া নিজের গৃহ নির্ম্মাণ করেন না। সম্মুখে খড় কুটা, বালি, মাটি, রাবিস যাহা পাওয়া যায় তাহাই দিয়া যিনি স্বগৃহের ভগ্ন স্থান গুলি সংস্কার করেন, তাঁহাকে পরে ঠকিতে হয়। যিনি সুবিবেচক, তিনি কোন উপাদান ব্যবহার করিবার পূর্ব্বে সেটিকে বিশেষ ভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখেন, ও অনুপযুক্ত বা অনিষ্টকর বিবেচনা করিলে তৎক্ষণাৎ তাহা পরিত্যাগ করেন। অন্নময় কোষের সংস্কার সাধন করিতে হইলে আহার সম্বন্ধে এইরূপ সাবধানতার প্রয়োজন। যাহা শুদ্ধ ও পবিত্র কেবল তাহাই শরীরের মধ্যে প্রবেশ করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য ; যাহা অশুদ্ধ; যাহা অপবিত্র, যাহাতে শরীর ও মনের অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকে, এরূপ কোন খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করা উচিত নয়। এ বিষয়ে পূর্ব্বে সাবধান হইয়া না থাকিলেও নিরাশ হইবার প্রয়োজন নাই। আজ যে দেহ দেখিতেছি তাহার পরমায়ু বড় জোর সাত বৎসর। প্রতিদিন ইহা যেরূপ ভাবে ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে, তাহাতে সাত বৎসরের মধ্যে যে বর্ত্তমান অনুগুলি ঝরিয়া পড়িবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। পূর্ব্বে যত মন্দ উপাদান দিয়াই দেহ নির্ম্মাণ করিয়া থাকি না কেন, সাত বৎসর পরে তাহার কণা মাত্র অবশিষ্ট থাকিবে না ইহা নিশ্চয়। সুতরাং পূর্ব্বের অসাবধানতার ফল চিন্তা করিয়া বৃথা অনুশোচনায় কালক্ষেপণ করিবার আবশ্যক নাই। এখন হইতে সাবধান হইলেই চলিবে।

যে দিন দেহকে আত্মার কার্য্যোপযোগী যন্ত্রে পরিণত করিবার জন্য ইহার

সংস্কারে প্রবৃত্ত হওয়া যায়, সেই দিন যোগ সাধনের প্রথম সোপানে পদার্পণ করা হয়। যিনি এ সাধনায় প্রবৃত্ত না হইবেন তাঁহার পরাবিদ্যার সত্যানুসন্ধান করিতে যাওয়া বৃথা। অনেকে বলেন, "পরাতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা যাহা বলিয়া থাকেন তাহা সত্য কিনা তাহা কেমন করিয়া জানিব? বিনা প্রমাণে তাঁহাদিগের কথা বিশ্বাস করি কি করিয়া? এই যে তাঁহারা এতগুলি দেহের কথা বলেন তাহা কি সত্য? কৈ আমরা ত একটি বৈ দেহ দেখিতে পাইতেছি না।" কিন্তু অপর দেহ গুলিকে দেখিতে হইলে তদনুরূপ সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় চাই; এবং সেই ইন্দ্রিয় বিকাশিত করিতে হইলে উপযুক্ত সাধনা চাই। মনে করুন যাঁহার অণুবীক্ষণ নাই বা যিনি অণুবীক্ষণের ব্যবহার প্রণালী অবগত নন, তিনি বসন্ত বিসূচিকা প্রভৃতি রোগের বীজ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবাণু সকল কিরূপে প্রত্যক্ষ করিবেন আর কিরূপেই বা তাহাদের অস্তিত্ব তাঁহার নিকট প্রমাণিত হইবে? সূক্ষ্ম বিষয় পরীক্ষা করিতে চান, অগ্রে স্থূলদেহ আয়ত্তে আনুন, অগ্রে তাহার সংস্কার সাধন করুন। অসংস্কৃত, অশুদ্ধ দেহে এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা নাই। সংকীর্ণ কারাগারে বদ্ধ থাকিয়া বহির্জগতের সংবাদ কি করিয়া পাইবেন? কূপমণ্ডূককে কেহ সাগরের কথা বলিলে সে তাহা নিতান্ত অশ্রদ্ধেয় জ্ঞানে হাসিয়া উড়াইয়া দিবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি?

(ক্রমশঃ)

ভক্তজীবন।

(৫ম সংখ্যার ১৭১ পৃষ্ঠার পর হইতে)

(৪)

সেই মহাপুরুষদিগের উপর সম্পূর্ণরূপে আত্মনির্ভর করিয়া, আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কামনা ও অভিলাষগুলি তাঁহাদের মহতী ইচ্ছায় মিশাইতে পারিলে, তাঁহাদিগের মহৎজ্ঞানে আমাদিগের সামান্যজ্ঞান, এবং তাঁহাদিগের পূর্ণতায় আমাদিগের অপূর্ণতা ডুবাইয়া দিতে পারিলে, অন্তঃকরণে যে অপূর্ব্ব আনন্দ-

রসের অনুভূতি হয়, তাহা বর্ণনাতীত। আত্মার নিজের কোনওরূপ কামনা নাই। শিষ্য যদি আপনার সুখাভিলাষ পরিত্যাগ করিতে পারে, তাহা হইলে গুরুদেবগণ তাহার দ্বারা নানাবিধ পরহিতকর কার্য্য করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হন। কখনও কখনও শিষ্যের মনে হইতে পারে, সে বুঝি তাঁহাদিগের কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইল; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। যখনই কোন শুভকার্য্য সম্পাদনের প্রয়োজন হইবে, তখনই শিষ্য তাঁহাদিগের সান্নিধ্য অনুভব করিতে পারিবে। দিনের পর রাত্রি, পরিশ্রমের পর বিরাম, যেমন প্রকৃতির নিয়ম, এ ক্ষেত্রেও সেইরূপ। যদি কখন এইরূপ অন্ধকার আসে, এবং সেই অন্ধকার কর্ত্তৃক কেবল আমরাই আক্রান্ত হই তজ্জন্য আমাদের অত্যন্ত ক্লেশ বোধ হইলেও, আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, সে অন্ধকার সুধু মঙ্গলের জন্য—অমঙ্গলের জন্য নয়। সেই সমস্ত মহাপুরুষগণের সান্নিধ্য ও সত্তা অনুভব করা ব্যতীত মহত্তর সুখ বা আনন্দ নাই, ইহা সত্য বটে; কিন্তু মানবমণ্ডলীর উন্নতির জন্য যদি তাহাও পরিত্যাগ করিতে প্রয়োজন হয়, তবে সে সুখাকাঙ্ক্ষাও হাসিতে হাসিতে পরিত্যাগ করা উচিত; কারণ আমাদের এই ত্যাগস্বীকার দ্বারা কেবল তাঁহাদেরই উদ্দেশ্য সাধিত হইবে।

(৫)

যদি কষ্ট স্বীকার করিলে, যাতনা সহ্য করিতে পারিলে, আমরা প্রকৃত কার্য্যক্ষম হইতে পারি, তাহা হইলে সেই কষ্ট ও যাতনা নিশ্চয়ই আমাদিগের মঙ্গলজনক হইবে। তাহার অভ্যন্তরে ঈশ্বরের যে মহতী দয়া নিহিত রহিয়াছে, তাহা অনুভব করিতে চেষ্টা করা উচিত। যখন দেখিতেছ যে, অবিরাম ঘাত প্রতিঘাতের দ্বারাই জগৎ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে, তখন নিজ নিজ সুখশান্তির আকাঙ্ক্ষা করা কখনও উচিত নয়। দৈহিক ও মানসিক অবসাদে যখন সমস্তই অন্ধকারাচ্ছন্ন মনে হইবে, তখন বুঝিতে হইবে সে অন্ধকার মিথ্যা। বাহ্যিক মায়ার আবরণে আমাদিগকে ঢাকিয়া, যখন তাঁহারা আমাদিগের সহানুভূতি হইতে দূরে থাকেন, তখন বুঝিতে হইবে যে, তাহা কেবল উপযুক্ত সময়ে উজ্জ্বলতর আলোকে সহস্রধারায় আমাদিগের হৃদয়ে করুণামৃত বর্ষণের জন্য। যখন অবসাদ অন্ধকারে অন্তরে আচ্ছন্ন হয়, তখনকার যন্ত্রণা কথায় প্রকাশ করিবার নয়। তথাপি তাঁহারা

নিকটে আছেন, শিষ্য যেন এ বিশ্বাস অটল রাখে। যেন বিশ্বাস থাকে, যদিও তাঁহাদের করুণার আলোক মনশ্চক্ষের অন্তরালে পড়িয়াছে, তথাপি তাহা শিষ্যের অজ্ঞাতসারে অন্তরে অন্তরে প্রতিদিন বৰ্দ্ধিত হইতেছে। এইরূপই তাঁহাদিগের জ্ঞান ও কৃপাপূর্ণ বিধি। যখন পুনরায় আমাদিগের মানসিক অনুভূতি ফিরিয়া আসে, তখন আমরা আমাদিগের আধ্যাত্মিক উন্নতি দেখিয়া বিস্ময়সাগরে মগ্ন হই। আধ্যাত্মিক রাজ্যের নিয়মের দিকে লক্ষ্য করিলে, কাহারও এইরূপ অবস্থায় অবসন্ন বা হতাশ হওয়া উচিত নয়। এইরূপ অবস্থাকে আধ্যাত্মিক জীবনের রাত্রি বলা যাইতে পারে, এবং তাহার তিরোভাবই আধ্যাত্মিক জীবনের দিন। সাধারণ দিনমান ও রাত্রিকাল যেরূপ অলঙ্ঘনীয় প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন, ইহাও সেইরূপ। অতএব আমাদের বিশ্বাস থাকা উচিত যে, সময়ে এই অন্ধকার দূরীভূত হইবে। সর্ব্বদাই মনে রাখা উচিত যে, যে মহাপুরুষদিগের হস্তে এই পৃথিবীর ভার রহিয়াছে, যাঁহারা ক্রমাগতই ইহাকে উন্নতির পথে লইয়া যাইতেছেন, তাঁহাদিগের জ্ঞানালোকে এই আপাততঃ প্রতীয়মান অজ্ঞাতরূপ ধূমপুঞ্জ নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে। শত শত পরীক্ষায় পতিত হইবে, শত শত বাধাবিঘ্ন প্রাপ্ত হইবে, কিন্তু সর্ব্বত্রই তাহাদিগের উপর দৃঢ়বিশ্বাস রাখিয়া সেই সমস্ত বাধাবিঘ্ন পশ্চাতে ফেলিতে হইবে—সেই সমস্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইবে। আধ্যাত্মিক জীবনে রাত্রিকাল যখন দূরীভূত হইয়া যায়, তখন মনে হয় উহা ক্ষণস্থায়ী, এবং উহা হইতে কোনও প্রকৃত বিপদ নাই। কিন্তু এই ক্ষণিক অন্ধকার সহ্য করিবার ক্ষমতা না থাকাতে, অনেক সাধক বহুদূর অগ্রসর হইয়াও, পরিশেষে সেই উন্নত অবস্থা হইতে পতিত হইয়াছে।

(৬)

আধ্যাত্মিক জীবন এবং প্রেম ব্যয়িত হইলে ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না, অধিকন্তু বৰ্দ্ধিত হইয়া পূর্ণতা ও গভীরতা লাভ করিয়া থাকে। জীবনে যত সন্তুষ্ট ও সুখী থাকিতে পার, চেষ্টা করিবে। কারণ আনন্দই আধ্যাত্মিক জীবনের প্রধান উপাদান। দিব্যদৃষ্টি বা প্রকৃত জ্ঞানের অভাব বশতঃ সমস্ত ঘটনার কার্য্যকারণ সম্বন্ধ স্থির করিতে পারি না বলিয়াই, অনেক সময়ে আমরা দুঃখ অনুভব করিয়া থাকি। সুতরাং যথাশক্তি মনকে বিষাদের আক্রমণ হইতে

রক্ষা করা কর্ত্তব্য। বিষণ্ণতা আধ্যাত্মিক উন্নতির অন্তরায়। যদিও দুঃখানুভূতি একেবারে দূর করিতে পারা যায় না, তথাপি তাহাতে একেবারে আত্মহারা হইয়া যাওয়া উচিত নহে। (ক্রমশঃ)

শ্রীমনিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিজ্ঞান, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য।

পূর্ব্ব সংখ্যায় আমরা Colonel de. Rochas কৃত জন্মান্তরীণ স্মৃতির পুনরুদ্ধারের ব্যাপার উল্লেখ করিয়াছি। এবারে সেই বিষয়ের আরও দুই একটি কথা বলিব। তিনি তাঁহার প্রবন্ধের প্রারম্ভেই মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে সমস্ত জীবনের স্মৃতি যে পুনরায় জাগিয়া উঠে, ইহা স্বীকার করিয়াছেন। এই স্মৃতি আমাদের সমস্ত কর্ম্মের গুপ্তলিপি। ইহাকে হিন্দুরা চিত্রগুপ্তের খাতা বলিয়া বর্ণনা করেন। এবং এই স্মৃতির সাহায্যে মৃত্যুর পূর্ব্বে প্রত্যেক জীব স্বীয় কর্ম্ম পর্য্যালোচনা করিয়া সজ্ঞানে ও স্বাধীনভাবে পরজন্মের অদৃষ্ট স্থির করিয়া লয়। এই স্মৃতি কার্য্য শৃঙ্খলাবদ্ধ।

*   *   *

আমাদের বিশিষ্ট কার্য্য, চিন্তা বা ভাব বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে তাহার পশ্চাতে কতকগুলি কারণ দৃষ্ট হয়। ঐ কারণ গুলির মধ্যে কতকগুলি নৈমিত্তিক, আর কতকগুলি স্বভাবজ। নৈমিত্তিক কারণগুলিকে বিশ্লেষণ করিলে, আমাদের কর্ম্মের যে অংশ দ্বারা আমরা অন্যান্য জীবের সহিত সংবদ্ধ, তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। স্বভাবজ কারণ গুলিকে বিশ্লেষণ করিলে, আমাদের কর্ম্মের মধ্যে যে বিভিন্ন ও সংস্কাররূপ বীজ আছে, তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। মনে করুন, আমি অন্য ব্যক্তির সহিত কলহ করিলাম। আমার স্বভাবে যদি ক্রোধবৃত্তি না থাকিত, তাহা হইলে বিবাদটী ঘটিত না। আবার এই ক্রোধভাবটীরও দুইটী কারণ আছে। পূর্ব্বে, ইহজন্মে বা পরজন্মে, বহুবার ক্রোধের বিকাশ না হইলে, আমার স্বভাবে এই ক্রোধপ্রবণতা বীজরূপে থাকিত না। যোগদ্বারা সুতীক্ষ্ণ ও পরিমার্জ্জিত বুদ্ধির সাহায্যে, এই ক্রোধপ্রবণতা বীজটী বিশ্লেষণ করিতে পারিলে, তাহার ভিতর সূক্ষ্ম সংস্কাররূপে অবস্থিত, পূর্ব্বকৃত ক্রোধের বিকাশগুলিও দেখিতে পাইব। এবং সেই সঙ্গে সেই বিলুপ্ত ঘটনাগুলিও চিত্তক্ষেত্রে পুনরুদ্রিক্ত হইবে। তবে এরূপ করিতে গেলে, দেহজ অস্মিতা ও অভিমান ত্যাগ করিয়া সূক্ষ্মভাবে স্থিত "আমিকে" জানিতে পারা চাই। ক্রোধপ্রবণতার আর একটি সূক্ষ্মতর কারণ আছে। ইহা সূক্ষ্মতরভাবে আমাদের স্বভাবের ভিতর লুক্কায়িত থাকে। উহার নাম ফলাকাঙ্খা। এই ফলাকাঙ্খার মূলে আরও প্রচ্ছন্নভাবে অন্যান্য সূক্ষ্মতম সংস্কার লুক্কায়িত আছে। ইহা হইতে বুঝা গেল যে,

প্রত্যেক স্থূল ঘটনা বিশ্লেষণ করিলে, তাহা হইতে ইহ জীবনের সংস্কারগুলি বুঝিতে পারা যায়, এবং ঐ সংস্কারগুলির ভিতরে পূর্ব্বজন্মকৃত ঘটনাবলী সূক্ষ্মভাবে নিহিত আছে। এবং তাহারও পশ্চাতে পূর্ব্বজন্মের স্বভাব প্রচ্ছন্নভাবে লুকায়িত আছে।

* * * *

এই সূক্ষ্মভাবেস্থিত ঘটনাবলী পুনরাবিষ্কার করিতে গেলে সর্ব্বপ্রথমে মানবকে ইহ জন্মের অস্মিতা ও দেহাভিমান অতিক্রম করিতে হয়। তারপর ইহজীবনে সঞ্চিত ইন্দ্রিয়জ, মানস প্রভৃতি সংস্কারগুলিকে নিষ্ক্রিয় করিতে হয়। কিন্তু ইহা হইলেই হইবে না। দেহ, ইন্দ্রিয় ও মনের অতীত, আত্মজ্ঞান প্রবুদ্ধ হওয়া চাই। সেই জন্য জনসাধারণকে Mesmerise করিয়া সূক্ষ্ম স্মৃতির পুনরুদ্ধার করা যায় না। Colonel Rochas ও ঐ প্রণালী অবলম্বনে কার্য্য করেন। তিনি নির্ম্মলচিত্ত ও উন্নতমনা বালিকাকে অজ্ঞান করিয়া,অল্পে অল্পে তাহার দেহাভিমান দূর করিয়া, তাহার সুতীক্ষ বুদ্ধির সাহায্যে প্রসুপ্ত সংস্কার গুলিকে অল্পে অল্পে জাগাইয়া দেন। যদ্যপি আমরা ইন্দ্রিয় প্রভৃতিকে পরিষ্কৃত ও নির্ম্মল করিতে পারি, এবং যদ্যাপি স্থূলাতীত ভাবে স্থিত আমাদের "আমাকে" কথঞ্চিৎ ভাবেও জানিতে পারি, তাহা হইলে পরিষ্কৃত বুদ্ধির সাহায্যে আমরাও পূর্ব্বজন্মের স্মৃতির পুনরুদ্ধার করিতে পারিব। কিন্তু ইহা করিতে গেলে, আত্ম পদার্থে আস্থা থাকা চাই এবং ভগবদ্গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের যে স্থিতপ্রজ্ঞ অবস্থার কথা বলা আছে, তাহা লাভ করা চাই।

*

Colonel Rochas বালিকাকে অজ্ঞান করিয়া তাহার আত্ম জ্ঞানকে সূক্ষ্ম জগতে জাগ্রত করেন; এবং তাহার পর ধীরে ধীরে বালিকার ধীশক্তিকে বীজভাবেস্থিত সংস্কারগুলিকে বিশ্লেষণ করিতে নিয়োজিত করেন। এইরূপে ইহজীবনের ঘটনাবলী সমস্ত পুনরুদ্ধৃত করিয়া মৃত্যু পারে ধীশক্তিকে লইয়া যান। এরূপে লব্ধ মৃত্যুর বর্ণনাটী বড় সুন্দর। বালিকাটী বলে যে, "আমি আর নাই অথচ যেন কি রকম ভাবে আছি।"

দেহের সহিত সংশ্লিষ্ট আত্মজ্ঞান দেহ ত্যাগ করিলে, জীব আর আপনার নাম ও রূপ নির্দ্দেশ করিতে পারে না। কিন্তু যে একেবারে আমি নাই তাহাও, বলিতে পারা যায় না। "আমি আছি" এই জ্ঞান থাকে। কিন্তু আমি কে ও কিরূপ এই জ্ঞান থাকে না। আমাদের মনে হয় যে মৃত্যু অতিক্রম করিতে গেলে ধ্যানস্থ হইয়া "আমার" এই সূক্ষ্মভাব নিত্য অনুভব করা চাই। দেহরূপ মোহ কলিল অতিক্রম করিয়া যখন আমার "আমি" স্থিরভাবে থাকিতে পারিবে, তখনই পূর্ব্ব জন্মের ঘটনাগুলি স্পষ্টরূপে দেখিতে পাওয়া যাইবে। মৃত্যুঞ্জয় না হইলে, গুড়াকেশ না হইলে পুনর্জ্জন্ম প্রত্যক্ষরূপে দেখা যায় না। কিন্তু কয়জন সাধক "আমি কিছু নই", এই ভাবে সাধনা করিতে পারেন।

নবম ভাগ। { অগ্রহায়ণ। } ৮ম সংখ্যা।

ব্রহ্মাষ্টক।

ভুজঙ্গ প্রয়াস ছন্দ ॥
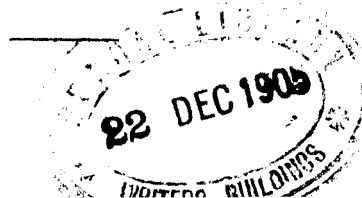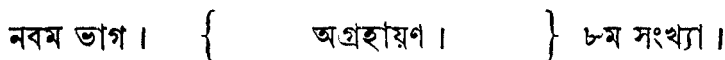
অখণ্ডং চিদানন্দ দেবাধিদেবং।
মুনীন্দ্রাদি রুদ্রাদি ইন্দ্রাদি সেবং ॥
মুনীন্দ্রাদি ইন্দ্রাদি চন্দ্রাদি মিত্রং।
নমস্তে নমস্তে। নমস্তে পবিত্রং ॥
ধরাত্বং জলাগ্নী! মরুত্বং নভসত্বং।
ঘটত্বং পটস্ত্বং। অনুত্বং মহত্বং ॥
মনস্ত্বং বচস্ত্বং। দৃশস্ত্বং শ্রুতসত্বং।
নমস্তে নমস্তে। নমস্তে সমস্তং ॥
অডোলং অতোলং। অমোলং অমানং।
অদেহং অছেহং। অনেহ নিদানং ॥
অজাপং অথাপং। অপাপং অতাপং।
নমস্তে নমস্তে। নমস্তে অমাপং ॥

ন গ্রামং ন ধামং। ন শীতং ন উষ্ণং।
ন রক্তং ন পীতং। ন শ্বেতং ন কৃষ্ণং॥
ন শেষং ন অশেষং। ন রেফং ন রূপং।
নমস্তে নমস্তে। নমস্তে অরূপং॥
ন ছায়া ন মায়া। ন দেশো ন কালো।
ন জাগ্রং ন স্বপ্নং। ন বৃদ্ধো ন বালো॥
ন হ্রস্বং ন দীর্ঘং। ন রসং অরসং।
নমস্তে নমস্তে। নমস্তে অগম্যং॥
ন বন্ধং ন মুক্তং। ন মৌনং ন বক্তং।
ন ধূম্রং ন তেজো। ন যামী ন নক্তং॥
ন যুক্তং অযুক্তং। ন রক্তং বিরক্তং।
নমস্তে নমস্তে। নমস্তে অশক্তং॥
ন রুষ্টং ন মুষ্টং। ন ইষ্টং অনিষ্টং।
ন জ্যেষ্ঠং কনিষ্টং। ন মিষ্টং অমিষ্টং॥
ন অগ্রং ন পৃষ্টং। ন তুলং ন গৃষ্টং।
নমস্তে নমস্তে। নমস্তে অধিষ্টং॥
ন বক্তং ন ঘ্রাণং। ন কর্ণং ন অক্ষং॥
ন হস্তং ন পাদং। ন সীশং ন লক্ষং।
কথং সুন্দরং সুন্দরং নাম ধেয়ং।
নমস্তে নমস্তে। নমস্তেঽপ্রমেয়ং॥

ইতি ব্রহ্মাষ্টক সমাপ্ত।

শ্রীবলাইচাঁদ মল্লিক।

মহিম্ন স্তব।

(পুর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

ক্রতৌ সুপ্তে জাগ্রত্ত্বমসি ফলযোগে ক্রতুমতাং,
কঃ কর্ম্ম প্রধ্বস্তং ফলতি পুরুষারাধনমৃতে।
অতস্ত্বাং সম্প্রেক্ষ্য ক্রতুষু ফলদানপ্রতিভুবং,
শ্রুতৌ শ্রদ্ধাং বাচা দৃঢ়পরিকরঃ কর্ম্মসু জনঃ ॥ ২০ ॥

[ত্বমেব কর্ম্মফলদাতা বিধাতা ইতি ত্বদারাধনাধীনান্যেব কর্ম্মণঃ ফলানি ইত্যুক্ত্বা স্তৌতি।]

ক্রতাবিতি। ক্রতুমতাং যজ্বনাং ফলপ্রেপ্সুনামিতিশেষঃ, ক্রতৌ যজ্ঞকর্ম্মণি সুপ্তে, কর্ম্মণঃ ক্ষণবৃত্তিত্বাৎ ধ্বস্তেসতীত্যর্থঃ ফলমনুৎপাদ্য যজ্ঞসমাপ্তৌ যজ্ঞকর্ম্মরূপকারণাভাবে যজ্বনঃ যজ্ঞফলরূপ স্বর্গানুৎপত্তেঃ ("চিরধ্বস্তংফলায়ালং ন কর্ম্মতিশয়ংবিনে" ত্যাচার্য্যৈরুক্তত্বাৎ) যজ্বনাং যজ্ঞফলা নবাপ্তি সম্ভাবনায়ামিতি ভাবঃ, ত্বং ফলযোগে যজ্বভিঃ সহ ক্রতুজনস্য যজ্বনামভীষ্টফলজনকস্য দৃষ্টস্য যোগসম্পাদনে ইত্যর্থঃ জাগ্রৎ অসি সাবধানোভবসি। অতএবহি যজ্ঞেশ্বরে ত্বয়ি কর্ম্মার্পণং তৎকর্ম্মপরিগ্রহার্থঞ্চ ত্বদারাধনমিতি শ্রুত্যাদিষনুশিষ্টমিতি তাৎপর্য্যার্থঃ। নচ ত্বদারাধনং বিনৈব কর্ম্মফলত্বিত্যাহ কেতি। পুরুষস্য চৈতন্যরূপস্য ব্রহ্মণস্তব আরাধনমৃতে অর্চ্চনং বিনা, প্রধ্বস্তং চিরবিনষ্টং কর্ম্ম ক কুত্র ফলতি ফলায় কল্পতে। তবার্চ্চনাং বিনা যজ্ঞকর্ম্ম কচিদপি ন ফলতি কিন্তু তবার্চ্চনায়ৈব ফলতীতি ভাবঃ। অতঃ কারণাৎ জনঃ ত্বাং ক্রতুষু যজ্ঞকর্ম্মসু ফলদানে প্রতিভুবং লগ্নকং সম্প্রেক্ষ্য জ্ঞাত্বা শ্রুতৌ শ্রুত্যুক্তবাক্যে ইত্যর্থঃ শ্রদ্ধাং .বদ্ধা বিশ্বাসংকৃত্বা কর্ম্মসু যাগাদিকার্য্যেষু দৃঢ়পরিকরঃ সাধ্যবসায়ঃ ভবতীতি শেষঃ। ২০।

[তুমিই কর্ম্মফলদাতা বিধাতা, অতএব কর্ম্মফল তোমারই অধীন, এই বলিয়াই স্তব করিতেছেন।]

কর্ম্ম ক্ষণধ্বংসি, পরন্তু কারণাভাবে কার্য্য হয় না ইহা শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। সুতরাং যজ্ঞকর্ত্তাদিগের যজ্ঞ সমাপ্তির পর যজ্ঞকর্ম্ম ধ্বংস হইলে যজ্ঞকর্ম্মরূপ কারণাভাবে যজ্ঞকর্ম্মের ফলরূপ কার্য্য হইতে পারে না। এই কারণেই

তুমি যজ্ঞাদিগের আত্মার সহিত, যজ্ঞজন্য ও যজ্ঞফলজনক চিরস্থায়ী অপূর্ব্ব অদৃষ্টের সংযোগ করিয়া থাক। অদৃষ্টের যোগ না হইলে কি কখনও কর্ম্ম-ফল ফলিত? অতএব তোমাকে যজ্ঞফল দানে প্রতিভূ জানিয়াই লোকে দৃঢ় বিশ্বাস সহকারে শ্রুত্যুক্ত যজ্ঞাদি কার্য্যে রত হইয়া তোমার আরাধনা করে। শ্রদ্ধাসহকৃত আরাধনা ব্যতীত সুফল কোথায়? ২০।

ক্রিয়া-দক্ষো দক্ষঃ ক্রতুপতিরধীশস্তনুভৃতা,
মৃষীণামার্ত্বিজ্যং শরণদ সদস্যাঃ সুরগণাঃ।
ক্রতুষু ভ্রংশস্ত্বত্তঃ ক্রতুফলবিধানব্যবসিনো
ধ্রুবং কর্ত্তুঃ শ্রদ্ধাবিধুরমভিচারায় হি মখাঃ॥ ২১॥

[শ্রদ্ধয়া পুরুষার্চ্চনাভাবেন ক্রিয়া বৈফল্যং দর্শয়তি।]

ক্রিয়েতি। হে শরণদ, আশ্রয়প্রদ, ক্রিয়াসু যজ্ঞাদিকার্য্যেষু দক্ষঃ নিপুণঃ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যবিধানকর্ত্তৃত্বাৎ কার্য্যজ্ঞঃ কার্য্যকুশলশ্চেত্যর্থঃ দক্ষঃ দক্ষনামা পুরুষঃ ব্রহ্মণো দক্ষাঙ্গুষ্ঠজাতত্বাৎ দক্ষ ইত্যুচ্যতে, দেহিনামাদিভূতত্বাৎ প্রজাসর্জ্জনাচ্চ যশ্চ প্রজাপতি শব্দেনোচ্যতে, স দক্ষ প্রজাপতিঃ স্বয়ং যত্র (যজ্ঞে) ক্রতুপতিঃ যজ্ঞানুষ্ঠাতা; ঋষীণাং স্বয়ং ভৃগ্বাদীনাং ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রণেতৄণাং যত্র আর্ত্বিজ্যম্ ঋত্বিক্ত্বম্, স্বয়ং ভৃগুপ্রভৃতয় ঋষয়ঃ যত্র ঋত্বিজ ইত্যর্থঃ। সুরগণা ইন্দ্রাদ্যা যজ্ঞাংশগ্রাহিনো দেবা যত্র সদস্যাঃ যজ্ঞাংশ বিভক্তারঃ। যজ্ঞাংশভাজামপ্রীতিনিবারণায় যজ্ঞাংশানামুচিতানামংন্যূনাতিরিক্ততা পরি-হারার্থং ক্রতুপতিনা বৃতা বিভাগ কার্য্যাদিষু ব্যবস্থাপকাঃ সদস্যাঃ। ততস্ত্বমপি যত্র ক্রতোঃ ফলবিধানে ব্যসনী ব্যগ্রঃ যজ্ঞফলদানোৎসুকঃ;

* কর্ম্ম ক্ষণধ্বংসি হইলেও কর্ত্তার আত্মাতে প্রত্যেক কর্ম্ম জন্য এক একটী অদৃষ্ট জন্মে। তাহা আত্মার সহিত চিরস্থায়ী; দেহ নাশ হইলেও তাহার নাশ হয় না। অতএব কর্ম্মধ্বংস হইলেও তাহার ফল আত্মানিহিত ঐ অদৃষ্ট হইতে হয়। যেমন পক্ক ফল নষ্ট হইলেও তাহার ক্ষিতিগত বীজ হইতে তদনুরূপ ফলের উৎপত্তি হয়; তেমনই কর্ম্ম নষ্ট হইলেও তাহার আত্মগত অদৃষ্ট হইতে আত্মার কর্ম্মানুরূপ ফলভোগ হয়। তাহা কোনক্রমেই অতিক্রম করা যায় না। ঈশ্বরের ইচ্ছায় প্রকৃতির নিয়মে আত্মার সহিত এই অদৃষ্টের যোগ হইয়া থাকে। ইহাই প্রাচীন আর্য্যগণের মত।

তাদৃশাদপি তত্বঃ পঞ্চম্যাস্তস্, যত উৎপন্নমিত্যপাদানেচ পঞ্চমী! ক্রতুভ্রংশ যজ্ঞনাশঃ জাত ইতি শেষঃ। যজ্ঞস্য ফলোৎপাদনে সর্ব্বসামগ্রী সম্পত্তাবপি কেবলং ত্বদ্ভক্ত্যা ভাবেনৈব দক্ষস্য যজ্ঞনাশ স্তেন চ তস্য মহদনিষ্টং জাতমিতি ভাবঃ। তদেবাহ ধ্রুবংনিশ্চিতং শ্রদ্ধাবিধুরং ভক্তিবিক্লবং যথাতথা কর্ত্তু-রনুষ্ঠাতুঃ মথা অভিচারায় মহানিষ্ঠায় ভবন্তীতি শেষঃ। ২১।

[নারায়ণার্চ্চনা ব্যতিরেকে ক্রিয়া ফলবতী না হওয়ার দৃষ্টান্ত দেখাইয়া স্তব করিতেছেন।]

হে সর্ব্বাশ্রয়, যজ্ঞদক্ষ দক্ষপ্রজাপতি স্বয়ং যে স্থলে যজ্ঞকর্ত্তা, ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণেতা যজ্ঞের বিধাতা স্বয়ং ভৃগু প্রভৃতি ঋষিগণ যে স্থলে ঋত্বিক, যজ্ঞ ভাগগ্রাহী ইন্দ্রাদি দেবগণ স্বয়ং যে স্থানে সদস্য, আর যজ্ঞেশ্বর স্বয়ং তুমি যেখানে ফলদানের নিমিত্ত উৎসুক, সেখানেও যে যজ্ঞ নষ্ট হইল, নিশ্চয়ই সে কেবল তোমাকে অর্চ্চনা না করার ফল। যজ্ঞেশ্বরে ভক্তিহীন যজ্ঞ কি কথন সফল হয়? তাহা কেবল অনিষ্টেরই উৎপাদন করে। ২১।

প্রজানাথং নাথ! প্রসভমভিকং স্বাং দুহিতরং,
গতং রোহিদ্ভূতাং রিরময়িষু মৃষ্যস্যবপুষাঃ।
ধনুষ্পাণের্যাতং দিবমপি সপত্রাকৃতমমুং,
ত্রসন্তং তেঽদ্যাপি ত্যজতি ন মৃগ-ব্যাধ-রভসঃ॥ ২২॥

রাজ্ঞামপি রাজা ঈশ্বরাণাঞ্চেশ্বর স্তমসৎক্রিয়াদণ্ডেন তাদৃশ কর্ম্মভ্যঃ প্রজানাং নিবৃত্তিরূপাং শিক্ষাং সুবিহিতকার্য্যে নিয়োজিতস্য দণ্ডিতস্য ক্রিয়য়াচ জগতাং মঙ্গলাগুবং বিদধাতীতি দর্শয়ন্ ভগবন্তং স্তৌতি।]

প্রজেতি। মৃগরূপং প্রজাপতিং সূর্য্যং বিধ্যতি ইতি মৃগব্যাধঃ মহাদেবঃ তৎসংবুদ্ধৌ। মৃগব্যাধায় দক্ষায় দক্ষযজ্ঞহরায়চেতি ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে পঞ্চবিংশা-ধ্যায়েঽনুষঙ্গপাদে মহাদেবস্য বৈদিক নাম্নাং মধ্যে মৃগব্যাধেতি নাম সূচনাৎ। হে নাথ হে প্রভো! রোহিদ্ভূতাং নক্ষত্রভূতাং হরিণীভূতামিতি চ ধ্বন্যতে। রোহিৎ পুমান্ বর্ণভেদে নক্ষত্রে চ দিবাকরে। স্ত্রিয়াং মৃগ্যাং লতাভেদে ইতি কোষঃ। স্বাং স্বকীয়াং দুহিতরং কন্যাং কন্যানাম্নীমুত্তরফাল্গুনাদি। তারাসংহতিরূপাং। সর্ব্বা এবতারকাঃ প্রজাপতেঃ কন্যা ইতি শ্রূয়তে। প্রসিদ্ধাং তাং অভিকং অভিগমনোন্মুখং। সর্ব্বাসু রাশিতারাসু সূর্য্যস্য

প্রজাপতের্গমনং জ্যোতিঃশাস্ত্র প্রসিদ্ধম্। তেন কন্যাগমনমাপি প্রসিদ্ধমেব; তাংপ্রতি কামুকঞ্চেতি ধ্বন্যতে। রিরময়িষুং সঙ্গমনেন রময়িতুমিচ্ছুং সঞ্জিগমিষুমিত্যর্থঃ। অতএব ঋক্ষস্য নক্ষত্রস্য বপুষা শরীরেণ নক্ষত্ররূপেণ সূর্য্যরূপেণেতি যাবৎ মৃগরূপেণেতি চ ধ্বন্যতে। ঋক্ষস্য বপুষেতি পাঠে স এবার্থঃ। দিবমাকাশংঅপি যাতং পশ্চাৎ প্রসভং বলাৎ বলমাশ্রিত্য ণ্যব্ লোপে পঞ্চমী। গতং সঙ্গতং অতএব ধনুঃ মূলাদিনক্ষত্রপুঞ্জরূপঃ ধনুরাশিঃ ধনুরাকারত্বাৎ স এব ধনুরিত্যুচ্যতে; তৎপাণৌ হস্তে যস্য তস্য তে তব স পত্রা কৃতং শরেণ লক্ষীকৃতং। সপত্রনিষ্পত্রাদিত্যাদিনা সপত্র শব্দাৎ পীড়ায়াং ডাচ্‌প্রত্যয়ঃ। আকাশে কন্যায়াঃ পশ্চাৎ অর্দ্ধনুদৃ´শ্যতে তৎপ্রজাপতি তাড়নার্থং ত্বয়ৈব ধৃতমিতি প্রৌঢ়োক্তিঃ। অবএব ত্রসন্তং ভীতং অমুং সর্ব্বে দৃশ্যমানং প্রজানাং ভূতানাং নাথং প্রজাপতিম্ সূর্য্যমিত্যর্থঃ কর্ম্মভূতং অদ্যাপি রভসো বেগঃ ত্বদ্ভয়াৎ পলায়ন জর ইত্যর্থঃ কর্ত্তৃভূতঃ। রভসো-বেগহর্ষয়োরিতি যাদবঃ। ন ত্যজতি ন জহাতি। ত্বত্ত এব ভীতঃ সোঽদ্যাপি তাদৃশেনৈব বেগেন দিবি ভ্রমতি নতু ক্ষণমপ্যবস্থাতুমুৎসহতে ইতি স্পষ্টো বাচ্যার্থঃ। আকাশে সূর্য্যো যন্নিরন্তরং ভ্রমতি তৎ তবৈব তাড়নভয়াদিতি ভাবঃ। অত্র শ্রুতিরপি "ভয়াদস্যাগ্নি স্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ। ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ।" ইতি সূর্য্যং কন্যাসঙ্গতং দৃষ্টা শাসনার্থং ধনুষা ত্বমেব তমনুসরসি তেনৈব স নিরন্তরমাকাশে পরিভ্রমতি নচ ভ্রমণাদ্বিরমতি ইতি প্রৌঢ়োক্তং পুরাণাদাবপি প্রসিদ্ধম্। এতেন দণ্ডনীয়ে প্রজাপতৌ এতাদৃশং ভ্রমণ দণ্ডবিধানাৎ নকোঽপ্রি প্রজাসু পুনস্তাদৃশং দুষ্কর্ম্ম করিষ্যতীতি প্রজানাং শাসনম্, পরঞ্চ দণ্ডিতস্য ভ্রমণাত্তাপনালোকেন রূপেণ তৎকার্য্যেণ প্রজাং বহুনি মঙ্গলান্তরাণি সাধিতানীত্যুক্তম্। ২২।

[রাজা যেমন দণ্ডনীয়ের প্রতি দণ্ডবিধান দ্বারা তাহাকে ও অন্যান্য প্রজাগণকে দুষ্কর্ম্ম হইতে নিবৃত্তি শিক্ষা দেন এবং দণ্ডনীয়ের কার্য্যদ্বারা অপরাপর প্রজাগণের বহুবিধ মঙ্গল সাধন করেন সেইরূপ রাজরাজেশ্বর তুমিও করিয়া থাক ইহা প্রদর্শন করিয়া স্তব করিতেছেন।]

হে নাথ, প্রজাপতি কামুক হইয়া সূর্য্যরূপ ধারণ পূর্ব্বক আকাশগামী হইয়া স্বীয় কন্যাতে (উত্তরফাল্গুনী প্রভৃতি নক্ষত্রসংহতিরূপ কন্যারাশিতে)

যে বল পূর্ব্বক অভিগমন করিয়াছিলেন সেই হেতুই তিনি তোমার ধনুর (মুলাদি নক্ষত্র পুঞ্জরূপধনুরাশির) লক্ষ্য হইয়াছিলেন এবং ভয়ে অদ্যাপি তোমার ঐ ধনুর অগ্রে অগ্রে ধাবিত হইতেছেন, স্থির হইতে পারিতেছেন না। তুমি ঈশ্বরের ঈশ্বর; মহেশ্বর, তুমি আদ্যাশক্তির আশ্রয়; তোমার ভয়ে কোন দেবতা না ব্যস্ত হইয়া জগতের মঙ্গল বিধানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন? ২২।

স্বলাবণ্যাশংসা-ধৃত-ধনুষমহ্লায় তৃণবৎ,
পুরঃপ্লুষ্টং দৃষ্টা পুরমথন! পুষ্পায়ুধমপি।
যদি স্ত্রৈণং দেবী যমনিয়তদেহার্দ্ধঘটনা-
দবৈতি ত্বা মধ্বাবত বরদ মুগ্ধা যুবতয়ঃ ॥ ২৩ ॥

[সম্প্রতি ভেদবুদ্ধিমতাং জীবানাং সম্বন্ধে নামমাত্রতোভিন্নয়ো গুণ-গুণিনোরিব অঙ্গাঙ্গিনোরিব শক্তি শক্তি মতোরিবাভিন্নয়োরপি প্রকৃতি পুরুষয়ো ভিন্নত্বা কল্পনয়া সর্ব্বশক্তিমন্তং শক্তং বা তমেক পুরুষং অলিঙ্গং অজ্ঞেয়ং বা ব্রহ্ম স্তৌতি; অভেদ বুদ্ধ্যাস্তবাসম্ভবাৎ।]

স্বলাবণ্যেতি। হে পুরমথন জন্মনাশন, স্বস্থলাবণ্যেন সৌন্দর্য্য গৌরবেন মোহেন শক্তেতি যাবৎ আশংসা ত্বৎ পরাজয় বিষয়ে আশায়স্যা সা তমোক্তা ইয়ং দেবী তবৈব মায়া ধৃতধনুষং ত্বদ্বশীকরণার্থং উদ্যতঃ পুষ্পাণি কুসুমান্যেব আয়ুধানি (পুষ্পাণাং কামোদ্দীপকত্বাৎ কামস্ত্রত্বম্) সম্মোহনাস্ত্রাণি যস্য তং তথোক্তং স্বস্যাং সঙ্কল্পং কামং ত্বদ্বশীকরণাভিলাষং ইতি যাবৎ পুরঃ আত্মনঃ অগ্রে তৃণবৎ শুষ্কেন্ধনবৎ অহ্নায় ঝটিতি প্লুষ্টং দগ্ধং দৃষ্টাপি অবলোক্যাপি পরমেশ্বরস্য পরমজ্ঞাগ্নিময়ত্বাৎ তত্র (মায়া) স্বসংকল্পং ব্যর্থমবলোক্যাপীত্যর্থঃ অজিরত দেহার্দ্ধ ঘটনাৎ নিরন্তরং অর্দ্ধং গৌর্য্যা অর্দ্ধঞ্চ হরস্যেতি তয়োর্দেহার্দ্ধয়ো গুণগুণিনোরিব যদ্ঘটনং মিলনং প্রকৃতি-পুরুষোঃ পৃথক সংস্থানাভাবাৎ তয়োর্যো নিত্য সম্বন্ধ ইত্যর্থঃ তস্মাৎ হেতোঃ, যদ্বা ত্বদিচ্ছয়ৈব অনিয়তদেহার্দ্ধঘটনা সবাপ্যাপীতি যবর্থে পঞ্চমী। যদিত্বাং স্ত্রৈণং স্ত্রীবশং স্ববশমিত্যর্থঃ জানাতি দেহার্দ্ধ রূপেণ স্থিতাপি যদি সা মুগ্ধত্বাৎ চৈতন্যাংশ রহিতায়াঃ স্বস্যাঃ পৃথকৃত্বং প্রাধান্যং সৃষ্টিকর্ত্তৃত্বঞ্চ মন্যতে ঈশ্বরস্য অক্ষোভাত্বং আত্মনি প্রভুত্বঞ্চ ন জানাতি তদা হে বরদ কামদ কামোৎপাদন সকামধ্বংসোবা তবৈব স্বেচ্ছাধীন মিতি বোধনার্থং বরদেতি সম্বোধনম্। বত ইতি খেদ প্রকাশনে অদ্ধা

নিশ্চিতং! খেদানুকম্পাসন্তোষবিস্ময়ামন্ত্রণে বত ইতি তত্ত্বেবত্বাহংশুসাম্যম্‌ মিতি চামরঃ। যুবতয়ঃ মুগ্ধাঃ মূঢ়াঃ মূঢ়ত্বাদ্দুঃখোৎপাদিকাইত্যর্থঃ। মুগ্ধঃ সুন্দর মূঢ়য়োরিতি বিশ্বঃ। জনৈর্যুবতয়ো মুগ্ধা ইতি যদুচ্যতে তৎসত্য মেবেতি ভাবঃ। ত্বদর্দ্ধভূতায়া যুবত্যা মায়ায়াশ্চৈতন্যরূপস্য তবাংশাস্থেঽপি মুগ্ধত্বে অন্যাসাং যুবতীনাং মুগ্ধতা নিশ্চিতৈবেতি প্রৌঢ় বচনার্থঃ। তদীয়াং প্রকৃতিং যস্তুতঃ পৃথঙ্মন্যতে স মূঢ়এবেতি নিষ্কৃষ্টার্থঃ। অত্র মনুঃ দ্বিধা কৃত্বাত্মনোদেহ-মর্দ্ধেন পুরুষোঽভবৎ। অর্দ্ধেন নারী তস্যাংশ বিরাজ মসৃজৎ প্রভুঃ॥” ইতি আবরকার্থস্তু পুরাণে মহাদেবেন কামদেবস্য ভস্মীকরণম্‌ প্রসিদ্ধ মেব। ২৩।

[ভেদ বুদ্ধি অভেদ বুদ্ধির মূল; এজন্য ভেদ বুদ্ধিতে স্তব করিতেছেন। পরন্তু অভেদবুদ্ধিতে স্তবই অসম্ভব।]

আবরকার্থ। হে অভীষ্টপ্রদ মহাদেব, পার্ব্বতী স্বীয়রূপলাবণ্য হেতুক কামদেব জয়ী হইতে পারিবেন, এই আশায় ধনুর্ধারণ মাত্রে তাঁহাকে তোমার সম্মুখে দগ্ধ হইতে দেখিয়াও, যদি কেবল তোমার সহিত তাঁহার নিরন্তর অর্দ্ধাঙ্গ ভাবে মিলিত থাকায় তোমাকে তাঁহার বশীভূত মনে করেন, তাহা হইলে লোকে যে যুবতীদিগকে মুগ্ধস্বভাবা বলে ইহা মিথ্যা নহে। ২৩।

অপাবৃতার্থ। হে কামপ্রদ! হে মোক্ষধাম! জগন্মোহিনী মায়ার মনোহর রূপলাবণ্য চৈতন্যময় তোমার নিকটেও স্ফূর্ত্তি পাইবে, অতএব তিনি তোমা-তেও কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন, এই আশায় তাঁহার যে তোমাকে বশীভূত করার সংকল্প সেই সংকল্প উত্থান মাত্রেই তোমার সমীপে শুষ্ক তৃণের ন্যায় দগ্ধ হয়। ইহা দেখিয়াও যদি কেবল তোমার সহিত তাঁহার নিত্য মিলন দেখিয়াই তোমাতে তাঁহার প্রভুত্ব মনে করেন, তবে যুবতীরা যে মুগ্ধ ও জড় স্বভাব হয় এ বিষয় নিশ্চয় প্রমাণিত হইতেছে। ২৩।

চৈতন্য ও অবিদ্যার জ্ঞান পরস্পর সম্বন্ধ ও সমকাল স্থায়ী। মানবের হৃদয়ে ইহারা পরস্পর বিরোধী বলিয়া প্রতীত হয় এবং কখনও চৈতন্যের বা মায়ার প্রাবল্য প্রতিভাত হয়। এস্থলে রূপক মুখে ঐ দুইটিকে স্ত্রী পুরুষ কল্পনা করা হইয়াছে। পণ্ডিতেরা এই দুই প্রকার জ্ঞানের কারণীভূত পদার্থদ্বয়কে অঙ্গাঙ্গিভাবে মিলিত পরমেশ্বর বা তাদৃশ জ্ঞানের করণীভূত এক মাত্র পদার্থকে দ্বিধা ভাবে প্রতীত একই পরমেশ্বর বলেন এই পদার্থের অস্তিত্ব

ব্যতীত স্বরূপ জ্ঞান সর্ব্বথা অসম্ভব। তাঁহার সম্পূর্ণ মহিমা ও সম্পূর্ণ বিভূতি যোগেরও অগোচর। "অস্তীত্যেবোপলব্ধব্যঃ" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যেও জানা যায় যে তাহার অস্তিত্ব মাত্র জানা যায় লক্ষণ দ্বারা বুঝা যায় না। মুক্ত হইলে অস্তি ও অস্মি ভেদ থাকে না, কেবল এক মাত্র হওয়ায় জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় ভেদ থাকে না কে কারে বুঝিবে? তখন আপনিই আপনাতে পূর্ণানন্দময়। ২৩।

(ক্রমশঃ)

আচার।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

বহির্জগতে পদার্থনিচয়ের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, কি মৌলিক, কি অমৌলিক (যৌগিক) কি ভৌতিক সকল পদার্থই স্বজাতীয় পদার্থের সহিত মিলিত বা স্বজাতীয় বস্তুবিশেষের ক্রোড়ীকৃত করিতে ব্যগ্র বা তৎপর আছে। এই নিয়মানুসারে প্রথম এক একটী পরমাণু মিলিত হইয়া এই বৃহদ্‌ব্রহ্মাণ্ড রচনা করিয়াছে; একটী লতা উদ্ভিন্ন হইবা মাত্র সন্নিহিত তরু গ্রহণার্থ চেষ্টা পায়; একটী বিদ্যুৎ অন্য বিদ্যুৎকে ক্রোড়ীকৃত করিতে আকর্ষণ করে। পরম কারুণিক পরমেশ্বর পশু পক্ষীর প্রতিও এই ভাবটী অযত্নসুলভ সিদ্ধরূপে নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন।

ঈশ্বরের সৃষ্টি বিচিত্র। তাঁহার মহিমা অপার। তিনি মনুষ্যকে জ্ঞান সুখাদি বিবিধ সম্পদে বিভূষিত করিয়াছেন; সত্যমিথ্যারূপ কল্পনা রাজ্যের অধিপতি করিয়া দিয়াছেন; কিন্তু কেবল সেই স্বভাবসুলভ সম্মিলনে বঞ্চিত করিয়াছেন। মনুষ্যগণ সেই সেই ভাবে বঞ্চিত হইয়া তদভাব পরিপূরণের প্রত্যাশায় জাগতিক প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে দাম্পত্য সংবন্ধ সংস্থাপন নিমিত্ত প্রতিনিয়ত যত্নপরায়ণ হয়। মনুষ্যের কথা কি? সৃষ্টির আদিতে সমুদ্ভূত অশেষজ্ঞানেচ্ছাশক্তিসম্পন্ন স্বয়ং হিরণ্যগর্ভ বা ঈশ্বর একমাত্র পত্নীর অভাবে আপনাকে অসম্পূর্ণ মনে করিয়াছিলেন এবং কোনরূপ আনন্দ উপভোগ করিতে পারিলেন না। তখন তিনি দ্বিতীয় লোক পাইতে ইচ্ছা করিলেন এবং আপন শরীরকেই দুই ভাগে বিভক্ত করিলেন, এবং তাহাই (বিভক্ত

শরীরদ্বয়ই) পতি ও পত্নী ভাবে প্রকাশ পাইল, বলিতে কি ইতঃপূর্ব্বে তিনিও আপনাকে "অর্দ্ধভাগ" (১) বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। (২)

উপরিলিখিত আখ্যায়িকাটী বৃহদারণ্যকোপনিষদে লিখিত আছে। উপনিষদকে অপ্রমাণ বলিবার কোন কারণ নাই। পরন্তু এটী পতি পত্নী সম্বন্ধের অবশ্যম্ভাবিত্বের জ্ঞাপক। পুরুষ যে এই অভাব পূরণের জন্য চেষ্টা পাইতে পারেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

সে যাহা হউক কথিত দাম্পত্য প্রণালী বা পরস্পর মিলনাভিলাষ যে জগতের স্থূল সূক্ষ্ম সর্ব্ব পদার্থের অন্তর্নিহিত একটী স্বভাব, আধুনিক বিজ্ঞান শাস্ত্রও তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করে; সুধু স্বীকার নহে—কার্য্যেও তাহাই প্রকাশ পায়।

অতএব মনুষ্য যে সেই স্বাভাবিক ভাব পরিত্যাগ করিবে বা তাহার অনুযায়ী হইবে না, এ বিষয়ে কোন যুক্তি দেখা যায় না। মনুষ্য সেই প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে হউক বা যে কোন কারণেই হউক নিজের "অর্দ্ধবৃগল" ভাব পরিহার করিতে চেষ্টা পাইবেই পাইবে। বলবৎ বাধা বশতঃ যেমন জড়জগতেরও স্বভাবের অবরোধ বা অন্যথাভাব ঘটিয়া থাকে, তীব্র বৈরাগ্য উৎপন্ন হইলে পুরুষেরও সেই সম্মিলনাভিলাষটী বিলীন হইয়া যায়। তাহার পরীক্ষার জন্যই অর্থাৎ বালকের হৃদয়ে তাদৃশ তীব্র বৈরাগ্য উৎপন্ন হয় কিনা, অথবা বিষয় ভোগের জন্য তাহার চিত্ত ধাবিত হয় কি না, ইহা জানিবার নিমিত্তই প্রথমে ব্রহ্মচর্য্যের কঠোর নিয়ম বালকের স্কন্ধে আরোপিত করা হইয়াছে।

ইদানীন্তন শিক্ষাবিভাগে বালকের শিক্ষানুসারে যেমন প্রবেশিকা প্রভৃতি চারি প্রকার পরীক্ষার সৃষ্টি হইয়াছে, আর্য্যশাস্ত্রেও সেইরূপ ব্রহ্মচর্য্যাদি

---

(১) কোন কোন বীজ অঙ্কুরোদ্গম কালে নিজেই দুইটী সংহত পত্রাকারে উদ্ভিন্ন হয়, তেঁতুল বীজে এ ভাবটী প্রায়ই দেখা যায়। উহাকে (দৃঢ় সংলগ্ন পত্রদ্বয়কে) 'বৃগল' বলে, উহার একাংশ ভগ্ন হইলে "অর্দ্ধবৃগল" বলে।

(২) সবৈ নৈব রেমে, তস্মাদেকাকীনরমতে সদ্বিতীয়মৈচ্ছৎ * * সীইমমেবাত্মানং দ্বেধাপাতয়ৎ ততঃ পতিশ্চ পত্নীচাভবতাং তস্মাদিদমর্দ্ধবৃগলমিব। বৃহদারণ্যকোপনিষৎ ১।৪।৪।

আশ্রম-চতুষ্টয় বিষম শিক্ষা ও পরীক্ষার স্থানরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। প্রচলিত শিক্ষা-বিভাগে যেরূপ সর্ব্ব পরীক্ষার দ্বারস্বরূপ প্রথমেই প্রবেশিকা পরীক্ষা; প্রবেশিকায় প্রকৃত শিক্ষা হউক বা নাই হউক উহা যে পরীক্ষারাজ্যের দ্বারস্বরূপ এবং উহা অতিক্রম না করিলে যে প্রকৃত শিক্ষারাজ্যে প্রবেশ করা যায় না, এ কথা সত্য।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে সমাবর্ত্তনকার্য্য শেষ করিয়া গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিতে হইবে। গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিতে হইলে অন্যান্য সামগ্রীর ন্যায় সমুচিত দারসংগ্রহ করাও আবশ্যক। মনু বলিয়াছেন ব্রহ্মচারী গুরুর অনুমতি ক্রমে স্নানও সমাবর্ত্তন ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া সুলক্ষণ সমানজাতীয় দার সংগ্রহ করিবে। (১) কিন্তু পিতৃ মাতৃ সগোত্র হইতে দার সংগ্রহ করা নিতান্ত দূষণীয়।

বিবাহ-কাল।

এই দার সংগ্রহেরই নামান্তর বিবাহ বা বিবাহ সংস্কার। বিবাহ অর্থ—বরকন্যার পরস্পর পতি-পত্নীভাবে জ্ঞান, অর্থাৎ 'ইনি আমার ভার্য্যা' (এই প্রকার বরের জ্ঞান) ও 'ইনি আমার পতি' (এই প্রকার ভার্য্যার জ্ঞান) এই প্রকার জ্ঞান বর ও কন্যার হৃদয়ে উপজাত হইলেই উভয়ের বিবাহ সম্বন্ধ সম্পন্ন হয়। (২)

অন্যান্য সংস্কারের ন্যায় ইহাতেও কাল বিশেষ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ধর্ম্ম-শাস্ত্রানুসারে দেখা যায় সাধারণতঃ স্বামীর যে পরিমাণে বয়স, কন্যার বয়স তাহার এক তৃতীয়াংশের অনধিক হওয়া আবশ্যক। এইরূপ বয়স্থ বরকন্যার সম্বন্ধই ধর্ম্ম ও ভোগের হিতপ্রদ। এ নিমিত্ত মনু বলিয়াছেন যে "ত্রিশ বৎসর বয়স্ক পুরুষ, দ্বাদশবর্ষ বয়স্কা মনোরমা রমণীর পাণি গ্রহণ করিবে, অথবা চব্বিশ বৎসর বয়স্ক পুরুষ অষ্ট বর্ষ বয়স্কা কন্যার বিবাহ করিবে"। (৩) ইহা

---

(১) "গুরুণানুমতা স্নাত্বা সমাবর্ত্তো যথাবিধি। উদ্বহেত দ্বিজো ভার্য্যাং সবর্ণাং লক্ষণান্বিতাং"॥ মনু।৩।৪।

(২) "সমেয়ং ভার্য্যা সমায়ং পতিঃ" ইতিজ্ঞানং। উদ্বাহতত্ব।

(৩) ত্রিংশ বর্ষো বহেদ্ ভার্য্যাং হৃদ্যাং দ্বাদশ বার্ষিকীং। এ্যষ্টবর্ষোহষ্ট-বর্ষাং বা ধর্ম্মে সীদতি সত্বরং॥ মনু।৯.৯৪।

দ্বারাই বুঝা যাইতেছে যে, বরের বয়স অপেক্ষা সাধারণতঃ কন্যার বয়স দুই তৃতীয়াংশ ন্যূন হওয়া আবশ্যক; এবং মনু একথাও বলিয়াছেন যে উক্তবিধ দাম্পত্য সম্বন্ধই পতি-পত্নীর গৃহধর্ম্ম সমধিক উন্নতি লাভ করে।

(ক্রমশঃ)

আদর্শ-চরিত্র।

১। দেবব্রত।

ত সমান মহাভারতের কথা মনে হইলে স্বতঃই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ও কৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদ মনে উদয় হয়। যুদ্ধকাম সমবেত বীরমণ্ডলীর সম্মুখে বিষাদগ্রস্ত অর্জ্জুনের প্রতি শ্রীভগবানের সর্ব্বধর্ম্ম ও সর্ব্বভাবের সামঞ্জস্য স্থাপন পূর্ব্বক অশ্রুতপূর্ব্ব উপদেশ কাহার মনে না উদয় হইয়া থাকে? শ্রীভগবানের উক্তি যখন অর্জ্জুনের সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি হইল, যখন তিনি বুঝিতে পারিলেন যে তিনি সেই বিরাট পুরুষের হস্তে সামান্য ক্রীড়নক মাত্র, তখনই বলিতে পারিয়াছিলেন, "করিষ্যে বচনং তব" এবং তাহার ফলে সমগ্র বাধা বিঘ্ন অতিক্রম পূর্ব্বক অপূর্ব্ব ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন, জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তির অপূর্ব্ব সমাবেশ।

সহজেই মনে হয় দৈবীসম্পদ-অভিজাত সত্ত্বগুণ-প্রধান ধনঞ্জয়ের পক্ষে ইহার কোনটীই বিসদৃশ নহে—কোনটীও অসম্ভব নহে। কিন্তু যদিও অর্জ্জুন ভগবানের সখা, যদিও তিনি ভারতীয় তদানীন্তন বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বীর বলিয়া খ্যাত, তথাপি ভীষ্মের তুলনায় তাঁহাকে বালক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। নিয়ত ভগবানের ক্রোড়ে থাকিয়া যাহা অর্জ্জুন শিক্ষা করিতে পারেন নাই এবং যাহার সমাপ্তি যুদ্ধক্ষেত্রেও অর্জ্জুনের পক্ষে সাময়িক বলিয়া জ্ঞান হয়, সে শিক্ষা যেন সমস্তই ভীষ্মের নিজস্ব—সেগুলি যেন সমস্তই তাঁহাতে প্রযোজ্য—যেন দেবব্রতই মূর্ত্তিময়ী গীতা। গভীর নিষ্কম্প হৃদয়ে কর্ত্তব্য সাধনে কঠোর প্রতিজ্ঞা, অমানুষী স্বার্থত্যাগ ও প্রগাঢ় ভক্তি—যে ভক্তির বাহ্যিক উচ্ছ্বাস তাঁহার জীবনে কেবল মাত্র দুইবার দেখিতে পাই, এগুলি যেন তাঁহারই এবং তাঁহাতেই সম্ভব। এই নীরব অথচ অপ্রতিহত ভক্তিস্রোতের প্রকাশ

সহ্য করিতে না পারিয়া, এক সময়ে ভগবানেরও আত্মবিস্মৃতি ঘটিয়াছিল, এবং এই ভক্তি বলে আকৃষ্ট হইয়া ভগবান রুধিরাপ্লুত রণক্ষেত্রে শরশয্যায় শায়িত ধর্ম্মবীরের নির্ম্মল জ্যোতিটুকু নিজ জ্যোতিতে মিশাইয়া লইয়াছিলেন।

দেবব্রতের জন্ম বৃত্তান্ত প্রত্যেক হিন্দুর হৃদয়ে অঙ্কিত রহিয়াছে। শান্তনু রাজার সহিত বিষ্ণুপাদ সম্ভূতা অনন্ত পবিত্রতাময়ী ধারার উদ্বাহে দেবব্রতের জন্মই সম্ভব এবং প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত ভীষ্ম চরিত্র লক্ষ্য করিলে এরূপ অপূর্ব্ব সম্মিলনের উপযুক্ত বিকাশ সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম হয়।

ষোড়শ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত দেবব্রত জীবনের কোন ইতিহাস নাই। তিনি তাঁহার মাতা কর্ত্তৃক শিক্ষার জন্য বশিষ্ট হস্তে ন্যস্ত হইয়াছিলেন, ইহাই সংক্ষেপ কথা। শিক্ষার প্রভাব এবং এই শিক্ষা সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর ক্ষত্রিয় যুবকের হৃদয় ও চরিত্র কিরূপ ভাবে ঘটন করিয়াছিল, এতদুভয় তাঁহার পরজীবনের ঘটনাবলীতে সম্পূর্ণরূপে দেখা যায়; এবং এই দেব চরিত্র সম্বন্ধে চিন্তা করিতে যেন মুহূর্ত্তের জন্যও আত্মহারা হইতে হয়, এবং সেই পুরাতন কথাটী মনে পড়ে—"মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা।"

যুবক দেবব্রত পিতার বিষাদের তথ্য অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিলেন যে, তিনি ধীবর কন্যা সত্যবতীর অনুপম রূপলাবণ্যে মুগ্ধ, কিন্তু কন্যার পিতা বৃদ্ধ ধীবর স্বার্থ প্রণোদিত হইয়া কতকগুলি অন্যায় প্রতিজ্ঞায় তাঁহাকে আবদ্ধ হইতে বলায় রাজা তাহাতে অসম্মত হইলে, তাঁহার সত্যবতী লাভেচ্ছা তখন ফলবতী হয় নাই। লোকতঃ ধর্ম্মতঃ রাজা ধীবরের প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারিলেন না বটে; কিন্তু সত্যবতীর রূপলাবণ্য তাঁহার অন্তরে যে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়াছিল তাহা নির্ব্বাপিত হইল না, বরং উপস্থিত বিঘ্নে সমধিক প্রবল হইতে লাগিল, এবং রাজাকে বিষাদগ্রস্ত ও একান্ত ক্লিষ্ট করিয়া ফেলিল। পিতার এইরূপ শারীরিক ও মানসিক অবস্থা লক্ষ্য করিয়া দেবব্রত বৃদ্ধ ধীবরের নিকটে গমন করিলেন এবং পিতার শারীরিক ও মানসিক ক্লেশ অপনোদনের জন্য যে কঠোর প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ হইলেন তাহা দেবতাদিগের পক্ষেও অসম্ভব। যাঁহার পূর্ণরূপে নিবৃত্তি মার্গে প্রবেশ লাভ হইয়াছে তাঁহার পক্ষে এরূপ অমানুষী ত্যাগ স্বীকার সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু দেবব্রত তখন যুবক—সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বরের একমাত্র পুত্র সুতরাং

সম্মুখে ভোগ্য বিষয়ের অভাব নাই এবং বিষয় গ্রহণের উপযুক্ত শারীরিক ও মানসিক বৃত্তি সমূহের কোনটাও অসম্পূর্ণ বা শিথিল বলিয়া বোধ হয় না। বৈশ্যের ন্যায় কষা মাজা করিয়া এবং এরূপ ত্যাগ তাঁহার ক্ষত্রিয় বর্ণোচিত হইবে কিনা বিচার করিয়া অথবা নিত্যানিত্য বস্তু সম্বন্ধে সম্যক্ বিবেচনা করিয়া যে এরূপ কঠোর প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ হইয়াছিলেন তাহা ধারণা হয় না। এক দিকে পিতার সুখ শান্তি স্থাপন এবং অপর দিকে নিজের ভোগবিলাস ও রাজ্যাভিলাষ প্রভৃতি ত্যাগ এই দুইটীর মধ্যে পূর্ব্বোক্তটী ধীবরের কঠোর প্রস্তাব স্বত্বেও যে অনুমাত্র বিচলিত হয় নাই, ইহাই দেবব্রত চরিত্রে যে জন্ম জন্মান্তরীণ সাধানার ও শিক্ষার প্রভাবে দৃঢ়তা সম্পূর্ণরূপে অভ্যাস হইয়াছে তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এই ভীষণ প্রতিজ্ঞা অদ্য দেবব্রতকে ভীষ্ম নামে অভিহিত করিল, এবং রাজা শান্তনু ঘোর মোহান্ধকারের মধ্যে মুহূর্ত্তের জন্য পুত্রের ভীষণ প্রতিজ্ঞার বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া দেবব্রতকে "ইচ্ছা মৃত্যু" বর দিয়া পুনরায় পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইলেন। কন্যা রাজরাণী হইবে, কন্যার সন্তান সন্ততি কুরুকুলের উজ্জ্বল কিরীট মস্তকে ধারণ করিয়া ভারতসম্রাজ্য শাসন করিবে ইত্যাকার সুখ কল্পনা জীর্ণতরণী-বাহক দরিদ্র ধীবর উপযুক্ত সময় বুঝিয়া বড়ই সোহাগে পোষণ করিয়া ফেলিল, কিন্তু ধীবরের পক্ষে এই আপাত-মধুর কর্ম্মের ফল স্বরূপ কুরুকুল নির্ব্বংশ হইল। শান্তনু রাজা পরলোক গত হইলে সত্যবতী ভীষ্মকে রাজ্যভার গ্রহণ করিতে আহ্বান করিলেন। এই অবসরে রাজ্যভার গ্রহণ করিলে জগতে ভীষ্মকে যে বিশেষ নিন্দনীয় হইতে হইত তাহা বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু ভীষ্ম তাঁহার লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইলেন না। তিনি প্রবঞ্চনা শিক্ষা করেন নাই; এবং যদিও এক্ষেত্রে আত্মেতর কেহ প্রবঞ্চিত হইত না তথাপি আত্ম প্রবঞ্চনা করিতে পারিলেন না—তাঁহার অন্তরের নিভৃতস্তরও বোধ হয় অনুমাত্র উদ্বেলিত হইল না। অতি বিনীত ভাবে মাতা সত্যবতীকে বুঝাইয়া দিলেন যে, তিনি কুরুকুল রক্ষার জন্য তাঁহার চির কৌমার্য্যব্রত ভঙ্গ করিতে পারেন না, এবং রাজ্যভারও গ্রহণ করিতে পারেন না। অগত্যা সত্যবতীকে আপদ্ধর্ম্ম উপদিষ্ট অন্য উপায় অবলম্বন করিতে হইল—শান্তনু বংশ রক্ষা হইল—এবং ভীষ্মের প্রতিজ্ঞাও অটুট রহিল। "মহাত্মা ভীষ্ম ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু এবং মহামতি বিদুর ইঁহাদিগকে জন্মাবধি পুত্র

নির্ব্বিশেষে প্রতি পালন করিতেন, তিনি তাঁহাদিগকে সমস্ত সংস্কারে সংস্কৃত করিয়াছিলেন ; এবং পরিশ্রমে ও ব্যায়ামে সুনিপুণ করিয়াছিলেন। প্রণষ্ট প্রায় শান্তনুবংশ পুনরুদ্ধৃত হইলে সত্যের সমাদর ও গৌরব বৃদ্ধি হইল"। সত্যের সমাদর ও গৌরব বৃদ্ধি হইল বটে, কিন্তু পাণ্ডুর পরলোক গমনের পর যে ভীষণ বিপ্লবের সূচনা হইল তাহাতে সমাদর ও গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য কুরু পাণ্ডব যুদ্ধের অবতারণা হইল, কুরুকুল নির্ম্মূল হইল, গীতার ধর্ম্ম স্থাপন হইল, এবং তাহার আধার স্বরূপ সত্যের সমাদর ও গৌরব বৃদ্ধি হইল। এই ঘোর বিপ্লবের সূচনা হইতে শেষ পর্য্যন্ত ভীষ্ম চরিত্র সম্পূর্ণ শিক্ষাপ্রদ। বিপ্লবের প্রারম্ভেই দুর্য্যোধন অন্ধ এবং স্নেহান্ধ নরাধিপ ধৃতরাষ্ট্রকে বলিতেছেন "হে তাত! পিতামহ ভীষ্ম আমাদের উভয় পক্ষেই সম পক্ষপাতী"। দুর্য্যোধনের চক্ষে এবং লোক চক্ষে ভীষ্ম সমপক্ষপাতী, কিন্তু তাঁহার এই সমপক্ষপাতীত্বের যে গভীর কর্ত্তব্য নিষ্ঠা ও স্বার্থত্যাগ নিহিত ছিল তাহা যুধিষ্ঠির, বিদুর এবং শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন অন্য কেহ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। যদিও ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ তথাপি তাঁহার জীবদ্দশায় অন্ধ সত্যবতী-পুত্রের পক্ষাবলম্বনই ভীষ্মের একমাত্র কর্ত্তব্য এবং পাণ্ডুপুত্রগণের প্রতি স্নেহ এবং সত্যের সমাদর ও গৌরব বৃদ্ধি করণের প্রবল আকর্ষণ উপেক্ষা করিয়া তাহাতেই নিষ্ঠাবান হওয়া গভীর স্বার্থত্যাগের পরিচায়ক। এস্থলে ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার করিয়া যাহা সম্পূর্ণ অধর্ম্ম বলিয়াই ধারণা হয় সেইটী অবলম্বন করা—সাধারণতঃ বড়ই অযৌক্তিক বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু যিনি ধর্ম্মাধর্ম্মের আশ্রয় ও বীজ স্বরূপ তাঁহার নিকট তাঁহার ভক্তের হৃদয়ের ভাব লুক্কায়িত ছিল না তাই আত্মহারা হইয়া রণস্থলে রথচক্র গ্রহণ করিয়াছিলেন তাই শেষ সময়ে ভক্তের একমাত্র বাসনা পূর্ণ করিয়াছিলেন।

ব্রহ্ম ও ঈশ্বর।

ব্রহ্ম ও ঈশ্বর সম্বন্ধে দুই একটি কথা।

শিষ্য। আপনি ব্রহ্ম ও ঈশ্বর এই দুইটি কথার এক অর্থ করিয়াছেন, কিন্তু ঐ কথার অর্থ কি এক রকম?

গুরু। আজকাল অনেকেই এই দুই কথার অর্থ একইরূপ বুঝিয়া থাকেন; কিন্তু সকলের জানা আবশ্যক যে এই দুইটি কথার হিন্দুশাস্ত্রানুসারে বিশেষ প্রভেদ জানা যায়। এই প্রভেদটি বুঝিলে সাংখ্যকার কপিল দেবকে আর কেহ নাস্তিক বলিয়া অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন না। বেদান্ত শাস্ত্রের একমেবাদ্বিতীয়ং কথাটির 'একং' কথাটির যে অর্থ বুঝায়, তাহারই নাম ব্রহ্ম। সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ এবং আনন্দস্বরূপ যে পদার্থ ভিন্ন অন্য কোন নিত্য পদার্থ নাই তাহারই নাম ব্রহ্ম। এই ব্রহ্ম পদার্থটি কি ইহাই অন্বেষণ করা সকল দর্শন শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। নিত্য পদার্থ এই জগতে এক বই দুই নাই ইহাই বেদান্তের মত, এবং সেই নিত্য পদার্থই ব্রহ্ম। সাংখ্যকার যাহাকে পুরুষ বলেন তিনিই ব্রহ্ম। ইনি নির্গুণ; ত্রিগুণের অতীত। ইহার রশ্মি প্রকৃতির ক্ষেত্রে পড়িয়া জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কার্য্য চলিতেছে; তথাপি ইনি সৃষ্টিকর্ত্তা নহেন। জগতের সৃষ্টি কর্ত্তা হিন্দুদর্শনশাস্ত্র সকলের মতে কেহই নাই। প্রকৃতি এবং ব্রহ্ম উভয়ই অনাদি; প্রকৃতি অনিত্য পদার্থ, ব্রহ্ম নিত্য পদার্থ, কারণ কালের বশে প্রকৃতির পরিবর্ত্তন হইতেছে; কিন্তু ব্রহ্মের কোন পরিণাম নাই। আমি তোমাকে বিশ্বের সমষ্টি শক্তি সম্বন্ধে পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি সেই সমষ্টি শক্তিই ব্রহ্ম। এই বারে দার্শনিকগণ ঈশ্বর কথাটিতে কি অর্থ করেন তাহা বলি শুন। পাতঞ্জলির যোগশাস্ত্রের নামই সেশ্বর সাংখ্যশাস্ত্র, তিনিই এইরূপ ঈশ্বর কথাটির অর্থ করেন।

ক্লেশ কর্ম্ম বিপাকাশয়ৈর পরামৃষ্ট পুরুষ বিশেষ ঈশ্বরঃ।

স পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ কালেনাবচ্ছেদাৎ॥

প্রণবস্তস্য বাচক॥

ক্লেশ, কর্ম্ম, বিপাক এবং আশয় কর্ত্তৃক যিনি পরামৃষ্ট হন না এরূপ পুরুষ বিশেষের নাম ঈশ্বর।

তিনি জগতের আদি গুরু, কাল কর্ত্তৃক তাঁহার অবচ্ছেদ হয় না। প্রণব মন্ত্র সেই ঈশ্বরের বাচক।

এক্ষণে দেখ পাতঞ্জলির "ঈশ্বর" কথায় জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা বুঝায় না। যিনি অজ্ঞান জীবগণের গুরুস্বরূপ, যিনি জীবের মোক্ষের পথ দেখাইয়া দেন, সেই জগৎ গুরুর নাম ঈশ্বর। হিন্দু দর্শনকারগণ বলেন যে অজ্ঞান হইতে জীবের সৃষ্টি হয় এবং এই অজ্ঞান দূর হইলেই জীব তাহার প্রকৃত স্বরূপ, অর্থাৎ ব্রহ্ম-স্বরূপ অবগত হয়; যাঁহার আলোকে এই অজ্ঞান তিমির দূর হয়—সেই সূর্য্য স্বরূপ পুরুষ বিশেষের নাম ঈশ্বর।

সাংখ্যকার কপিলদেবের সাংখ্যশাস্ত্রকে নিরীশ্বর সাংখ্য বলে; কিন্তু কেন যে তাহাকে নিরীশ্বর সাংখ্য বলা হয়, তাহা বোধ হয় অনেকে জানেন না। পাতঞ্জলি ঈশ্বর কথার যেরূপ অর্থ করিয়াছেন, সাংখ্যকারও ঈশ্বর কথার সেইরূপ অর্থ করিয়া গিয়াছেন; তিনি বলেন যে সকল পুরুষ অজ্ঞান-মুক্ত হইয়া ব্রহ্মে লীন হইয়াছেন, যাঁহারা পূর্ব্বে ভিন্ন ভিন্ন পুরুষ ছিলেন—কিন্তু মুক্ত হইয়া যাঁহারা একাত্মা হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে (তাঁহাদিগকে না বলিয়া তাঁহাকে বলাই যুক্তি যুক্ত হয়) ঈশ্বর নাম দেওয়া যায়। ইনি মুক্তাবস্থা প্রাপ্ত, সুতরাং ক্লেশ, কর্ম্ম, বিপাক এবং আশয় কর্ত্তৃক অপরামৃষ্ট্য সুতরাং পাতঞ্জলি যাহাকে ঈশ্বর বলেন কপিলদেব ঈশ্বর কথাতে সেই অর্থই বুঝিতেন তথাপি তাঁহার শাস্ত্রকে নিরীশ্বর সাংখ্য কেন বলা হইয়াছে তাহা বলি শুন।

পাতঞ্জলি ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য যে সাধন প্রণালী দেখাইয়া গিয়াছেন, ঈশ্বর প্রণিধান তাঁহার একটি অঙ্গ। কপিলদেব কিন্তু এই কথা বলেন যে, ব্রহ্মজ্ঞান লাভ জন্য ঈশ্বর প্রণিধান অবশ্য প্রয়োজনীয় নহে। কপিলদেব বলেন যে ঈশ্বর অর্থাৎ মুক্ত পুরুষগণের আভা চিত্তে প্রতিবিম্বিত হইলে মনুষ্য মোক্ষের পথ কি তাহা বুঝিতে পারে। চিত্ত নির্ম্মল করিতে পারিলে ঈশ্বরের আভা তাহাতে পতিত হইবেই হইবে; সুতরাং যে কোন উপায়ে হোক চিত্ত নির্ম্মল করিতে পারিলেই মুক্তির পথ দেখিতে পাওয়া যায়। ঈশ্বর প্রণিধান ব্যতীত যে অন্য উপায়ে চিত্ত নির্ম্মল হয় না একথা তিনি বলেন না। পাতঞ্জলিও তাহা বলেন না বটে; তবে পাতঞ্জলির সাধন প্রণালীতে ঈশ্বর প্রণিধান অর্থাৎ প্রণবার্থ চিন্তা এবং প্রণব জপ একটি প্রধান অঙ্গ; কপিলের মতানুযায়ী ঈশ্বর

প্রণিধানের বেশী দরকার নাই। এই জন্যই কপিলের শাস্ত্রকে নিরীশ্বর সাংখ্য এবং যোগশাস্ত্রকে সেশ্বর সাংখ্য বলা হয়।

আমাদের দর্শনশাস্ত্র সকলের মধ্যে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিলে দেখিতে পাইবে, যে প্রকৃত পক্ষে আসল কথায় সকল শাস্ত্রের মধ্যে কোন মতভেদ নাই; ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্গীতায় সমস্ত দর্শন শাস্ত্রের সমন্বয় করিয়াছেন।

ঈশ্বর অর্থে জগৎগুরু আদিগুরু। যখন দেখিবে যে মোক্ষ লাভের জন্য অন্তর ব্যাকুল হইতেছে, তখন জানিও যে তোমার চিত্তে ঈশ্বরের আভা পড়িবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। বেদান্তশাস্ত্রানুসারে সাধক শম 'দম' উপরতি-তিতিক্ষা, শ্রদ্ধা, সমাধান এই ষট্গুণে ভূষিত হইলে, তবে তাহার মুমুক্ষুত্ব জন্মে। যাঁহার এই মুমুক্ষুত্ব জন্মে নাই তিনি ব্রহ্ম জিজ্ঞাসার অধিকারী নহেন।

যে উপায় অবলম্বনে ব্রহ্মজ্ঞান জন্মায় তাহার নাম যোগ। এই যোগ আবার প্রধানতঃ দুই প্রকারের। এক অব্যক্তের উপাসনা, এবং অন্যটি ঈশ্বর উপাসনা। এই দুই প্রকার উপাসনারই প্রশংসা গীতাশাস্ত্রে কথিত আছে। অধিকারী ভেদে একপ্রকার উপাসনা অন্য প্রকার উপাসনা অপেক্ষা প্রশস্ত।

শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন যে :—

ক্লেশোঽধিকতরস্তেষাং অব্যক্তাসক্ত চেতসাং।
অব্যক্তাহি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে ॥

যাঁহারা দেহ অভিমান পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই, তাঁহারা অব্যক্তাসক্ত-চেতা হইলে অধিকতর কষ্ট পান; যাহা ব্যক্ত নহে এরূপ বিষয়ে দেহাভি-মানীগণের চিত্তপ্রবণতা সহজে জন্মে না, সুতরাং অব্যক্ত উপাসনার দ্বারা তাহারা দুঃখই পাইয়া থাকে। দেখ আমরা এইরূপ দেহাভিমানী লোক; সুতরাং আমাদের পক্ষে অব্যক্ত উপাসনা বড় দুরূহ ব্যাপার, সেই জন্য ঈশ্বর উপাসনাই আমাদের পক্ষে প্রশস্ত। হিন্দু এবং বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীগণের মতে জগৎগুরু ঈশ্বর অব্যক্তভাবে সদাই বিরাজমান আছেন; কিন্তু অব্যক্তের আভা সাধারণের চিত্তে প্রতিবিম্বিত হয় না বলিয়া, সময়ে সময়ে কোন দেহ আশ্রয় করিয়া তিনি সাধারণ জনকে ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়া থাকেন।

পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং।
ধর্ম্মসংরক্ষণার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলিয়া গিয়াছেন। বৌদ্ধগণের এইরূপ বিশ্বাস যে ধ্যানী বুদ্ধদেব সময়ে সময়ে কোন মনুষ্য দেহ আশ্রয় করিয়া জীবগণের মোক্ষের পথ দেখাইয়া দেন। ঈশ্বর যখন এইরূপ কোন দেহাশ্রয়ী হন, তখন তিনি ব্যক্তভাবে মনুষ্যজন সমীপে অবতীর্ণ হইয়াছেন বলা যায়। এইরূপ ব্যক্ত ঈশ্বরের সাহায্যে মোক্ষের পথ অনুসন্ধানের নাম ব্যক্ত উপাসনা।

একটি কথা তোমাকে এইখানে বলা কর্ত্তব্য যে, ঈশ্বর কোন দেহ আশ্রয় করিয়া ব্যক্ত ভাব ধারণ করেন বলিয়া, সেই দেহকে যেন ঈশ্বর বলিয়া বুঝিও না। শ্রীকৃষ্ণ ও বুদ্ধদেব ইঁহারা ব্যক্ত ভাবাপন্ন ঈশ্বরাবতার, কিন্তু যদি কৃষ্ণ-উপাসক বা বুদ্ধ উপাসক হইতে চাও, তবে তাঁহাদের দেহের রূপকেই যেন ঈশ্বর জ্ঞান করিও না। ঈশ্বর দেবকী পুত্রের শরীরে অবতীর্ণ হইলেও দেবকী পুত্রের মনুষ্য রূপকে ঈশ্বরের রূপ মনে করিও না। দেবকী পুত্রের বিশ্বব্যাপী আত্মাকেই ঈশ্বর বলিয়া জানিও। এইটি শিক্ষা দিবার জন্যই শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে তাঁহার বিশ্বরূপ দেখাইয়াছিলেন।

ঈশ্বরের বিশ্বরূপ অন্তরে ধারণা করিতে শিখ, তবে ঈশ্বর তোমাকে মোক্ষের পথ দেখাইয়া দিবেন, ব্রহ্ম কি পদার্থ তখন বুঝিতে পারিবে। ঈশ্বরের বিশ্বরূপ অন্তরে ধারণা করা কথাটির অর্থ একটুকু স্পষ্ট করিয়া বলি শুন।—"স এব পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ।"

ঈশ্বর সম্বন্ধে এই কথাটি সতত স্মরণ রাখিও; তাহার পর যে অবতারের নামে তোমার সহজেই ভক্তি আসে, তাঁহাকেই গুরু জানিয়া জ্ঞান উপার্জ্জনের চেষ্টা কর; ক্রমে সেই গুরুকে বিশ্বরূপ জানিয়া বিশ্বকেই গুরু স্বরূপ দেখিতে শিখ। যতদিন না গুরুকে বিশ্বব্যাপী বলিয়া অন্তরের প্রত্যয় জন্মিবে, ততদিন তোমার বিশ্বরূপ দর্শন হয় নাই জানিও।

যিনি আমাকে মুক্তির পথ দেখাইয়া দেন, তিনিই আমার গুরু। তিনি জগতের সর্ব্বত্রই বিদ্যমান আছেন; ফলে, ফুলে, নদীতে, সমুদ্রে, মনুষ্য দেহে, মনুষ্যচিত্তে সর্ব্বত্রই আমার গুরু বিদ্যমান আছেন। গাছের ফলটি আমায় শিক্ষা দিয়া থাকে; ফুলটির নিকট হইতে ঢের শিখিতে পারি; একটি পাঁচ মাসের শিশুর নিকট হইতে কত জ্ঞান পাই; যে দিকে দেখি সেই দিকেই

সকলে আমাকে জ্ঞান দান করিবার জন্য প্রবৃত্ত রহিয়াছে। এইরূপ প্রত্যয় চিত্তে জন্মিলে তবেই শুকদেব ঈশ্বরের বিশ্বরূপ প্রত্যক্ষ করিতে পারা যায়। যখন দুই বৎসরের একটি ছেলের দিকে জ্ঞান লাভের উদ্দেশে চাহিয়া দেখি, তখন সেই দুই বৎসরের ছেলেই আমার গুরু; কেন না তীব্র জ্ঞান লালসা বশতঃ সেই ছেলের দেহেই তখন ঈশ্বরের আবির্ভাব হয়। ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী, কিন্তু সকলে তাহাকে দেখিতে পায় না। জ্ঞান লালসায় তীব্র সংবেগ উপস্থিত হইলে আমাদের এমন একটি ইন্দ্রিয় স্ফুরিত হয়, যাহার সাহায্যে জগৎগুরু ঈশ্বরকে সর্ব্বভূতেই দেখিতে পাওয়া যায়।

একই পদার্থকে যখন যে ভাবে দেখিবে, তখন উহা সেই অনুযায়ী আকার ধারণ করে। ক্ষুধার্থ হইয়া যখন একটি সুপক্ক ফলের দিকে দৃষ্টি কর তখন উহা তোমার ক্ষুধা শান্তির উপযোগীতা আকার ধারণ করে। আবার যখন জ্ঞান পিপাসায় কাতর হইয়া ঐ ফলের দিকে দৃষ্টি কর, তখন উহাই জ্ঞান দাতার আকার প্রাপ্ত হয়। জগতে শত্রু নাই, মিত্র নাই, স্ত্রী নাই, পুত্র নাই, কেহ নাই, কেবল আছেন গুরু, এই প্রত্যয় দৃঢ় করিতে চেষ্টা কর তবেই ঈশ্বরোপাসনা করিতে শিখিবে। যদি প্রকৃত জ্ঞান লালসা জন্মিয়া থাকে তবে স্পষ্ট বুঝিতে পারিবে, যে তোমার পরম শত্রু যে তোমার শত্রুতাচরণ করিতেছে, তাহার ভিতর হইতে একজন তোমাকে জ্ঞান দান করিতেছে।

দেখ, আমার গুরুর রূপ তোমাকে বলি শুন। অব্যক্ত ব্রহ্ম আমার গুরুর আত্মা, আদিত্য-লীন ঋষিগণ তাঁহার চিত্ত, এই পৃথিবীতে যে সকল মহাত্মারা ধর্ম্মশাস্ত্র সকলের গুহ্য ভাব বহন করিতেছেন তাঁহারাই তাঁহার মুখ, বৃক্ষ-লতা-মনুষ্য-সমাকীর্ণ ভূতল তাঁহার দেহ, কর্ম্মীগণ তাহার হস্ত ইত্যাদি।

ছাত্র। মহাশয় ঈশ্বরকে যদি বিশ্বব্যাপী বলিয়াই বুঝিতে হইবে, তবে শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধদেব ইহাঁদের ঈশ্বরের অবতার বলিয়া মানিবার প্রয়োজন কি?

গুরু। শ্রীকৃষ্ণ ও বুদ্ধদেব মোক্ষাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া জগতের হিত সাধন জন্য যে সকল জ্ঞান বিতরণ করিয়া গিয়াছেন, সেই জ্ঞান লাভেচ্ছায় তাঁহাদের শরণাপন্ন হইতে ধর্ম্মশাস্ত্রে উপদেশ দেয়। মানুষ মরে না এটা জানিয়া রাখিও। শ্রীকৃষ্ণ বা বুদ্ধদেব স্থূল দেহ ছাড়িয়া গিয়াছেন বটে,

কিন্তু তাঁহারা আপনাদিগকে সর্ব্বভূতস্থ দেখিতে শিখিয়াছিলেন, তাই স্থূল দেহ ত্যাগ করিয়া সর্ব্বভূতস্থ হইয়া আছেন। সাধারণ মানুষে, মানুষকে যত ভাল বাসিতে পারে, অন্য কোন পদার্থ কিম্বা অব্যক্ত পদার্থকে তত ভাল বাসিতে পারে না। সেই জন্যই ঈশ্বর সময়ে সময়ে মনুষ্য দেহ আশ্রয় করিয়া—মোহিনী শক্তি আশ্রয় করিয়া—সাধারণের মন মুগ্ধ করিয়া—মনুষ্যবিশেষের প্রতি তাঁহাদের মন আকৃষ্ট করিয়া দিয়াছেন। সেই উন্নত মনুষ্যের মুখ দিয়া ব্রহ্মজ্ঞান পূর্ণ অমৃতময়ী বাক্য সকল বাহির করিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া দিয়াছেন। আবার বিশেষের প্রতি ভক্তি সংস্থাপন করিয়া সাধারণ মনুষ্য জ্ঞানের পথে ক্রমশঃ অগ্রসর হইবে, ইহাই ঈশ্বরের অভিপ্রেত, সুতরাং ব্যক্ত-ভাবাপন্ন ঈশ্বরের উপাসকগণকে ঘৃণা করিও না, বরং অধিকারীভেদে এইরূপ উপাসনা শ্রেষ্ঠ উপাসনা বলিয়া জানিও। কেন না,

অব্যক্তাহি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে।

কিন্তু একটি কথা সতত স্মরণ রাখিও যে, যে অবস্থা বিশেষে মানুষের ভক্তি সহজেই উদয় হয়। তাঁহার মনুষ্য মূর্ত্তিকেই ঈশ্বরের মূর্ত্তি বলিয়া মনে করিও না। ঈশ্বরের মূর্ত্তি বিশ্বরূপ, নিরাকার, * তিনি জ্ঞান উপদেশ দিবার জন্য অবতার বিশেষের শরীর আশ্রয় করিয়াছেন মাত্র। আসল কথা এই যে, যাঁহার চিত্তে ঐশ্বরিক আলোকের আভা নির্ম্মল ভাবে প্রতিবিম্বিত হইতে পায়, তাহাতেই ঈশ্বর অবতীর্ণ হন, অর্থাৎ তাঁহাকেই ঈশ্বরের অবতার বলিতে পারা যায়।

ছাত্র। কোন্ ব্যক্তির চিত্ত পূর্ণ নির্ম্মলতা পাইয়াছে, এবং কোন্ ব্যক্তির তাহা পায় নাই ইহা কেমন করিয়া বুঝিতে পারা যাইবে?

গুরু। ইহাত তোমায় পূর্ব্বে একবার বলিয়াছি যে, যিনি "সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানিচাত্মনি" আপনাকে সর্ব্বভূতস্থ এবং সর্ব্বভূতকে আপনাতে দেখিতে শিখিয়াছেন, তাহারই চিত্ত প্রকৃত নির্ম্মলতা পাইয়াছে। যিনি ক্লেশ শূন্য, যাঁহার কর্ম্ম নিষ্কাম, যিনি সদানন্দ, তাঁহারই চিত্ত নির্ম্মলভাবাপন্ন হইয়াছে বলিয়া বুঝিও।

* এ কথাটি যুক্তিসিদ্ধ বোধ হয় না। অনুত্ব ও মহত্ব দুই ভাবের ভিতর দিয়া ঈশ্বর প্রকাশিত হইতে পারেন। দেহধারণ করিলেই চৈতন্য বদ্ধ হয় না। পঃ সং।

ঈশ্বর প্রণিধান দ্বারা যাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে চান তাঁহাদের প্রথমে নামে ভক্তি স্থাপন করিতে শিখা কর্ত্তব্য। যথন দেখিবে নামে ভক্তি হইতে জ্ঞান লালসা ক্রমেই বাড়িতেছে, তখন জানিও যে ভক্তির পরিপক্কতা উপস্থিত হইয়াছে। জ্ঞানময়ী ভক্তিই প্রকৃত ঈশ্বর ভক্তি; এই জ্ঞান লালসা পরিতৃপ্ত করিবার জন্য যথন ঈশ্বর—তত্ত্বাভিজ্ঞসাধকজনের সঙ্গ কামনা প্রবল হইবে, যথন সর্ব্ব ভূতেই গুরুর অধিষ্ঠান দেখিতে পাইবে, তখন তোমার ভক্তি বীজ হইতে অঙ্কুর জন্মিয়াছে জানিও। ক্রমেই সেই অঙ্কুর জ্ঞানময় আনন্দময় বৃহৎ অশ্বত্থ বৃক্ষের উৎপন্ন হইয়া, চারিদিকে শাখা প্রশাখা ছড়াইয়া গ্রীষ্মার্ত্তজনকে ছায়া প্রদান করিতে সমর্থ হইবে।

ঈশ্বর প্রীতি সম্বন্ধে আর একটি কথা বলিতে চাই। প্রকৃত ঈশ্বর প্রেম জন্মিয়াছে কিনা ইহা জানিবার জন্য একটি সুন্দর উপায় বলিতেছি শুন। দেখ যেরূপ ভালবাসাকে সাধারণতঃ প্রেম স্নেহ বা ভক্তি বলা যায়, ঈশ্বর প্রীতি সেরূপ ভালবাসা নহে। প্রীতি তত্ত্ব আলোচনা করিয়া দেখিলে ইহা স্পষ্ট দেখিতে পাইবে যে যাহাকে অনুরাগ বলি, দ্বেষ তাঁহার আনুষঙ্গিক।

হিন্দুশাস্ত্রকারকগণ এই রাগ এবং তাহার আনুষঙ্গিক দ্বেষকে ক্লেশের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। দ্বেষ যেরূপ ভালবাসার আনুষঙ্গিক সেরূপ ভালবাসা রাগাতে অন্তরে না আসিতে পায় তাহারই চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। পাতঞ্জলির মতে ঈশ্বর প্রণিধানের আসল উদ্দেশ্যই তাই। তখন ঈশ্বর প্রীতি জন্মিয়াছে বলা যায়। খ্রীষ্টিয়ান যদি হিন্দুর প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন হন, নিরাকার উপাসক যদি সাকার উপাসকের উপর বিদ্বেষভাবাপন্ন হন, তবে তাঁহাদের ঈশ্বর প্রীতি জন্মায় নাই বলিতে হইবে। যাঁহার অন্তর একেবারে দ্বেষশূন্য হইয়াছে তাঁহাকেই প্রকৃত ঈশ্বর ভক্ত বলিয়া জানিও। যে অনুরাগ হইতে গোঁড়ামী জন্মে সে অনুরাগ ত্যাগ করিতে হইবে, কেন না গোঁড়ামী জন্মিলেই নিজের মত দ্বারা অন্যমতের উপর বিদ্বেষ জন্মিয়া থাকে। এই সব কথা বুঝিয়া ঈশ্বর প্রীতি কি পদার্থ তাহা শিখিতে চেষ্টা কর। ঈশ্বরে অনুরাগ এবং গোঁড়ামী ও দ্বেষ ভাবের উপর সমস্ত দ্বেষ রাখিয়া দিয়া ঈশ্বর প্রীতি শিখিতে চেষ্টা কর।

শ্রীবলাই চাঁদ মল্লিক।

ভারতীয় কথা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

আদিপর্ব্ব—পাণ্ডবগণের জন্ম।

(পাণ্ডুর প্রতি অভিশাপ এবং তাহার ফল।)

অতঃপর নিরলস পাণ্ডু সুখসেব্য প্রাসাদনিলয়, সুখশয্যা পরিত্যাগ করিয়া জায়াদ্বয় সমভিব্যাহারে মৃগয়ার্থ অরণ্যবাসী হইলেন। তথায় একদা মৃগধ্যান নিষেবিত মহারণ্যে বিচরণ করিতে করিতে মৈথুনধর্ম্মে আসক্ত এক যুথগতি মৃগকে শরবিদ্ধ করিলেন। পাণ্ডুর এ কার্য্যটী অত্যন্ত নৃশংস কার্য্য হইয়াছিল। এইরূপ নির্দ্দয় ও নিষ্ঠুরের ন্যায় কার্য্য করায় তাঁহার প্রতি অভিশাপ হইল যে, "তিনিও সেইরূপ স্ত্রীধর্ম্মরক্ষণহেতু ক্রিয়া সমাধান সময়ে সেই অবস্থায় প্রেতলোকে গমন করিবেন।" এই নিদারুণ অভিশাপে রাজা পাণ্ডু সাতিশয় মর্ম্মপীড়িত হইলেন, এবং অপুত্রক হইবেন ভাবিয়া বিস্তর বিলাপ করিতে লাগিলেন।

পাণ্ডুর প্রতি অভিশাপ।

* * * *

* * শুনিয়া পাণ্ডু বিষণ্ন বদন।
শোকেতে আকুল হইয়া করেন ক্রন্দন॥
ভার্য্যাসহ কান্দেন যেমন বন্ধুলোকে।
অশেষ বিশেষ রাজা নিন্দে আপনাকে॥

* * * *

কেন হেন বড় কুলে হইল উদ্ভব।
আপনার কর্ম্মভোগে করে লোকে সব॥

* * * *

সমুচিত ফল তার হইল এত কালে
খণ্ডন না হয়—কর্ম্ম অনুসারে ফলে॥

পাণ্ডুর বিলাপোক্তিতে আমরা আবার কর্ম্ম ও কর্ম্ম-ফলের উক্তি দেখিতেছি। পাণ্ডু বলিতেছেন "আপনার কর্ম্মভোগ করে লোকে সব" "খণ্ডন না হয় কর্ম্ম অনুসারে ফলে" বাস্তবিক কথা।

"ভূতপূর্ব্বং কৃতং কর্ম্ম কর্ত্তারমনুতিষ্ঠতি।
যথা ধেনু সহস্রেষু বৎসো বিন্দতি মাতরং।
এবম্ পূর্ব্বকৃতং কর্ম্ম কর্ত্তার মনুতিষ্ঠতি।
স্বকৃতং ভুঙ্ক্ষ চাত্মীয়ং মূঢ়ঃ কিং পরিতপ্যসে।

পাণ্ডুর এই প্রকার জ্ঞানগর্ভ বিলাপে আরও জ্ঞানের বিকাশ পাইল। তিনি মানবের স্বাভাবিক ভোগবাসনা পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার ভোগবাসনা ইহলোকের সীমা অতিক্রম করিল এবং পরলোকের প্রতি দৃষ্টি হইল। তখন রাজা পাণ্ডু রাজ্য, অর্থকাম পরিত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যাশ্রম অবলম্বন পূর্ব্বক ভার্য্যা সমভিব্যাহারে বনে প্রস্থান করিলেন।

পাণ্ডু—"আজ হৈতে ত্যজিলাম সংসার বিষয়।
শরীর ত্যজিব, তপ করিয়া আশ্রয়॥
একাকী হইয়া পৃথ্বী করিব ভ্রমণ।
সকল ইন্দ্রিয়গণ করিব দমন॥

সন্তান এই ত্রিলোক মধ্যে ধর্ম্মময়ী প্রতিষ্ঠা স্বরূপ। যাগানুষ্ঠান, তপস্যা ও উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত নিয়ম, এই সমস্ত নিঃসন্তান ব্যক্তিদিগের পক্ষে পবিত্রকারী নহে। পুত না হইলে পিতৃঋণ পরিশোধের উপায় হয় না। এই সকল ভাবিয়া পাণ্ডু একদিন যশস্বিনী ধর্ম্মপত্নী কুন্তীকে নির্জ্জন স্থানে কহিলেন "হে কুন্তি! তুমি এই আপৎকালে অপত্য উৎপাদনে যত্নবতী হও।"

"দেব হৈতে পুত্র হবে উক্তি বিধাতার।
আপনি করহ কুন্তী বিধান ইহার॥

পৃথার অপর নাম কুন্তী। শূররাজ, পিতৃস্থানীয় প্রিয় সুহৃৎ, নিঃসন্তান, মহাত্মা কুন্তিভোজরাজের নিকট প্রথম সন্তান দিবেন বলিয়া অঙ্গীকৃত ছিলেন। আদিগর্ভসম্ভূতাকন্যা পৃথাকে প্রদান করিয়া অঙ্গীকার রক্ষা করিয়াছিলেন। পালক পিতার নামানুযায়ী "পৃথার" অপর একটী নাম কুন্তী।

কুন্তী।

ভর্ত্তার হিতকার্য্যে ও প্রিয়ানুষ্ঠানে অনুরক্তা কুন্তী স্বামীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন "বাল্যাবস্থায় আমি পিতৃগৃহে অতিথি সেবায় নিযুক্ত ছিলাম;

তখন সংশিতব্রত ব্রাহ্মণগণকে সমধিকরূপে পরিচর্য্যা করিতাম। একদা মহর্ষি দুর্ব্বাসা তথায় উপস্থিত হইলেন; আমি তাঁহাকে সর্ব্বপ্রযত্নে পরিতুষ্ট করিলাম। সেই ভগবান্ আমাকে অভিচারসংযুক্ত বরদান পূর্ব্বক একটী মন্ত্র প্রদান করিয়া বলিয়াছিলেন যে, যখনই যে দেবতাকে আমি পুত্রার্থ স্মরণ করিব তখনই সেই দেবতার প্রসাদে আমার পুত্র উৎপন্ন হইবে।

"বাল্যকালে পিতৃগেহে ছিলাম যখন।
অতিথি সেবনে ছিল মম নিয়োজন॥
অকস্মাৎ আইল দুর্ব্বাসা মুনিবর।
মুনিবরে সেবনে করিনু সুবিস্তার॥
পরম সঞ্চিতব্রত মুনি মহাশয়।
সেবা বলে আমা প্রতি হইল সদয়।
মন্ত্র দিয়া আমাকে কহিলেন সে মুনি।
যেই দেবে ইচ্ছা তব হবে সুবদনি॥
এই মন্ত্র পড়ি তারে করিয়া আহ্বান।
অবিলম্বে সেই দেব আসিবে তব স্থান॥
যেই বর ইচ্ছা কর পাবে সেই বর।
এত বলি দুর্ব্বাসা গেলেন দেশান্তর॥

এই কথা বলিয়া কুন্তীদেবী স্বামী সকাশে এইরূপে পুত্রোৎপাদনের অনুমতি যাচ্ঞা করিলেন। পাণ্ডু সম্মত হইলেন; এবং দেবগণ মধ্যে পুণ্যাত্মা ধর্ম্মরাজকে পুত্রের নিমিত্ত আহ্বান করিতে বলিলেন। কুন্তী দেবীর যথাবিধি অনুষ্ঠানের ফল হইল। যুধিষ্ঠির জন্মগ্রহণ করিলেন। অনন্তর এইরূপে কুন্তীদেবী বায়ুদেবকে স্মরণ করায় তাঁহার বরে ভীমের জন্ম হইল। দেবরাজ ইন্দ্রকে স্মরণ করায় অর্জ্জুনকে পুত্ররূপে পাইলেন।

পঞ্চপাণ্ডবের জন্ম।

পরে পাণ্ডু কর্ত্তৃক আদিষ্টা হইয়া কুন্তী মাদ্রীকে এই মন্ত্র শিখাইলেন এবং মাদ্রী অশ্বিনী কুমারদ্বয়কে স্মরণ করায় নকুল ও সহদেবের জন্ম হইল।

এইরূপে পঞ্চপাণ্ডবের সৃষ্টি হইল; অর্থাৎ পাণ্ডুর দেবতাবর প্রাপ্ত পাঁচটী পুত্র হইল।

একদা রাজা পাণ্ডু রিপুপরবশ হইয়া পূর্ব্বোক্ত জীবনান্তকারী অভিশাপ ভয় বিস্মৃত হইলেন; এবং মাদ্রীদেবীর সহিত সহবাস বাসনা করিলেন। মাদ্রীদেবী সাধ্যমত প্রতিষেধ করিলেন, কিন্তু কামবশ পাণ্ডু কিছুতেই নিবারিত হইলেন না; এবং অবশেষে মাদ্রীদেবীকে স্পর্শমাত্রেই দেহান্তর প্রাপ্ত হইলেন।

পাণ্ডুর মৃত্যু।

কালেতে যে করে তাহা কে খণ্ডিতে পারে।
পরম পণ্ডিতবুদ্ধি কালেতে সংহারে॥

আবার,—

"সর্ব্বং পরবশং দুঃখম্, সর্ব্বমাত্মবশম্ সুখম্"।"পরবশ সকল দুঃখের আকর, এবং আত্মবশ সমুদায় সুখের নিদান"। পাণ্ডু পরবশ হইলেন এবং তাহার ফল "দুঃখ" মৃত্যুরূপে তাঁহাকে গ্রাস করিল।

আবার "পাণ্ডু" যতই জ্ঞান পরিপক্ব হউন মানবীয় দুর্ব্বলতা সমুদয় তাঁহা হইতে অপসৃত হয় নাই; যদি তাহাই হইবে তবে,—

"ব্যাঘ্রীব তিষ্ঠতি জরা অপি তর্জ্জয়ন্তী।
রোগাশ্চ শত্রব ইব প্রভবন্তি গাত্রে॥
আয়ুঃ পরিস্রবতি ভিন্নঘটাদিবাম্ভো।
লোকে ন চাত্মাহিতমাচরতীহ কশ্চিৎ॥"

"জরা ব্যাঘ্রীর ন্যায় থাকিয়া তর্জ্জন করিতেছে। রোগ সকলও শত্রুর ন্যায় গাত্রে উৎপন্ন হইতেছে, যেরূপ ছিদ্র ঘট হইতে জল নিঃসৃত হয়, তদ্রূপ আয়ুক্ষয় হইতেছে তথাপি মনুষ্য নিজ হিতাচরণ করিতেছে না।" পাণ্ডু ভীষণ অভিশাপ ভুলিবেন তাহা নিতান্ত আশ্চর্য্য নহে। আবার তাহা না হইলে কর্ম্মফলের সার্থকতা থাকিবে কিরূপে? তাঁহার অনুষ্ঠান সৎ, কিন্তু কর্ম্মফল যাইবে কোথা? অভিশাপ কি কার্য্যে ব্যর্থ হয়?

অনন্তর পতিশোকে স্ফুরিতধারা, রোরুদ্যমানা মাদ্রীর পার্শ্বে ভূপতির প্রাণহীন দেহ দেখিয়া কুন্তী উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন। পরলোকগত ভর্ত্তার অনুগামিনী হইবার জন্য উভয় স্বপত্নী মধ্যে প্রীতিদ্বন্দ্ব হইল; পরে মাদ্রী কহিলেন, "ভূপতি আমাকে কামনা করিয়াই দেহত্যাগ করিয়াছেন; এই হেতু আমার অনুগমন প্রশস্ত"। ধর্ম্মপত্নী যশস্বিনী

মদ্ররাজদুহিতা কুন্তী দেবীকে নিজ পুত্রদ্বয়ের পালনভার অর্পণ করিয়া অনতিবিলম্বে চিতাগ্নিস্থ নরশ্রেষ্ঠ পাণ্ডুর অনুগামিনী হইলেন। কুন্তী দেবী নিজ পুত্রের ন্যায় মাদ্রী পুত্রদ্বয়কে লালন পালন করিতে লাগিলেন।

দেবকল্প মণ্ডবিৎ মহর্ষি তাপসগণ আসিয়া পরস্পর শ্রদ্ধাপূর্ব্বক পাণ্ডুপুত্রগণকে হস্তিনাপুরে ভীষ্মদেব এবং ধৃতরাষ্ট্র (অন্ধরাজা) সকাশে আনয়ন পূর্ব্বক তাঁহাদের সমর্পণ করিলেন।

পরে যথা সময়ে পাণ্ডুর প্রেতকার্য্য এবং পারলৌকিক ক্রিয়া যথাবিহিত রূপে সমাধান হইল।　　　(ক্রমশঃ)

শ্রীমনোরঞ্জন সিংহ।

পাগলের প্রলাপ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)।

(৫৯)

মা মঙ্গলময়ি! তোমার মঙ্গল ইচ্ছা কিছুই বুঝিতে পারি না। আমরা সদাই আপন পর অমঙ্গল সাধনা বা কামনা করি, তাই আমাদের প্রাণ সদাই অমঙ্গল ভয়ে আতঙ্কিত হইয়া উঠে। তুমি আড়ালে দাঁড়াইয়া দেখ আর হাস, আর মনে কর "চোরের মন পুঁই আঁদাড়ে"। সর্ব্বমঙ্গলে! তোমার সংসারে সকলই মঙ্গলময়। মা, আমাদের মন হইতে অমঙ্গল আশঙ্কা বিদূরিত করিয়া দাও, তুমি যে কাহারও অমঙ্গল করিতে পার না—এই ধ্রুব সত্য আমাদের প্রাণে দৃঢ়বদ্ধ করিয়া দাও মা!

(৬০)

সূর্য্য সাড়ে নয়কোটী মাইল দূরে আছেন বলিয়া আমরা উঁহাকে দেখিতে পাইতেছি, উঁহার আলোকে পুলকিত হইতেছি। উনি যদি সহসা আমাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ান, তাহা হইলে আর কি আমরা উঁহাকে দেখিতে পাই? সেই মুহূর্ত্তেই আমাদের আঁখি অন্ধীভূত হইয়া যায়। তাই বিপদ্‌ভীতি বিভীষিকার সময় মা যখন ছুটিয়া আসিয়া আমাদের কোলে করিয়া লয়েন, তখন আর আমরা তাঁহাকে দেখিতে পাই না। সেই অসংখ্যকোটী সূর্য্য প্রভাশালিনী জ্যোতির্ম্ময়ী জননীর দিকে চাহিতে পারে এরূপ সবল চক্ষু কাহার আছে? তাই সে সময় আমরা ভয়ে চক্ষু মুদ্রিত করি।

(৬১)

মানুষ মা লক্ষ্মীর একটী টাকার থলি, তাহার ভিতর মা যখন টাকা রাখেন, তখন সে ফুলিয়া উঠে; আবার যখন টাকা বাহির করিয়া লন, তখন সে সঙ্কুচিত হয়।

(৬২)

মানব অষ্টধাতু নির্ম্মিত বিচিত্র বিগ্রহ বিশেষ। রস, রক্ত, মেদ, মাংস, অস্থি, মজ্জা, শুক্র, এই সপ্ত ধাতু রঙ্গ, লৌহ, সীসক, তাম্র, দস্তা, রৌপ্য ও পারদ পরন্তু প্রেমই ইহাদের সংখ্যা পূরণকারী বিশুদ্ধ হেম। ইহাদের প্রকৃতিগত বিশেষ পার্থক্য নাই, একটী সোহাগায় গলে, অপরটী সোহাগে দ্রবীভূত হয়। সুবর্ণের অভাবে ধাতু নির্ম্মিত বিগ্রহে যেমন দেবতার প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয় না, সেইরূপ প্রেম না থাকিলে এই ধাতুময় মানব মূর্ত্তিতে প্রেমময় দেবাদিদেবের অধিষ্ঠান হয় না।

(৬৩)

ইচ্ছাময়ের রাজত্বে যে যাহা ইচ্ছা করিবে তাহার তাহাই পূর্ণ হইবে, সাধু হউক, অসাধু হউক, তুমি যেরূপ ইচ্ছা হৃদয়ে পোষণ কর না কেন, একদিন না একদিন তাহা পূর্ণ হইবেই হইবে—এজনমে না হয় জন্মান্তরে হইবে; কখনই তাহা অপূর্ণ থাকিবে না; সাধু ইচ্ছা করিলে ভগবান তোমার সহায় হইবেন—আর অসাধু ইচ্ছা করিলে সয়তান সহায়তা করিবে; পরন্তু ইচ্ছা করা তোমার হাত।

(৬৪)

যে সন্দেশ তৈয়ারী করিতেছে ও যে পাথর ভাঙ্গিতেছে দুইজনই স্ব স্ব কর্ম্মজনিত শ্রান্তি অনুভব করিতেছে। একজন সন্দেশ তৈয়ারী করিতেছে বলিয়া যে তাহার গায়ে আগুনের ঝাঁজ অন্য জনের দেহে রৌদ্রের তাপ অপেক্ষা বেশী মধুর লাগিতেছে; অথবা একজনের তাড়ু নাড়িতে অন্য জনের হাতুড়ি পেটার চেয়ে কম কষ্ট হইতেছে এরূপ ত বোধ হয় না; দুই জনেই ভাবিতেছে কতক্ষণে হাতের কাজ শেষ হইবে, কাজ শেষ হইলে যেন তাহারা বাঁচে। সেইরূপ ভাই! এই কর্ম্মক্ষেত্র পৃথিবীতে আসিয়া সকলকেই কর্ম্ম করিতে হইতেছে, কেহ বা ভাল কর্ম্ম করিতেছে—কেহ বা মন্দ কর্ম্ম

করিতেছে. কিন্তু দুইজনকেই সমান ক্লেশ ও ক্লান্তি ভোগ করিতে হইতেছে, তবে কেহ বা তাড়ু নাড়িতেছে কেহ বা হাতুড়ি পিটিতেছে। কর্ম্ম শেষ না হইলে কাহারও নিস্তার নাই।

(৬৫)

সেই নবনীত চোরের রাজত্বে এতদিন আসিয়াছি দুই রকমের বেশী ত লোক দেখিতে পাইলাম না। একদল চোর, অপরদল জুয়াচোর। চোরেরা কেবল পরের যাহা ভাল দেখে তাহাই আপন করিতে চায়, আর জুয়াচোরেরা আপনার যাহা মন্দ দেখে তাহাই গোপন করিতে যায়। দেখিও ভাই! বরং চোর হইও ত কখনও জুয়াচোর হইতে যাইও না।

(৬৬)

ল্যাজা মুড়ো বাদ দিয়া খাওয়াই মিষ্টি। সুখদুঃখ বিজড়িত অতীতের স্মৃতি ও সাধশঙ্কা মিশ্রিত ভবিষ্যতের ভাবনা ত্যাগ করিয়া বর্ত্তমান লইয়া থাকাই সহজ সাধনা।

(৬৭)

জ্বলন্ত লৌহ স্বল্পক্ষণেই শীতল হইয়া যায়; পরন্তু তাহাতে যে হাত দিয়াছে তাহার হাতের ঘা সারিতে বিলম্ব হইয়া থাকে। তাই বলি ভাই! পরের প্রাণে আগুণ জ্বালিও না, তাহার শিখা একবার তোমাকে স্পর্শ করিলে তোমার হৃৎপিণ্ডে যে ফোস্কা পড়িবে তাহার জ্বলনে বহুদিন জ্বলিতে হইবে। কালক্রমে সন্তপ্ত ব্যক্তির মর্ম্মাগ্নি নির্ব্বাপিত হইলেও তোমার হৃদয়ের ক্ষত শুকাইবে না।

(৬৮)

গাছটী কোন্ গাছ হইতে কলম করা হইয়াছে, কোথায় কোন বাগানে পোতা হইয়াছে, কে তাহাতে জল সিঞ্চন করিয়াছে, কে তাহার ফল সংগ্রহ করিয়াছে, কে তাহা বিক্রয় করিয়াছে, তাহা কত দামে কেনা হইয়াছে, ফলটীর আকৃতি ও বর্ণ কিরূপ এবং খাইতে কীদৃশ মধুর ইত্যাদি তাহার বিবিধ বিশদ্ বিবরণ পরের মুখে শুনিলে যেমন বোম্বাই, ল্যাঙ্গরা, আমের আস্বাদন কিছুই বুঝা যায় না; অথবা কাহার কোন গরুটীর কোন্ দিনের দুগ্ধে ছানা কাটান হইয়াছে, কাহার কোন্ খেতের আকের চিনির সহিত তাহা পাক করা

হইয়াছে এবং কোন্ ময়রাই বা তাহা কিরূপে প্রস্তুত করিয়াছে ইত্যাদির ইতিহাস বা তাহার আস্বাদনের মধুরতার প্রশংসাবাদ শুনিলে যেমন স্বদেশ রসগোল্লার স্বাদের উপলব্ধি বা অনুমান হয় না, সেইরূপ বহুবিধ শাস্ত্রানুশীলন বা বিচার তর্কে ব্রহ্মানন্দ রসাস্বাদন হওয়া নিতান্ত অসম্ভব। স্বয়ং সে অমৃত পান করিতে হইবে, পরের মুখে খাইলে চলিবে না।

(৬৯)

সুলভ মূল্যের ফল অধিকাংশই স্বাদ বর্জ্জিত বা বিকৃতাস্বাদ; একটু দাম দিয়া কিনিলে তাহা আর বড় একটা খারাপ হয় না। তাই বলি ভাই! সংসারের যত সহজ লভ্য সুখ দেখিতেছ সে সকলই স্বল্পস্থায়ী, তাহাদের মধুরতা উপলব্ধি হইতে না হইতেই তাহারা বিষময় হইয়া উঠে। রূপরসগন্ধ-স্পর্শশব্দজনিত সকল সুখই পিত্তলের বাটীতে ঘৃতের ন্যায় মানবহৃদয়ে শীঘ্রই দূষিত ও কলঙ্কিত হইয়া উঠে, একটু সাধনা দ্বারা কণা মাত্র পরমানন্দ সংগ্রহ করিতে পারিলে চিরদিন তাহা বসিয়া খাইতে পারিবে, তাহার মধুরতার হ্রাস বিকৃতি নাই; সেই নিত্য নব সুখ সমুদ্রের এক বিন্দু তোমার হৃদয়কে অনন্ত জীবন পরিপূরিত ও উচ্ছ্বাসিত করিবে।

(৭০)

৯৮,৪° ডিগ্রী যেমন মানবদেহের স্বাভাবিক তাপ সেইরূপ মনের উত্তাপও সর্ব্বদা সমভাবে ৯৮,৪° ডিগ্রী রাখিতে পারিলে প্রকৃত স্বাস্থ্যলাভ করা যায়। কামক্রোধাদিতেও দেহমন উভয়ই উত্তপ্ত হয়, এবং বিপত্তীতিবিভীষিকাতেও সমকালে উভয়ের স্বাভাবিক তাপ হ্রাস প্রাপ্ত হয়। তাই বলি ভাই! কায়মনে সতত নর্ম্যাল টেম্পারেচার রক্ষা করিতে চেষ্টা করিবে।

(৭১)

সাধারণ লোকে সন্ধ্যাকালে দেবতার আরতি দেখিয়া সন্তুষ্ট হয়, পরন্তু প্রেমিক সাধকেরা নিশিদিন আত্মারতিতে আত্মহারা। তাঁহাদের দেখিবার শুনিবার শক্তি নাই, শুদ্ধ চৈতন্যলাভ করিয়া তাঁহারা অচৈতন্য হইয়াছেন, প্রাণের সামগ্রী পাইয়া পরমানন্দে পাগল হইয়াছেন; সেই আঁখির আরাম আনন্দ জ্যোতিঃ দর্শনে তাঁহাদের নয়ন অন্ধ হইয়াছে, হৃদয়মন্দিরে শঙ্খ ঘণ্টা দুন্দুভিনাদে তাঁহাদের শ্রবণ বধির হইয়াছে; তাঁহারা

কখন স্তম্ভিত, কখন চকিত, কখন আনন্দিত, কখন উৎকণ্ঠিত, কখন অনিমেষ, কখন মুদ্রিত নয়ন; তাঁহারা কখন "মা" "মা" বলিয়া কাঁদিয়া উঠেন, কখন "বাবা" "বাবা" বলিয়া তাণ্ডব নৃত্যে উন্মত্ত হন, তাঁহাদের আকার প্রকার বড় বিচিত্র ও বিস্ময়কর।

(৭২)

যাহার অন্তরে স্নেহ পদার্থ আছে তাহাই জ্বলিবে, স্নেহই দাহবস্তুর দহন ক্রিয়ার সাধনীভূত কারণ; তাই বলি ভাই! জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিলেও স্নেহ প্রস্রবণের আশ্রয় ছাড়িও না।

(৭৩)

যখন কোন দুশ্চিকিৎস্য ভীষণ রোগের বীজাণু দ্বারা কোন স্থানের বায়ু দূষিত হয়, তখন একটা খুব ঝড় বৃষ্টি বিদ্যুৎ বজ্রাঘাত হইতে সে হাওয়া বদলাইয়া যায়; সেইরূপ যখন আমাদের মনের কোনরূপ ঘোরতর বিকার উপস্থিত হয়, তখনই মঙ্গলময়ের সূক্ষ্ম সুন্দর নিয়মে কোন না কোন বিপদ আপদের প্রবল ঝঞ্ঝাবাত আসিয়া আমাদের হৃদয় পূত, পরিষ্কৃত ও প্রশান্ত করিয়া দেয়।

(৭৪ (

প্রদীপ জ্বলিলে কালো জিনিসই ভাল দেখা যায়, উজ্জ্বল জিনিসের দীপ্তি বৃদ্ধি হইয়া আমাদের দর্শনশক্তিকে অভিভূত করে। তাই বলি ভাই! সেই জ্যোতির জ্যোতিঃ জ্যোতির্ম্ময়ী মাকে আমার দেখিতে হইলে অন্ধ বিশ্বাসে দেখিবে, জ্ঞানের আলো লইয়া যাইও না বিপদে পড়িবে, তাহা হইলে তাঁহার দিকে তাকাইবার আর ক্ষমতা থাকিবে না। যাঁহারা জ্ঞান বা প্রেমের প্রদীপ লইয়া খুঁজিয়াছেন তাঁহারাই আমার মাকে কালো বলিয়া স্থির করিয়াছেন এবং মা কৃপা করিয়া কালো রূপ ধরিয়াছেন বলিয়াই তাঁহার দর্শন তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব হইয়াছে। প্রদীপ ধরিয়া কোটী সূর্য্যপ্রসবিণীকে খুঁজিয়া বেড়াইলে পাগলেও তাহাকে পাগল বলে। (ক্রমশঃ)

শ্রীগোবিন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিচার সাগর।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

বিমলিন সত্বগুণ সহিত অজ্ঞান।
চৈতন্য আভাস তার আর অধিষ্ঠান॥
এ তিন মিলনে জীব যেই কর্ম্ম করে।
করম ফলের আশা ধরে সে অন্তরে॥ ১৫৫॥

[টীকা :—রজ ও তমোগুণে মিলিত সত্বগুণ সহিত অজ্ঞান, ও সেই অজ্ঞান অংশে যে চৈতন্য আভাস, এবং সেই অজ্ঞানের অধিষ্ঠান কূটস্থ—এই তিনের মিলকে জীবপদ কহে। সেই জীব কর্ম্ম করে ও কর্ম্মফল আশা করে।

জীবের সেই কর্ম্ম অনুসারে উত্তম অধম ভোগ নিমিত্ত ঈশ্বর সংসার সৃষ্টি করেন। সুতরাং ঈশ্বরে বিষমদৃষ্টি বা ক্রূরতা নাই। যিনি কহেন যে, সর্ব্ব প্রথম সৃষ্টিতে পূর্ব্ব কর্ম্ম নাই, এবং প্রথম সৃষ্টিতে উত্তম অধম প্রাণী সৃজনে ঈশ্বরের বিষম দৃষ্টি লক্ষিত হয়—একথা সম্ভবেনা। কারণ সংসার অনাদি, উত্তরোত্তর সৃষ্টি পূর্ব্ব পূর্ব্ব কর্ম্ম হেতু। সর্ব্বপ্রথম কোন সৃষ্টি নাই, সুতরাং ঈশ্বরে কোন দোষ নাই।]

যথাক্রমে অবিচ্ছেদে প্রবাহের মত।
সৃষ্টি স্থিতি লয় শিষ্য সংঘটন যত॥
এক সৃষ্টি পূর্ব্বগত প্রলয়ের পরে।
সূক্ষ্ম ভাবে রহে সব মায়ার উদরে॥
ত্রিগুণ সে মায়া, শিষ্য সকল নিলয়।
জগৎ উদ্ভব স্থান আর তার লয়॥
পূর্ব্ব সৃষ্টি কৃত জীবকর্ম্ম অনুসারে।
ইচ্ছে ঈশ জীব ভোগ জগ করিবারে॥
প্রলয়েতে গুণত্রয় সাম্যভাবে রয়।
সৃষ্টি কালে গুণক্ষোভ সে ইচ্ছায় হয়॥
ইচ্ছামাত্র সে ক্ষোভন, নহে ক্রিয়াফল।
সন্নিকট গন্ধে যথা চিত্ত সচঞ্চল॥

"এক আমি বহু হব" ইচ্ছার প্রকাশ।
গুণ ক্ষোভে হয় সৃষ্টি, এ বহু বিকাশ॥
গুণসাম্য নাম শিষ্য তত্ত্ব পরধান।
গুণ ক্ষোভে মহত্তত্ত্ব কহে জ্ঞানবান॥
বীজ যথা থাকে ঢাকা ত্বক্ আচ্ছাদনে।
মহত্তত্ত্ব থাকে তথা সাম্য আবরণে॥
সাত্ত্বিকাদি ভেদে তিন, মহৎ প্রকার।
সেই ভেদে হয় ত্রয় তত্ত্ব অহঙ্কার॥
তামস সে অহঙ্কার হইলে ক্ষোভন।
যথাক্রমে হয় পঞ্চভূতের সৃজন॥
সেই অহঙ্কার যে'ন হয়রে ক্ষোভন।
শব্দতন্মাত্র তায় হয় বিস্ফুরণ॥
শব্দতন্মাত্র যেই—ক্ষুভিত হইল।
শব্দগুণ নভ তায় শিষ্য উপজিল॥
তামস সে অহঙ্কার আবরিল উভে।
শব্দতন্মাত্র আর শব্দগুণ নভে॥
আকাশ ক্ষোভনে শিষ্য স্পর্শ মাত্র হল।
তাহাতে পরশগুণ বায়ু মহাবল॥
নভ স্পর্শমাত্র আর বায়ু আচ্ছাদিল।
বায়ুর ক্ষোভনে রূপমাত্র জনমিল॥
রূপমাত্রে রূপগুণ তেজ উপজিল।
বায়ু রূপমাত্র আর তেজ আবরিল॥
তেজের ক্ষোভনে রসমাত্র জনমিল।
রসমাত্রে রসগুণ জল উপজিল॥
রসমাত্র আর জল তেজেতে ঢাকিল।
জলের ক্ষোভনে গন্ধমাত্র জনমিল॥
গন্ধমাত্রে গন্ধগুণ পৃথ্বী উপজিল।
গন্ধমাত্র আর পৃথ্বী জলে আবরিল।

(সবিস্তার ভূত সৃষ্টি এরূপ হইল॥)
নভ বায়ু তেজ জল পৃথ্বী পঞ্চভূত।
শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ সমযুত॥
রাজস সে অহঙ্কার তৈজস বাখান।
তাহার বিকারে দশ ইন্দ্রিয় ও প্রাণ॥
সাত্ত্বিক সে অহঙ্কারে বৈকারিক কয়।
তার ক্ষোভে দশ দেব আর মন হয়॥
মহত্তত্ত্ব আদি হতে মহাভূত মিলি।
প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ড উদরে সকলি॥
এক দিবাকর যথা অসংখ্য কিরণ।
অজস্রধারায় শিয্য করে উদ্গীরণ।
তথা এক ঈশ হতে নানাকৃতিময়।
নানাবর্ণ সুবিশাল বিশ্ব এই হয়॥
দীপালোক থাকে যথা কাচ আচ্ছাদনে।
সেইরূপ থাকে ঈশ বিশ্ব আবরণে॥ ১৫৬॥

[টীকা :—ঈশ্বর জীবগণের কর্ম্মফলদানে উদাসীন হইলে প্রলয় উপস্থিত হয়। প্রলয়কালে সর্ব্বপদার্থ সংস্কাররূপে মায়ায় নিহিত থাকে। সুতরাং জীবগণের অভুক্ত কর্ম্ম সকল সূক্ষ্মভাবে মায়ায় নিহিত থাকে। জীবের কর্ম্মভোগ আবার সম্মুখ হইলে ঈশ্বরের এই ইচ্ছা হয় যে "জীবগণের ভোগ নিমিত্ত জগৎ সৃষ্টি হউক।"

ঈশ্বরের এই ইচ্ছায় মায়ার গুণসাম্য ক্ষোভন হয়। পরিমল নিকটবর্ত্তী হইলেই, যেমন চিত্তচাঞ্চল্য ঘটে, সেইরূপ সেই ইচ্ছামাত্রেই গুণসাম্য ক্ষোভন হয়। সেই ক্ষোভণের মধ্য হইতে এক মধুর অস্ফুট ধ্বনি উঠিতে থাকে— "একোঽহম্ বহুস্যাম" (এক আমি বহু হইব) এই বহু বিকাশ ইচ্ছাই সৃষ্টি ও জীবোৎপত্তির কারণ। এই সৃষ্টিব্যাপার অনুশীলন করিলে একত্ব হইতে বহুত্ব ও ঋজুত্ব হইতে বিচিত্র জটিলতা পরিদৃষ্ট হয়। যেরূপ এক দিবাকর হইতে অসংখ্য কিরণ সমূহ উদ্ভূত হয়, সেইরূপ এক ঈশ্বর হইতে এই নানাবর্ণাকৃতিময় সুবিশাল বিশ্ব সম্ভূত হয়।

সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়, যথা ক্রমে অবিচ্ছেদে প্রবাহরূপে সংঘটিত হইতেছে। সৃষ্টির পূর্ব্বে অতীত প্রলয়ের পর সমস্তই "অব্যক্ত" মায়া দ্বারা আবৃত থাকে। ঋষিগণ সেই "অব্যক্তকে" সূক্ষ্মপ্রকৃতি বলিয়া অভিহিত করেন।

সচ্চিদানন্দময় পরব্রহ্মের বিশালবক্ষে অসংখ্য চিৎপুঞ্জ অবস্থিত। সেই চিৎপুঞ্জ সর্ব্বশক্তিমান, ও প্রত্যেকেই এক এক বিশ্বের কেন্দ্ররূপে নিত্যই বিরাজমান। যিনি যে বিশ্বের কেন্দ্র, তিনি সেই বিশ্বের ঈশ্বর। ঈশ্বর সেই "অব্যক্ত" আবরণ অনুপ্রাণিত করিয়া বিশ্বসৃষ্টি করেন। প্রলয় কালে বিশ্ব "অব্যক্তে" বিলীন থাকে, এবং সৃষ্টিকালে সেই চিৎযোগে "অব্যক্ত" হইতে সমুত্থিত হয়। স্ফটিকাবরণে দীপালোকের ন্যায় বিশ্ব মধ্যে ঈশ্বর আবৃত থাকেন।

"অব্যক্ত" বা মায়া ত্রিগুণাত্মক। প্রলয়কালে সত্ত্বাদি গুণত্রয় সাম্যাবস্থায় (state of equilibrium) থাকে। এই গুণসাম্যকে "প্রধান" তত্ত্ব কহে। সৃষ্টিকালে ঈশ্বর ইচ্ছানুরূপ সেই গুণসমস্ত ক্ষুভিত করিয়া সত্ত্বাদি গুণত্রয়কে কার্য্যোন্মুখ করেন। তখন চিৎপ্রভাবে সেই গুণসাম্য হইতে গুণ ব্যঞ্জন হয়। সেই গুণ ব্যঞ্জনকে ঋষিগণ মহত্তত্ত্ব কহেন। মহত্তত্ত্ব ত্রিবিধ—সাত্ত্বিক,রাজসিক ও তামসিক। ঐ ত্রিবিধ মহত্তত্ত্ব হইতে ত্রিবিধ অহঙ্কার তত্ত্বের উৎপত্তি। তামসিক অহঙ্কার ক্ষুভিত হইয়া শব্দতন্মাত্র ও শব্দতন্মাত্র হইতে শব্দ-গুণ বিশিষ্ট আকাশের (mighty element of Ether)সৃষ্টি হয়।* সেই তাম-সিক অহঙ্কার শব্দতন্মাত্র ও শব্দগুণ বিশিষ্ট আকাশকে আবৃত করে। আকাশ ক্ষুভিত হইয়া স্পর্শতন্মাত্রের সৃষ্টি হয়, ও তাহা হইতে স্পর্শগুণ বিশিষ্ট বায়ু উৎপন্ন হয়। আকাশ সেই স্পর্শতন্মাত্র ও বায়ুকে আবৃত করে। বায়ু ক্ষুভিত হইয়া রূপতন্মাত্র উৎপাদন করে। রূপতন্মাত্র হইতে রূপগুণ বিশিষ্ট তেজের

---

* আকাশ তত্ত্বের মূলে আরো ২টি তত্ত্ব আছে। তাহাদের নাম আদি ও অনুপাদক। এই তত্ত্বদ্বয় আমাদের জ্ঞান ও চিন্তার অতীত।

প্রাচীন শাস্ত্রের "তত্ত্ব" আধুনিক পশ্চাত্য বিজ্ঞানের "পরমাণু" (Atom). একটিমাত্র "পরমাণু" আছে বলিয়া পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ ভ্রমে পতিত হন। তাঁহার কারণ এই যে তাঁহারা কেবল পৃথ্বীতত্ত্বের অনুশীলনে ব্যাপত; অপর তত্ত্বগুলি তাঁহাদের লক্ষ্য পথের বাহিরে।

উৎপত্তি হয়। বায়ু সেই রূপতন্মাত্রও তেজকে আবৃত করে। তেজের ক্ষোভনে রসতন্মাত্র উৎপন্ন হয়। সেই রসতন্মাত্র হইতে রসগুণ জলের উৎপত্তি হয়। তেজ সেই রসতন্মাত্র ও জলকে আবৃত করে। জলের ক্ষোভণে গন্ধতন্মাত্র উৎপন্ন হয়। সেই গন্ধতন্মাত্র হইতে গন্ধগুণ পৃথ্বীর উৎপত্তি হয়। জল সেই গন্ধতন্মাত্র পৃথ্বীকে আবৃত করে।

এইরূপে তামস অহঙ্কার হইতে ভূত তন্মাত্রের সৃষ্টি হয়। রাজসিক অহঙ্কার বা তৈজস হইতে ইন্দ্রিয়গণ† ও পঞ্চ প্রাণের‡ উৎপত্তি হয়। সাত্বিক অহঙ্কার বা বৈকারিক হইতে ইন্দ্রিয়গণের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা সমূহের ও অন্তঃকরণের উৎপত্তি হয়।

আকাশ শব্দগুণ—তাহাতে প্রতিধ্বনিরূপ শব্দ আছে। বায়ুতে সাঁ সাঁ শব্দ ও শীতোষ্ণ কঠিন হইতে বিলক্ষণ স্পর্শ অনুভূত হয়। অগ্নিরূপ তেজে ধক্ ধক্ শব্দ, উষ্ণস্পর্শ ও প্রকাশ রূপ আছে। জলে কল কল শব্দ, শীত স্পর্শ, শুক্লরূপ ও মধুর রস আছে। জল এক রকম, তবে পৃথ্বীসংযোগে কটু ও ক্ষার আস্বাদ হয়। আমলকী কি হরিতকী চিবাইয়া জল পান করিলে জলের মধুর রস প্রতীত হয়। পৃথিবীতে কট্ কট্ শব্দ শীতোষ্ণ বিলক্ষণ কঠিন স্পর্শ, শ্বেত পীত নীল রক্ত হরিতাদি রূপ, মধুর, অম্ল,তিক্ত, কষায় ক্ষার রস ও দ্বিবিধ গন্ধ আছে। এই রীতিতে আকাশে এক, বায়ুতে দুই, তেজে তিন, জলে চার ও পৃথ্বীতে পাঁচ গুণ আছে। প্রত্যেকের স্বগুণ এক ও অতিরিক্তগুণ তত্তৎ কারণের। সকলের মূল কারণ ঈশ্বর। ঈশ্বরে মায়া ও চৈতন্য এই দুই অংশ। মায়ার মিথ্যাত্ব ও চৈতন্যর সত্তাস্ফূর্ত্তি সর্ব্বভূতেই বিরাজমান।

সাত্বিক অহঙ্কার হইতে অন্তঃকরণের উৎপত্তি। অন্তঃকরণ জ্ঞানের হেতু। অন্তঃকরণ হইতেই জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। সুতরাং অন্তকরণ ভূত সমূহের সত্ত্বগুণের কার্য্য। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চভূতের সহায়ক। অন্তর অর্থাৎ দেহের ভিতর ও করণ অর্থে জ্ঞানের সাধন। অন্তঃকরণের পরিমাণকে বৃত্তি কহে। অন্তঃকরণ বৃত্তি চতুর্ব্বিধ (১) বুদ্ধি (২) মন (৩) চিত্ত ও (৪) অহঙ্কার। পদার্থের তারতম্য নিশ্চয়কারি বৃত্তিকে বুদ্ধি কহে। সঙ্কল্প বিকল্প বৃত্তিকে মন কহে। চিন্তা বৃত্তিকে চিত্ত কহে। "আমি" এই বিশিষ্ট অভিমান বৃত্তিকে অহঙ্কার কহে।

---

† পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়। ‡ পান, অপান, সমান, ব্যান ও উদান।

রাজস অহঙ্কার হইতে ক্রিয়া, শক্তি, প্রাণ, এবং জ্ঞান ও কর্ম্মেন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়। ক্রিয়া ও স্থান ভেদে প্রাণ পঞ্চপ্রকার। যাহার স্থান হৃদয় ও ক্রিয়া ক্ষুৎপিপাসা, তাহাকে প্রাণ কহে। যাহার স্থান পায়ু, ও ক্রিয়া মল মূত্র অধোনয়ন, তাহাকে অপান কহে। যাহার স্থান নাভি ও ক্রিয়া ভুক্তপীত অন্নজল পাবনযোগ্য করা, তাহাকে সমান কহে। যাহার স্থান কণ্ঠ, ও ক্রিয়া শ্বাস প্রশ্বাস তাহাকে উদান কহে। যাহার স্থান সর্ব্বশরীর, ও ক্রিয়া রসমিশ্রন, তাহাকে ব্যান কহে।

রাজসিক অহঙ্কার বিকারে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়। শ্রোত্র, চক্ষু, ত্বক্‌, ঘ্রাণ ও জিহ্বা এই চার বিজ্ঞানেন্দ্রিয়। বাক, পানি, পাদ, পনয়ু ও উপস্থ এই কয়টি কর্ম্মেন্দ্রিয়। (ক্রমশঃ)

শ্রীবিজয় কেশব মিত্র বি, এল।

চন্দ্রালোকে।

(গল্প)

অপরাহ্নে দুইটী যুবক এক সুবৃহৎ অট্টালিকার সম্মুখস্থ বিস্তৃত পুষ্পোদ্যানে প্রবেশ করিয়া কিয়ৎক্ষণ পদচালনার পর একটী মঞ্চের উপর উপবেশন করিল। উভয়েই সমবয়স্ক—বয়স প্রায় ২২। ২৩ বৎসর। তাহাদের মধ্যে একটীর নাম বিমল ও অন্যটীর নাম প্রফুল্ল; বিমল প্রফুল্লের বন্ধু এবং সহাধ্যায়ী। প্রফুল্ল এই হরিপুর গ্রামের স্বনামখ্যাত জমীদার শ্রীযুক্ত শশিশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের একমাত্র পুত্র। বিমল কলিকাতা নিবাসী কোন এক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণকুমার। প্রফুল্লের পিতামহ ৺চন্দ্রশেখর বন্দোপাধ্যায় অধিক বেতনে সরকারি কার্য্যে নিযুক্ত হন। এতদ্ব্যতীত সৌভাগ্যক্রমে তিনি অতুল সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছিলেন। এই হরিপুর গ্রাম সেই সম্পত্তির অন্তর্গত। তিনি পূর্ব্বে বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত দেবীপুরে বাস করিতেন। ৫০। ৬০ বৎসর পূর্ব্বে উক্ত গ্রাম ভদ্রলোকের বাসোপযোগী না থাকায় তিনি পৈত্রিক আবাস ত্যাগ করিয়া হরিপুরে আসিয়া বাস করেন। তিনি অতিশয় ধর্ম্মভীরু লোক ছিলেন; এই কারণে হরিপুরের আবাল বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই তাহাকে ভক্তি ও বিশ্বাস করিত। হরিপুরের পূর্ব্ব জমীদার মৃতদার ও

অপুত্রক ছিলেন। তাঁহার সহিত চন্দ্রশেখর বাবুর অচ্ছেদ্য প্রণয় ছিল। তাঁহার এই অতুল সম্পত্তির অন্য কেহ উত্তরাধিকারী না থাকায় অন্তিমকালে তিনি এই মর্ম্মে এক উইল করিয়া যান যে, তাঁহার সম্পত্তির তিন-চতুর্থাংশ দেবসেবা অতিথিসেবা প্রভৃতি বিবিধ সৎকর্ম্মে ব্যয়িত হইবে, এবং এই সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহের ভার তাহার বন্ধু চন্দ্রশেখর বাবুর উপর ন্যস্ত থাকিবে। অবশিষ্ট একচতুর্থাংশ চন্দ্রশেখর বাবু এই বাটীতে অবস্থান করিয়া পুত্র পৌত্রাদিক্রমে ভোগদখল করিবেন।

তাঁহার মৃত্যুর পর চন্দ্রশেখর বাবু সপরিবারে এই বাটীতে আসিয়া বাস করেন। বাটীর দক্ষিণ পার্শ্বে অতিথিশালা এবং বাম পার্শ্বে একটী উচ্চ দেবমন্দির। সম্মুখে সেই পুষ্পোদ্যান। চন্দ্রশেখর বাবু আজ প্রায় বিংশতি বৎসর হইল মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। তাহার পুত্র শশিশেখর বাবু এখন সমস্ত বিষয় সুচারুরূপে পরিদর্শন করিতেছেন।

আগামী মাসে প্রফুল্লের বিবাহ, তাই আজ কাল হরিপুরে বড়ই ধুম পড়িয়াছে। পুরাতন অট্টালিকা, রাস্তা, ঘাট প্রভৃতির মেরামত হইয়াছে। স্থানে স্থানে নহবত বসিয়াছে। পতাকা সমূহ পত্ পত্ রবে উড়িতেছে। যেন হরিপুর গ্রামখানি নূতন সাজে সজ্জিত হইয়া আনন্দে নৃত্য করিতেছে। বিবাহ এই বাটী হইতেই সম্পন্ন হইবে। শশিশেখর বাবু একমাত্র পুত্র প্রফুল্লের জন্য, অনেক দিন হইতে একটী সৎকুলোদ্ভবা সুলক্ষণা পাত্রীর অনুসন্ধানে ছিলেন। সম্প্রতি বিধি তাঁহার মনোবাসনা পূর্ণ করিয়াছেন। কিন্তু পাত্রীর পিতা নিতান্ত দরিদ্র; দু'দশ টাকা ব্যয় করেন এমনও সামর্থ্য নাই। এই কারণে শশিশেখর বাবু পিতামাতা আত্মীয় স্বজনসহ পাত্রীকে নিজ ভবনে আনয়ন করিয়াছেন। এই সুযোগে যে বর কন্যার পরস্পর যে দর্শন ঘটে নাই, এমন নহে। পাত্রী নিতান্ত বালিকা নহে; বয়স ত্রয়োদশ বৎসর। নাম কমলা।

বিমল—"প্রফুল্ল! তোমার বিবাহের আর অধিক দিন নাই, অন্ততঃ পনর দিনের কমে আমরা বৃন্দাবন হইতে কোন ক্রমে ফিরিতে পারিব না। আমার বিবেচনায় তোমার বিবাহের পর বৃন্দাবন যাত্রা যুক্তি সঙ্গত; কারণ বিঘ্ন পদে পদে। যদি কোন ক্রমে নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ফিরিতে না পারি? আর এ সময়ে তোমার পিতা মাতাই বা তোমাকে ছাড়িবেন কেন?

তোমার বিবাহের কথা লিখিলে আমি এখন না আসিয়া বিবাহের দু এক দিন অগ্রে আসিতাম এবং তৎপরে উভয়ে স্বচ্ছন্দে যাইতে পারিতাম।

প্রঃ।—"তুমি যাহা বলিলে, সমস্তই যুক্তিসঙ্গত বটে, কিন্তু এ সময়ে বাড়ী থাকিতে কেমন লজ্জাবোধ হয়। বিশেষতঃ আমার অনেক দিন হইতে একবার বৃন্দাবনে বেড়াইতে যাইবার ইচ্ছা হৃদয়ে পোষণ করিয়া আসিতেছি। মা ও বাবা অনুমতি দিয়াছেন।"

বিঃ।—"যদি সেখানে কোন বিপদ উপস্থিত হয়, তখন উপায়!"

প্রঃ।—"যাহা ঘটিবার তা ঘটিবেই; এখানে থাকিলেও ঘটিবে, আর বৃন্দাবনে থাকিলেও ঘটিবে। তবে স্থানের মাহাত্ম্য মানিলে, বৃন্দাবনই শ্রেষ্ঠ। যাহা হউক, সে জন্য তোমাকে তত ভাবিতে হইবে না। সে সম্বন্ধে আমরা যে দৈববলে বলীয়ান, তাহা কি জান না॥"

বিঃ।—"কি রকম!"

প্রঃ।—"কেন, আমাদের বাটীর সম্বন্ধে যে একটী প্রবাদ আছে তাহা কি এ পর্য্যন্ত কখন শুন নাই।"

বিঃ।—"তুমি ত আমাকে কিছু বল নাই।"

প্রঃ।—"ঐ যে মন্দির দেখিতেছ,ঐ মন্দিরের প্রবেশ পথে একটী বৃহৎ ঘণ্টা ঝুলান আছে। আমাদের কোন গুরুতর বিপৎপাতের সময় হইলে ইহা নিজে নিজে বাজিতে থাকে। ইহা হইতে যে একটা বিপদ আজই হউক, আর দুদিন পরেই হউক ঘটিবে, সেটী বুঝিতে পারি। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আমাদের পরিবারবর্গ, যিনি যেখানেই থাকুন না কেন, ঐ শব্দ শুনিতে পান। আমার ঠাকুরদাদার মৃত্যুকালে বাবা কাশীধামে ছিলেন। তিনি একদিনের জ্বরে মারা পড়েন। বাবার সহিত দেখা করিবার জন্য তিনি অত্যন্ত অস্থির হন এবং তারযোগে সংবাদ প্রেরণ করেন। সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া বাবা তদ্দণ্ডেই যাত্রা করিবেন, এমন সময়ে ঘণ্টার শব্দ তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। সুতরাং তিনি অনুমান করিলেন যে অন্তিমকালে পিতা পুত্রের সাক্ষাৎ ঘটিবে না। যে আশঙ্কা তাহার মনে স্বততঃই উদয় হইয়াছিল, বাটী আসিয়া দেখিলেন, তাহা সত্যে পরিণত হইয়াছে।"

"তুমি কখন শুনিয়াছ!"

"অনেকবার শুনিয়াছি। বাল্যকালে মনে করিতাম পূজার সময় যেমন অন্যান্য ঘণ্টা বাজে, এটীও তাই। আরও পাছে আমি ভয় পাই, এজন্য এসম্বন্ধে আমাকে কেহ কিছু বলিত না। কিন্তু চিরদিন এরূপ বিষয় গোপন থাকে না। অবশেষে আমি জানিতে পারিয়া সুযোগক্রমে দুই একটা ঘটনা মিলাইয়া দেখিয়াছি। আশ্চর্য্যের বিষয় সমস্তই মিলিয়াছে।

"ভুতের দৌরাত্মের কথা অনেক শুনিয়াছি বটে, কিন্তু এরূপ ঘটনা কখন শুনি নাই। কত দিন হইতে ইহা ঘটিয়া আসিতেছে?"

"শুনিয়াছি মন্দির স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গেই—।"

"রহস্যটী উদ্ঘাটনের চেষ্টা কখন করিয়াছ ?"

"ঘণ্টাটী যে আপনাআপনি বাজে, তাহা আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি।"

"তোমার কথায় ও আমার অবিশ্বাস নাই। তবে যদি এখন একান্তই যাইবে বলিয়া মানস করিয়া থাক, তাহা হইলে আর বিলম্ব করা বিধেয় নহে। যাহাতে আগামী কল্যই যাত্রা করিতে পারি, তাহার বিধান কর।"

"সমস্তই আয়োজন করিয়া রাখিয়াছি।"

"বৃন্দাবনে বাসার কিরূপ বন্দোবস্ত করিয়াছ ?"

"সেখানে আমাদের যে ঠাকুরবাড়ী আছে, সেই স্থানেই থাকিবার স্থির হইয়াছে। বাবা সেখানের পূজারী ঠাকুরকে আমাদের যাইবার বিষয় লিখিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিয়া লিখিয়াছেন। বৃন্দাবনে তিনিই আমাদের সমস্ত বিষয়ের বন্দেবাস্ত করিয়া দিবেন।"

"তবে আমরা যে কল্য যাত্রা করিব, এ বিষয় তাঁহাকে এখনই টেলিগ্রাম করা হউক।"

"চল, রাত্রি হইয়াছে। টেলিগ্রাম করিবার জন্য অফিসে লোক পাঠাইতে হইবে।"

(ক্রমশঃ) শ্রীবিরাজমোহন দে।

সমালোচনা।

সন্দর্ভ সংগ্রহ, প্রথম ভাগ, ডাক্তার শ্রীহেমচন্দ্র সেন প্রণীত, মূল্য ।/০ আনা মাত্র। হেমবাবুর সন্দর্ভগুলি পাঠ করিলেই প্রতীত হয় যে, তিনি শুধু জড়বাদী ডাক্তার নহেন; তিনি যোগী। বাস্তবিক পক্ষে স্থূলবিজ্ঞানের সঙ্গে সূক্ষ্মবিজ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞান না থাকিলে পূরাকালে কেহ চিকিৎসক হইতে পারিতেন না। জীবের শরীর বুঝিতে গেলে শুধু উপাদান গুলি বুঝিলে চলিবে না। যাহার শরীর তাহাকে, ও তাহার কর্ম্মও, বুঝিতে হইবে—তবেই চিকিৎসা; নচেৎ কেবল অন্ধকারে ঢেলা মারা। স্থূলবিৎ চিকিৎসক গল্পের তাঁতির ন্যায়। তাঁতি মহাশয়কে সকলে জ্ঞানী বলিয়া বিপদ আপদে তাহার পরামর্শ লইত। এক দিন একটী ডান্‌পিটে ছেলে তাল গাছে উঠিয়া নামিতে না পারাতে, গ্রামের লোক সমবেত হইয়া তাঁতি ভায়ার পরামর্শ লয়। তাঁতি মহাশয় বলিলেন,—"এর আর ভাবনা কি? যত মূর্খ কিনা;—যাও এক গাছা দড়ী লইয়া গাছে উঠিয়া বালকের কোমরে বাঁধিয়া দাও। তারপর নীচে হইতে টান।" তাহাই করা হইল, এবং বালকটী পড়িয়া মরিয়া গেল। তখন তাঁতি মহাশয় অপ্রতিভ হইয়া ভাবিতে ভাবিতে মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিলেন "এমনটা হল কেন। পেঁচোর মার বাছুরটা কূপে পড়ে গেলে, দড়ী বাঁধিয়া টানিতে ত বেশ উঠিয়া আসিল !!!" আমাদের মধ্যে আজ কাল অনেক ডাক্তারকে ঐ প্রকারে "এমনটা হল কেন" বলিতে হয়। সে যাহা হউক প্রবন্ধ গুলি বড় গভীর, এবং বড়ই দুর্ব্বোধ্য; কারণ সাধক ভিন্ন বিষয় গুলির অনুভব হয় না। কিন্তু স্থির মনে পড়িলে এবং মনে মনে ভাবিতে ভাবিতে বুঝা যাইতে পারে। সাধকগণ "হংসবিজ্ঞান" ও "আমি তাঁর অনুর অনু" শীর্ষক প্রবন্ধ দুটী পাঠ করিলে উপকৃত হইবেন।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের "গীতায় ঈশ্বর বাদ—" নামক পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য কাগজের মলাট ১৲ টাকা, কাপড়ে বাঁধাই ১।০ টাকা মাত্র। বারান্তরে বিষয়ের সমালোচনা হইবে। হীরেন্দ্র বাবুর পুস্তক যে পাঠক মাত্রেরই বিশেষ উপকারী হইবে, তাহা বলা বাহুল্য।

সাঃ মুঃ

নবম ভাগ। { পৌষ। } ৯ম সংখ্যা।

আনন্দ-লহরী।

(শঙ্করাচার্য্যকৃত।)

(১)

শিবঃ শক্ত্যা যুক্তো যদি ভবতি শক্তঃ প্রভবিতু
নচেদেবং দেবো নখলু কুশলঃ স্পান্দতুমপি।
অতস্ত্বামারাধ্যাং হরিহরবিরিঞ্চ্যাদিভিরপি,
প্রণন্তুং স্তোতুং বা কথমকৃতপুণ্যঃ প্রভবতি ॥

শক্তি সনে শিবের মিলন
জননি! যখন হয়, স্থজন-পালনলয়-
—করমে,জনমে তাঁর প্রভাব তখন;
প্রকৃতি বিহনে পুন পুরুষে না,বহে গুণ;
শব সম—নাহি থাকে স্ফুরণ-স্পন্দন,

নিগূঢ় তত্ত্বে, তোর নিরবধি হ'য়ে ভোর
হরিহরব্রহ্মা আদি করে আরাধন ;
মুই যে অকৃতি ছার কোন পুণ্যে মা! তোমার
তব যোগ্য নতিস্তুতি করিব সাধন ?

(২)

তনীয়াংসং পাংশুং তব চরণপঙ্কেরুহভবং,
বিরিঞ্চিঃ সঞ্চিন্বন্ বিরচয়তি লোকানবিকলং।
বহত্যেনং শৌরিঃ কথমপি সহস্রেন শিরসাং,
হরঃ সংক্ষুভ্যৈনং ভজতি ভসিতোদ্ধূননবিধিং॥

মহিমার কে করে বর্ণন ?
তব পাদ-পদ্ম ধূলি অবচয়ি কতগুলি,
বিরিঞ্চি রচনা করে নিখিল ভুবন ;
মহাবল বিষ্ণু আহা কত কষ্টে পুন তাহা
পাতিয়া সহস্র শির করয়ে বহন ;
নিজ তেজে ভস্ম করি' সেই রেণু-চূর্ণ ধরি'
নিজ অঙ্গে করে হর বিভূতি-লেপন ;
ওমা! তোর তেজোময় চরণ-পরাগচয়,
সৃজন পালন লয় সবার কারণ।

(৩)

অবিদ্যানামন্তঃস্তিমিরমিহিরোদ্দীপনকরী,
জড়ানাং চৈতন্যস্তবকমকরন্দশ্রুতিশিরা।
দরিদ্রানাং চিন্তামণিগুণমিকা জন্মজলধৌ,
নিমগ্নানাং দংষ্ট্রা মুররিপু-বরাহস্য ভবতি॥

অনুকম্পা তব অতুলন ;
মূঢ়জনচিত মাঝে যে ঘন তিমির রাজে,
জ্ঞানের মিহির তাহে করে উদ্দীপন ;
জড়-জন-হৃদি-শাখে যে পুষ্প-স্তবক থাকে,
তাহে মকরন্দ-ধারা করহ ক্ষরণ;

ভিখারীর চিন্তামণি তুমি মা! জগতে গুণি,
অভীষ্ট-পুরণ তরে সদা অকৃপণ ;
জনম-জলধি-জলে নিমগন নরদলে
উদ্ধারিতে বরাহের, তুমি মা! দশন।

(৪)

ত্বদন্যঃ পাণিভ্যা মভয়বরদে দৈবতগণঃ,
ত্বমেকা নৈবাসি প্রকটিতবরভীত্যভিনয়া।
ভয়াৎ ত্রাতুং দাতুং ফলমপিচ বাঞ্ছাসমধিকং,
শরণ্যে লোকানাং তব হি চরণাবেব নিপুনৌ॥

অসামান্য শকতি তোমার ;
আর যত দেবতারা বরাভয়দান তারা
করে শুধু কর তুলি,' অভিনয় সার।
হে লোক-শরণ্যে মাতঃ! তোমার করুণা-জাত
বরাভীতি দানরীতি বিভিন্ন প্রকার ;
ভয় হ'তে পরিত্রাণ, বাঞ্ছার অধিকদান,
ও রাঙ্গা চরণ যেই স্মরে একবার,
নিমেষে লভে সে জন ; যেমতি করুণ মন
বাসনা পূরণে তথা শকতি অপার।

(৫)

হরি ত্বামাধ্য প্রণতজনসৌভাগ্যজননীং,
পুরা নারী ভুত্বা পুররিপুমপি ক্ষোভমনয়ৎ।
স্মরোঽপি ত্বাং নত্বা রতিনয়নলেহ্যেনবপুষা,
মুনীনামপ্যন্তঃ প্রভবতি হি মোহায় মহতাং॥

ভকতের সৌভাগ্যদায়িনি !
তব কাম-কলা-রূপ ধ্যান করি' বিশ্বরূপ,
মহেশের চক্ষে ধরি' মূরতি মোহিনী
মোহন রূপের শরে বিঁধিল যে দিগম্বরে,
সে তোমার লীলা মাগো! বিশ্ব-প্রসবিনি!

মদন (৩) যে বারবার রতি-রুচি বপু তার,
রাখি আঁখি' পরে অয়ি চিরকুহকিনি !
মোহয়ে মুনির মন, সে তোমার অতুলন,
মায়া-খেলা জানি মাগো মহামায়াবিনি !

(৬)

ধনুঃ পৌষ্পং মৌর্ব্বী মধুকরময়ী পঞ্চবিশিখা,
বসন্তঃ সামন্তো মলয়মারুতায়োধনরথঃ।
তথাপ্যেকঃ সর্ব্বাং হিমগিরিসুতে কথমপি কৃপা,
মপাঙ্গাত্তে লব্ধা জগদিদমনঙ্গো বিজয়তে ॥

অতনু যে সামান্য মদন ;
কুসুমের ধনুখান পঞ্চমাত্র ফুলবান
মধুকরময় গুণ করিয়া ধারণ ;
বসন্তে সামন্ত করি', মলয়ের রথে চড়ি',
পলকে প্রলয় তুলি' জিনে ত্রিভুবন ;
সে শুধু মা ত্রিলোচনা। অপাঙ্গের কৃপাকণা,
হিমগিরি সুতে ! তোর করি আহরণ।
অনঙ্গের জগজয় তোমারি মহিমা কয়,
সৃজন লীলার হয় প্রধান কারণ !

(৭)

ক্বণৎকাঞ্চীদামা করিকলভকুম্ভ স্তনভরা,
পরিক্ষীণা মধ্যে পরিণত শরচ্চন্দ্রবদনা।
ধনুর্ব্বাণান্ পাশং সৃণিমপি দধানা করতলৈঃ,
পুরস্তাদাস্তাং নঃ পুরমথিতু রাহোপুরুষিকা ॥

ওমা সেই মুবতি তোমার—
করি-শিশু-কুম্ভ সম স্তনযুগ্ম অনুপম,
লাবণ্য-তরঙ্গ তুলে বক্ষেতে যাহার ;
যার ক্ষীণ কটি-তটে কিঙ্কিনী মধুর রটে,
শরদিন্দু-শোভা জিনি বদন যাঁহার ;

রাজে যা'র চারি করে চাপাঙ্কুশ পাশশরে,
ভোলায় ভোলার মন রূপশিখা যাঁর ;—
মহেশ-গৌরব-ভূমি ধরি' সে মুরতি তুমি,
উর ওমা ! মনোময়ি ! ধেয়ানে আমার।

(৮)

সুধাসিন্ধোর্মধ্যে সুরবিটপিবাটীপরিবৃতে,
মণিদ্বীপে নীপোপবনবতি চিন্তামণিগৃহে।
শিবাকারে মঞ্চে পরমশিবপর্য্যঙ্কনিলয়াং,
ভজন্তি ত্বাং ধন্যাং কতিচন চিদানন্দলহরীং।

ভজে তোমা ভকত মোহিত ;—
অমৃত-সিন্ধুর মাঝে মণিময় দ্বীপ রাজে,
কল্পতরুবাটিকায় হইয়ে বেষ্টিত ;
কদম্বের কুঞ্জবন শোভে তাহে সুশোভন,
চিন্তামণিময় গৃহ তাহে বিরাজিত ;
পঞ্চশিব সে মণ্ডপে স্তম্ভ রূপে সদা জপে,
তদুপরি আজ্ঞাচক্র আছে অবস্থিত ;
তদুপরি সিংহাসনে বিন্দুরূপ শিবাসনে,
চিদানন্দময়ি মাতঃ ! আছ অধিষ্ঠিত।

(৯)

মহীং মূলাধারে কমপি মণিপুরে হুতবহং,
স্থিতং স্বাধিষ্ঠানে হৃদি মরুতমাকাশমুপরি।
মনোঽপি ভ্রূমধ্যে সকলমপি ভিত্বা কুলপথং,
সহস্রারে পদ্মে সহ রহসি পত্যা বিহরসি॥

জাগো জাগো কুলকুণ্ডলিনি !
মূলাধার চক্রভাগে মেদিনী-মণ্ডল আগে,
তেজি' ধীরে স্বাধিষ্ঠানে উরি' বিজয়িনি !

বরুণ মণ্ডল হ'তে মণিপুর-চক্রপথে,
অলন্ত অনল ভেদি' উরধগামিনি।
হৃদি-স্থিত বায়ুময় অনাহত চক্রালয়,
ভেদিয়া, বিশুদ্ধ-চক্রে ব্যোমদেশ জিনি,
ভ্রূযুগ নিহিত মরি! আজ্ঞাচক্র পরিহরি',
বিহর মা সহস্রারে শিব-সোহাগিনি!

(১০)

সুধাধারাসারৈশ্চরণযুগলান্তর্ব্বিগলিতৈঃ,
প্রপঞ্চং সিঞ্চন্তী পুনরপি রসাম্নায়মহসা।
অবাপ্য স্বাং ভূমিং ভুজগনিভমধ্যুষ্টবলয়ং,
স্বামাত্মানং কৃত্বা স্বপিষি কুলকুণ্ডে কুহরিণি॥

কুলপথ ভেদি' সমুদয়;
সহস্রারে আরোহিয়া, পতি সহ বিহরিয়া,
পদাম্বুজসুধাধারে প্লাবি' চক্রচয়;
পুন সেই চক্রপথ অবরোহি' ক্রমাগত,
মূলাধারে ধীরে ধীরে হও মা উদয়;
সার্দ্ধ ত্রিবলয়াকার ধরিয়া ভুজঙ্গাকার,
ছিদ্রময় কুলকুণ্ড করিয়া আশ্রয়;
ফণামুখে ব্রহ্মদ্বার অবরোধি' পুনর্ব্বার,
হও মা নিদ্রিত তথা মুদ্রিত হৃদয়।

(ক্রমশঃ)

শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী।

শ্রুতিস্তুতিঃ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

শ্রুতয় উচুঃ।—জয় জয় জহ্যজামজিত দোষগৃভীতগুণাং,
ত্বমসি যদাত্মনা সমবরুদ্ধসমস্তভগঃ।
অগজগদোকসামখিল শক্ত্যববোধক তে,
ক্কচিদজয়াত্মনা চ চরতোঽনুচরেন্নিগমঃ॥১৪॥

শ্রুতয়ঃ উচুঃ ;—(হে) অজিত (মায়াত্মনভিভূত), জয় জয় (নিজোৎকর্ষমবষ্ক্টমাবিষ্কুরু।) দোষগৃভীতগুণাং (দোষায় আনন্দাত্মাবরণায় গৃভীতা গৃহীতা গুণাঃ সত্বাদয়ঃ যয়া তাং, যদ্বা, দোষে স্ববৃত্তিরূপয়ৈবাবিদ্যয়া জীবানাং বন্ধনে এব বিষয়ে গৃভীতঃ গৃহীতঃ গুণঃ স্ববৃত্তিরূপয়ৈব বিদ্যয়া তেষাং মোচনরূপঃ যয়া তাম্) অজাং (মায়াং) জহি (নাশয়।) যৎ (যস্মাৎ) ত্বম্ আত্মনা (স্বরূপভূতেন পরমানন্দেন তদভিন্নয়া শক্ত্যা এব) সমবরুদ্ধ সমস্তভগঃ (সংপ্রাপ্তসমস্তৈশ্বর্য্যাদিগুণঃ) অসি। অগজগদোকসাম্ (অগানি সর্ব্বদা স্থিরাণি বৈকুণ্ঠানি জগন্তি অস্থিরাণি ব্রহ্মাণ্ডানি ওকাংসি স্থানানি যেষাং তেষাং জীবানাম্) অখিলশক্ত্যববোধক (অখিলাঃ প্রাকৃতাঃ অপ্রাকৃতাঃ বা যাঃ শক্তয়ঃ তদববোধক তাসাং শক্তিত্বদায়ক) ক্কচিৎ (কদাচিৎ সৃষ্ট্যাদি সময়ে পুরুষরূপেণ) অজয়া (মায়য়া) আত্মনা (স্বয়ং ভগবদাদিরূপেণ স্বরূপশক্ত্যা) চ চরতঃ (চরন্তং) তে (ত্বাম্ অস্মল্লক্ষণঃ) নিগমঃ (বেদকদম্বঃ) অনুচরেৎ (প্রতিপাদয়েৎ, সেবেত)॥১৪॥

শ্রুতিগণ বলিলেন ;—হে অজিত, আপনার জয়!! আপনার জয়!!!। আপনি মায়ার বিনাশ সাধন করুণ। মায়া গুণবতী হইয়াও নাশ যোগ্যা ; কারণ, মায়ার গুণধারণ কেবল জীবকে বন্ধন করিয়া উক্ত বন্ধন মোচনের নিমিত্ত। মায়া অবিদ্যারূপা নিজবৃত্তি দ্বারা জীবের স্বরূপাবরণ পূর্ব্বক, পুনশ্চ বিদ্যারূপা নিজবৃত্তি দ্বারা তাঁহার মোচন সাধন করিয়া থাকেন। বন্ধন ও মোচন কার্য্যেই মায়ার গুণ ব্যক্ত হয়। অতএব মায়ার গুণধারণ দোষের নিমিত্তই বলা যাইতে পারে। যিনি দোষের নিমিত্ত গুণধারণ করেন, তাঁহার বিনাশ অবশ্য কর্ত্তব্য। অতএব আপনি তাদৃশী মায়ার বিনাশ সাধন

করিয়া নিজের উৎকর্ষ আবিষ্কার করুন। মায়ার বিনাশ সাধন করিতে গিয়া আপনার বন্ধনের আশঙ্কা নাই; কারণ, আপনি মায়ার অধীন নহেন, মায়াই আপনার অধীন। আপনার বশীভূতা মায়ায় আপনাকে জয় করিতে নিতান্ত অসমর্থা। বিশেষতঃ, সকল ঐশ্বর্য্য—সকল সামর্থ্য—সকল শক্তিই আপনার আয়ত্তাধীন। কি অপ্রাকৃত-বৈকুণ্ঠাদি ধামস্থ জীবনিচয় কি প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডবর্ত্তী জীবসমূহ সকলেরই যে কিছু শক্তি দেখা যায়, তৎ-সমস্তই আপনার, আপনিই শক্তির শক্তিত্বদায়ক। সৃষ্ট্যাদি সময়ে আপনি যখন শ্রীভগবদাদিরূপে নিজস্বরূপশক্তির সহিত ও পুরুষরূপে মায়ার সহিত বিহার করেন—লীলা করেন, তখন শ্রুতি সকল আপনার প্রতিপাদন দ্বারা আপনার সেবা করিয়া থাকেন।

উক্ত স্তবটী নিম্নলিখিত শ্রুতিগণের ঃ—

"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রযন্ত্যভি-সংবিশন্তি তদ্‌বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্‌ব্রহ্ম"। তৈত্তিরীয় উপনিষদ ।৩।১

"যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ। তং হ দেবমাত্মবুদ্ধিপ্রকাশং মুমুক্ষু বৈ শরণমহং প্রপদ্যে"। শ্বেতাশ্বতর ।৬।১৮

"যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্ বিজ্ঞানাদন্তরো যং বিজ্ঞানং ন বেদ যস্য বিজ্ঞানং শরীরং যো বিজ্ঞানমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ। বৃহদারণ্যক ।৩।৭।২২

"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম"। তৈত্তিরীয় ।২।২

"যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ, তস্মাদেতদ্ ব্রহ্মনাম রূপমন্নঞ্চ জায়তে"। মুণ্ডক ।১।১।৯

প্রথম তিনটি শ্রুতি সৃষ্ট্যাদি কার্য্য লিঙ্গ দ্বারা পুরুষরূপের প্রতিপাদক, এবং শেষ দুইটি সত্যাদি স্বরূপনির্দ্দেশ দ্বারা শ্রীভগবদ্রূপের প্রতিপাদক। এইরূপ শ্রুতি সকল মূল গ্রন্থে দেখিয়া লইবেন।

বৃহদুপলব্ধমেতদবযন্ত্যবশেষতয়া,
যত উদয়াস্তময়ৌ বিকৃতে' র্মৃদিবাবিকৃতাৎ।
অত ঋষয়ো দধুস্ত্বয়ি মনোবচনাচরিতং,
কথমযথা ভবন্তি ভুবি দত্তপাদানি নৃণাম্ ॥ ১৫ ॥

বৃহদিতি। অবশেষতয়া (বিশ্বস্মাৎ অবশিষ্যমানত্বেন) এতৎ (সর্ব্বং)

বৃহৎ (ব্রহ্ম এব) উপলব্ধম্ ।(অবগতম্।) যতঃ (উপাদানভূতাৎ) মৃৎ (মৃদঃ) ইব অবিকৃতাৎ (ব্রহ্মণঃ সকাশাৎ) বিকৃতেঃ (বিকারমাত্রস্য সর্ব্বকার্য্যস্য) উদয়াস্তময়ৌ (উৎপত্তিপ্রলয়ৌ) অবযন্তি (মন্যন্তে) অতঃ (উপাদানত্বেন সর্ব্বাত্মকত্বাৎ) ঋষয়ঃ (বেদাঃ) ত্বয়ি (ব্রহ্মণি এব) মনোবচনাচরিতং (মনসঃ আচরিতং তাৎপর্য্যং, বচনস্য আচরিতম্ অভিধানং চ) দধুঃ (ধৃতবন্তঃ, নিশ্চিতবন্তঃ।) নৃণাং (ভূচরাণাং যত্র কুত্রাপি) দত্তপদানি (দত্তানি নিক্ষিপ্তানি পদানি) ভুবি কথম্ অযথা (অদত্তানি) ভবন্তি ॥ ১৫ ॥

যাহা কিছু উপলব্ধ হয়, সে সকলই বৃহৎ ব্রহ্ম। বৃহৎ ব্রহ্মই সকলের অবশেষ থাকেন। যেমন মৃত্তিকা হইতে ঘটপটাদির উৎপত্তি ও বিনাশ, তেমনি অবিকৃত ব্রহ্ম হইতেই বিকারভূত বিশ্বের উৎপত্তি ও প্রলয় হইয়া থাকে। এই নিমিত্তই বেদ সকল তোমাতে মন ও বচনের ব্যাপার অর্পণ করিয়া থাকেন। যেমন, প্রাণীদিগের চরণ যেখানেই অর্পিত হউক, সেই স্থানই পৃথিবী, তেমনি মনুষ্য যাহা কিছু চিন্তা করেন বা বলেন, তাহাই বৃহৎ ব্রহ্ম ॥১৫॥

ইতি তব সূরয়স্ত্র্যধিপতেঽখিললোকমল-
ক্ষপণকথামৃতাব্ধিমবগাহ্য তপাংসি জহুঃ।
কিমুত পুনঃ স্বধামবিধুতাশয়কালগুণাঃ,
পরম ভজন্তি যে পদমজস্রসুখানুভবম্ ॥ ১৬ ॥

ইতি তবেতি। ভোঃ ত্র্যধিপতে (ত্রিগুণমায়ামৃগীনর্ত্তক, ঊর্দ্ধাধোমধ্যবর্ত্তমানানাং সর্ব্বেষামধীশ্বর, ত্বমেব সর্ব্বকারণত্বেন পরমার্থত্বাৎ ভজনীয়) ইতি (হেতোঃ) সূরয়ঃ (বিবেকিনঃ) তব অখিললোকমলক্ষপণকথামৃতাব্ধিম্ (অখিলস্য বাসনাপর্য্যন্তস্য লোকমলস্য কর্ম্মদোষস্য ক্ষপণী নিরসনী যা কথা সৈবামৃতাব্ধিঃ অপারপরমানন্দঃ তম্) অবগাহ্য (শ্রদ্ধয়া নিষেব্য) তপাংসি (তপঃ প্রধানানি তাপজনকানি বা কর্ম্মানি) জহুঃ (ত্যক্তবন্তঃ)। তেষাং সাধকানাম্ অপি যদি তত্র এবং তদা হে) পরম (সর্ব্বোৎকৃষ্ট), স্বধামবিধুতাশয়কালগুণাঃ (স্বধাম্না শুদ্ধাত্মস্বরূপস্ফুরণেন বিধুতাঃ ত্যক্তাঃ আশয়গুণাঃ অন্তঃকরণধর্ম্মাঃ রাগাদয়ঃ কালগুণাঃ জরাদয়ঃ চ বৈঃ তে যদ্বা স্বধাম্না স্বরূপসাক্ষাৎকারেণ বিধুতাঃ নির্জ্জিতাঃ আশয়ঃ অন্তঃকরণং কালঃ জরাদিহেতুঃ

কালপ্রভাবঃ গুণাঃ সত্ত্বাদয়ঃ চ যৈঃ তে) যে (আত্মারামতয়া জীবন্মুক্তাঃ) পুনঃ (তব) অজস্রসুখানুভবং (নিত্যানন্দচিদাত্মকং) পদং (ব্রহ্মাখ্যং তত্ত্বং স্বরূপং বা) ভজন্তি, (তে তম্ অবগাহ্য তানি জহুরিতি) কিমুত (বক্তব্যম্) ॥ ১৬ ॥

হে ত্রিগুণমায়ামৃগীনর্ত্তক, তুমি সর্ব্বকারণ বলিয়া পরমার্থ; তুমিই ভজনীয়। বিবেকী সকল তোমার সকল-লোক-মল-নিরমলকারী কথামৃতসাগরে অবগাহন পূর্ব্বক তপ ত্যাগ করিয়া থাকেন। হে পরম, স্বরূপসাক্ষাৎকার হেতু যাঁহাদিগের অন্তঃকরণ, কালপ্রভাব ও প্রকৃতিগুণ নির্জ্জিত হইয়াছে, যাহারা তোমার সচ্চিদানন্দাত্মক স্বরূপের ভজন করেন, তাঁহারা যে তোমার তাদৃশ কথামৃতসিন্ধুতে অবগাহন পূর্ব্বক তপ ত্যাগ করিবেন, তাহা বলা বাহুল্য ॥১৬॥

দৃতয় ইব শ্বসন্ত্যসুভৃতো যদি তেঽনুবিধা,
মহদহমাদয়োঽণ্ডমসৃজন্ যদনুগ্রহতঃ।
পুরুষবিধোঽন্বয়োঽত্র চরমোঽন্নময়াদিষু যঃ,
সদসতঃ পরং ত্বমথ যদেষ্ববশেষমৃতম্ ॥ ১৭ ॥

দৃতয় ইতি। অসুভৃতঃ (প্রাণিনঃ) দৃতয়ঃ (ভস্ত্রাঃ) ইব (শ্বসদাভাসাঃ অপি) যদি তে (তব) অনুবিধাঃ (অনুবিদধতি ইতি, অনুবর্ত্তিনঃ, ভক্তাঃ ভবন্তি তদা) শ্বসন্তি (প্রাণন্তি, জীবন্তি), যদনুগ্রহত (যস্য তব অনুগ্রহতঃ অনুগ্রহেণ অনুপ্রবেশেন লব্ধসামর্থ্যাঃ সন্তঃ) মহদহমাদায়ঃ (মহান্ অহম্ অহঙ্কারঃ চ আদিঃ যেষাং তে) অণ্ডং (সমষ্টিব্যষ্টিদেহরূপং ব্রহ্মাণ্ডম্) অসৃজন্ (সৃষ্টবন্তঃ।) (ত্বম্) অত্র (মহদাদিষু) অন্বয়ঃ (অন্বেতি অনুপ্রবিশতি ইতি)। যৎ (যস্মাৎ) সদসতঃ (স্থূলসূক্ষ্মাৎ অন্নময়াদেঃ যদ্বা সতঃ আনন্দময়াখ্যস্য পরমাত্মনঃ অবয়বস্য প্রিয়াদেঃ অসতঃ অন্নময়াদেঃ চ যৎ) পরং (পুচ্ছভূতং সর্ব্বপ্রতিষ্ঠা ব্রহ্ম তৎ খলু) ত্বম্। (তত্র অপি) এষু (প্রতিষ্ঠাবাক্যেষু) অবশেষং (বাক্যশেষত্বেনস্থিতম্) অথ ঋতং (সত্যং যদ্বস্তু তদপি ত্বম্ এব। অতঃ) অন্নময়াদিষু পুরুষবিধঃ (পুরুষাকারঃ) যঃ চরমঃ (আনন্দময়ঃ সঃ অপি ত্বম্ এব) ॥ ১৭ ॥

যাঁহারা তোমার অনুবর্ত্তী ভক্ত, তাঁহাদিগেরই জীবন সার্থক, তদিতর লোক সকল ভস্ত্রার ন্যায় কেবল বৃথা শ্বাস বহন করে মাত্র। মহৎ, অহম আদি তত্ত্ব সকল তোমারই অনুগ্রহে ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করে। তুমি মহদাদি তত্ত্বে

অনুপ্রবিষ্ট হইয়াই উহাদের অনুগ্রহ করিয়া থাক। সৎ ও অসতের যিনি প্রতিষ্ঠাভূত ব্রহ্ম, তিনিই তুমি। আবার ঐ প্রতিষ্ঠাবাক্যে যাহা অবশেষ, যাহা সত্য, অন্নময়াদিতে যিনি চরম পুরুষবিধ তিনিও তুমিই ॥১৭॥

উদরমুপাসতে য ঋষিবর্ত্মসু কূর্পদৃশঃ,
পরিসরপদ্ধতিং হৃদয়মারুণয়ো দহরম্।
তত উদগাদনন্ত তব ধাম শিরঃ পরমং,
পুনরিহ যৎ সমেত্য ন পতন্তি কৃতান্তমুখে ॥১৮॥

উদরমিতি। ঋষি বর্ত্মসু (ঋষীণাং সম্প্রদায়মার্গেষু) যে কূর্পদৃশঃ (কূর্পং শর্করারজঃ বিদ্যতে দৃক্ষু অক্ষিষু যেষাং তে রজঃ পিহিত দৃষ্টয়ঃ, স্থূল দৃষ্টয়ঃ শার্করাক্ষাঃ) উদরং (ব্রহ্মেতি মনিপুরস্থং বৈশ্বানরাখ্যং ব্রহ্ম) উপাসতে (ধ্যায়ন্তি)। আরুণয়ঃ (অরুণস্য অপত্যানি আরুণ্যাখ্যাঃ ঋষয়ঃ তু) পরিসর পদ্ধতিং (পরিতঃ সরন্তি প্রসর্পন্তি ইতি পরিসরাঃ নাড্যঃ তাসাং পদ্ধতিং মার্গং প্রসরণ স্থানং) হৃদয়ং (হৃদয়স্থং) দহরং (দহরাকাশাখ্যং ব্রহ্ম উপাসতে)। (হে) অনন্ত, ততঃ (হৃদয়াৎ) তব ধাম (উপলব্ধিস্থানং সুষুম্নাখ্যং) পরমং (শ্রেষ্ঠং জ্যোতির্ম্ময়ং) শিরঃ (মুর্দ্ধাণং প্রতি) উদগাৎ (উদসর্পৎ), যৎ সমেত্য (প্রাপ্য) পুনঃ ইহ কৃতান্তমুখে (কৃতান্তস্য কালস্য মুখে সংসারে) ন পতন্তি ॥১৮॥

ঋষি সম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁহারা স্থূলদর্শী, তাঁহারা উদর মধ্যস্থ বৈশ্বানরাখ্য ব্রহ্মের উপাসনা করিয়া থাকেন। আরুণিরা নাড়ী সমূহের প্রসর্পণ স্থানভূত হৃদয়ের অন্তর্গত দহরাকাশাখ্য ব্রহ্মের উপাসনা করিয়া থাকেন। হে অনন্ত, তোমার শ্রেষ্ঠ সুষুম্নাখ্য উপলব্ধিস্থান ঐ হৃদয় হইতে মস্তকে উদ্‌গত হইয়াছে ; ঐ স্থান লাভ হইলে, আর জীবকে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হয় না ॥১৮॥

স্বকৃতবিচিত্রযোনিষু বিশন্নিব হেতুতয়া,
তরতমতশ্চকাস্স্যনলবৎ স্বকৃতানুকৃতিঃ।
অথ বিতথাস্বমূষবিতথং তব ধাম সমং,
বিরজধিয়োঽনুযন্ত্যভিবিপণ্যব একরসম্ ॥১৯॥

স্বকৃতেতি। অনলবৎ স্বকৃতানুকৃতিঃ (স্বকৃতাঃ যোনীঃ অনুকরোতি

ইতি) স্বকৃতবিচিত্রযোনিষু (স্বেনৈব কৃতাসু বিচিত্রাসু উচ্চনীচমধ্যমাসু যোনিষু অভিব্যক্তিস্থানেষু দেবাদি দেহেষু) হেতুতয়া (উপাদানতয়া প্রয়োজকতয়া বা) বিশন্ ইব (বর্ত্তমানঃ ত্বং) তরতমতঃ (উৎকৃষ্টাপকৃষ্ট ভাবেন) চকাস্সি (অবভাসসে স্বশক্তিং প্রকাশয়সি)। অথ (অতএব) বিতথাসু (উৎপত্ত্যাদিনা বিকারবতীষু) অমুষু (যোনিষু) অবিতথং (সর্ব্বাবিকার রহিতম্ অতএব) সমং (তুল্যং সর্ব্বদা) একরসম্ (একরূপং) তব ধাম (স্বরূপম্) অভিবিপণ্যবঃ (অভিতঃ বিগতব্যবহারাঃ) বিরজধিয়ঃ (নির্ম্মলমতয়ঃ) অনুযন্তি (জানান্তি) ॥১৯॥

অগ্নি যেমন দাহ্য বস্তুর আকারের অনুরূপেই প্রকাশ পায়, আপনিও তদ্রূপ স্বমায়ারচিত বিচিত্র শরীরে প্রয়োজকরূপে প্রবিষ্টের ন্যায় বর্ত্তমান থাকিয়া উৎকৃষ্টাপকৃষ্টভাবে প্রকাশ পাইয়া থাকেন। অতএব নিষ্কাম নির্ম্মলমতি মুনিগণ ঐ সকল সবিকার দেহে বর্ত্তমান থাকিলেও, আপনার স্বরূপকে অবিকৃত, সম ও একরসই দর্শন করিয়া থাকেন ॥১৯॥

স্বকৃতপুরেষ্বমীষ্ববহিরন্তরসংবরণং তব,
পুরুষং বদন্ত্যখিলশক্তিধৃতোঽংশকৃতম্।
ইতি নৃগতিং বিবিচ্য কবয়ো নিগমাবপণং,
ভবত উপাসতেঽঙ্ঘ্রিমভবং ভুবি বিশ্বসিতাঃ ॥২০॥

স্বকৃত পুরেষ্বিতি। অমীষু স্বকৃতপুরেষু (স্বকৃতদেহেষু বর্ত্তমানম্) অবহিরন্তর সংবরণং (কার্য্যকারণাভ্যাস সংস্পৃষ্টং) পুরুষং (জীবম্) অখিল-শক্তিধৃতঃ (সর্ব্বশক্তিধরস্য) তব অংশকৃতম্ (অংশং মায়োপাধিতয়া সম্পাদিতং শ্রুতয়ঃ)বদন্তি। ইতি (এবং) নৃগতিং (জীবস্য তত্ত্বং) বিবিচ্য (নিশ্চিত্য) ভুবি (বর্ত্তমানাঃ) কবয়ঃ (বিবেকিনঃ) বিশ্বসিতাঃ (জাতবিশ্বাসা) নিগমাবপণং (নিগমোক্তকর্ম্মণামাবপণং সর্ব্বকর্ম্মার্পণবিষয়ং যদ্বা নিগমাঃ সর্ব্বে বেদাঃ আ সমন্তাৎ উপ্যন্তে সমর্পিতাঃ ক্রিয়ন্তে যাস্মিন্ তম্) অভবং (জন্মমরণাদি সংসারদুঃখনিবর্ত্তনং) ভবতঃ অঙ্ঘ্রিম্ উপাসতে (সেবন্তে) ॥২০॥

স্বকর্ম্মোপার্জ্জিত বিবিধ দেহে ভোক্তৃস্বরূপে বর্ত্তমান হইয়া বস্তুতঃ কার্য্যকারণাবরণ রহিত জীবনে অখিলশক্তিধারী তোমার অংশই বলিয়া থাকেন। এই প্রকার জীবতত্ত্ব নিশ্চয় করিয়া বিবেকী সকল এই মর্ত্ত্যলোকে

থাকিয়াই বিশ্বাস সহকারে সর্ব্ববেদের সমন্বয় স্থানভূত ও সংসারদুঃখনিবর্ত্তক ত্বদীয় চরণকমল উপাসনা করিয়া থাকেন ॥২০॥

দুরবগমাত্মতত্ত্বনিগমায় তবাত্ততনো-
শ্চরিতমহামৃতাব্ধিপরিবর্ত্তপরিশ্রমণাঃ।
ন পরিলষন্তি কেচিদপবর্গমপীশ্বর তে,
চরণসরোজহংসকুলসঙ্গবিসৃষ্টগৃহাঃ ॥২১॥

দুরবগমেতি। (হে) ঈশ্বর, দুরবগমাত্মতত্ত্বনিগমায় (দুরবগমং দুর্জ্ঞেয়ং যৎ আত্মতত্ত্বং তস্য নিগমায় জ্ঞাপনায়) আত্মতনোঃ (স্বীকৃতদেহস্য) তব চরিতমহামৃতাব্ধিপরিবর্ত্তপরিশ্রমণাঃ কেচিৎ অপবর্গং (মোক্ষম্ অপি) ন পরিলষন্তি (ইচ্ছন্তি কিন্তু তেনৈব সুখেন পূর্ণাঃ সন্তঃ) তে (তব) চরণ সরোজহংসকুলসঙ্গবিসৃষ্টগৃহাঃ (ভবন্তি) ॥ ২১ ॥

হে ঈশ্বর, দুর্জ্ঞেয় আত্মতত্ত্ব জ্ঞাপনার্থ দেহধারণকারী তোমার চরিতরূপ মহামৃতসমুদ্রে অবগাহন কৃতযত্ন ভক্ত সকল মোক্ষ ও অভিলাষ করেন না, পরন্তু তদীয় চরণসরোজে হংসকুলের ন্যায় রমমান পরমহংসগণের সঙ্গে গৃহত্যাগী হইয়া থাকেন ॥ ২৩ ॥

ত্বদনুপথং কুলায়মিদমাত্মসুহৃৎপ্রিয়বৎ,
চরতি তথোন্মুখে ত্বয়ি হিতে প্রিয় আত্মনি চ।
ন বত রমন্ত্যহো অসদুপাসনয়াত্মহনো,
যদনুশয়া ভ্রমন্ত্যুরুভয়ে কুশরীরভৃতঃ ॥ ২২ ॥

ত্বদনুপথমিতি। ত্বদনুপথং (ত্বদনুবর্ত্তি, ত্বৎসেবোপয়িকম্) ইদং কুলায়ং (কৌ পৃথিব্যাং লীয়তে ইতি শরীরম্) আত্মসুহৃৎপ্রিয়বৎ চরতি (ভবতি) তথা চ (অপি) বত অহো (কষ্টং যে) অসদুপাসনয়া (অসতাং দেহাদিনাম্ উপাসনয়া উপাসললেন) হিতে প্রিয়ে আত্মনি উন্মুখে ত্বয়ি ন রমন্তি (ত্বাং ন ভজন্তি তে) আত্মহনঃ; (যতঃ) যদনুশয়াঃ (যস্যাম্ অসদুপাসনায়াম্ অনুশয়ঃ বাসনা যেষাং তে) কুশরীরভৃতঃ (সন্তঃ) উরুভয়ে (সংসারে) ভ্রমন্তি ॥ ২২ ॥

তোমার সেবার উপযোগী এই শরীর আত্মার ন্যায়, সুহৃদের ন্যায় ও প্রিয়ের ন্যায় প্রকাশ পাইলেও, যাঁহারা প্রকৃত সুহৃৎ, প্রিয় ও আত্মা যে তুমি সেই তোমার উপাসনা না করিয়া অসৎ শরীরের সেবায় রত হয়েন, তাঁহারাই

আত্মঘাতী ; কারণ, তাঁহারা দেহ সেবার বাসনা বশতঃ নিকৃষ্ট শরীরধারণ পূর্ব্বক এই ভয়ঙ্কর সংসারে ভ্রমণ করিয়া থাকেন ॥ ২২ ॥

নিভৃতমরুন্মনোঽক্ষদৃঢ়যোগযুজো হৃদি যন্,
মুনয় উপাসতে তদরয়োঽপি যযুঃ স্মরণাৎ।
স্ত্রিয় উরগেন্দ্রভোগভুজদণ্ডবিষক্তধিয়ো,
বয়মপি তে সমাঃ সমদৃশোঽঙ্ঘ্রি সরোজ সুধাঃ ॥ ২৩ ॥

নিভৃতেতি। নিভৃতমরুন্মনোঽক্ষদৃঢ়যোগযুজঃ (নিভৃতানি সংযমিতানি মরুন্মনোক্ষাণি যৈঃ তে নিভৃতমরুন্মনোঽক্ষাঃ তে চ তে দৃঢ়ং যোগং যুঞ্জন্তীতি দৃঢ়যোগযুজঃ চ তে) মুনয়ঃ যৎ (নির্ব্বিশেষাবির্ভাববিশেষং ব্রহ্মাখ্যং তত্ত্বং) হৃদি উপাসতে (ধ্যায়ন্তি, প্রাপ্স্যন্তি তু চিরাদেব) তৎ (এব তত্ত্বম্) অরয়ঃ অপি স্মরণাৎ যযুঃ (প্রাপুঃ)। উরগেন্দ্রভোগভুজদণ্ডবিষক্তধিয়ঃ (উরগেন্দ্রস্য ভোগোদেহঃ তৎসদৃশয়োঃ ভুজদণ্ডয়োঃ বিষক্ত ধীঃ যাসাং তাঃ) স্ত্রিয়ঃ (তব নিত্যপ্রেয়স্যঃ যাঃ) তে (তব) অঙ্ঘ্রিসরোজসুধাঃ (উপাসতে) বয়ম্ অপি সমাঃ (তত্তুল্যরূপাঃ) সমদৃশঃ (তদ্ভাবানুগতভাবাঃ সত্যঃ তাঃ যযিম) ॥ ২৩ ॥

দৃঢ়যোগযুক্ত মুনিগণ প্রাণ, মন ও ইন্দ্রিয়সকল সংযমন পূর্ব্বক যে তত্ত্ব হৃদয়ে ধ্যান করেন, তাহা তোমার অরিগণ স্মরণদ্বারা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। উরগেন্দ্রভোগসদৃশ তোমার ভুজদণ্ডে আসক্তবুদ্ধি তোমার নিত্যপ্রেয়সী সকল তোমার যে চরণসরোজসুধা লাভ করেন, তত্তুল্যরূপা আমরাও তদ্ভাবানুগতভাব হইয়া তাহাই লাভ করিয়া থাকি ॥ ২৩ ॥

ক ইহ নু বেদ বতাবরজন্মলয়োঽগ্রসরং,
যত উদগাদৃষির্যমনু দেবগণা উভয়ে।
তর্হি ন সন্ন চাসদুভয়ং ন চ কালজবঃ
কিমপি ন তত্র শাস্ত্রমবকৃষ্ট শয়ীত যদা ॥ ২৪ ॥

ক ইহেতি। বত (অহো) ভগবান্, ইহ জগতি অগ্রসরং (পূর্ব্বাসন্ধং ত্বাম্) অবর জন্মলয়ঃ (অর্ব্বাচীনোৎপত্তি নাশবান্) কঃ নু (পুমান্) বেদ (জানাতি।) যতঃ (তত্ত্বঃ এব) ঋষিঃ (ব্রহ্মা) উদগাৎ (উৎপন্ন), যং (ব্রহ্মাণম্) অনু উভয়ে (আধ্যাত্মিকাঃ আধিদৈবিকাঃ চ) দেবগণাঃ।

যদা তু ভবান্ শাস্ত্রং (স্ববিজ্ঞাপকং বেদম্) অবকৃষ্য (আকৃষ্য) শয়ীত (জগৎ কার্য্যং প্রতি দৃষ্টিং নিমীলয়তি) তর্হি (তদা) ন সৎ (স্থূলম্ আকাশাদি) ন চ অসৎ (সূক্ষ্মং মহদাদি ন চ) উভয়ং (সদ সদ্ভ্যাম্ আরব্ধং শরীরং) ন চ কালজবঃ (কালবৈষম্যম্।) তত্র (তদা অনুশায়িনাং জীবানাং জ্ঞানসাধনম্ ইন্দ্রিয়াদ্যপি) কিম্ অপি ন॥ ২৪॥

হে ভগবন্। এই সংসারে তুমি পূর্ব্বসিদ্ধ, অতএব পরে যাঁহার জন্ম ও নাশ, তিনি তোমাকে কি জানিতে পারেন? সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মাও তোমা হইতেই উৎপন্ন হয়েন। আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিক দেবগণ ব্রহ্মার পরে উৎপন্ন হয়েন। তুমি যখন শাস্ত্র সকল লইয়া শয়ন. কর তখন স্থূল, সূক্ষ্ম, শরীর, ইন্দ্রিয় ও কালবৈষম্যাদি কিছুই থাকে না॥ ২৪॥

জনিমসতঃ সতো মৃতিমুতাত্মনি যে চ ভিদাং,
বিপণমৃতং স্মরন্ত্যপদিশন্তি ত আরুপিতৈঃ।
ত্রিগুণময়ঃ পুমানিতি ভিদা যদবোধকৃতা,
ত্বয়ি ন ততঃ পরত্র স ভবেদববোধরসে॥ ২৫॥

জনিমিতি। অসতঃ (পদার্থস্য) জনিম্ (উৎপত্তিং তথা) সতঃ (পদার্থস্য) মৃতিং (বিনাশং) চ যে স্মরন্তি (বদন্তি) তে (সর্ব্বে) আরুপিতৈঃ (ভ্রমৈঃ এব) উপদিশন্তি। উত (অপি) যে আত্মনি ভিদাং (ভেদং স্মরন্তি তে অপি); যৎ (যস্মাৎ) ত্রিগুণময়ঃ পুমান্ ইতি (কৃত্বা) ভিদা (ভেদব্যবহারঃ) অবোধকৃতা (অজ্ঞানকারিতা তথা যে চ) বিপণং (কর্ম্মফল ব্যবহারম্) ঋতং (সত্যং স্মরন্তি তে অপি এবং যঃ ভ্রমঃ) সঃ (মায়াতঃ) পরত্র অববোধরসে (জ্ঞানৈকস্বরূপে) ত্বয়ি ন ভবেৎ॥ ২৫॥

যাঁহারা অসতের উৎপত্তি, সতের নাশ ও আত্মার ভেদ বলেন, তাঁহারা ভ্রমবশতই ঐ প্রকার উপদেশ করিয়া থাকেন; কারণ, পুরুষকে গুণময় ভাবিয়া যে ভেদ ব্যবহার, তাহা অজ্ঞান কল্পিত। আবার যাঁহারা কর্ম্ম-ফল-ব্যবহার কে সত্য বলেন, তাঁহারাও ভ্রান্ত। আপনি মায়াতীত, আপনাতে ঐ ভ্রম সম্ভব হয় না॥ ২৫॥

সদিব মনস্ত্রিবৃৎ ত্বয়ি বিভাত্যসদামনুজাৎ
সদভিমৃশন্ত্যশেষমিদমাত্মতয়াত্মবিদঃ।

ন হি বিকৃতিং ত্যজন্তি কনকস্য তদাত্মতয়া
স্বকৃতমনুপ্রবিষ্টমিদমাত্মতয়াঽবসিতম্ ॥ ২৬ ॥

সদিবেতি। ত্বয়ি অসৎ (অবর্ত্তমানং) মনঃ ত্রিবৃৎ (ত্রিগুণকার্য্যে জগতি বর্ত্তমানং সৎ) সৎ (বর্ত্তমানম্) ইব বিভাতি। আত্মবিদঃ (তু) আমনুজাৎ ইদং স্বকৃতং (স্বেন ত্বয়া কৃতম্) অনুপ্রবিষ্টম্ আত্মতয়া অবসিতং (চ) অশেষং জগৎ আত্মতয়া সৎ অভিমৃশন্তি (জানন্তি যতঃ কনকবণিজঃ) কনকস্য বিকৃতিম্ (অপি) ন ত্যজন্তি হি ॥ ২৬ ॥

তোমাতে অবর্ত্তমান মন ত্রিগুণকার্য্য জগতে বর্ত্তমানবৎ প্রকাশ পাইয়া থাকে। আত্মতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি সকল সোপাধিক জীবসমূহ ব্যাপিয়া তৎকৃত ও তৎকর্ত্তৃক অনুপ্রবিষ্ট ও আত্মস্বরূপে অবধারিত এই নিখিল জগৎকে সৎ বলিয়াই জানেন। কারণ সুবর্ণবণিক সুবর্ণের বিকারকেও ত্যাগ করেন না ॥২৬॥

তব পরি যে চরন্ত্যখিলসত্ত্বনিকেততয়া,
ত উত পদাক্রমন্ত্যবিগণয্য শিরো নির্ঋতেঃ।
পরিবয়সে পশূনিব গিরা বিবুধানপি তাং-
স্ত্বয়ি কৃতসৌহৃদাঃ খলু পুনন্তি ন যে বিমুখাঃ ॥ ২৭ ॥

তবেতি। অখিলসত্ত্বানিকেততয়া যে তব (ত্বাং) পরিচরন্তি তে উত (এব) অবিগণয্য নির্ঋতেঃ (মৃত্যোঃ) শিরঃ পদা আক্রমন্তি। ত্বয়ি কৃতসৌহৃদাঃ খলু পুনন্তি, যে বিমুখাঃ ন। তান্ বিবুধান্ অপি (ত্বং) গিরা পশূন্ ইব পরিবয়সে (বধ্নাসি) ॥ ২৭ ॥

যাঁহারা অখিলজগদাধারস্বরূপে তোমার উপাসনা করেন, তাঁহারা নগণ্য বোধে মৃত্যুর মস্তকে পদাঘাত করিয়া থাকেন। যাঁহারা তোমার সহিত সৌহৃদ্য স্থাপন করেন, তাঁহারাই জগৎ পবিত্র করেন, ত্বদ্বিমুখজন তাহা পারেন না। ত্বদ্বিমুখজন জ্ঞানী হইলেও, তুমি তাঁহাকে বেদবাক্য দ্বারা পশুবৎ বন্ধন করিয়া থাক ॥ ২৭ ॥

স্বমকরণঃ পুরাড়খিলকারকশক্তিধর-
স্তব বলিমুদ্বহন্তি সমদন্ত্যজয়াঽনিমিষাঃ।
বর্ষভুজোঽখিলক্ষিতিপতেরিব বিশ্বসৃজো,
বিদধতি যত্র যে ত্বধিকৃতা ভবতশ্চকিতাঃ ॥ ২৮ ॥

ত্বমকরণ ইতি। ত্বম্ অকরণঃ স্বরাট্ অখিলকারকশক্তিধরঃ (অতএব) বর্ষভুজঃ অখিলক্ষিতিপতেঃ ইব অজয়া (সহিতাঃ) অনিমিষাঃ (দেবাঃ) বিশ্বসৃজঃ (অপি) সমদন্তি, ভবতঃ চকিতাঃ (সন্তঃ) যত্র যে তু অধিকৃতাঃ (তৎ) বিদধতি, তব বলিম্ উদ্বহন্তি ॥ ২৮ ॥

আপনি প্রাকৃতেন্দ্রিয়রহিত, স্বপ্রকাশ ও সকল ইন্দ্রিয়ের শক্তি ধারণ করেন; অতএব মায়ার সহিত সকল দেবতা এবং বিশ্বস্রষ্টা ব্রহ্মা প্রভৃতিও খণ্ডমণ্ডল পতি সকল অখিলক্ষিতিপতির ন্যায় আপনার প্রজাগণ কর্ত্তৃক দত্ত বলি ভোজন করেন। আপনার ভয়ে নিজ নিজ অধিকার পালন করেন এবং আপনার বলি বহন করেন ॥ ২৮ ॥

স্থিরচরজাতয়ঃ স্যুরজয়োত্থনিমিত্তযুজো,
বিহর উদীক্ষয়া যদি পরস্য বিমুক্ত ততঃ।
ন হি পরমস্য কশ্চিদপরো ন পরশ্চ ভবেদ্,
বিয়ত ইবাপদস্য তব শূন্যতুলাং দধতঃ ॥ ২৯ ॥

স্থিরচরেতি। (হে) বিমুক্ত, যদি (সৃষ্টিসময়ে) ততঃ (অজাতঃ) পরস্য (তব) অজয়া বিহরঃ (বিহারঃ, তদা) উদীক্ষয়া উত্থনিমিত্তযুজঃ স্থিরচরজাতয়ঃ স্যুঃ (জায়ন্তে)। বিয়তঃ ইব অপদস্য শূন্যতুলাং দধতঃ পরমস্য তব কশ্চিৎ অপরঃ ন পরঃ চ ন হি ভবেৎ ॥ ২৯ ॥

হে বিমুক্ত, তুমি যখন সৃষ্টিসময়ে মায়ার সহিত বিহার করিতে ইচ্ছা কর, তখনই তোমার ঈক্ষণমাত্র মায়া হইতে স্থাবর ও জঙ্গম প্রাণী সকল উৎপন্ন হয়েন। তুমি আকাশের ন্যায় শূন্যসদৃশ ও বৈষম্যরহিত ॥ ২৯ ॥

অপরিমিতা ধ্রুবাস্তনুভৃতো যদি সর্ব্বগতা-
স্তর্হি ন শাস্যতেতি নিয়মো ধ্রুব নেতরথা।
অজনি চ যন্ময়ং তদবিমুচ্য নিয়ন্তৃ ভবেৎ,
সমমনুজানতাং যদমতং মত দুষ্টতয়া ॥ ৩০ ॥

(হে) ধ্রুব, অপরিমিতাঃ (বস্তুতঃ এব অনন্তসংখ্যাঃ) ধ্রুবাঃ (নিত্যাঃ চ যে) তনুভৃতঃ (জীবাঃ তে) যদি সর্ব্বগতাঃ (বিভবঃ স্যুঃ) তর্হি (তেষাং ব্যাপ্যত্বাভাবেন সমত্বাৎ) শাস্যতা ইতি নিয়মঃ ন (স্যাৎ)। ইতরথা (জীবস্য অণুত্বেন ব্যাপ্যভাবে তু সতি তন্নিয়মঃ ন ইতি) ন (অপি তু স ঘটত

এব)। যন্ময়ং (যদুপাদানকং যৎ) অজনি (জাতং) তৎ (উপাদানং কর্ত্তৃ, স্বপর্য্যায়) অবিমুচ্য (অপরিত্যজ্য তস্য জায়মানস্য বৎ) নিয়ন্তৃ ভবেৎ। যৎ (উপাদানরূপং পরমাত্মাখ্যং তত্ত্বং যেন অপি অপরেণ) সমং (সমানম্ ইতি) অনুজানতাং (অনুজ্ঞাম্ অপি দদতাং) মতদুষ্টতয়া (মতস্য দুষ্টতয়া অশুদ্ধত্বেন) অমতং (জ্ঞাতং ন ভবতি) ॥ ৩০ ॥

হে ধ্রুব, অপরিমিত নিত্য জীবগণ যদি বিভু হয়, তাহা হইলে নিয়ম্য-নিয়ন্তৃ-ভাব থাকে না ; জীব অনু হইলে, তাহা থাকে। কারণ কার্য্যের সর্ব্বাংশ ব্যাপিয়াই নিয়ন্তা ; অর্থাৎ প্রবর্ত্তক হইয়া থাকে। সেই কারণকে যদি কেহ কার্য্যের সহিত সমান বলিয়া নির্দ্দেশ পূর্ব্বক নিজের অভিজ্ঞতা প্রকাশ করেন, তবে তাঁহার মত দূষিত বলিয়া তিনি জানেন না, ইহাই বলিতে হয় ॥ ৩০ ॥

জীবকে কার্য্য বলা হইলেও জীবের স্বরূপতঃ উৎপত্তি নাই জানিতে হইবে। উপাধির উৎপত্তিই জীবের উৎপত্তি। কি প্রকৃতি কি পুরুষ কেহই জীবরূপে উৎপন্ন হয় না ; প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ই অজ। বায়ুসহযোগে জল হইতে বুদ্বুদের ন্যায়, প্রকৃতি ও পুরুষের সহযোগে প্রাণী সকল অর্থাৎ জীবের প্রাণাদি উপাধি সকল উৎপন্ন হয় এবং পুনর্ব্বার প্রলয়ে ঐ উপাধি সকল, নদী সকল যেরূপ সমুদ্রে লীন হয় এবং সমস্ত রস যেমন, মধুর রসে লীন হয়, তদ্রূপ পরমস্বরূপ তোমাতেই লয় পাইয়া থাকে। বিবিধ নাম ও বিবিধ গুণের সহিত উপাধির উৎপত্তিতেই জীবের উৎপত্তি এবং উপাধির লয়েই জীবের লয় জানিতে হইবে ॥ ৩১ ॥

আপনার মায়া দ্বারা জীবের দুস্তর ভ্রম ও আপনাকে উক্ত ভ্রমের নিবর্ত্তক বিদিত হইয়া সুমেধা সকল আপনাতেই অনুক্ষণ বর্দ্ধমান ভাব অর্থাৎ ভক্তি করিয়া থাকেন। আপনি ভক্তজনের পালক। আপনি যাহাকে রক্ষা করেন না, আপনার ভ্রুকুটিরূপ কাল তাহারই সংসারভয় উৎপাদন করিয়া থাকে। যিনি আপনার শরণাগত ভক্ত, তাঁহার আর সংসারভয় কেন হইবে ? ॥ ৩২ ॥

হে অজ, যাহারা শ্রীগুরুর চরণ আশ্রয় না করিয়া অতিশয় চঞ্চল, জিতেন্দ্রিয়ও জিতপ্রাণ যোগিগণেরও অবশ্য মনোরূপ অশ্বকে বশীভূত

করিতে প্রয়াস পায়, তাহারা উপায়খিন্ন ও বিবিধ দুঃখকুল হইয়া সাগরমধ্যে কর্ণধাররহিত বণিক্‌সমূহের ন্যায় সংসার সাগরে নিমগ্ন হইয়া থাকে॥ ৩৩॥

মনুষ্যের মধ্যে যিনি আপনার ভজন করেন, আপনি তাঁহার সম্বন্ধে সর্ব্বরসস্বরূপে স্ফুরিত হইয়া থাকেন। এরূপ হইলেও, স্বজন, পুত্র, দেহ, কলত্র, ধন, গৃহ, ভূমি ও রথাদি বস্তু সকল তুচ্ছ, তুমিই সত্য, ইহা না বুঝিয়া যিনি স্ত্রীর সহিত সঙ্গত হইয়া রতিসুখের নিমিত্ত এই সংসারে বিচরণ করেন, তাঁহাকে কোন্ অকিঞ্চিৎকর নশ্বর বস্তু সুখদান করিবে? ॥ ৩৪॥

যাঁহাদের চরণোদক অন্যের পাপ নাশ করে, যাঁহারা তোমার পাদপদ্ম হৃদয়ে ধারণ করেন। যাহারা নিত্যসুখস্বরূপ তোমাতে একবার মন অর্পণ করিয়াছে, সেই অহংমমাভিমানরহিত ঋষি সকল এই পৃথিবীতে প্রভূত পুণ্যাবহ তীর্থ ও মন্দির সকলে বাস করিয়া থাকেন। পুরুষের বিবেকনাশক গৃহ সকলকে আশ্রয় করেন না॥ ৩৫॥

এই সংসার সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরমেশ্বর হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া ইহাকেও সচ্চিদানন্দস্বরূপ জ্ঞান করা যুক্তিবিরুদ্ধ। এই সংসারের কোথাও কোথাও সচ্চিদানন্দরূপত্বের ব্যভিচার দৃষ্ট হইয়া থাকে। তবে কি সংসারকে শুক্তিরজতাদির মিথ্যা, অসত্য, ভ্রমাত্মক, কল্পনাময় বলিব? না, তাহাও বলিতে পারি না; কারণ, ইহার সত্তা ও অর্থক্রিয়াকারিতা উভয়ই দৃষ্ট হইতেছে। কেবল ব্যবহার সিদ্ধির নিমিত্ত অনাদি ভ্রম স্বীকার করিলেও, অন্ধপরম্পরান্যায়ে অনবস্থাদোষের দুর্বারত্ব বিধায়, তদ্বারা অভিষ্ট সিদ্ধ হয় না। বিশেষতঃ কুত্রাপি বস্তুর কল্পনা দৃষ্ট হয় না, সম্বন্ধেরই কল্পনা দৃষ্ট হইয়া থাকে। বস্তু সত্য, বস্তুসম্বন্ধ কল্পনাই মিথ্যা, আরোপিতা। তোমার বেদরূপা বাণী গৌণলক্ষণাদি বৃত্তিসমূহ দ্বারা সংসারের সচ্চিদানন্দরূপত্ব বুদ্ধি উৎপাদন পূর্ব্বক কর্ম্মজড় ব্যক্তি সকলকে ভ্রমে পাতিত করে॥ ৩৬॥

এই বিশ্ব যদি সৃষ্টির পূর্ব্বে না থাকিত, তবে ইহার উৎপত্তিও সম্ভব হইত না। অতএব এইরূপ অনুমান করা যায় যে, এই বিশ্ব স্থিতি সময়েও তোমাতেই প্রকাশ পাইয়া থাকে। তবে তোমার শুদ্ধস্বরূপে এই বিশ্বের স্থিতি অনুমান করা ভ্রম। অতএব অবিবেক বশতঃই লোকে এই বিশ্বকে মৃৎসুবর্ণাদির বিকার ঘটকুণ্ডলাদির সহিত তুলনা করিয়া থাকে। বস্তুতঃ

যাঁহারা এই বিশ্বকে কেবল কল্পনাময় বলেন বা যাঁহারা ইহাকে ব্রহ্মস্বরূপ বলেন, তাঁহারা উভয়েই অজ্ঞ ॥ ৩৭ ॥

জীব মায়ায় মোহিত হইয়া অবিদ্যাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক দেহেন্দ্রিয়াদিতে আত্মবুদ্ধি স্থাপন করিয়া তাহাতেই অভিনিবিষ্ট হইয়া আত্মবিস্মৃত হইয়া সংসারী হয়েন। তুমি কিন্তু নিত্যৈশ্বর্য্যসমন্বিত অপরিমেয়ৈশ্বর্য্য ও অনিমাদ্যষ্টবিভূতিযুক্ত নিজ পারমৈশ্বর্য্যে বিরাজ কর বলিয়া, ভুজঙ্গ যেমন নিজের ত্বক্‌কে ত্যাগ করে, তদ্রূপ মায়াকে ত্যাগ করিয়া থাকে ॥ ৩৮ ॥

হে ভগবন্। যোগীরাও যদি হৃদয়স্থ কামজটা উৎপাটন না করেন, তবে সেই সকল অসৎ যোগীর হৃদয়ে থাকিয়াও 'অস্মৃত কণ্ঠমণির ন্যায় দুর্জ্ঞেয়ই থাক। ইন্দ্রিয় তর্পণপরায়ণ যোগীদিগের ইহলোকে কাল হইতে এবং পরলোকে তোমায় অপ্রাপ্তি নিবন্ধন অসুখ অনিবার্য্য ॥ ৩৯ ॥

যিনি আপনাকে জানিয়াছেন, তিনি কর্ম্মফলদাতা হইতে উত্থিত শুভ ও অশুভ কর্ম্মের ফল, সুখ ও দুঃখ প্রাপ্ত হয়েন না, এবং দেহাভিমানীদিগের প্রবৃত্তি নিবৃত্তিকর বিধিনিষেধেরও অবশীত হয়েন না; কারণ তাঁহারা অনুদিন গীতপরম্পরা দ্বারা আপনাকে শ্রবণ করিয়া হৃদয়ে ধারণ করিয়া থাকে ॥ ৪০ ॥

হে ভগবান্। আপনি অনন্ত, অতএব দেবতারাও আপনার অন্ত প্রাপ্ত হয়েন না। সাবরণ ব্রহ্মাণ্ড সকল আকাশে রজঃকণার ন্যায় কালচক্র দ্বারা পরিবর্ত্তিত হইয়া তোমার দেহ মধ্যেই পরিভ্রমণ করিয়া থাকে। তৎপর্য্যবসিতা শ্রুতি সকল অতন্নিরসন মুখে তোমাতেই ফলিত হইয়া থাকে ॥ ৪১ ॥

মালী হইয়া সেই বীজ রোপণ পূর্ব্বক শ্রবণ কীর্ত্তনাদিরূপ জল দ্বারা সেচন করিলে, ভক্তিরূপা লতা অঙ্কুরিত ও ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করিয়া বিরজা ও ব্রহ্মলোক পার হইয়া পরব্যোম পর্য্যন্ত উত্থিত হয়। পর-ব্যোমের উপরিভাগে গোলক বৃন্দাবন অবস্থিত। ঐ শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ-চরণরূপ কল্পবৃক্ষ আছেন। ভক্তিরূপা লতা যাইয়া উক্ত শ্রীকৃষ্ণচরণরূপ কল্পবৃক্ষে আরোহণ করেন। তদনন্তর শাখাপল্লবাদি বিস্তার পূর্ব্বক প্রেমরূপ ফল প্রসব করিতে থাকেন।' মালী এই স্থানে থাকিয়াই লতার মূলে

যত শ্রবণ কীর্ত্তনাদিরূপ জল সেচন করিতে থাকেন, লতাও ততই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে। মালীর একটি প্রধান কর্ত্তব্য এই যে, যত্ন পূর্ব্বক লতাকে আবরণ করা; কারণ, বৈষ্ণবাপরাধরূপ মত্তহস্তী উত্থিত হইয়া যদি ঐ লতার মূলোচ্ছেদ করে, তবে লতা শুকাইয়া যাইবেক। যেমন মত্তহস্তী হইতে লতাকে রক্ষা কর্ত্তব্য, তেমনি লতার অঙ্গে কোন প্রকারে উপশাখা জন্মিতে বা বর্দ্ধিত হইতে না দেওয়াই কর্ত্তব্য। ভোগবাঞ্ছা, মোক্ষবাঞ্ছা, জীবহিংসা, নিষিদ্ধাচার, ব্রত, পূজা ও প্রতিষ্ঠা প্রভৃতিই উপশাখা। উপশাখা সকল বর্দ্ধিত হইতে থাকিলে, মূলশাখার বৃদ্ধি স্থগিত হইয়া যায়। উপশাখা জন্মিতে না দেওয়াই কর্ত্তব্য। যদি অনবধানতা বশতঃ কোন উপশাখা জন্মিতে দেখা যায়, তবে তৎক্ষণাৎ উহা ছেদন করিয়া ফেলাই কর্ত্তব্য। উপশাখা ছেদন করিয়া দিলে, মূল শাখা বর্দ্ধিত হইয়া কল্পবৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া থাকে। তখন মালী লতাকে অবলম্বন করিয়া অনায়াসেই আরোহণ পূর্ব্বক সুপক্ক প্রেমফল পাড়িয়া আস্বাদন করিতে পারেন। একবার কল্পবৃক্ষ লাভ হইলে, ঐ কল্পবৃক্ষের সাক্ষাৎ, সেবা ভিন্ন মালীর আর কোন কর্ত্তব্য থাকে না। কল্পবৃক্ষের সেবা দ্বারাই প্রেমফলের রসাস্বাদন হইয়া থাকে। ঐ প্রেমই পরম পুরুষার্থ। ধর্ম্মাদি পুরুষার্থ চতুষ্টয় ঐ প্রেমরূপ পরম পুরুষার্থের তুলনায় তৃণবৎ তুচ্ছ।

তথাহি ললিত মাধবে—

> ঋদ্ধা সিদ্ধিব্রজবিজয়িতা সত্যধর্ম্মা সমাধি-
> র্ব্রহ্মানন্দো গুরুরপি চমৎকারয়ত্যেব তাবৎ।
> যাবৎ প্রেম্নাং মধুরিপুবশীকারসিদ্ধৌষধীনাং,
> গন্ধোঽপ্যন্তঃকরণ সরণীপান্থতাং ন প্রয়াতি॥

যে পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণবশীকরণের সিদ্ধৌষধিরূপ শাস্ত্রাদি যে কোন প্রেমের লেশও অন্তঃকরণপথের পথিক না হয়, সেই পর্য্যন্তই সম্পূর্ণা সিদ্ধি সকল, সত্যধর্ম্মোপেত সমাধি ও তৎফলস্বরূপ গুরুতর ব্রহ্মানন্দ চিত্তের চমৎকারিতা সম্পাদন করে।　　(ক্রমশঃ)

ভারতীয় কথা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

আদিপর্ব্ব—কৌরবগণের জন্ম।

দুর্য্যোধন।

ইতিমধ্যে ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী গর্ভপ্রসূত ঋষিপ্রসাদলব্ধ শতপুত্রের ও এক কন্যার জন্ম হইল। যে দিন ভীম জন্মগ্রহণ করেন সেইদিন কুরুপুত্রগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠ "দুর্য্যোধন" জন্মিলেন। এই দুর্য্যোধনের জন্মদিনে চারিদিকে অশুভ লক্ষণ দৃষ্ট হইল ; চতুর্দ্দিকে ঘোরঘনঘটায় সমাচ্ছন্ন হইল ; শিবাগণ মাংসভোজী, পিশিতাশী ঘোর জন্তুগণ চতুর্দ্দিকে অমঙ্গলসূচক শব্দ করিতে লাগিল—

*　　*　　*　　*

জনম মাত্রেকে,　　শিবিগণ ডাকে
যেমন গৃধ্রগর্জ্জন॥
তার ডাকশুনি,　　যেন গৃধ্রধ্বনি,
গৃধ্রগণ সব ডাকে।
কুকুর শৃগাল,　　ডাকে পালে পাল,
নগর পুরিল ডাকে,॥
বহে তপ্তবাত,　　সঘনে নির্ব্বাত,
দশদিক যায় পুড়ি।
মিহির মুনির,　　বরিষে রুধির,
ঝঞ্ঝনা হয় গিরি॥

প্রকৃতি ও মানব।

প্রকৃতি দেবী এই বিশ্বে মানবমণ্ডলীর জননীস্বরূপা। তাঁর সন্তানগণের মঙ্গল সূচনা দেখিলে হাস্যকৌমুদী বিকশিত হয়েন। তখন প্রকৃতিমাতা দিবাকরকে একচক্ররথে সপ্তাশ্ব যোজিত করিয়া অরুণ কিরণে জগতের তিমিররাশি ভেদ করিয়া মানবের আনন্দে যোগদান করিতে প্রেরণ করেন ; চারুহাসিনী উষা দেবীকে বনের ফুল ফুটাইয়া স্বীয় সুবর্ণ কান্তিতে দিঙ্মণ্ডল আলোকিত করিয়া চঞ্চল চরণে মানবের

হাসিতে হাসি মিশাইতে পাঠান; আবার বিটপীশ্রেণীকে কোমল পল্লবসমূহ দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া মনোরঞ্জ মৃদুল অনিল দ্বারা মন্দ মন্দ ভাবে পল্লবগুলি হিল্লোলিত করতঃ কুসুমাকরের মাথায় মালতী মল্লিকা—গোলাপ টগরাদির সুগন্ধি প্রসূনমালা পরাইয়া দিয়া পৃথিবীতে স্বর্গীয় শোভা ও সচ্ছলতার সঞ্চার দর্শাইয়া সন্তানবাৎসল্যের এবং সহানুভূতির পরাকাষ্ঠা প্রদান করেন। আবার যখন কোন অমঙ্গলের সূচনা দেখেন, তখন প্রকৃতি মাতা ধরণীকে ঘোর তিমির, মেঘ কুজ্ঝটিকায় আবৃত করিয়া ভবিষ্যতের অশুভতা ও অমঙ্গলের ভীষণতা প্রকাশ করেন। গগনে ঘোরঘটা, প্রলয়ের ধূমের ন্যায় বিশ্ব আবরণ করে। চারিদিকে বন্যজন্তুগণ অশুভজনক রব করিতে থাকে—যেন প্রকৃতি দেবী সকলদিকেই রোদনের রোল তুলিয়া দেন, ও ভীষণতার প্রতিমূর্ত্তি দেখান।

প্রকৃতির সহিত মানবমণ্ডলীর এই নিত্যসম্বন্ধ। প্রকৃতিদেবী জননী স্বরূপা হইয়া অপ্রত্যক্ষ ভাবে সন্তানগণকে শিক্ষা দেন। দুর্য্যোধনের জন্মে, পৃথিবীতে ঘোরতর অশুভ নীত হইল। প্রকৃতি দেবী ইঙ্গিতে তাহা দেখাইলেন এবং সেই সঙ্গে স্বয়ং অশ্রুবর্ষণ করিলেন। তাই মহাত্মা ব্যাসদেব স্বীয় জননী সকাশে আসিয়া সাবধান বচনে বলিলেন—

"অবধানে শুন মাতা আমার বচন।
ধর্ম্মকাল গেল, পাপ কাল উপাসন॥
তোমার বংশেতে হবে বড় দুরাচার।
কপট হইবে, বড় হিংসা অহঙ্কার।
এই সবাকার পাপে মজিবে সকল।
পৃথিবী হরিবে শস্য, মেঘ অল্পজল॥
ধর্ম্মলুপ্ত হইবেক, যত যজ্ঞবর।
আত্মাত্ম হিংসা সবে করিবে বিস্তর॥
সেকারণে মা জননী কহি যে তোমায়।
কুলক্ষয় দেখিতে নয়নে না যুয়ায়॥
গৃহ ত্যজি জননি চলহ তপোবন।
সংসার ত্যজিয়া মাতা তপে দেহ মন॥"

এদিকে পরমজ্ঞানী বিদুর এবং অপরাপর অমাত্য দ্বিজগণ স্বকুলরক্ষা এবং শান্তির জন্য এই নবজাত পুত্রকে ত্যাগ করিতে অন্ধরাজকে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র পুত্রস্নেহ নিবন্ধন তাহা করিতে পারিলেন না। তিনি তখন পুত্রস্নেহ ইন্দ্রজালে মোহিত; তাঁহার ভোগবাসনা তখন বিষয় গ্রহণে অভিলাষী, অহঙ্কারাত্মিকা বুদ্ধির বশীভূত হইয়া দুঃখ ও শোকের মূলস্বরূপ এই পুত্র "দুর্য্যোধনকে" রাখিলেন। অপত্যস্নেহে মুগ্ধ হইয়া রাজকর্ত্তব্য বিস্মরণ হইলেন। স্বীয় স্কন্ধে অপার দুঃখভার ক্রয় করিলেন। তাঁহার স্নেহই সকল দুঃখের মূল হইল।

"স্নেহমূলানি দুঃখানি"।

স্নেহের জন্য রাজকর্ত্তব্য ভুলিলেন—"কর্ত্তব্য" বিস্মৃত হইলেন। এদিকে জগতের মহৎশিক্ষার জন্য দেবগণের মহাব্রত সাধনের মন্ত্রস্বরূপ দুর্য্যোধন দিন দিন বর্দ্ধিত হইয়া উঠিলেন।

দুর্য্যোধন।

বহু পূর্ব্ব জন্ম হইতে দুর্য্যোধন কুরুক্ষেত্র ইতিহাসে স্বকার্য্যসাধনের কর্ম্মঠ জীবন লাভের জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। তিনি অতিশয় বলিষ্ঠ এবং সাহসী ছিলেন। অনেক বিষয়ে ধার্ম্মিক ছিলেন এবং রাজকার্য্যের অধিকাংশ অঙ্গগুলি সুচারুরূপে চালাইতে পারিতেন। তাঁহার একমাত্র "স্বার্থ পরতা" দোষ, সকল অনিষ্টের মূল হইয়াছিল। 'আমি' সর্ব্বপ্রথম স্থান অধিকার করিব—'আমি' রাজা হইব,—'আমি' সকল কার্য্যে 'নিজের' অভি-লাষ মত করিব—এই তাঁহার বাসনা ছিল। কেহ যদি তাঁহাকে কোন বিষয়ে পরাস্ত করিত, বা তাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর স্থান অধিকার করিত, তিনি একেবারে হিংসা, ও দ্বেষে জর্জ্জরিত হইতেন; এবং শেষ পর্য্যন্ত এই একমাত্র "স্বার্থ পরতা" দোষে তিনি তাঁহার কুলধ্বংস করিয়াছিলেন। ক্রমশঃই আমরা দুর্য্যোধনের এই "স্বার্থপরতা" জনিত অশেষবিধ দুঃখভোগ এবং সৃষ্টির বৈষম্য দেখিতে পাইব। মলিন বস্তু যেমন আপনাতে পতিত সূর্য্যরশ্মির সকল বর্ণই আত্মসাৎ করে, কিছুই রশ্মির বলিয়া প্রকাশ করেনা, দুর্য্যোধনের স্বার্থপতায় তদ্রূপ তাঁহার সকল গুণকেই আত্মসাৎ করিয়াছিল—কোনটীকেই প্রস্ফুটিত হইতে দেয় নাই। ক্রমশঃ শোক, হিংসা, ঈর্ষা, পরিতাপ একে একে দুর্য্যো-ধনকে আশ্রয় করিলে; ধন মান, প্রণয়—সুখ না আনিয়া, আনিল দুঃখ।

মায়াময় ইন্দ্রজালে মুগ্ধ হইয়া শূন্যময় সংসারে দুর্য্যোধন কেবল আপনাকেই দেখিতে লাগিলেন। তাহাতে বিক্ষেপকর কর্ম্মের জাল ছেদন করিতে না পারিয়া, আপনার কর্ম্মে আপনিই চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। অজ্ঞতাবশতঃ কর্ত্তৃত্বাভিমানী এবং করণাভিনিবিষ্ট দুর্য্যোধন নিজ ভোগার্থে সুখ আনিতে প্রয়াস পাইয়া, সাগরতুল্য গভীর দুঃখ আহ্বান করিলেন। আমরা তাঁহার বাল্যজীবন হইতে এই স্বার্থপরতা নিবন্ধন অশেষবিধ কর্ম্মকাণ্ডের ক্রমবিকাশ দেখিতে পাইব।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমনোরঞ্জন সিংহ।

আধ্যাত্মিক জীবনের নিয়ম।

ভূমিকা।

আমাদের মধ্যে অনেকের এই বিশ্বাস যে, আমাদের মহত্তর বা আধ্যাত্মিক জীবন কোন প্রকার নিয়ম, শৃঙ্খলা বা কার্য্যকারণ সম্বন্ধের অধীন নহে। আমরা মনে করি যে ধর্ম্ম ব্যাপারে কেবলমাত্র স্বেচ্ছাচারিতারই স্থান আছে এবং কোন উচ্চতর কারণের দ্বারায় ধর্ম্মজীবন গঠিত হয়। আমরা অনেকে মনে করি যে, এই রাজ্যে উদ্যম বা চেষ্টা ব্যতিরেকে ফললাভ করা যায়, স্বীয় চরিত্রগত দোষ বা আধ্যাত্মিক দুর্ব্বলতা ব্যতিরেকেও কোন অপরিজ্ঞাত শক্তির বলে সাধককে মার্গচ্যুত হইতে হয়। ঐ প্রকার ভ্রান্তি কেবল ধর্ম্মজীবন সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান ও অনুশীলন না থাকাতেই উৎপন্ন হয়। প্রাকৃতিক পরিদৃশ্যমান ব্যবহারিক জগতের দিকে দৃষ্টি করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, নূতন আবিষ্কৃত ও বিস্ময়জনক নিয়মাবলী আবিষ্কারের পূর্ব্ব হইতেই আছে; কিন্তু তদ্বিষয়ে অজ্ঞানতাবশতঃ পূর্ব্বে যাহা অপরিজ্ঞাত ছিল, পূর্ব্বে যাহাকে আকস্মিক বলিয়া মনে করিতাম, এক্ষণে বিশিষ্ট অনুশীলন সাহায্যে তাহা নিয়ম বা শৃঙ্খলাবদ্ধ বলিয়া বোধ হয়। তদ্রূপ আধ্যাত্মিক জীবনও আপাততঃ কোন নিয়মাধীন বলিয়া বোধ না হইলেও প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে।

---

* শ্রীমতী Annie Besant কৃত 'Laws of the Higher Life' অবলম্বনে লিখিত।

আগ্নেয়গিরির নৈসর্গিক অথচ বিস্ময়াবহ অগ্নিরুদ্গমন প্রভৃতির দিকে দৃষ্টি করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, কয়েক ঘণ্টা মধ্যে যেস্থানে উচ্চ গিরিবর শোভিত ছিল তাহা সমতল হইয়া যায়; শস্য শ্যামলা উর্ব্বর ক্ষেত্রের পরিবর্ত্তে কোথা হইতে হঠাৎ বন্ধুর গিরিমালা আবির্ভূত হয়। এই সকল দেখিয়া মানব এক সময়ে ভাবিত যে, উহা অনৈসর্গিক, আকস্মিক ও স্বাভাবিক নিয়ম সকল বিধ্বস্তকারী; এবং উহার অভ্যন্তরস্থ শক্তি ও গতির বিকাশ পরিমাণ করা মানুষের অসাধ্য; কিন্তু এক্ষণে জড় বিজ্ঞানের উন্নতির সহিত আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, আগ্নেয়গিরির অগ্নি উদ্গীরণরূপ আকস্মিক ঘটনার ভিতরেও বাস্তবিকপক্ষে নিয়ম বা শৃঙ্খলার অভাব নাই। উহা নিয়ম ও সুচারু শৃঙ্খলার অভিব্যক্তি মাত্র। সমুদ্রতল যেরূপ অল্পে অল্পে "পলি" পড়িয়া উচ্চ হইয়া লক্ষ লক্ষ বৎসর পরে পর্ব্বতশ্রেণীরূপে পরিণত হয়, সেইরূপ আকস্মিক ব্যাপারের মধ্যেও শৃঙ্খলা বা নিয়মের চিহ্ন দৃষ্ট হয়। আকস্মিক হইলেই যেমন স্থূল জগতে শৃঙ্খলার অভাব হয় না, তদ্রূপ ধর্ম্ম ব্যাপারেও স্থূলদৃষ্টিতে যে সকল বিষয়:আকস্মিক বলিয়া বোধ হয়, তাহার ভিতরেও নিগূঢ়ভাবে নিয়ম ও শৃঙ্খলার রাজত্ব চলিতেছে।

আধ্যাত্মিক জগতের দিকে চাহিয়া দেখিলে, আমরা এই প্রকার আপাতঃ প্রতীয়মান "আকস্মিক" শক্তির উদ্গমন দেখিতে পাই। সামান্য তুচ্ছ ঘটনাতেও মানবের জীবনস্রোত হঠাৎ ফিরিয়া গিয়াছে, এরূপ ঘটনাও বিরল নহে। সামান্য ক্ষণের মধ্যে মানব চরিত্র কিরূপে পরিবর্ত্তিত হয়, কিরূপে তাহার সমুদয় স্বাভাবিক গতি হঠাৎ বিভিন্ন হইয়া যায়, এইরূপ ঘটনা সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে সাধকদের জীবনে দৃষ্ট হয়। Prof. James কৃত "Varieties of Religious Experience নামক গ্রন্থে এইরূপ অনেক আশ্চর্য্য ঘটনার সমাবেশ আছে। আমাদের দেশে সকলে জানেন যে বিল্বমঙ্গল (লীলাশুক) জগাই মাধাই ও লালা বাবুর জীবন এইরূপ মুহূর্ত্তমধ্যে ভিন্নরূপ ধারণ করে। সাধারণতঃ ইহা আমাদের বুদ্ধিগম্য নহে, ও লোকে "ভগবদ্ কৃপা" নামক অনির্দ্দেশ্য শক্তিকে ঈদৃশ ঘটনার কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করে। সে ভাবে দেখিলে আগ্নেয়গিরির অগ্নি উদ্গীরণও ভগবদ্‌শক্তির বিকাশ; সুতরাং ভগবদ্-শক্তি বলিলে বিশেষ কিছুই বুঝা যায় না। সাধারণের বিশ্বাস এই

প্রকার ভগবদ্‌শক্তির বিকাশ জীবের কর্ম্ম বা ঐ প্রকার কোন নিয়মের অধীন, নহে কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তাহা নহে। পরিমার্জ্জিত বুদ্ধির সহিত স্থিরভাবে দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, এ রাজ্যেও বিশৃঙ্খলতার লেশমাত্র নাই এবং আমরা এক্ষণে বুঝিতে পারিলেও এখানে ঐশ্বরিক নিয়মের বিপর্য্যয় দৃষ্ট হয় না। আমরা ক্রমশঃ বুঝিতে পারিতেছি যে, কি প্রাকৃতিক—কি আধিদৈবিক—কি আধ্যাত্মিক সর্ব্বজগতেই একমাত্র আত্মচৈতন্য প্রকাশমান। এই চৈতন্যই বিভিন্ন প্রকারে প্রতিক্ষণে প্রকাশিত হইতেছে। আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে আত্মচৈতন্য এক এবং অদ্বিতীয়; এবং এই একতা ও অদ্বিতীয়তাই মায়িক অভিব্যক্তিতে নিয়ম বা শৃঙ্খলারূপে প্রকাশিত হয়; মানব চৈতন্য consciousness এক বলিয়াই বিভিন্নরূপে প্রতীয়মান বিষয়রাশিকে স্বীয় শক্তি প্রকাশ দ্বারা শৃঙ্খলা বদ্ধ করিয়া একীকৃত করে এবং উচ্চ শৃঙ্খলা মানব চৈতন্যের একীকরণ জন্য শক্তির প্রকাশ মাত্র। তদ্রূপ নৈসর্গিক নিয়মাবলীও ঈশ্বর বা আত্মচৈতন্যের শক্তির প্রকাশ মাত্র বুঝিতে পারা যায়। এরূপ যে কোন ঘটনা আমাদের স্থূল দৃষ্টিতে আকস্মিক বা অনৈসর্গিক বলিয়া বোধ হউক না কেন, তাহার ভিতর সেই এক এবং অদ্বিতীয় চৈতন্যশক্তি শৃঙ্খলা ও নিয়মরূপে সর্ব্বদা বিরাজিত।

আমরা প্রথমতঃ (১) নিয়ম বা শৃঙ্খলার দ্বারা কি বুঝি তাহা আলোচনা করিব। তৎপরে (২) স্থূল মস্তিষ্ক ও স্নায়ুমণ্ডলের সাহায্যে প্রকাশিত জাগ্রত চৈতন্যের অতীত যে এক সূক্ষ্মতর চৈতন্য বা মহত্তর প্রজ্ঞা আছে, তাহা ধর্ম্মশাস্ত্র ও তৎসম্বন্ধীয় গ্রন্থাবলীর সাহায্য ব্যতিরেকে যে প্রমাণিত হইতে পারে তাহা আলোচনা করা যাইবে। তৎপরে (৩) স্বধর্ম্মাচরণ ও কর্ত্তব্যজ্ঞান দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া এই বৃহৎ চৈতন্য কিরূপে প্রকাশিত হয় তাহা বলা হইবে। তদনন্তর (৪) কি প্রকারে বাহিক কর্ত্তব্যজ্ঞানেরও উচ্চস্তরে আত্মজ্ঞান কিরূপে আত্মনিবেদনরূপে প্রকাশিত হয় তাহা দেখা যাইবে। এস্থলে বলা আবশ্যক যে, কর্ত্তব্যজ্ঞানে ঋণী ও দায়িত্বভাব আছে, এবং কর্ম্ম না করিলে প্রত্যবায় আছে; সুতরাং কর্ত্তব্যজ্ঞানে প্ররোচিত কর্ম্মের দ্বারা আমরা অস্মদ্‌ প্রত্যয়গম্য পদার্থের বহির্ভূত নিয়মাবলীর দ্বারা চালিত হই। কারণ প্রত্যবায়ের ভয় আমা-

দের মনে উপস্থিত থাকে ; কিন্তু প্রকৃত আত্মজ্ঞানের বিকাশের সহিত সমুদয় জগৎ ব্যাপিয়া বিস্তৃত আত্মচৈতন্য প্রত্যক্ষ হওয়াতে আর বাহিরের জ্ঞান থাকে না, সুতরাং বাহিরের দায়িত্ব-জ্ঞান অপসৃত হয়। তখন বাহ্যজীবন অভ্যন্তরীণ জীবনের বিকাশমাত্র হয়। পূর্ণ চৈতন্যের সহিত একতা অনুভব করাতে তাহার কোন অভাব জ্ঞান নাই। যখন কোন বাহ্য বস্তুর দ্বারা তাহার কার্য্য নিরূদ্ধারিত হয় না, তখন তাহার কর্ম্ম নাই ; সে যে কর্ম্ম করে তাহা কেবল অনন্তশক্তির জন্য প্রকাশ। যখন তাহার ভিতর দিয়া অনন্তশক্তির বিকাশ হইবার উপযুক্ত প্রণালী পায়, তখন আত্মনিবেদনই ধর্ম্ম হয়। তখন এই পূর্ণ অসীম আত্মচৈতন্য সাধকরূপ প্রকাশক্ষেত্র অবলম্বন করিয়া জগতের জন্য স্বেচ্ছাক্রমে ও আনন্দসহকারে কার্য্য করে, ইহাই সাধকের আত্মত্যাগ। ঈশ্বরের যে আত্মত্যাগে তাঁহার অসীম চৈতন্য সসীমভাব গ্রহণ করিয়া জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে, ইহা তাহার ক্ষুদ্র প্রতিকূল ছায়ামাত্র। যেখানে যে কেহ ভগবানের চরণপথে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছে সেখানে এই ঐশ্বরিক অনন্তশক্তির বিকাশের প্রণালী বা ক্ষেত্র সৃষ্ট হয়। এই প্রণালী যদ্যপি প্রথমে পরমাত্মার তুলনায় ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র, তথাপি উহা অনন্তশক্তির বিকাশ হেতু হওয়াতে জগদীশ্বরের কৃপাতে অসীম ও অনন্তরূপ ধারণ করে।

১। নিয়ম বা শাসন।

আমরা নিয়ম বা শাসনের দ্বারা কি বুঝি তাহা সর্ব্বাগ্রে দেখা উচিত। এই কথার অর্থ লইয়া অনেক সময় বিশেষ গোলযোগ উপস্থিত হয়। সুতরাং ইহার প্রকৃত তাৎপর্য্য আমাদের নির্ণয় করা আবশ্যক।

দেশের নিয়ম বা Law বলিলে কি বুঝায় তাহা বোধ হয় কাহারও অবিদিত নাই। দেশের রাজার নিয়ম বলিলে—আমরা বুঝি যে, (১) যিনি নিয়ম কর্ত্তা, তিনি যাহা করিবেন তাহাই দেশের নিয়ম। এই নিয়ম কর্ত্তা বা অনুসাশিতা একজন ব্যক্তিবিশেষ হইতে পারেন—অথবা মন্ত্রীবর্গের সভা হইতে পারেন—অথবা সমাজস্থ সকলে মিলিয়া একত্র হইয়া এই নিয়ম করিতে পারেন। যাঁহারা নিয়ম করেন তাঁহারাই তাহার পরিবর্ত্তন করিতে পারেন, তাঁহাদের ইচ্ছার উপর নিয়মের গঠন ও পরিবর্ত্তন নির্ভর করে ; সুতরাং দেশের নিয়ম অস্থায়ী ও পরিবর্ত্তনশীল। (২) দ্বিতীয়তঃ এই নিয়মগুলি

বিধি ও নিষেধ অর্থাৎ "ইহা করিও" "তাহা করিওনা," ইত্যাদি আদেশরূপে প্রকাশ পায় এবং আজ্ঞাগুলি ব্যতিক্রমপক্ষে বিশেষ বিশেষ দণ্ড বা ফল সহকারে প্রচলিত হয়। অর্থাৎ সে আজ্ঞার ব্যতিক্রম করিলে তাহাকে দণ্ডনীয় হইতে হইবে। যেমন শাসন, নিয়ম বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নপ্রকার, তদনুরূপ দণ্ডবিধিও বিভিন্ন। নিয়ম পরিবর্ত্তনশীল দণ্ডবিধিও সেই প্রকার। কোন মতেই উহাকে নিয়মভঙ্গের স্বাভাবিক পরিণাম বলা যাইতে পারে না। কারণ ঐ দণ্ড যদৃচ্ছাক্রমে বিহিত হইয়া থাকে এবং ইচ্ছানুসারে যখন তখন পরিবর্ত্তন করা যাইতে পারে। আর ভিন্ন ২ দেশে এক অপরাধের দণ্ড বিভিন্ন রূপ দৃষ্ট হয়। যথা কোন দেশে চৌর্য্য অপরাধে হয়ত কারাদণ্ড হইবে, কোন দেশে সামান্য বেত্রাঘাতে দণ্ডিত করিবে, আবার কোন দেশে কলুষিত হস্তের ছেদনবিধি আছে, আবার কোথাও বা ঐ অপরাধে গুরুতর প্রাণ দণ্ডের বিধান করা হয়; সুতরাং একই অপরাধের নানাবিধ দণ্ড দৃষ্ট হয়। প্রত্যেক স্থলেই অপরাধের সহিত দণ্ডের কোন বিষয়ে সমতা বা ঐক্য দৃষ্ট হয় না। এবং রাজপ্রচলিত দণ্ডকৃত কর্ম্মের স্বাভাবিক ফল বলিয়া বুঝা যায় না।

কিন্তু যখন আমরা প্রাকৃতিক নিয়ম বা বিধি আলোচনা করি, তখন উল্লিখিত মানুষিক বিধান বলিতে যাহা বুঝায় তাহা কিছুই বুঝায় না। প্রাকৃতিক নিয়ম কোন কর্ত্তৃপক্ষের আজ্ঞা বা আদেশ হইতে প্রসূত হয় না। ইহা কেবল মাত্র কয়েকটী ঘটনার অবস্থা বা নিয়মের Condition অধীনে যাহা সর্ব্বদা ঘটে তাহারই উল্লেখ বা নির্দ্দেশ করে মাত্র। যথা মাধ্যাকর্ষণ শক্তি, অথবা Chemical affinity বা রাসায়নিক আকর্ষণ শক্তি, যেমন হাইড্রোজেন গ্যাস দুই ভাগ ও অক্সিজেন গ্যাস এক ভাগ মিলাইলে জল হয়। যেস্থানে মিশাও না কেন জলই হইবে; একস্থলে জল ও অপর স্থলে অগ্নি হইবে না। যে স্থলে ঐ সকল অবস্থা গুলি Condition বিদ্যমান থাকিবে, সেইস্থলে ঐ প্রকার পরিণাম বা ফল দৃষ্ট হইবে। এই পরিণাম যে অপরিহার্য্য, অবশ্যসম্ভাবী ও অপরিবর্ত্তনশীল তাহার উল্লেখের নামই Law। ইহা বিশ্বনিয়ন্তার শক্তির বিকাশ; সুতরাং তাহার পরিবর্ত্তন নাই; সর্ব্বদা অচল ও অটল এবং সমভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহা কাহারও

আজ্ঞা "ইহা কর" বা "করিওনা" এইরূপ ইচ্ছাগত নহে; পরন্তু ইহা কেবল এইমাত্র উল্লেখ করে—যে এই অবস্থাগুলি বিদ্যমান থাকিলে এই পরিণাম হইবে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত অবস্থা বা Condition এক থাকিবে, পরিণামও এক এবং অভিন্ন হইবে। অবস্থান্তর হইলে ফলেও পার্থ্যক্য দৃষ্ট হইবে।

দ্বিতীয়তঃ প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যতিক্রমের সহিত কোন প্রকার স্বেচ্ছাচারী দণ্ড বিধান দৃষ্ট হয় না। প্রকৃতি কাহাকেও শাস্তি দেন না। প্রাকৃতিক জগতে কতকগুলি ঘটনা উপস্থিত থাকিলে কতকগুলি পরিণাম ঘটিয়া থাকে। ইহারই উল্লেখের নাম Law বা নিয়ম; এতদ্ব্যতিরেকে অন্য কিছুই নহে। কতকগুলি ঘটনা জানা থাকিলে যে কি পরিণাম হইবে তাহা জানিতে পারা যায়। কারণ ইহার পরিণাম অপরিবর্ত্তনশীল ও অবশ্যম্ভাবী। ব্যক্তিগত ইচ্ছা বা ক্ষণিক ভাবের উপর ফল নির্ভর করে না।

এতদ্ব্যতিরেকে, প্রাকৃতিক ও মানুষিক নিয়মের প্রভেদ আরও অনেক বিষয়ে দেখা যায়। মানুষিক বিধানের ব্যতিক্রম সম্ভবপর, কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়ম কেহ ভঙ্গ করিতে পারে না। রাজপুরুষদিগের চক্ষে ধুলি দিয়া দেশের রাজার নিয়ম লঙ্ঘন করিতে পারা যায়; কিন্তু প্রকৃতির নিয়মে ফাঁকি চলে না। তুমি যাহাই কর না কেন, প্রাকৃতিক নিয়ম সেইরূপই অক্ষুণ্ণ থাকিবে। যতই তুমি ইহার বিরুদ্ধে মাথা খুঁড়িয়া মর না কেন, ইহার কোন বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হইবে না। যতই প্রাকৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ করিবে, ততই পর্ব্বতের বিরুদ্ধে যেরূপ বীচিমালা আঘাত করিয়া বিধ্বস্ত হয়, সেইরূপ নিজেই মরিবে। নিয়মের একচুল ব্যতিক্রম হইবে না। উহা পর্ব্বতের ন্যায় সমভাবে বিদ্যমান রহিবে। স্বভাবিক নিয়মের বিশেষ এই যে, কার্য্য, ফল বা কারণ প্রচ্ছন্নভাবে সদাই বর্ত্তমান এবং কারণই কার্য্যরূপে প্রকাশিত। যেমন অগ্নির দাহিকাশক্তি উষ্ণজলে উষ্ণতারূপে পরিণত হইয়া থাকে। কার্য্য আচরণের রূপ বা অবস্থান্তর মাত্র।

প্রাকৃতিক নিয়ম এই প্রকার। ইহা কেবল অবস্থার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম অপরিবর্ত্তনশীল ঘটনার উল্লেখ করে মাত্র। ইহার নাম নিয়ম। আধ্যাত্মিক জীবনে হউক বা সাধারণ জীবনে হউক নিয়ম বলিলে ইহাই বুঝিতে হইবে।

এই ভাবে নিয়মকে বুঝিলে আমাদের দেহে অসীম বলের সঞ্চার হয়;

অনেক বিষয় মানবসাধ্য হয় এবং হৃদয়ে আশার উদ্রেক হয়; কারণ আমরা বুঝিতে পারি যে আধ্যাত্মিক জগৎ স্বেচ্ছাচারিতার রাজত্ব নহে, যে এস্থলে অদ্য যে নিয়ম আছে কল্য তাহার পরিবর্ত্তে অন্য নিয়ম বিহিত হইবে। আমাদের নিজের ইচ্ছামত উহার পরিবর্ত্তন হইবে না। আমরা একমাত্র নিত্যবস্তুর উপর এক বিশ্বনিয়ন্তার নিয়মের উপর নির্ভর করিয়া কার্য্য করিতেছি; সুতরাং আমরা পরিণাম বা ফল সম্বন্ধে স্থির নিশ্চয় হইয়া কার্য্য করিতে পারি। কিন্তু এই নিয়মের রাজ্যে অকুতোভয়ে ও শান্তিসহকারে কার্য্য করিতে হইলে, একটী বস্তু আমাদের আবশ্যক—সেটী জ্ঞান। যতক্ষণ আমরা নিয়ম সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকি ততক্ষণ আমাদিগকে স্থানচ্যুত, ইতস্তত: প্রধাবিত, তরঙ্গায়িত ও বিফল মনোরথ হইতে হয় এবং ততক্ষণ আমাদিগের চেষ্টা নিষ্ফল হইবে, আশা দলিত হইবে, এবং আমাদিগকে ধূলাশায়ী হইতে হইবে। কিন্তু অজ্ঞানের পরিবর্ত্তে জ্ঞানলাভ করিলে যে নিয়ম আমাদিগকে এইরূপে নিষ্পেষিত ও পদদলিত করিতেছিল, সেই নিয়মই আবার আমাদের আজ্ঞাবহ ভৃত্য হইবে এবং আমাদের সহায়তা করতঃ উন্নতির সোপানে লইয়া যাইবে। কোন এক ইংরাজ বিজ্ঞানবিদ্ বলিয়াছিলেন যে, প্রকৃতিকে বাধ্যতার দ্বারা বশীভূত করা যায়। এই কথা গুলি অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভ ও অর্থমূলক। এই গুলি জ্বলন্ত অক্ষরে লিখিয়া রাখার যোগ্য।

নিয়মকে জানা চাই; তাহার বশে চলা চাই, তাহার অধীন হইয়া কার্য্য করা চাই, তবে সে তাহার অসীম বলের সাহায্যে তোমাকে তুলিবে এবং তোমার বাঞ্ছিত গন্তব্যস্থানে পৌঁছিয়া দিবে। যে নিয়ম সম্বন্ধে আমরা অজ্ঞ এবং যাহাকে বিপদজনক বলিয়া মনে করি, সেই নিয়ম সম্যক্ অবগত হইলে আমাদের বিপদের উদ্ধারকর্ত্তা হয়। গত কয়েক শত বৎসরের প্রাকৃতিক জগতের নিয়ম আলোচনা করিয়া মানব এই বিস্ময়কর ব্যাপারটী বিলক্ষণ শিক্ষা পাইতেছে। একটি প্রাকৃতিক নিয়মের দৃষ্টান্ত লওয়া যাউক। আকাশ মেঘাবৃত হইলে বিদ্যুতের আলোক ও বজ্রের ধ্বনিতে আমাদের হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার হয়। সেই বজ্র যেখানে পতিত হয়, সেস্থান চূর্ণ বিচূর্ণ করে। কত সুশোভিত অট্টালিকা বজ্রাঘাতে ধূলিশেষ হইয়া যায়। এই ভয়াবহ বিপদজনক রহস্য-পূর্ণ ব্যাপারকে ক্ষুদ্র মানব কি প্রকারে আয়ত্ত করিবে ইহাই ভাবিয়া আমরা

আকুল হইতাম। কিন্তু এক্ষণে সেই প্রলয়ঙ্কর বিভীষিকাময় জ্বলন্ত অগ্নিকে মানব আপান কার্য্যে নিযুক্ত করিতে শিখিয়াছে। কেবল জ্ঞানের দ্বারাই মানব এই বিদ্যুতাগ্নিকে ভৃত্যের ন্যায় আজ্ঞাবহ করিয়াছে। এক্ষণে বিদ্যুতাগ্নি পথে পথে আলোক বিতরণ করিতেছে, অশ্বের ন্যায় শকটাদি বহন করিতেছে। *সেই তাড়িত প্রবাহ নিমেষে এক্ষণে শতযোজন দূরাবস্থিত পুত্রের* নিকট হইতে সমুদ্রের মধ্য দিয়া শুভসংবাদ আনয়ন করিয়া অদর্শনক্লিষ্ট বৃদ্ধ পিতা মাতার হৃদয়ে আশার সঞ্চার ও নবজীবন দান করিতেছে। যখন আমরা প্রকৃতিকে তাহার নিয়ম জানিয়া বশীভূত করিতে শিখি, তখন সে আমাদের নিকট পরাজিত এবং তখন তাহার সমুদয় শক্তি আমাদের ব্যবহারে আসে।

প্রাকৃতিক শক্তির কথা যাহা বলা হইল অন্যান্য শক্তি সম্বন্ধে তাহাই ঘটে। আধ্যাত্মিক ও প্রাকৃতিক জীবনে যে সকল শক্তি আছে তাহাও এই নিয়মাধীন। এই বিশাল জগতে স্থূল বা সূক্ষ্ম সমুদয় ক্ষেত্রেই এই নিয়ম। যদি আধ্যাত্মিক জীবনলাভ কবিতে চাও, তবে তাহার নিয়মগুলি জানা আবশ্যক। সে গুলি জানিতে পারিলে তাহারা তোমার বাঞ্ছিত গন্তব্য স্থানে লইয়া যাইবে। যদি সে গুলি সম্বন্ধে অজ্ঞ থাক তাহা হইলে তোমার সমুদয় চেষ্টা নিষ্ফল হইবে। যতই চেষ্টা কর না কেন, মনে হইবে যে এক পদও তুমি অগ্রসর হও নাই। সকল চেষ্টাই যেন বৃথা হইয়াছে। সুতরাং আধ্যাত্মিক জগতের নিয়মগুলি আমাদের সকলের জানা অত্যাবশ্যক।

(ক্রমশঃ)

অসাধারণ শক্তি।

ত্রিশ বৎসরের অধিক হইল ভারতের কোন স্থানে একটি নূতন ছাউনি* বসিতেছিল। পল্টনের কর্ম্মচারীগণ† অর্থাৎ কাপ্তেন কর্ণেল প্রভৃতি আপনাপন বাংলা নির্ম্মাণ জন্য সরকার হইতে অর্থসাহায্য প্রাপ্ত হন। তিন জন

* Military Cantonment.

† Military Officers.

তাঁহাদের বাসোপযোগী গৃহের জন্য একটী স্থান নির্দ্দেশ করেন। গৃহারম্ভের পূর্ব্বে জনৈক চীরাচ্ছাদিত মলিনকায় ফকির তাঁহাদের নিকট আসিয়া সবিনয় প্রার্থনা করে যে, উক্ত পবিত্র ভূমিখণ্ড পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারা অন্যত্র গেলে ভাল হয়। ইংরাজ সৈনিক পুরুষেরা তাহার কথা "অসঙ্গত কুসংস্কার" বলিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দেন। তখন ফকির বেচারী অত্যন্ত উত্তেজিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া সাহেবত্রয়কে শাপ দেয় যে, তাহারা অপঘাত মৃত্যুতে বিনষ্ট হইবেন; এবং তাঁহাদের বাংলা ভূমিসাৎ হইবে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর উজ্জ্বল আলোকপ্রাপ্ত শ্বেতাঙ্গ পুরুষেরা এরূপ বাতুলের অভিসম্পাত একদম্ তুচ্ছ করিতে বাধ্য, সুতরাং নিরুদ্বেগে বাংলা নির্ম্মিত হইল। কিন্তু অতি অল্পদিন মধ্যে অফিসারদের একজন পোলো খেলায় ঘোড়া হইতে পড়িয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন, দ্বিতীয় ব্যক্তিও তাহার কিছুদিন পরে ঐ প্রকারে ঘোড়া হইতে পড়িয়া মারা যান। তৃতীয় ব্যক্তি এইরূপ ঘটনার পর ছুটি লইয়া বিলাত যাত্রা করেন। বিদায় ফুরাইলে ভারতে প্রত্যাগত হইয়া নৌকাডুবিতে গঙ্গার গর্ভে দেহ ত্যাগ করেন। বজরাতে দুইজন সাহেব ছিলেন, তন্মধ্যে এই ব্যক্তি বিলক্ষণ সন্তরণপটু থাকা সত্বেও প্রাণ হারাইলেন, অপর সাহেব রক্ষা পাইলেন। অবশেষে পরবর্ত্তী বর্ষাকালে ভয়ানক বন্যা হইয়া গঙ্গাতীরবর্ত্তী বাংলাটীও ভাসিয়া গেল।

উপসংহারে এই মাত্র বক্তব্য যে বর্ত্তমান সময়ের ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকগণ যাহা স্বীকার করিতে এ পর্য্যন্ত প্রস্তুত হন নাই, তাহা আমরা অসম্ভব বলিয়া উড়াইয়া দিয়া থাকি। আমাদের পরবংশীয়েরা যখন ঐ সকল বিষয় প্রাকৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধ নয় বলিয়া গ্রাহ্য করিবেন, তখন তাঁহারা আমাদের বুদ্ধির তারিফ না করিয়া থাকিতে পারিবেন না; যেমন আমরা এখন আমাদের পূর্ব্বগতদিগের সম্বন্ধে প্রকাশ করিয়া থাকি। নিউটন যখন বাষ্পীয় শক্তি দ্বারা শকটাদি পরিচালনের আভাস দিয়াছিলেন, তখন ফরাসী পণ্ডিত বল্টেয়ার উহা অসম্ভব অপ্রাকৃতিক বলিয়া নিউটনের কথার অযৌক্তিকতা সাব্যস্ত করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তজ্জন্য আমরা বল্টেয়ারের যেরূপ তারিফ করিয়া থাকি, কালে আমরাও সেইরূপ তারিফ পাইব সন্দেহ নাই। যাহা হউক মানুষের বিদ্যাবুদ্ধিক্ষমতা এখনও কতদূর বাড়িতে পারে সে সম্বন্ধে বিংশ

শতাব্দীর প্রধান বৈজ্ঞানিক টেস্‌লা কি বলিতেছেন পাঠকগণের গোচরার্থ তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"According to the adopted theory, first clearly formulated by Lord Kelvin, all matter is composed of a primary substance of inconcivable tennity, vaguely designated by the word 'Ether'. The atom of an elementary body is differenciated from the rest of this substance, which fills all space, merely by movement, as a small whirl of water is a calm lake.

All matter, then is merely whirling ether. By being set in movement ether becomes matter perceptible to our senses, the movement arrested the primary substance reverts to its normal state and becomes imperceptible. This theory of the constitution of matter is not merely a beautiful conception, which in its essence is contained in the old philosophy of the Vedas, but a physical truth; then if ether whirl or atom be shattered by impact or slowed down and arrested by cold, any material, whatever it be would vanish into seeming nothingness and conversely, if the ether be set in movement by some force, matter would again form. Thus by the help of a refrigerating machine or other means for arresting ether movement, and an electrical or other force of great intensity for forming ether whirls, it appears possible for man to amichilate or to create at his will, all we are able to percieve by our tactile sense." Unpublished address of, Nicola Tesla.

তাৎপর্য্য এই যে লর্ড কেল্‌ভিন প্রমুখ বৈজ্ঞানিকগণের মতে সমুদয় জড়বস্তু ইথার নামক পদার্থের (আকাশের) রূপান্তর মাত্র। ইথারকে জড়ে পরিণত করিতে গেলে তাহাকে অনবরত পাক খাওয়াইয়া রাখিতে হয়, সেই

পাক আবার বন্ধ, করিতে পারিলে জড়ের আকৃতি বিলুপ্ত হয়। টেস্‌লা বলেন যে জড়পদার্থ সম্বন্ধে এইমত আমাদের বৈদিকশাস্ত্রেও পাওয়া যায়। এই সত্য অবলম্বন করিয়া উত্তাপ ও শৈত্য দ্বারা ইথারকে পাক খাওয়াইবার এবং সেই পাক বন্ধ করিবার ব্যবস্থা করিতে পারিলে জড়ের সৃষ্টি ও নাশ সম্পাদিত হইতে পারে। এজন্য টেস্‌লা যন্ত্রাদির প্রস্তাব করিয়াছেন, পরন্তু ইচ্ছাশক্তি দ্বারাও তাহা সম্ভব।

এবম্প্রকার ঘটনার উল্লেখ করতঃ মহাত্মা সিনেট সাহেব বলিয়াছেন যে, স্থূলবুদ্ধি সাধারণ লোকে এ সকল কথা শুনিলে, "কি আশ্চর্য্য!"বলিয়াই ক্ষান্ত হন; একবারও ভাবেন না যে বিনাকারণে অকস্মাৎ এরূপ সংযোগ হওয়া অসম্ভব, বিশেষ যখন দেখা যায় যে সংসারে এরূপ সর্ব্বদাই ঘটিয়াছে।*

শ্রীচন্দ্রশেখর সেন।

চন্দ্রালোকে।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

পরদিন রাত্রি সাড়ে আট ঘটিকার সময় প্রফুল্ল ও বিমল আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সহ ষ্টেসনাভিমুখে যাত্রা করিল। সঙ্গে দুইজন ভৃত্য ও একজন পাচক চলিল। ষ্টেসনে পৌছিবা মাত্র মাষ্টার মহাশয় তাহাদিগকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া, তাহাদের জন্য যে গাড়ী রিজার্ভ করা ছিল, সেই গাড়ী দেখাইয়া দিলেন। ক্রমে গাড়ী ছাড়িয়া দিল। যথাসময়ে তাহারা বৃন্দাবনে পৌছিয়া দেখিল যে পূজারী মহাশয় স্বয়ং দুই খানি ভাড়াটিয়া গাড়ী সহ তাহাদের জন্য ষ্টেসনে অপেক্ষা করিতেছেন। পরস্পরের পরিচয় ও কুশলাদি আলাপনের পর তিনি তাহাদিগকে লইয়া ঠাকুর বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন।

চন্দ্রশেখর বাবু এক সময়ে তীর্থ পর্য্যটনে বহির্গত হন। নানা তীর্থ

---

* "The thick-headed common place person says : "How curious !" "What an odd coincidence !" Never stopping to calculate the millions to one that stand against the possibility that any such coincideneces can be due to chance or the gross absurdity of supposing them due to chance when they are multiplied in number." Natures mysteries—A. P. Sinnet.

পরিদর্শনের পর তিনি বৃন্দাবনে উপস্থিত হন এবং স্থানটী অতি মনোরম দেখিয়া মধ্যে মধ্যে বাস করিবার অভিপ্রায়ে এখানে এক দেবালয় স্থাপন এবং তৎসহ একটী ক্ষুদ্র বাস-ভবন নির্ম্মাণ করিয়া যান। সে আজ প্রায় ৪০ বৎসরের কথা। দেবালয়ের স্থানে স্থানে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। এপর্য্যন্ত এক বারও মেরামত হয় নাই। যাহা হউক তাহারা তথায় উপস্থিত হইয়া পরিচ্ছদাদি পরিবর্ত্তন করিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিল। এদিকে পূজারী ঠাকুর পূর্ব্ব হইতেই আহারীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি পাচককে রন্ধন স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া কিয়ৎক্ষণ পরে প্রফুল্ল ও বিমলকে লইয়া স্নানোদ্দেশে যমুনাতীরে গমন করিলেন। এদিকে পাচক অল্লক্ষণের মধ্যে অন্ন ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করিয়া রাখিল। তাহারা স্নান সমাপনান্তে প্রত্যাগত হইলে, "বেলা অধিক হইয়াছে, আপনারা ভোজনান্তে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করুন; আমি এক্ষণে বিদায় হই, পুনরায় ৫টার সময় আসিব" এই বলিয়া পূজারী মহাশয় বিদায় গ্রহণ করিয়া স্বীয় আলয়ে গমন করিলেন।

যথা সময়ে পূজারী মহাশয় অসিয়া উপস্থিত হইলেন। কিন্তু তখনও প্রফুল্ল ও বিমলকে নিদ্রায় অভিভূত দেখিয়া তাহাদগকে না জানাইয়া শয্যা পার্শ্বে বসিয়া রহিলেন। অল্লক্ষণের মধ্যে উভয়েই জাগরিত হইল এবং পার্শ্বে পূজারী মহাশয়কে উপবিষ্ট দেখিয়া প্রফুল্ল বলিল, "আমাদের জন্য আপনার অত্যন্ত কষ্ট হইতেছে। এস্থান আমাদের সম্পূর্ণ অপরিচিত।"

"আপনাদের অন্নে আমরা চিরকাল প্রতিপালিত। আপনার এত কুণ্ঠিত হইবার কোন কারণ নাই। কর্ত্তা বাবুর আদেশ, আপনারা এখানে যত দিন থাকিবেন, আমি পুত্র নির্ব্বশেষে আপনাদের রক্ষণাবেক্ষণ করিব। যাহা হউক ক্লান্তি দূর হইয়াছে ত!"

"আজ্ঞে, হাঁ, আমরা বেশ সুস্থ হইয়াছি।"

"অদ্য বৃন্দাবন পরিদর্শনে বহির্গত হইবেন কি!"

"সম্পূর্ণ ইচ্ছা আছে; কিন্তু আজ আপনাকে অনেক অনেক কষ্ট দিয়াছি; তজ্জন্য বলিতে সাহস করি না।

"আমার বিন্দুমাত্র কষ্ট হয় নাই; বরং আপনাদের আগমনে আমার সমধিক আনন্দ হইয়াছে। তবে আর বিলম্ব করিবার আবশ্যক নাই—সন্ধ্যা

আগত প্রায়" এই বলিয়া প্রফুল্ল, বিমল ও একজন ভৃত্যকে সঙ্গে লইয়া তিনি বহির্গত হইলেন।

আহা! কি নয়ন-মন মুগ্ধকর স্থান! সারি সারি বৈষ্ণবগণের কুঞ্জ; তন্মধ্যে রাসমঞ্চ, দোলমঞ্চ, তামালবন, নিকুঞ্জবন শোভা পাইতেছে; ময়ূর-ময়ূরী নৃত্য করিতেছে,; কোকিলের কুহুরবে সকলেই মোহিত। পালে পালে মর্কট নিঃশঙ্কচিত্তে বিচরণ করিতেছে। নিদাঘজ্বালা নিবারণার্থ উচ্চশির কেলি কদম্ব যমুনা পুলিনে বিরাজ করিতেছে। এখানে লছমি শেঠের কীর্ত্তি দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। ধবল-ভূধর সদৃশ বিশাল মন্দির; সম্মুখে স্বর্ণ মণ্ডিত এক মনোহর স্তম্ভ। ভিতরে রৌপ্য নির্ম্মিত হস্তী ও ময়ূর; হীরক, মুক্তা ও স্বর্ণের কত শত অলঙ্কার ঝক্ ঝক্ করিতেছে। তাঁহার সদাব্রতে কত শত দীনহীন প্রতিপালিত হইতেছে। তাহারা তাঁহার প্রতিষ্ঠিত লক্ষ্মী নারায়ণকে দর্শন ও প্রণাম করিয়া বদান্যহৃদয় লালা বাবুর কীর্ত্তি দর্শনে গমন করিল। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত মোহন মন্দির, মঠ, অতিথিশালা দর্শন করিলে চমৎকৃত হইতে হয়। এখানে সহস্র সহস্র যাত্রী অহরহ ভোজনে পরিতৃপ্ত হইয়া থাকেন। এই রূপে তাহারা অন্যান্য স্থান পরিদর্শন করিয়া ভক্তি-ভরা হৃদয়ে বাসাভিমুখে যাত্রা করিল।

প্রায় রাত্রি ৯টার সময় পূজারী মহাশয় তাহাদিগকে লইয়া বাসায় প্রত্যাগত হইলেন। প্রফুল্ল সর্ব্বাগ্রে শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিল, কিন্তু তদ্দণ্ডেই বিকট চীৎকারে বাহিরে আসিয়া বলিল যে একটী বৃহৎ বিষধর সর্প শয্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছে। তচ্ছ্রবনে পূজারী মহাশয় ও ভৃত্যদ্বয় একগাছা লাঠি লইয়া কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে, সকলের অভিপ্রায় ব্যর্থ করিয়া সর্পটি এক গর্ত্তের মধ্যে প্রবেশ করিল। সেই কক্ষে রাত্রি যাপন করিতে প্রফুল্ল ও বিমল শঙ্কিত হইল দেখিয়া তিনি তাহাদিগকে দেবালয়ে শয়ন করিতে অনুরোধ করিলেন; অগত্যা তাহারা সেই প্রস্তাবেই সম্মত হইলে পূজারী মহাশয় সে রাত্রির মত বিদায় গ্রহণ করিলেন। আহারাদি সমাপনান্তে পাচক ও ভৃত্যদ্বয় দেবালয়ে স্থানাভাব প্রযুক্ত বাটীর মধ্যেই শয়ন করিল এবং প্রফুল্ল ও বিমল ঠাকুর বাড়ীতে শয়ন করিতে গেল।

তাহারা ঠাকুর বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া দেখিল প্রশস্ত বেদীর উপর

তুলসী-চন্দনে চর্চ্চিত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রস্তর বিনির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তি। মূর্ত্তিটী ঊর্দ্ধে প্রায় চার ফিট্। চরণে নুপুর, কটিদেশে পীতবসন, হস্তে স্বর্ণবলয়, গলে বনফুলমালা, কর্ণে কুণ্ডল এবং মস্তকে চূড়া। মৃদুমন্দ সমীরণে চন্দন ও ফুলের সৌরভে গৃহটী আমোদিত। সম্মুখে যমুনা কল কল রবে প্রবাহিতা। আজ পূর্ণিমা নিশি; যমুনা সলিলে চন্দ্র কিরণ পতিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিতেছে! আজ যেন চন্দ্রদেব নিষ্কলঙ্ক। তাঁহার স্নিগ্ধ উজ্জ্বল কিরণে জীবকুল বিমোহিত। তাহারা বিগ্রহকে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া শয়ন করিল। পরস্পরকে নিদ্রিত মনে করিয়া উভয়েই নিস্তব্ধ। এইরূপে কিছুক্ষণ অতিবাহিত হইলে প্রফুল্ল মুহুর্মুহুঃ পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিতেছে দেখিয়া বিমল জিজ্ঞাসা করিল, "প্রফুল্ল! ওরূপ করিতেছ কেন!"

ঘুম আসিতেছে না, কেমন এক রকম ভয় ও যন্ত্রণা হইতেছে।"

"ও কিছু নয়; সর্পটা দেখা অবধি আমারও ঐরূপ হইতেছে!"

"না ভাই! আমি যেন কোন উপস্থিত বিপদ গণিতেছি। সর্ব্বনাশ! ঐ শুন, যেন সেই ঘণ্টার শব্দ!" এই বলিয়া প্রফুল্ল হস্তদ্বয়ে মুখমণ্ডল আবৃত করিল।

"ওকি! উন্মাদ হোলে না কি?"

"না ভাই! আমি পাগল হই নাই। ঘণ্টাটি স্পষ্টই বাজিতেছে!"

"অনর্থক ভয় পাইও না; চল বাহিরে যাই!'

"না, বাহিরে যাইতে হইবে না—এখানে সাপের বড়ই উপদ্রব।'

"তবে ঘরের জানালা দ্বার সমস্ত খুলিয়া দিই", এই বলিয়া বিমল সমস্ত খুলিয়া দিয়া প্রফুল্লের পার্শ্বে উপবেশনপূর্ব্বক তাহাকে নানা উপায়ে অন্যমনস্ক করিতে চেষ্টা পাইল।

"না ভাই! আর না—ঘরের চারি ধার হইতে যেন ঘণ্টার শব্দ উত্থিত হইতেছে—শব্দটী যে ক্রমশই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল! তুমি যাহা বলিয়াছিলে, তাহাই ঘটিল। কেন তোমার কথা অবহেলা করিয়াছিলাম! না জানি কি সর্ব্বনাশই ঘটিল! হা ভগবান!

তাহাকে লইয়া বিমল সহসা বড়ই বিব্রতে পড়িল। করযোড়ে বিগ্রহকে প্রণাম করিয়া মনেমনে প্রার্থনা করিল, "দেব! এবিপদ হইতে রক্ষা করুন। প্রফুল্লের যেন কোন অমঙ্গল না ঘটে।"

প্রফুল্ল অধৈর্য্য সহকারে আবার বলিয়া উঠিল," ঐ শুন, এখন ঘণ্টাটী এই ঘরের মধ্যেই ভৈরব রবে বাজিতেছে।" এই বলিয়া বিকার গ্রস্ত রোগীর ন্যায় শয্যা ত্যাগ করিয়া আবার তৎক্ষণাৎ উপাধানে মুখ লুকাইল।

নিকটে পাখা না থাকায় বিমল অগত্যা বিগ্রহের চামর লইয়া তাহাকে ব্যজন করিতে করিতে নানা প্রকারে সান্ত্বনা করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু কোন চেষ্টা ফলবতী হইল না। আবার উঠিয়া বসিল এবং বিমলের গলদেশ ধারণ করিয়া বক্ষে মুখ লুকাইয়া বালকের ন্যায় রোদন করিতে করিতে বলিল, "ভাই! কি যে সর্ব্বনাশ ঘটে, কিছুই বলিতে পারি না।"

"কেন বৃথা অনিষ্ঠ চিন্তা করিতেছ। আমার বোধ হয় এটী তোমার ভয় জনিত মস্তিষ্কের বিকার মাত্র। উভয়ে এক স্থলে অবস্থান করিতেছি, কিন্তু তুমি শব্দ শুনিতেছ, আর আমি শুনিতেছি না; ইহা কি সম্ভব?'

সহসা প্রফুল্লের দৃষ্টি বাহিরে পতিত হইল। বাহিরে জ্যোৎস্না ফাটিয়া পড়িতেছে। সে আলোকে দিবালোকের ন্যায় ক্ষুদ্র বস্তুও স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়। কিয়ৎক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিল, "দেখ দেখ, গৃহের ঠিক সম্মুখে ৩।৪ ফিট ঊর্দ্ধে কেমন এক রকম ধূমের ন্যায় দেখা যাইতেছে। কি আশ্চর্য্য! ঐ ধূমের মধ্যে চন্দ্ররশ্মি পৃথক পৃথক ভাবে পতিত হইয়া যেন নৃত্য করিতেছে। আর ঐ রশ্মিগুলি একত্রিত করিলে যেন একটী মূর্ত্তি গঠিত হয়।"

বিস্ময়াস্তঃকরণে উভয়েই বাহ্যজ্ঞান হারা হইয়া সেই অলৌকিক দৃশ্য দেখিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে সেই ধূম ঘণীভূত হইয়া বাস্তবিক একটী মূর্ত্তি গঠন করিল। দেখিতে দেখিতে সেটী রমণী মূর্ত্তি ধারণ করিল। আহা! কি মনোহর! সুন্দরে মধুরে মিশ্রিত! সুচিকণ কেশদাম পৃষ্ঠদেশ দিয়া পদ চুম্বন করিতেছে। রমণীর সেই নলজ্জ দৃষ্টিতে যেন সরলতা মাথান। মুখকমলে চন্দ্র কিরণ প্রতিভাত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিল।

"হায় অভাগিনি! এ হতভাগ্যের অদৃষ্টদোষে আজ তুমি তোমার অমূল্য জীবন হারাইলে! আজ আমিই তোমার মৃত্যুর কারণ হইলাম! ভাই বিমল! আমি ঐ রমণীকে চিনিয়াছি। ঐ বালিকাই আমার ভাবী পত্নী! দেখ দেখ, বাহিরে যাইবার জন্য আমাদিগকে ইঙ্গিত করিতেছে না? এঁ্যা, আমাকে ডাকিতেছ? কিন্তু আমার যে পা উঠিতেছে না।" এতক্ষণ বিমল প্রফুল্লের পার্শ্বে বসিয়া মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় মূর্ত্তিটী অবলোকন করিতেছিল। বাহিরে যাইবার জন্য ঘন ঘন ইঙ্গিত করিতেছে দেখিয়া বিমল বলিল, "প্রফুল্ল এ কি অদ্ভুত রহস্য! কি জন্য ডাকিতেছে, চল নিকটে যাই।"

তাহারা গৃহের বাহিরে আসিলে মূর্ত্তিটী দ্রুত পদবিক্ষেপে অগ্রে অগ্রে চলিতে লাগিল এবং প্রফুল্ল ও বিমল তাহার পশ্চাৎ অনুসরণ করিল। ক্রমে সেটী বাটীর ভিতর প্রবেশ করিয়াই তাহাদের চক্ষের উপর সহসা শূন্যে মিশিয়া গেল। অমনি দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিয়া বজ্রনিনাদে ঠাকুর বাড়ী পড়িয়া গেল। (ক্রমশঃ।) শ্রীবিরাজমোহন দে।

বিজ্ঞান প্রাচ্য ও প্রতীচ্য।

সে দিন অত্রস্থ Campbell Schoolএর কতকগুলি ছাত্র একটী রোগীর সেবা করিতেছিল রোগীর রোগ বৃদ্ধি হইল এবং তাহার জীবন ইহ ও পরজীবনের সন্ধি স্থলে আসিয়া পৌছিল। তখন রোগীকে তাহার অবস্থা বর্ণনা করিতে বলায় সে বলিল "আমি বেশ আছি কোন কষ্ট নাই। তবে ভয় করিতেছে আমি যেন ছড়াইয়া পড়িতেছি"। রোগী ভাগ্যক্রমে সুস্থ হইয়াছে। এক্ষণে অজ্ঞ সূক্ষ্মভাবে অনভ্যস্থ জীব মৃত্যুসময়ে দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলে স্থূল মোহজন্য স্থূলভাবেই বুঝিতে চেষ্টা করে এবং সে কারণ তাহার মনে হয় যেন সে বিস্তৃত হইয়া ছড়াইয়া পড়িয়া কোথায় মিশিয়া যাইতেছে। পরিচ্ছিন্ন সীমা স্বরূপ দেহভাবে বদ্ধ হইলে আত্মজ্ঞান ও বহির্ম্মুখী হইয়া পড়ে এবং সীমাটী পড়িয়া গেলে আপনাকে হারাইয়া ফেলে। সূক্ষ্মভাব, অভ্যাস ও ধ্যানধারণা যে কত আবশ্যক তাহা অনেকে বুঝিতে পারিবেন।

* * *

প্রতীচ্য খণ্ডে থিয়সফির প্রভাব কিরূপে দিন দিন বিস্তৃত হইছে. তাহা Rev. T. S. Lea কৃত essays in Logos and Gnosis : Mainly in Relation to the Neo-Buddhist Theosophy নামক পুস্তক পাঠে জানা যায়। পুস্তকের প্রারম্ভে গ্রন্থকারকে স্বীকার করিতে হইয়াছে, যে একালে শুধু বিশ্বাসের উপর ধর্ম্মস্থাপনা করিলে চলিবে না। জ্ঞান ও আত্মজ্ঞানের আবশ্যকতা আছে; এবং Theosophy দ্বারা এই জ্ঞানের প্রসার কিরূপে সাধিত হইতেছে, তাহা তিনি স্বীকার করেন। তবে পুনর্জ্জন্ম লইয়া থিয়সফির সঙ্গে তাঁহার বিবাদ।

* * *

তাঁহার অপত্তি তিনটী। প্রথমতঃ খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মগ্রন্থে পুনর্জ্জন্মের উল্লেখ নাই, এবিষয়ে আমরা বলি যে, New Testment এ ওরূপ বিশিষ্ট উল্লেখ না থাকিলেও তাহার যথেষ্ট কারণ আছে। নূতন অভিনব ধর্ম্ম সৃষ্টি করিবার মানসে প্রভু খ্রীষ্টের শিষ্যমণ্ডলী পূর্ব্ব প্রচলিত ধর্ম্মের সহিত সৌশাদৃশ্য কম করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করেন। পূর্ব্বে যাহা কিছু ছিল তাহা তাঁহাদের চক্ষে Pegan বলিয়া গণ্য হইত। যাহারা এখনও অমানুষিক উপায়ে প্রভু খ্রীষ্টের প্রকৃত শিক্ষা গ্রহণে সক্ষম, তাঁহারা এবিষয়ে সন্দেহ করিতে পারেন, না।

* * *

তাঁহার দ্বিতীয় আপত্তি এই যে, প্রাকৃতিক জগতে বাহ্যভাবে পুনর্জ্জন্মের ক্রিয়া দৃষ্ট হয় না এ কথাটী আমরা স্বীকার করি না। পুনর্জ্জন্মের প্রতিচ্ছবি উদ্ভিজ জগতেও দৃষ্ট হয়। ভুঁই চাঁপা নামক উদ্ভিদ যেরূপে মরিয়া গিয়া পুনরায় পুষ্পে বিকশিত হইয়া উঠে, যেরূপে ইংরাজি Pondwid শীতের প্রারম্ভে মরিয়া গিয়া গ্রীষ্ম কালে পুনরায় সজীব হয়, তাহা দেখিলে ও কথা বলা যায় না। তাঁহার তৃতীয় অপত্তি যে, পুনর্জ্জন্মবাদে ঈশ্বরের পাপ মোচনরূপ ক্ষমতার হানি হয়, একেবারেই অগ্রাহ্য। ঈশ্বরের অনুগ্রহ হইতে গেলেই যে স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রম করিতে হয়, ইহা মিথ্যা। ঈশ্বরের অনুগ্রহেই পুনর্জ্জন্ম ও সংসার চক্রের নিবৃত্তি উভয় ব্যাপারেই সাধিত হয়। যাহা হউক পাদ্রী মহলে থিয়সফির চর্চ্চা ভয়প্রযুক্ত হইলেও ফলে মঙ্গলদায়ক। আশা করি গ্রন্থকার এবিষয়ে পুনরায় চিন্তা করিবেন।
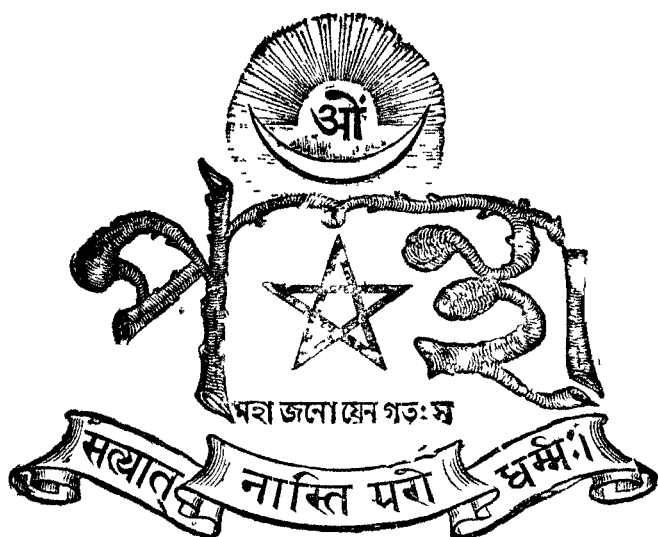
৯ম ভাগ। { মাঘ, ১৩১২ সাল। } ১০ম সংখ্যা।

চৈতন্য কথা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

বুদ্ধদেব।

যে কালে বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সে কালে সনাতন ধর্ম্মের ছায়ামাত্র ভারতবর্ষে ছিল। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পার্থিবলীলা সংবরণ করিলে গভীর অন্ধকার আসিয়া ধর্ম্মজগৎ আচ্ছাদিত করিল, অত্যুজ্জ্বল প্রদীপ্ত আলোক নির্ব্বাপিত হইলে অন্ধকার যেমন অধিকতর অন্ধকারময় হয়, ভারতের ভাগ্যে তাহাই ঘটিয়াছিল। সে চিন্তাশীলতা, সে স্বাধীনতা, সে উদারতা যেন একবারে লোপ পাইয়াছিল, দর্শনের সঙ্কীর্ণতা, ধর্ম্মের সাম্প্রদায়িকতা, চিন্তার শৃঙ্খলবদ্ধতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। বেদ বুঝিবার শক্তি থাকিল না, কিন্তু বেদের দোহাই উচ্চ হইতে উচ্চতর হইল, দর্শন কেবল গোঁড়ামীতে পরিণত হইল।

বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের অনুগামী ব্রাহ্মণগণ "ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণ" শব্দে অভিহিত

হইতেন এবং দর্শনের অনুগামী সন্ন্যাসীদিগকে বহুকাল হইতে শ্রমণ বলিত। বাল্মীকি কৃত রামায়ণেও শ্রমণের উল্লেখ আছে।

আর্য্যেন মম মান্ধাত্রা ব্যসনং ঘোরমীপ্সিতম্।
শ্রমণেন কৃতে পাপে যথা পাপং কৃতং ত্বয়া॥

রামচন্দ্র বালিকে বলিয়াছিলেন "এক শ্রমণ এইরূপ পাপাচরণ করিলে আমার পূর্ব্বপুরুষ মান্ধাতা এইরূপ দণ্ড দিয়াছিলেন।" শ্রমণেরা কর্ম্মকাণ্ড মানিতেন না; তাঁহারা দর্শন মানিতেন। দর্শন মানিতে গিয়া কেহ হয় ত উপনিষদ্ মানিতেন—কেহ মানিতেন না।

প্রচলিত নিয়ম অনুসারে বুদ্ধদেবও একজন শ্রমণ হইলেন। সেকালে ব্রাহ্মণেরা বাদশীল ছিলেন। তীর্থীয়, আজীবিক ও নিগ্রন্থ বলিয়া তাঁহাদের মধ্যে ভেদ ছিল। তাঁহারা কেহ "পদক" অর্থাৎ ছন্দঃগ্রন্থে পারদর্শী ছিলেন। কেহ বৈয়াকরণ ছিলেন, নিঘণ্টু, কেতুভ, ইতিহাস ইত্যাদি শাস্ত্রও তাঁহারা অধ্যয়ন করিতেন। জপের বিশেষ প্রতিষ্ঠা ছিল। ব্রাহ্মণদিগের প্রধান মন্ত্র সাবিত্রী ছিল। তিন বেদ অধ্যয়ন করিতেন বলিয়া, তাঁহাদিগকে ত্রৈবিদ্য বলিত। যে সকল ব্রাহ্মণগণ বাণপ্রস্থ অবলম্বন করিতেন, তাঁহাদিগকে "জটিল" বলিত। তাঁহারা জটা রাখিতেন এবং আশ্রমে বিধিপূর্ব্বক অগ্নি স্থাপন করিতেন। নিয়মিত কালে তাঁহারা মহাসমারোহে যজ্ঞ করিতেন। গোতমবুদ্ধের আবির্ভাব কালে তাঁহাদের অত্যন্ত সমাদর ছিল। সর্ব্ব প্রধান জটিল কশ্যপ বুদ্ধদেবের শিষ্য হইয়াছিলেন।

শ্রমণদিগের মধ্যে চারি প্রকার ভেদ ছিল—মার্গজিন (মার্গজয়ী) মার্গদেশক (মার্গ-উপদেশক) মার্গজীবী এবং মার্গদূষী। বোধ হয় জৈন সম্প্রদায় মার্গজিন হইতেই উদ্ভূত। শ্রমণদিগের মধ্যে বাদানুবাদে হাতাহাতি চলিত। তাহাদিগের মধ্যে ত্রিষষ্টি প্রকার দর্শন বা "দৃষ্টি" প্রচলিত ছিল। শ্রমণের সম্বন্ধে বুদ্ধদেব বলিয়াছিলেন—

"ন মুণ্ডকেন সমণো অব্বতো অলিকং ভণং।
ইচ্ছালোভ সমাপন্নো সমণো কিং ভবিস্সতি।"

মিথ্যাবাদী ও ব্রতহীন ব্যক্তি কেবল মস্তক মুণ্ডন দ্বারা শ্রমণ হয় না; বাসনা এবং লোভযুক্ত ব্যক্তি কিরূপে শ্রমণ হইবে?

"যো চ সমেতি পাপানি অণুং থূলানি সব্বসো
সমিতত্তা হি পাপানং সমণোহতি নবুচ্চতি ॥"

আর যিনি ক্ষুদ্র কিম্বা মহৎ সমস্ত পাপ দূরীকৃত করেন, পাপের প্রশমন-হেতু তিনি শ্রমণ বলিয়া কথিত হন। চারুচন্দ্র বসুর "ধর্ম্মপদ"—ধর্ম্মার্থ বাক্য ১৪৭পৃষ্ঠা।

ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে গোতমবুদ্ধের যে মত ছিল, তাহা জানা আবশ্যক।

ভগবান্ বুদ্ধদেব শ্রাবস্তি নগরে বাস করিতেছিলেন। কোশল হইতে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণগণ আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আর্য্য, আজ কালকার ব্রাহ্মণ-গণ প্রাচীন ব্রহ্মণ্যধর্ম্ম রক্ষা করেন কি ?" বুদ্ধদেব উত্তর করিলেন—"প্রাচীন ঋষিগণ সংযত ও তপস্বী ছিলেন। তাঁহারা ইন্দ্রিয়ের বিষয় ত্যাগ করিয়া আপন আপন মঙ্গলচিন্তা করিতেন। ধেনু, স্বর্ণ ও শস্য তাঁহাদের সম্পত্তি ছিল না। ধ্যানই তাঁহাদের প্রধান সম্পত্তি। সেই সকল ব্রাহ্মণদিগকে ধর্ম্ম রক্ষা করিত। কেহ তাঁহাদের বিরোধী ছিল না। লোকে ইচ্ছাপূর্ব্বক প্রচুর অর্থ সামগ্রী দ্বারা তাঁহাদের পূজা করিত।

আট্ চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত তাঁহারা ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিতেন। তাঁহারা বিজ্ঞানের অন্বেষণে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেন। তাঁহাদের চরিত্র অন্যের আদর্শ স্বরূপ ছিল। তাঁহারা অসবর্ণা কন্যার পাণিগ্রহণ করিতেন না এবং মূল্য দ্বারা পত্নী আহরণ করিতেন না। বিবাহের পর তাঁহারা দাম্পত্যপ্রেমে কাল-যাপন করিতেন। প্রায় ঋতুর অবসান কাল ব্যতীত অন্য সময়ে তাঁহারা পত্নী-সঙ্গম করিতেন না। তাঁহারা ধর্ম্মের প্রশংসা করিতেন। দয়া, দাক্ষিণ্য, ধৈর্য্য ও সত্য তাঁহাদের স্বাভাবিক ধর্ম্ম ছিল।

যাঁহারা ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে বিশিষ্ট ছিলেন, তাঁহারা স্বপ্নেও কামের অনুশীলন করিতেন না। তাঁহারা যজ্ঞের জন্য অর্থসংগ্রহ করিতেন। কিন্তু যজ্ঞকালে গো-বধ করিতেন না।

আহা! যেমন আমাদের মাতা, পিতা, ভাই, ভগিনী ; গোসমূহও আমাদের সেইরূপ বন্ধু। গো সকল হইতে আমরা আহার, ওষধি, বল ও সুখ প্রাপ্ত হই। এইজন্য তাঁহারা গো-বধ করিতেন না।

তাঁহারা সত্য সত্যই ব্রাহ্মণপ্রকৃতি ছিলেন। দীর্ঘকায়, বলবান্, সৌন্দর্য্য-

শালী সেই ব্রাহ্মণগণ আপন আপন কার্য্যে যথেষ্ট তৎপর ছিলেন। যতদিন তাঁহারা জীবিত ছিলেন, ততদিন এই আর্য্যবংশের উন্নতি ছিল।

হায়! কালের স্রোতে তাঁহাদের পরিবর্ত্তন হইল। রাজার ঐশ্বর্য্য দেখিয়া—সুশোভনা রমণী দেখিয়া তাঁহারা মোহিত হইলেন। তখন লোভপরবশ ব্রাহ্মণেরা উত্তম উত্তম ঋক্ রচনা করিয়া রাজার নিকট গমন করিলেন এবং অশ্বমেধাদি নানা যজ্ঞের ভান্ করিয়া দক্ষিণা স্বরূপ প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করিতে লাগিলেন। সুন্দর অট্টালিকা, সুন্দর পরিচ্ছদ, সুন্দরী রমণী, প্রভূত গো, অশ্ব, রথ, পরিচারকাদি, ইহাতেও ব্রাহ্মণদিগের লোভ পরিতৃপ্ত হইল না।

তাঁহারা রাজাকে যজ্ঞে গো-বধের জন্য উত্তেজিত করিলেন, রাজাও যজ্ঞে লক্ষ লক্ষ গো-বধ করিতে লাগিলেন। গোসমূহ কাহারও অনিষ্ট করে না; তাহারা ক্ষুরদ্বারা কি শৃঙ্গদ্বারা কাহাকেও আঘাত করে না। কোমল প্রকৃতি গো সকল আমাদিগকে দুগ্ধ দান করে। সেই গো সকলকে শৃঙ্গে ধরিয়া শাণিত অস্ত্রদ্বারা রাজা নিপাতিত করিতে লাগিলেন।

তখন দেবগণ, পিতৃগণ, ইন্দ্র, অসুর এমন কি রাক্ষসগণও আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তাঁহারা চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন "কি অবিচার!"

পূর্ব্বে তিন ব্যাধি ছিল; বাসনা, তৃষ্ণা ও ক্ষয়। গো-বধের কাল হইতে আটানব্বই ব্যাধির উৎপত্তি হইল। সনাতন কাল হইতে এই অবিচার চলিয়া আসিতেছে। নিরীহ গো সকল নিহত হইতেছে এবং যজ্ঞকারী ব্রাহ্মণগণ ধর্ম্মে পতিত হইয়াছে।

এই জন্য বিদ্বান্ ব্যক্তি সনাতন ধর্ম্মের নিন্দা করেন। এই জন্যই তিনি যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণের নিন্দা করেন। ধর্ম্মের যখন হানি হইল, তখনই শূদ্র ও বৈশ্যের মধ্যে বিরোধ হইল—ক্ষত্রিয়গণ ভিন্নমত অবলম্বন করিল—পত্নী পতিকে ঘৃণা করিতে লাগিল—ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণ কামসুখে রত হইল। (Sacred Books of the East vol X Satta-Nipata p. 47 ব্রাহ্মণ ধর্ম্মিকাসুক্ত।)

কোশলরাজ্যে অচিরাবতী (ইরাবতী) তীরে ভগবান্ বুদ্ধদেব শিষ্য সমভিব্যাহারে বিচরণ করিতেছিলেন। ব্রাহ্মণকুমার বাশিষ্ট ও ভরদ্বাজ

তর্কমীমাংসার জন্য তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা করপুটে নিবেদন করিলেন, "গোতম, ব্রহ্মার সহিত মিলিত হইবার উপায় আমাদের আচার্য্যগণ ভিন্নরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। ঐতরেয়, তৈত্তিরিয়, ছান্দোগ্য, অধ্বর্য্যু ও ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণগণ বিভিন্ন মার্গের উপদেশ করেন। সকল মার্গই কি ব্রহ্মাকে লাভ করিবার উপায়?" বুদ্ধদেব বলিলেন "বাশিষ্ঠ, বেদত্রয়ে পারদর্শী হইয়া কোনও ব্রাহ্মণ কি ব্রহ্মার সহিত সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন? তাঁহাদের সপ্তমপুরুষ পর্য্যন্তও কি কেহ এরূপ সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন? যে সকল ঋষিরা বেদত্রয় রচনা করিয়াছেন, বামদেব, বিশ্বামিত্র, জমদগ্নি, আঙ্গিরস, ভরদ্বাজ, বশিষ্ঠ, কশ্যপ ও ভৃগু, ইঁহারা কি কখনও বলিয়াছেন, আমরা ব্রহ্মার সহিত সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছি? যদি তাঁহারাই ব্রহ্মার সহিত সাক্ষাৎকার না করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহারা ব্রহ্মার সহিত মিলিত হইবার সহজ উপায় কিরূপে বলিতে পারেন? অন্ধদ্বারা কি অন্ধ নীয়মান হইতে পারে? সূর্য্য ও চন্দ্র ব্রাহ্মণেরা প্রত্যক্ষ করেন, ও নিত্য উপাসনা করেন। তাঁহারা কি বলিতে পারেন, সূর্য্যলোক ও চন্দ্রলোক যাইবার সহজ পথ কি?

বাশিষ্ঠ, যদি কেহ বলে, এই দেশে সর্ব্বাপেক্ষা যে সুন্দরী রমণী আছে তাহাকে আমি অত্যন্ত ভালবাসি এবং লোকে যদি তাহাকে জিজ্ঞাসা করে সে রমণী কে এবং উত্তরে যদি সে বলে আমি জানি না, তাহা হইলে কি সে উপহাসাস্পদ হয় না?

যদি চৌরাস্তার উপর কেহ সিঁড়ি নির্ম্মাণ করে, এবং জিজ্ঞাসা করিলে সে বলে কোন্ বাটীর উপর আরোহণ করিতে হইবে তাহা জানি না, তখন কি লোকে তাহাকে বাতুল বলে না?

এই অচিরাবতী নদী যদি আকূলপূর্ণা হয় এবং কর্ম্ম উপলক্ষে কাহাকেও যদি অপর পারে যাইতে হয়, সে যদি এ পার হইতে চীৎকার করে, "হে, নদীর অপরকূল, তুমি এই পারে আইস," তাহা হইলে কি অপর কূল সেই কথা শুনিবে? বাশিষ্ঠ, যদি ব্রাহ্মণেরা তিনবেদ অধ্যয়ন করিয়াও সেই সকল সদ্গুণের আধার না হন, যাহাতে লোক সত্য সত্য ব্রাহ্মণ হয়, তাহা হইলে কি "ইন্দ্র তোমাকে আহ্বান করিতেছি—বরুণ তোমাকে

আহ্বান করিতেছি—ঈশান তোমাকে আহ্বান করিতেছি—প্রজাপতি তোমাকে আহ্বান করিতেছি—ব্রহ্মা তোমাকে আহ্বান করিতেছি," এইমাত্র বলিয়া আহ্বান করিয়াই তাহারা মৃত্যুর পর ব্রহ্মার সহিত মিলিত হইতে পারে ?

রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ, এই পাঁচ বিষয়ের বন্ধনে ব্রাহ্মণগণ বিশেষরূপে আবদ্ধ। তাঁহারা নদীর অপর পারে কিরূপে যাইবেন ? বিষয়ের সম্বন্ধে তাঁহাদের রিপু সকল সর্ব্বদা উত্তেজিত হইতেছে। ভোগের উন্মাদে তাঁহারা এ বিষয় একবার ভাবিয়াও দেখেন না। মৃত্যুর পর এই সকল ব্রাহ্মণেরা কিরূপে ব্রহ্মার সহিত মিলিত হইতে পারেন ?

বাশিষ্ঠ, যদি এ পারে সম্পূর্ণভাবে আচ্ছাদিত হইয়া তুমি শয়ন কর, তাহা লইলে কি অচিরাবতীর অপর পারে যাইতে পার ?

কাম, হিংসা, আলস্য, অহঙ্কার এবং সংশয় এই পাঁচ আবরণে আচ্ছাদিত হইয়া ব্রাহ্মণেরা কিরূপে অপর পারে যাবেন ?

ব্রহ্মার কি পত্নী আছে, ব্রহ্মার কি ধন আছে ? তাঁহার কি ক্রোধ আছে, না হিংসা আছে, না মনের অপবিত্রতা আছে ? ব্রহ্মার কি আত্মসংযম নাই ?

সপত্নীক, ধনশালী ব্রাহ্মণগণের কি ব্রহ্মার কোন অংশে তুলনা হয় ? তাঁহারা রাগ দ্বেষে পূর্ণ হইয়া মৃত্যুর পর ব্রহ্মার সহিত কিরূপে মিলিত হইতে পারেন ?

ব্রাহ্মণেরা মনে করেন যে, তিন বেদ পড়িয়া তাঁহারা কোন পুণ্যলোকে গমন করিবেন ; কিন্তু বাস্তবিক তাঁহারা গভীর পঙ্কে নিমগ্ন হইতেছেন। তাঁহাদের ত্রয়ী বিদ্যা কেবল জলশূন্য মরুভূমি, মার্গহীন গহনবন, এবং নাশের আলয়মাত্র।

বাশিষ্ঠ, আমি তথাগত, আমাকে যদি কেহ ব্রহ্মলোকের কথা জিজ্ঞাসা করে, আমি নিঃসন্দেহরূপে ঐ লোকের কথা বলিতে পারি, কোন্ পথে ব্রহ্মলোকে যাইতে হয় তাহা বলিয়া দিতে পারি। আমি ব্রহ্মাকে জানি, ব্রহ্মলোকও জানি।

তবে বাশিষ্ঠ অবধান কর। কালে 'তথাগত' বুদ্ধ এই ব্রহ্মাণ্ডে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জ্ঞানালোকে পরিপূর্ণ, সুলক্ষণসম্পন্ন ও সুমহান্। ব্রহ্মাণ্ড

তাঁহার করতলগত। তিনি দেবগুরু ও মনুষ্যগুরু। তিনি অন্তরের আলোকদ্বারা সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড প্রত্যক্ষ করেন। অধোলোক ও উর্দ্ধলোক, মার ও ব্রহ্মা, শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ, দেব ও মনুষ্য, এমন কি যাবতীয় জীব তাঁহার জানিতে কিছুই বাকী থাকে না। তিনি নিজে সত্য উপলব্ধি করিয়া জগতে প্রচার করেন। ধর্ম্মের পূর্ণতা ও পবিত্রতা তিনি বিস্তার করেন।

এই সত্য অবগত হইয়া গৃহপতি গৃহত্যাগ করে। সে শীল ও সদ্গুণের অনুশীলন করে।"

Rhys David's Buddhist Sattas (Sacred Books of the East, Volume XI.) Tevigga Satta, page 167 et seq.

অনুবাদে Brahma" আছে। মূল পালিগ্রন্থে "ব্রহ্মা" কি "ব্রহ্ম" আছে বলিতে পারি না। অনুসন্ধান করিয়া পালিগ্রন্থ পাই নাই। রিস্ ডেভিড্ সাহেব অনুমান করেন, বাশিষ্ঠ ও ভরদ্বাজ ব্রহ্মের সহিত মিলিত হইবার কথা বলিয়াছিলেন। কিন্তু বুদ্ধদেব "ব্রহ্মার" কথা বলিয়াছিলেন। অনুমানটি মনে হয় সত্য।

"It is not easy to say what opinion is really imputed to the young Brahmanas before their conversion. It is probably meant that they were seeking a way by which their self should become identified after death, with Brahman ; a way by which they could escape from the immortality of transmigration, from existence altogether as seperate individuals. And in holding out a hope of union with Brhama as a result of the practice of universal love, the Buddha is most probably intended to mean a union with Brahma in the buddhist sense—that is to say a temporary companionship as a separate being with the Budddist Brahma, to be enjoyed by a new Individual not consciously identical with its predecessor." Rhys David's Introduction to Tevigga Satta.

রিস্ ডেভিড্ সাহেবের মতে বৌদ্ধ "ব্রহ্মা" ও হিন্দু "ব্রহ্মা" স্বতন্ত্র। কিন্তু এ অনুমান তাঁহার অলীক।

যে সময়ে বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ ক'রেন সে সময়ে ব্রাহ্মণেরা যজ্ঞের এত আদর করিতেন যে, বোধ হয়, উপনিষদের জ্ঞান তাঁহাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল না। দু'চারিখানি উপনিষদ্ প্রচলিত থাকিলেও 'ঔপনিষদ্ ব্রহ্মা' কেবল সুদূর স্মৃতিমাত্র ছিল। লোভী ব্রাহ্মণের নিকট উপনিষদ্ অপেক্ষা ত্রয়ীবিদ্যার সমাদর অধিক ছিল।

"এবং ত্রয়ী ধর্ম্মমনুপ্রপন্না, গতাগতং কামকামা লভন্তে।"

শ্রীকৃষ্ণের এই উপদেশ সকাম হৃদয়ে স্থান পায় নাই।

তবে ঔপনিষদ্ ব্রহ্মের কথা ব্রাহ্মণকুমারেরা যে একেবারে জানিতেন না, ইহা সম্ভবপর নয়। তাঁহারা ঐতরেয়, তৈত্তিরিয় ও ছান্দোগ্যমার্গের উল্লেখ করিয়াছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে আবার অধ্বর্য্যুর কথা। সকল মার্গই তাঁহাদের এক খেঁচুরি হইয়া পড়িয়াছিল। কর্ম্মকাণ্ডে তাঁহারা বড় জোর ব্রহ্মারই অন্বেষণ করিতে পারিতেন এবং জ্ঞানকাণ্ডদ্বারাই কেবল ব্রহ্ম পাইতেন। তাঁহাদের "ব্রহ্ম" ও "ব্রহ্মা" বড় বিভিন্ন ছিল না। তাঁহাদের "ব্রহ্মলোকে গমন" ও "ব্রহ্মত্বলাভ" হয় ত একই ছিল।

গোতমবুদ্ধ কিন্তু বাস্তবিক ঔপনিষদ্ ব্রহ্ম জানিতেন না। তিনি শ্রমণধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন। বেদ ও ঔপনিষদ্ অধ্যয়ন করিবার তাঁহার সুযোগ হয় নাই। ব্রাহ্মণদিগের আচরণে তিনি এত বিরক্ত হইয়াছিলেন যে, ব্রাহ্মণদিগের শাস্ত্র পড়িবার জন্য তাঁহার কিছুমাত্র আস্থা ছিল না।

তিনি সাধনাবলে—পূর্ব্বজন্মের সংস্কার বলে, দিব্যদৃষ্টি লাভ করিয়াছিলেন। দিব্যদৃষ্টিদ্বারা যাহা তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তাহাই তাঁহার ধর্ম্ম। যে সত্য তিনি প্রত্যক্ষ করেন নাই, তাহা তিনি ধর্ম্ম বলিয়া প্রচার করেন নাই। তাঁহার নিজ প্রত্যক্ষের উপর গভীর বিশ্বাস ছিল। সেই জন্য হৃদয়ের আবেগে তিনি সেই ধর্ম্মের উপর সকলের বিশ্বাস উৎপাদন করাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীপূর্ণেন্দু নারায়ণ সিংহ।

আদর্শ-চরিত্র।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

২। প্রহ্লাদ।

বিমূঢ় দ্বারপালদ্বয় বৈকুণ্ঠতোরণে নগ্ন ঋষিগণকে দেখিয়া উপহাসপূর্ব্বক বেত্রদ্বারা প্রবেশপথ বন্ধ করিয়া জগতের যে মহদুপকার সাধন করিয়াছে তাহা বর্ণনাতীত। কশ্যপ "পুত্রস্যৈব চ পুত্রাণাং ভবিতৈকঃ সতাং মতঃ। গাস্যন্তি যদ্যশঃ শুদ্ধং ভগবদ্যশসাসমং॥" বলিয়া দিতিকে যে কেবল শান্ত করিয়াছিলেন তাহা নহে, বস্তুতঃ আজিও এই কলির ঘোর অন্ধকারের মধ্য দিয়া প্রহ্লাদের শুভ্র চরিত্রালোক লক্ষ্য করিয়া কত ভক্ত পিপাসু-হৃদয় সেই সঙ্কীর্ণ দুরারোহ পথ অবলম্বনপূর্ব্বক ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে। লীলাময় তাঁহার অনন্তলীলা প্রকট ও লোক শিক্ষার্থ সর্ব্বথা যে কত লীলা বিস্তার করিতেছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। উষার ললাটে সিন্দুর শোভা, বিহঙ্গমগণের প্রভাতী গান, বৃক্ষ লতাদির শীর্ষে প্রভাত পবনান্দোলিত সৌরভময় পুষ্পস্তবক, শৈলস্খলিত নির্ঝরিণীর তুষারধবল ফেনপুঞ্জ বুকে করিয়া কুলকুল নিনাদ, প্রত্যেকটীই মানবকে এক অব্যক্ত প্রীতিশক্তির কথা বলিয়া দিতেছে; কিন্তু মানব যেন তাহাতেও সন্তুষ্ট নহে—যেন সে এ ইঙ্গিতের কথা বুঝে না—তাই মানবকে বুঝাইবার জন্য ভগবান্ তাঁহার হ্লাদিনীশক্তির প্রকৃষ্ট বিকাশ প্রহ্লাদে দেখাইয়া গিয়াছেন।

প্রহ্লাদের চরিত্র এতই মধুর, এতই শিক্ষাপ্রদ, যে স্বভাবতঃ ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুজাতি আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই গল্পাংশে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ। অনেকে এরূপ মনে করিতে পারেন যে, গল্পাংশ অতিরঞ্জিত এবং অধিকাংশ বর্জ্জনীয়। কিন্তু যিনি সর্ব্বসংশ্রয়ের চরণারবিন্দ অর্চ্চনেচ্ছুক, তাঁহার নিকট অতিরঞ্জিত কিছুই নহে; কারণ ভক্তের প্রাণে ভগবন্মহিমা সদসৎ সমস্ত বস্তুই ঘোষণা করিতেছে।

কোমলমতি বালক বালিকাদিগকে ভক্তি শিক্ষা দিবার পক্ষে প্রহ্লাদের আখ্যায়িকা সরল এবং উপযুক্ত। অপর দিকে প্রহ্লাদের ভক্তি জ্ঞানময়ী, নীচ বা দৌর্ব্বল্যদুষ্ট নহে; সুতরাং যাঁহারা আধ্যাত্মিক জীবনের উচ্চ সোপানে অবস্থিত, তাঁহাদের পক্ষেও যে সম্পূর্ণ শিক্ষাপ্রদ, তাহা প্রহ্লাদের উক্তিতে প্রকাশ পায়—"সর্ব্বেষু ভূতেষু ভক্তিরব্যভিচারিণী। কর্ত্তব্যা পণ্ডিতৈর্জ্ঞাত্বা সর্ব্বভূতময়ং হরিম্।" কালমাহাত্ম্যে এবং কর্ম্মদোষে আজ আমরা

সকলই প্রায় হারাইয়াছি, তাই আজ উল্লিখিত উক্তিতে যে গভীর তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না, তাই আজ ভগ্ন হৃদয়যন্ত্রে গ্রন্থিবিশিষ্ট তন্ত্রে সে ধ্বনি এবং সে ঝঙ্কার উঠে না।

প্রহ্লাদের চরিত্র আলোচনা করিতে গিয়া পূর্ব্ব হইতে কিঞ্চিৎ সাবধান হওয়ার প্রয়োজন। ভয়, পাছে প্রহ্লাদচরিত্রে পিতামাতার অবাধ্য হইবার একটী সুন্দর আদর্শ প্রকাশ পায়। অবাধ্য বালককে "দৈত্যকুলের প্রহ্লাদ" বলিয়া ভর্ৎসনা করিয়া থাকে; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে দেখিতে গেলে প্রহ্লাদ উচ্ছৃঙ্খল বা উন্মার্গগামী পুত্র নহে; ভগবদ্ভক্তির প্রেরণায় তাহার পক্ষে যাহা কর্ত্তব্য সে তাহাই করিয়াছে। তাহার হৃদয়ে যে জ্যোতি প্রকাশ হইয়াছিল, তাহা এক জন্মের নহে; কোন একটী নির্দ্দিষ্ট লীলার উপসংহারার্থে তাহার জন্ম; সুতরাং তাহার চরিত্র এ সম্বন্ধে কখনই বিসদৃশ নহে। যদি প্রহ্লাদ ভগবানে সম্পূর্ণ নির্ভর না করিয়া, তিনি যাহা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন তাহার সীমা অতিক্রম করিত, তাহা হইলে পিতার সম্বন্ধে তাহার চরিত্র দোষাবহ বিবেচনা করা যাইত। প্রহ্লাদও এ কথা বুঝিয়াছিল। তাই আমরা দেখিতে পাই ;—

> "গুরুণামপি সর্ব্বেষাং পিতা পরমেকোগুরুঃ।
> যদুক্তং ভ্রান্তিরত্রাপি স্বল্পাপি নহি বিদ্যতে॥
> পিতা গুরুর্নসন্দেহঃ পূজনীয় প্রযত্নতঃ।
> অত্রাপি নাপরাধ্যামীত্যেবং মনসি মে স্থিতম্॥"

প্রহ্লাদের সহিষ্ণুতা, অশেষ পীড়নে স্থৈর্য্য, শিক্ষার বিষয়। ইহাকেই "দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনা" বলা যায় এবং এই বুদ্ধিই "সমাধাবচলা।" প্রহ্লাদের স্থান সেখানে "যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে।" প্রহ্লাদ কাঁদিয়াছে, ডাকিয়াছে "হরি রক্ষা কর!" আর সেই অনন্ত করুণার আধার তাহাকে কোল দিয়া রক্ষা করিয়াছেন। জীবনে এক নিমিষের জন্য যদি অশ্রুসিক্ত কাতর ধ্বনি "হরি রক্ষা কর!" নিষ্পীড়িত হৃদয় হইতে উত্থিত হয়, তাহা তাঁহার চরণকমলই স্পর্শ করে এবং আর কোন ভয় থাকে না। তাই ভগবান্ বলিয়াছেন "স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ।" হিরণ্য-কশিপুর উৎপীড়ন ত সামান্য, তাঁহার এই ধর্ম্মের স্বল্পমাত্রও ঘোর ভবভয় হইতে ত্রাণ করে।

প্রহ্লাদের আখ্যায়িকা হইতে আমরা অন্যান্য বিষয়ও শিক্ষা করিতে পারি। হিরণ্যকশিপুর তীব্র দ্বেষ এবং তৎপুত্রের পরাভক্তি পরিণামে একই স্থানে পর্য্যবসিত হইল। দ্বেষভাব এবং ভক্তিভাবের এরূপ সামঞ্জস্য স্থাপনপূর্ব্বক উভয়েরই ভগবদ্ প্রাপ্তি। গীতায় উক্ত "তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত" শ্লোকার্দ্ধের সুন্দর ব্যাখ্যা। নিকৃষ্টই হউক আর উৎকৃষ্টই হউক তীব্র ভগবন্মুখী ভাবের অবশ্যম্ভাবী ফল ভগবানের চরণ কমল।

প্রহ্লাদের আখ্যায়িকা আর একটী নিগূঢ় তত্ত্ব প্রকাশ করে। নরসিংহ-রূপ অবলম্বনে যে গূঢ় রহস্য নিহিত, তাহা কেবল থিওসফিক্যাল পুস্তক সাহায্যে বুঝিতে পারা যায়। পুরাণকার—"দেবাঃ স্বর্গং পরিত্যজ্য তত্রাসান্মুনিসত্তম। বিচেরুরুবনৌ সর্ব্বে বিভ্রাণা মানুষীং তনুম্॥" এই পর্য্যন্ত বলিয়াই ক্ষান্ত। সৃষ্টির ইতিহাসে এখানে নরসিংহরূপে একটী নূতন পরিচ্ছেদ আরম্ভ হইল॥*

আধ্যাত্মিক জীবনাভিলাষীর প্রত্যেক নির্ব্বৈরাদি যোগ অবলম্বনপূর্ব্বক প্রহ্লাদ চরিত্রে লক্ষ্য স্থাপন করা কর্ত্তব্য। ভ্রান্ত এবং সদোষ মনুষ্য জীবনে সকল উপদেশ এবং শিক্ষা সম্যক্‌রূপে পর্য্যবসিত করা দুরূহ। তবে চিত্তের উন্মাদ বৃত্তির অবসরে ধীরে ধীরে অন্তঃকরণ সংশোধন করা বিধেয়। কশ্যপ প্রহ্লাদের চরিত্র—

"অলম্পটঃ নীলধরো গুণাকরো হৃষ্টঃ পরার্দ্ধ্যা ব্যথিতদুঃখিতেষু।
অভূশত্রুর্জগতঃ শোকহর্ত্তাঃ নৈদধিকং তাপমিবোড়ুরাজ॥"

হইবে বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। প্রহ্লাদের চরিত্র আলোচনা করিতে গিয়া যদি ইহার একটী ছায়াও আমরা অলক্ষিত হৃদয়ে পাতিত করিতে পারি, তাহা হইলে তাঁহার করুণায় লক্ষ্য পথে এক পদ অগ্রসর হইতে পারিব এবং এই জন্য পুরাণকার কর্ম্মসঙ্গীদিগের হৃদয় আকর্ষণ করিবার জন্য বলিয়াছেন—

"যস্তেত চ চরিতং তস্য প্রহ্লাদস্য মহাত্মনঃ
শৃণোতি তস্য পাপানি সদ্যোগচ্ছতি সংক্ষয়ং॥

(ক্রমশঃ)

---

* "......Their onward pressure...provoked the improvement of the highest of these—the much talked of missing link." Sinnett.

আত্মতত্ত্ব।

(১)

রে মানব ! ত্যজ ধন আকাঙ্ক্ষা প্রবল ;
কায়-মন-বাক্যে ভাব অনর্থ সকল।
লভিয়াছ যাহা তুমি স্বকর্ম্মের ফলে,
চিত্ত পরিতোষ কর তাহাদের বলে।

(২)

যে সকল কার্য্য তুমি হেরিছ সংসারে,
বিচিত্র ব্যাপার বলি ভাবিবে অন্তরে।
প্রিয়তমা ভার্য্যা কিম্বা সুন্দর তনয়,
কেহ কারো নয় বলি জানিবে নিশ্চয়।

(৩)

কে তোমার ? তুমি কার ? ভাব দেখি মনে
কোথা হ'তে এলে এই সংসার কাননে।
চিত্তে এই তত্ত্বকথা করি আন্দোলন,
ত্যজরে অবোধ ! তব আপন আপন।

(৪)

ধন জন যৌবন যাহা কিছু রয়,
কিছুই তোমার নয়, জানিবে নিশ্চয়।
এ সকল জন্য গর্ব্ব উচিত না হয়,
প্রচণ্ড কালের করে হ'বে সবে লয়।

(৫)

মায়াতে আবদ্ধ এই অখিল সংসার,
ত্যজিতে ইহারে হও বদ্ধপরিকর।
সংসারের সার সেই ব্রহ্মের চরণ—
জানিয়ে তাহাতে এবে হও নিমগন।

(৬)

পদ্মপত্রোপরি বারি যেমতি তরল,
তেমতি জীবন তব জানিবে চঞ্চল।
সাধুসঙ্গ পার যদি করিতে গ্রহণ,
সংসার সাগর পারে করিবে গমন।

(৭)

জননী জঠরে যবে হয়েছ উদয়—
মরিতে হইবে ইহা জানিবে নিশ্চয় ;
মৃত্যুর পশ্চাৎ পুনঃ লইবে জনম,
কেন তবে নাহি পার ত্যজিবারে ভ্রম ?

(৮)

অসার সংসারে এই দোষ দৃষ্ট হয় ;
রে মানব ! কিবা তব সন্তোষ বিষয় ?
আকাঙ্ক্ষা বর্জ্জিত হয়ে ভাব অনুক্ষণ,
সংসারের সার সেই নিত্য নিরঞ্জন।

(৯)

দিবস হইলে গত, নিশা আগমন,
প্রভাত উদয়, হ'লে সন্ধ্যা অবসান।
শিশির বসন্ত আদি ষড় ঋতুগণ,
করিছে সকাশে তব প্রতি আবর্ত্তন।

(১০)

দুরন্ত কালের খেলা করি দরশন,
পরমায়ু ক্রমে ক্রমে হতেছে বিলীন।
আশার প্রবল বায়ু তবু তব হৃদে,
বহিতেছে নিরবধি ভীষণ শবদে।

(১১)

শরীর গলিত পক্ক হ'ল কেশপাশ,
দন্তের অভাব মুখে হইল প্রকাশ,

অবসন্ন হেতু কর হইয়ে কম্পিত,
সুশোভিত যষ্টি এবে হ'তেছে স্খলিত।

(১২)

নিরখিয়া এই সব বিচিত্র ব্যাপার,
কেন রে ! রেখেছ হৃদে আশার ভাণ্ডার ?
চেষ্টা করি কর এবে তাহারে বর্জ্জন ;
ভ্রমে পড়ি কেন আর ? হও সচেতন।

(১৩)

দেবের মন্দিরে কিম্বা তরুর তলেতে,
করিবে যতনে শয্যা, কিম্বা ভূতলেতে ;
পরিধানে মৃগচর্ম্ম ভোগ সুখনাশে—
এ হেন বৈরাগ্য বল কারে না সন্তোষে ?

(১৪)

শত্রু মিত্র পুত্র কিম্বা আত্মীয় স্বজনে,
তুষিবে সকলে তুমি সমান যতনে।
যদি ইচ্ছা কর বিষ্ণুপদ লভিবারে,
সকল সময়ে সবে সাধিবে সাদরে।

(১৫)

ইন্দ্র চন্দ্র ব্রহ্মা কিম্বা দেব মহেশ্বর,
অচল জলধি কিম্বা তুমি আমি নর,
এ সকল কিছু নয় এ লোকের তরে।
কেন তবে মজ মূঢ় ! শোকের সাগরে ?

(১৬)

সর্ব্ব সারাৎসার সেই ব্রহ্ম সনাতন,
তুমি আমি সর্ব্ব জীবে বিরাজিত হন।
কেন তবে মোর প্রতি তব অসন্তোষ ?
কেন বা দেখাও তব ভীষণ আক্রোশ ?

(১৭)

আত্মাতে প্রভেদ কভু না কর দর্শন,
কি তোমার কি পরের সবই সমান।
তব আত্মা মধ্যে পরমাত্মারে দেখিবে,
পরস্পর ভেদজ্ঞান যতনে ত্যজিবে।

(১৮)

বাল্যকাল গত হয় ক্রীড়ার আবেশে,
যুবক কাটায় কাল যুবতী সম্ভাষে,
চিন্তাতে বৃদ্ধের দিন হয় অবসান,
পরব্রহ্ম পদে কেহ না হয় মগন।

(১৯)

অনর্থ অর্থের চিন্তা কেন কর নর?
বিন্দুমাত্র নাহি তাহে সুখের সঞ্চার।
পুত্র, ধনবান্‌গণ ভীতির কারণ;
এ হেন নিয়ম হয় সর্ব্বত্র দর্শন।

(২০)

যাবত সক্ষম তুমি হ'বে উপার্জ্জনে,
অনুগত রবে, তব আত্মীয় স্বজনে।
জর্জ্জর হইলে দেহ বার্দ্ধক্য কারণে,
সর্ব্বদা অক্ষম হবে অর্থ উপার্জ্জনে।

(২১)

এ হেন সময় তব হ'লে আগমন,
কেহ না করিবে আর প্রিয় সম্ভাষণ।
জগতের এই ভাব করি দরশন,
ত্যজ রে অবোধ! তব আপন আপন।

(২২)

কাম ক্রোধ লোভ মোহ করি সম্বরণ,
"কেবা তুমি?" আত্মা মধ্যে কর অন্বেষণ;

যেই নরাধম হয় শূন্য আত্মজ্ঞান,
নিশ্চয় তাহার হ'বে নরকেতে স্থান।

(২৩)

আশার কুহকে পূর্ণ এই ধরাতল ;
নির্ব্বোধ মানব তাহে সতত চঞ্চল।
বিহরে উন্মত্ত হ'য়ে ছার সুখ তরে,
বারেক না ভাবে চিতে কি হইবে পরে।

(২৪)

পূর্ণব্রহ্ম সনাতন পূর্ণ অবতার,
নিজগুণে করিছেন পাতকী উদ্ধার ;
নীচ মন, নয় রত তাঁর গুণগানে।
দয়াময় ! দেখো দীনে সে ভীষণ দিনে।

আনন্দ-গীতা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

৪৩। প্রকৃতি বা সৃষ্টিতে ক্রমোন্নতি বা অবনতি ব্যতীত এককালীন উন্নতি বা অবনতি দেখা যায় না। জীবের উন্নতি অবনতিও ক্রমে হইয়া থাকে।

৪৪। পরস্পর বিপরীত দুইটী পদার্থ দ্বারা "উৎকর্ষ অপকর্ষ" অবস্থা সর্ব্বদা ঘটিতেছে, সুতরাং উৎকর্ষ হেতু অপকর্ষ বস্তুকে উৎকর্ষে সংযোগ করিবে।

৪৫। সভ্যতা কোন একটী সীমাবদ্ধ পদ্ধতি নহে। যখন যে ব্যবহার (বিষয়) সাধারণের রুচিকর তাহাই তৎকালীন সভ্যতা।

৪৬। এক অঙ্ককে পাঁচবার ধরিলে পাঁচ হয়, আবার পাঁচ অঙ্ককে পাঁচবার ধরিলে পঁচিশ হইবে ; অতএব পাঁচ পঁচিশ সব এক একে।

৪৭। এক ব্রহ্মই অনন্তরূপ এবং অনন্তরূপের সমষ্টিই এক ব্রহ্ম।

৪৮। প্রথমেই প্রকৃতির সম্পূর্ণ বিপরীত শিক্ষা দ্বারা কাহাকেও যথার্থ প্রকৃতিতে আনা যাইবে না।

৪৯। স্ব স্ব উপাদান অনুসারে যে যাহা বুঝে, তাহাই তাহার ঠিক্ বোধ্য ; অপরের তাহা ঠিক্ বুঝাইতে গিয়া বাগ্‌বিতণ্ডা করা কেবল জল্পনা।

৫০। হিন্দু মুসলমান খৃষ্টানাদি আচার ব্যবহারে বিভিন্নতা ; প্রকৃতির বিকার উপাধি নহে, কেবল শ্রেণী বিভাগ দ্বারা উপাধি হইয়াছে।

৫১। ধর্ম্ম কোন জাতি বিশেষের সম্পত্তি নহে, সকল জাতিই ইহার সম্যক্ অধিকারী।

৫২। আমরা সৃষ্টিতে যে সমস্ত বস্তু দেখিতেছি তাহা সৃষ্টির প্রথমাবস্থায় যেরূপ আকৃতি, প্রকৃতি ও গুণাদি বিশিষ্ট ছিল, বর্ত্তমানে তাহার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে ও ক্রমে ঘটিবে; যেহেতু বিক্ষেপণমূলে বিক্ষেপণের বৃদ্ধি হইয়া রূপান্তর ঘটায়।

৫৩। ভগবানের রাজ্য (সৃষ্টিতে) এমন দুইটী পদার্থ নাই যাহার সর্ব্বাঙ্গীন সামঞ্জস্য আছে ; সুতরাং তাঁহার সেই একতম ক্রিয়া কোন দুইটী পদার্থে সমানভাবে চলিতেছে না।

৫৪। অভাব হইতে "তাপ" জন্মে ; অভাব রহিত করিলে জীবের সকল তাপ রহিত হইবে।

৫৫। জীবের যে যে সম্ভোগ-স্পৃহা বলবতী হইয়া "বিকৃতভাব" জন্মিয়াছে, সেই সমস্ত উপভোগ্য সামগ্রী সম্মুখে রাখিলে কদাচ "ভোগস্পৃহার" হ্রাস হয় না ; কিন্তু ভগবৎ কৃপায় সকলি সম্ভবে।

৫৬। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু ব্যতীত অপর বস্তুর অস্তিত্ব কেবল কথার দ্বারা ব্যক্ত হয় না।

৫৭। পঞ্চ "ভূত-বিনির্ম্মিত" সমস্ত বস্তুতেই সমস্ত গুণ আছে, কেবল "প্রকাশ-ভাবের" অভাব মাত্র। "প্রকাশক ক্রিয়া" জানিয়া ব্যবহার করিলে মানবে সর্ব্বগুণ ও সর্ব্বশক্তি সম্ভবে।

৫৮। অভাব সঙ্কোচ হইলে, পরকালে কেন—ইহকালেও শান্তি হইবে।

৫৯। যে কিছুতেই আসক্ত নয়,—যাহার প্রাণ কিছুই চায় না, সে দুঃখ কি তাহা জানে না।

৬০। বহু লোকের এক প্রকার "ভুল" হইতে পারে না, কিন্তু "ঠিক্" সমস্ত লোকেরই একরূপ হইবে। সংসারে বিকৃতি-বিশিষ্ট জীবের "বিকার" কোন স্থানেই দুইটীর এক হইবে না, কিন্তু "প্রকৃত প্রকৃতি" অনন্ত লোকেরই এক; যেমন একবিধ অঙ্ক সমাধানে পাঁচ জনের একই প্রকার "ভুল" হয় না, কিন্তু শুদ্ধতা বহুলোকের এক প্রকার হয়।

৬১। আমার যে কার্য্যে রুচি নাই সে কার্য্য করিলে অভ্যাসে পরিণত হইবে। যাহা অন্তরের সহিত করিবে না, তাহা অন্যের শাসনে করিতে গেলে অভ্যাসে পরিণত না হইয়া বরং অধিকতর বিরক্তি আসিবে।

৬২। লণ্ঠনের কালিমা পরিষ্কার না করিলে ক্রমে যেমন তাহার জ্যোতিঃ-প্রকাশক-শক্তি একেবারেই অপ্রকাশিত হয়, হৃদয়ের অজ্ঞানতা কালিমা দূর করিতে না পারিলে জ্ঞানালোকও তদ্রূপ অপ্রকাশিত থাকিবে।

৬৩। তুমি চক্ষু মুদিয়া থাকিলে, অন্যে সম্মুখে আলোক ধরিলেও তোমার আঁধার ঘুচিবে না।

৬৪। ভাবের ক্রিয়া সমগুণে ব্যাপ্ত হয়, তাই একের কান্নায় বহুজন কাঁদে, হাঁসে, ব্যথিত হয়, এবং যন্ত্রণা বোধ করে।

৬৫। স্থূলের ন্যায় যাতনা সূক্ষ্ম শরীরেও ভোগ হইবে, কল্পিত স্বর্গেও দ্বেষ হিংসা মারামারি, কাটাকাটি আছে। তবে মুক্তি ভিন্ন শান্তি কোথায়?

৬৬। মুক্ত হস্তে আসিয়াছ ও যাইবে, মধ্যে কয়েক দিনের জন্য মুষ্টি-বদ্ধ করিও না।

৬৭। এই বিশ্বভাণ্ডার যদি ভগবানের জান, তবে সকলের কেন তাহাতে সমান অধিকার না হইবে? তুমি ন্যায়বান্ ভাণ্ডারী মাত্র।

৬৮। গুণের পূজা ভিন্ন ধন কিম্বা জাতি গৌরবের কখনও পূজা হয় না।

৬৯। সদ্ব্যবহারে ব্রহ্মকে পর্য্যন্ত বশে আনিতে পার, কিন্তু অসৎ ব্যবহারে একটী বনের পশুকে বশে রাখা অসম্ভব।

৭০। কোন দাহ্য পদার্থই মনের অধিক যাতনা দিতে পারে না।

৭১। দূরবীক্ষণ, অণুবীক্ষণ, জ্ঞানবীক্ষণের অতীতে দেখিতে পার না।

৭২। পুরুষ প্রকৃতির বিক্ষেপণ জন্যই আকর্ষণ হইয়াছে, তাই স্ত্রীপুরুষ-সংযোগ জীবমাত্রেই দেখা যায়।

৭৩। যে বিষয় সুনিশ্চিত, তাহার জন্য অনুশোচনা কেন? অনিশ্চিত বিষয়ের আলোচনা কর, উপায় উদ্ভাবিত হইবে।

৭৪। যাহা করিতেছ ইহা গত জীবনের পুরস্কার, আবার ইহ জীবনে অনেক সংগ্রহ করিলে, একবার ভবিষ্যতের বিষয় ভাবিয়া দেখ।

৭৫। চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহাদির উদয়াস্তের ন্যায় তুমিও যাতায়াত করিতেছ; যাহা আসে তাহাই যায়, যাহা আসে না তাহা যায়ও না।

৭৬। তুমি জগৎ ছাড়িতে যেরূপ ভয়ে ব্যাকুল হইতেছ, আসিতে তদধিক ভয়াকুল হইয়াছিলে।

৭৭। দুঃখ না থাকিলে সুখ বুঝিতে না।

৭৮। ব্যাধিগ্রস্ত দুই একটী রাতকাণা দেখা যায়, ভবরোগে দিনকাণার সংখ্যাই অধিক।

৭৯। এক তরুতলবাসী-যোগি হৃদয়ের সুখ বা আনন্দ বিষয়াসক্ত জাগতিক জীবের সুখ এবং আনন্দ সমষ্টিরও অনেক অধিক। ভবরোগি! তুমি কি তাহা বুঝিতে পার?

"বসন্ত যোগাশ্রমী"—স্বামী কেশবানন্দ।

প্রশ্ন ও উত্তর।

প্রশ্ন।

সবিনয় নমস্কার নিবেদন মিদং ঃ—

আপনার সম্পাদিত 'পন্থা' পাঠে অনেক তথ্যের তাৎপর্য্য উপলব্ধি হইয়াছে; কিন্তু তাৎপর্য্য উপলব্ধি মাত্রেই হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা মিটে না। কার্য্যতঃ তাহা জীবনগত করিতে না পারিলে স্থায়ী ফল লাভ হয় না। যদি মহোদয়ের পরিচিত কোন মহাত্মার কৃপায় এই অভিলাষ পূর্ণ হয়, অনুগ্রহপূর্ব্বক কোথায় কিরূপে তাঁহার দর্শন পাওয়া যাইতে পারে জানাইলে চিরবাধিত হইব। নিবেদন ইতি—

উত্তর।

মহাজন সাক্ষাৎ জন্য আপনার আগ্রহ দেখিয়া আহ্লাদিত হইয়াছি; এই আগ্রহ যতই তীব্র হইবে ততই আপনি মহাজন সাক্ষাতের পথে অগ্রসর হইবেন। মহাজন সাক্ষাতের ঐ একমাত্র পথ। আমি এখন যদি আপনাকে কোন মহাজনের নাম ধাম বলিয়া দিই, তবে তাঁহার উপর আপনার বিশেষ শ্রদ্ধা না হইতে পারে, কিন্তু আপনার আগ্রহ তীব্র হইলে যিনি আপনার গুরু তিনি সূক্ষ্মশরীর ধারণে আপনার ললাটদেশে দেখা দিবেন।

মন, দ্বিদলে বিরাজ করে কে রে;
মন, খুঁজে নেনা তারে।
মন, দ্বিদলে বিরাজ করে যে রে।
দীক্ষাগুরু, শিক্ষাগুরু, পথের পরিচয় রে;
যে গুরু সেই কল্পতরু ললাটের ভিতরে
মন, খুঁজে নেনা তারে।

আপনি বৈষ্ণব অথবা শাক্ত কোন সম্প্রদায় ভুক্ত কি না? যে কোন সম্প্রদায় ভুক্ত হইয়া যাঁহার উপর ভক্তি হয়, এরূপ কোন লোকের নিকট হইতে মন্ত্র গ্রহণ করিয়া শাস্ত্রবিধিমত সাধনা করুন। কাম ও ক্রোধ জয় করাই যেন সাধনার উদ্দেশ্য হয়। সাত বৎসর এইরূপ সাধনার পর ইন্দ্রিয় বশীভূত হইলে গুরুদেব সাক্ষাৎ দিবেন।

যদি হিন্দু সম্প্রদায় ভুক্ত কোন লোকের উপর বিশেষ শ্রদ্ধা না থাকে, তবে পরাবিদ্যার্থী সমিতিতে প্রবেশ করুন। মন্ত্র সাধনার পথ দেখাইবার উপযুক্ত লোক এই সমিতির মধ্যে আছেন। শ্রী ক—

অহঙ্কার।

"বাচোবেগং মনসঃ ক্রোধবেগং
জিহ্বাবেগং স্তথাচোপস্থ বেগং।
এতান্ বেগান্ যো বিষহেত ধীরো
সর্ব্বামপীনাং পৃথিবীং স শিষ্যাৎ॥"

বাক্যবেগ মানসের ক্রোধবেগ আর।
উপস্থের বেগ তথা বেগ রসনার॥

এই কয় বেগ যেই পারে সহিবারে।
সমগ্র পৃথিবী সেই শাসিবারে পারে॥

আজকাল প্রায় সকল পত্রিকাতেই দেখিতেছি ধর্ম্মতত্ত্বের আলোচনা চলিতেছে। তন্মধ্যে 'নিষ্কাম কর্ম্ম' 'বাসনাত্যাগ' ইত্যাদি নানা প্রকার প্রবন্ধাদি প্রচারিত হইতেছে। এরূপ প্রবন্ধ যত প্রচার হয় ততই মঙ্গল সন্দেহ নাই। কিন্তু আমার মতে এরূপ প্রবন্ধের প্রকৃত কাল এখনও আমাদের উপস্থিত হয় নাই। সমুদয় কার্য্য, দেশ কাল পাত্র বিচার না করিতে পারিলে সুসিদ্ধ হয় না? অন্ততঃ তাহার সম্যক্ ফল পাওয়া যায় না। নিষ্কাম কর্ম্ম শান্তিদায়ক, বাসনাত্যাগ চিরসুখের নিকেতন প্রভৃতি বলিলেই, হয় না। বলা ও করা পৃথক্। এখন আমাদিগের দেশের অবস্থা যেরূপ দাঁড়াইয়াছে, সময় যেরূপ হইয়াছে ও আমরা যেরূপ হইয়াছি ; এই তিনটি বিবেচনা করিয়া যথোপযুক্ত প্রবন্ধ প্রচারের প্রয়োজন। আমাদের অন্তরে যে প্রচ্ছন্ন শত্রু গুপ্তভাবে বাস করিতেছে বলিয়া, আমাদের সমুদয় কার্য্য ভস্মে ঘৃতাহুতি হইতেছে, অদ্য তাহারই বিষয় ও তাহাকে বিনাশ করিবার শাস্ত্রকথিত উপায় আমার প্রধান আলোচ্য।

আজকাল অনেকের মুখে শুনিতে পাই, আমাদের কাজ জনকঋষির মত। যাঁহারা বলেন তাঁহারা নিশ্চয়ই আপনার মনকে সেইরূপ ভাবিয়া থাকেন। আমাদের ন্যায় তামসিক আহারে পুষ্ট ; স্বধর্ম্মবর্জ্জিত কুশিক্ষিতের মনকে এইরূপ বিশ্বাস করা যে ভবিষ্যতে সৎ হইবার আশাকে সমূলে বিনাশ করে, তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। আমাদের বিপুল মনোবলশালী বিবেকী ঋষিগণ ষট্‌সাধনায় সুসিদ্ধ হইয়া, মনকে ভৃত্যের ন্যায় বশীভূত করিয়াও বিশ্বাস করিতেন না।

পুরাণে বর্ণিত আছে কন্দর্পজিৎ মহাযোগী মহেশেরও মোহিনীমূর্ত্তি দর্শনে তপস্যা নষ্ট ও মন বিচলিত হইয়াছিল। ইহার আধ্যাত্মিক অর্থ ত্যাগ করিয়া এই অর্থেও ইহা স্পষ্ট শিক্ষা দিতেছে যে, মনকে বিশ্বাস করিও না। শম দমাদি দ্বারা শোধিত ও শ্রবণ মননাদি দ্বারা স্থিরীকৃত মনের প্রতি কার্য্য সাবধানে অবলোকন কর।

ইন্দ্রিয় জয় করিতে গৃহত্যাগ করিতে হয় না। গৃহ ছাড়িয়া অরণ্যে

যাইলেই কি ষড় রিপুর হস্ত হইতে উদ্ধার পাইবে? রিপু জয় করিতে হইলে অগ্রে তাহাদের নিরোধ চেষ্টা কর। চতুর্দ্দিকে প্রবল শত্রু থাকিতে দেশ-ভ্রমণে বহির্গত হওয়া কি বুদ্ধিমানের কার্য্য? অগ্রে বৈরিকুলকে যে কোন উপায়ে দুর্ব্বল করিয়া যখন স্পষ্ট বুঝিতে পারিবে শত্রুরা আমার অপকার সাধনে অক্ষম, তখনই যথেচ্ছা ভ্রমণে সাহসী হইবে।

যে মন প্রতিনিয়তই পরিবর্ত্তনশীল, তাহাকে বিশ্বাস কি? শঠ ব্যক্তি যেমন বাহ্য সৌজন্যে সরল লোককে ভুলাইয়া তাহার বিশ্বাসভাজন হয় এবং পরে তাহারই সর্ব্বনাশ সাধন করে, সেইরূপ মনও কাম, ক্রোধাদি জয়ী হইয়াছে এইরূপ ভাণ করিয়া সাধকের বিশ্বাস উৎপাদন করে এবং সাধককে রিপুজয়ে শিথিলপ্রযত্ন দেখিয়া—তাহাকে অতর্কিত ভাবে অধঃপাতিত করে।

মনের প্রতি কার্য্যই সাবধানে লক্ষ্য করা কর্ত্তব্য। অতএব এখন দেখা যাউক আমাদের মন কিরূপ। ধীরভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইহা বুঝিতে পারি যে, মনের সম্বন্ধে অহঙ্কারই অনিষ্টের মূল। প্রকৃত কথা গোপন না করিলে সকলকেই বলিতে হইবে যে, আমি অহঙ্কারে খাসের প্রজা। এই অহঙ্কার থাকিতে নিষ্কাম কর্ম্মের সাধনা অসম্ভব। ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিতে যে সুখ নাই, ইহা কেবল অহঙ্কার শূন্য অবস্থাতেই সম্যক্ বুঝা যায়। যতক্ষণ আমি আছি, ততক্ষণই অহঙ্কার। এই আমিত্বই সকল অনিষ্টের মূল। আমিত্বযুক্তের নিষ্কাম কথা আদ্রকব্যবসায়ীর পোতবার্ত্তার ন্যায়। এই আমিত্ব নষ্ট করিবার জন্য কোন মহাত্মার প্রার্থনা সঙ্গীত এইরূপ—

"কবে আমার 'আমি' যাবে।
'তুমি' উদয় হয়ে বিদায় দিবে।
আমি জাগি আমি ঘুমাই, ঘুমালে আর আমি ত নাই,
এমন কাঁচা আমি কাজ কি আমার
যদি (শেষে) আমি গিয়ে তুমিই রবে।
যে আমি তে তোমায় হারাই,
এমন আমির মুখে দি ছাই,
(এবার) আমার আমি করে কমি
তোমার দাস তুমি বলাবে।"

অহঙ্কার বা আমিত্ব পরিত্যাগ বিষয়ে সম্প্রদায় ভেদে অনেকে অনেক-বিধ উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এখন শাস্ত্রমতে আমরা কিরূপে ইহার হস্ত হইতে উদ্ধার পাইতে পারি তাহাই দেখিব।

ভগবানের অবতার অসংখ্য। বহু অবতারের মধ্যে ঋষভদেব একটী; দয়াময় জীবের এই প্রবল শত্রু বিনাশ করিবার উপায় স্বয়ং ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। পুরাণকুলচূড়ামণি সর্ব্ববেদান্তসার শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবান্ ঋষভদেব পুত্রদিগকে মোক্ষধর্ম্ম উপদেশ কালে পারমহংস জ্ঞান প্রদান করেন, এবং দ্বন্দ্ব ধর্ম্মের ত্যাগবিধি বুঝাইয়া দেন। তিনি অহঙ্কারই সংসারের মূল, অহঙ্কারই দেহ বন্ধনের হেতু ইত্যাদি বলিয়া সেই অহঙ্কারকে ত্যাগ করিবার পঁচিশটী উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। উক্ত ২৫টী কারণ ক্রমশঃ প্রকাশ করিতেছি;—

১ পরমহংস ও পরমগুরু স্বরূপ আমাতে ভক্তি করণ;—

ক্ষুদ্র জীব যখন সেই ষড়ৈশ্বর্য্যশালী পূর্ণব্রহ্মে মনোনিবেশ করে, তখন জানিতে পারে যে, জীবশক্তি কতটুকু লইয়া সীমাবদ্ধ। কোন বস্তুই, তুলনা না করিলে ভাল মন্দ বুঝা যায় না। ভগবানে ভক্তি করিলে, ভক্তিগুণে সকল তত্ত্বই বুঝিতে পারা যায়। ভক্ত, ভগবানের মহত্ত্ব দেখিয়া নিজের ক্ষুদ্রত্ব তাঁহার মহত্বে মিশাইয়া দেন। তখন তাঁহার ভগবানে চালকজ্ঞান আপনা আপনি হইয়া যায়। সেই সময়েই ভক্ত বলেন—"তুমি যন্ত্রী যন্ত্র প্রভু আমি, তাই বাজি যা বাজাও তুমি।" এই তুমিময় অবস্থায় আমিত্ব মিশিয়া যায়; অর্থাৎ অহঙ্কার সমূলে নষ্ট হয়।

২ বিতৃষ্ণা;—সংসারে টান না থাকা।

সংসারে যে সকল দ্রব্য নিত্য ব্যবহার করি, তাহা আজ আছে কাল নাই। সংসার পান্থশালা। যাবতীয় দ্রব্যই পথিকের জন্য। যে যখন আসিবে, তখন তাহারই হইবে। যত দিন এ পান্থশালায় আমি পথিক ভাবে উপনীত, ততদিন ঐ সমুদয় আমি উপভোগ করিব মাত্র। ভোগ মাত্রই আমার; কিন্তু প্রকৃত সত্ব কিছু নাই; নিজের জিনিষ নহে; অথচ যদি ভোগ করিতে পাই; তাহা ত 'পড়ে পাওয়া চৌদ্দ আনা;' যথালাভ। পুত্র যত দিন বাঁচিয়াছিল, ততদিন ফাঁকি দিয়া ভাল বাসিয়া

সংসার সাজাইয়া খেলাইয়া লইলাম। মরিল বেশ। কার ক্ষতি? "নাত্বং নাহং ন-য়ং লোকঃ"—ইহাও বিতৃষ্ণার .মূলসূত্র। ইহাতেই আমি মহৎ এই জ্ঞান তিরোহিত হয়।

৩ দ্বন্দ্বসহিষ্ণুতা ;—

শীত, গ্রীষ্ম, সুখ, দুঃখে সমান জ্ঞান। একটী ক্ষুদ্র কাঁটা পায়ে ফুটিলে যেন প্রাণ বাহির হইয়া যায়। আবার দেখিতে পাই, উটে বাছিয়া বাছিয়া কোকিলের প্রিয় কবির বর্ণনীয় সুগন্ধ আম্র মুকুল ফেলিয়া সেই কাঁটা ভক্ষণ করে। মুখ ক্ষত বিক্ষত রক্তাক্ত; তবুও কত সুখ। প্রবল শীতে গাত্রবস্ত্রহীন হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে প্রার্থনা করিলে গরম হউক, গরম হইল; পরম সুখ। আবার দারুণ গ্রীষ্মে সেই শৈত্যজন্য লালায়িতও হইয়া থাকে; তবে বল দেখি, আজ যাহাকে যে 'সুখে সুখ বলিলে, দুই দিন না যাইতেই তাহাকেই দুঃখ বল কি করিয়া? অতএব সুখ দুঃখ মনের বিকার ও বুদ্ধির দোষ ভিন্ন কি বলিব? সাধকের মনে যখন সুখ দুঃখ তত্ত্ব—এইরূপ পরিজ্ঞাত হয়, তখন দ্বন্দ্বসহিষ্ণুতা আপনি আসিয়া জুটে। যে আমিত্বের প্রসার এই সুখ দুঃখ লইয়াই, যদি সেই সুখ দুঃখই নাই, তখন শিরো নাস্তি শিরোব্যাথা অর্থাৎ অহঙ্কার কিরূপে থাকিবে?

৪ ইহ পরত্র দুঃখ দর্শন ;—

নিজের দুঃখ অনুভবে পরের দুঃখ দেখিতে শিখিলে, সর্ব্বভূতে দয়াবান্ হওয়া যায়। একটী পিপীলিকা মারিতে, পরে একটী তৃণ উৎপাটন করিতেও মনে হয়, বুঝি তাহার কত কষ্ট হইল। এই একটী মাত্র সৎবৃত্তির অনুশীলনেই অহঙ্কার-পর্ব্বতকে সার্ব্বজনীন করুণাসাগরে ডুবাইয়া দেয়।

৫ তত্ত্ব জিজ্ঞাসার ;—

"উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্ব দর্শিনঃ" তত্ত্ব-ভক্তি ভজনীয়ের জিজ্ঞাসা। ভক্তিতত্ত্বের আলোচনায় হৃদয় নবনীত-কোমল হইয়া যাইলে অহঙ্কারের প্রবেশাধিকার বন্ধ হয়।

৬ তপস্যা ;—

ব্রত ঈশ্বর সেবা আদি নিবন্ধন নিজের শয়ন ভোজনাদির সঙ্কোচ, ইহাতে

ক্রমে হীনতা উপস্থিত হয়, সেই হীনতার বন্যায় অহঙ্কার তৃণখণ্ডের ন্যায় ভাসিয়া যায়।

৭ আমার নিমিত্ত কর্ম্ম করণ ;—

শয্যা হইতে উঠিয়া যাহা যাহা করা যায়, সমুদয় যদি ভগবানের জন্য করিতে পারা যায়, সমুদয় ইন্দ্রিয়ই যদি তাঁহার কার্য্যে লাগাইতে পারা যায়,— মস্তক তাঁহার অভিবাদনে, হস্ত তদীয় কার্য্যাদিতে, পদ তাঁহার মন্দিরাদি গমনে, চক্ষু তাঁহার সেই অনির্ব্বচনীয় সচ্চিদানন্দময় শ্রীবিগ্রহ (বা তদ্ বিষ্ণোঃ পরমং পদম্) দর্শনে, কর্ণ লীলাময়ের লীলাগুণ শ্রবণে এবং রসনা বর্ণনে, নাসা তদীয় অঙ্গ সুরভি সম্পৃক্ত নির্ম্মাল্য ঘ্রাণে নিযুক্ত করিতে পারা যায়, তবে আর অহঙ্কার কোন্ ছিদ্র অবলম্বন করিয়া আসিবে ?

৮ আমার কথা কহন ;—

ভগবৎসম্বন্ধীয় কথার অবিচিন্ত্য শক্তি। অনবরত তদীয় কথা কহিতে কহিতে হৃদয়ে এমনই একটী অভিনব ভাবের উদয় হয় যে, তাহা অনুভব ভিন্ন বুঝা যায় না। সর্ব্বদা তদীয় কথা কহায় অনুভূতি (শক্তি) বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। তাঁহার পবিত্রতম কথায় নিয়ত রত থাকিলে হৃদয়ের পবিত্র ভাব আর কয় দিন না আসিয়া থাকিবে ? কথা মাহাত্ম্যে সমুদয় দোষ নষ্ট হয় ; অতএব অহঙ্কার আপনি নষ্ট হয়।

৯ যাহারা আমাকেই পরমারাধ্য দেব জানে, তাহাদের সহবাস ;—

সঙ্গের মহিমা কাহারও অবিদিত নাই। স্বর্গের দেবতা নরকের কীট, আবার নরকের কীট স্বর্গের দেবতা হইতেছে। যাহাদের দৃষ্টি কলুষিত তাহারা পাণ্ডুরোগীর ন্যায় সাধুকেও অসাধুই দেখে। কিন্তু ১ দিন ২ দিন ৩ দিন দেখিতে দেখিতে তাহার অন্তরের পাপ সাধু ও সাধুর সৎ আচার-দর্শন-সলিলে ধুইয়া যাইবে। ক্রমে সাধুর সাধুতা তাহাতে নিশ্চয় সংক্রামিত হইবে। তাঁহাদের অসীম ক্ষমতাসত্ত্বে দীনতা দেখিয়া নিজের অহঙ্কারিতায় ঘৃণা হইবে। অহঙ্কারকে যেমন চিনিবে অমনি অহঙ্কার "মুই চিনেছে" বলিয়া পলাইবে।

১০ দেহগেহে "আমি" 'আমার' বুদ্ধি (আসক্তি) ত্যাগের বাসনা ;—

"যথা গৃহান্তরস্থস্য নভসঃ কাপি ন ক্ষতিঃ।

গৃহেষু দাহ্যমানেষু গিরিরাজ তথৈব হি। (ভগবতী গীতা)

ভগবতী হিমালয়কে বলিলেন, পিতঃ যদি গৃহ দগ্ধ হয়, তাহা হইলে সেই গৃহের মধ্যস্থিত যে আকাশ, তাহার কি কোন ক্ষতি হয়? সেইরূপ দেহের পীড়ন, খণ্ডন, দাহনের সহিত আত্মার কোন সংস্রব নাই। বুদ্‌বুদ্‌ জলে উঠে, জলেই মিশায়; মধ্যের বায়ু টুকু (যাহা জলকে বুদ্‌বুদে পরিণত করিয়াছিল) মহা বায়ুতে মিশিয়া যায়। রাম একজনের মাথা ফাটাইল; বিবেচনা করিয়া দেখ মাথা ফাটাইতে ফাটাইল—রামের হাত, আর ঝাড়ের বাঁশ; কিন্তু নাম হইল রামের। পুলিসের রুল দমাদম্‌ রামের পৃষ্ঠে পড়িল। রামের চক্ষে অবিরল ধারে জল আসিল। রাম কি ভাবিতে পারে যে ইহাতে আমার কি ক্ষতি? যাহারা চিম্‌টী কাটিলে উহুঃ! করিয়া উঠে, তাহারা কি ভাবিতে পারে "যথা গৃহান্তরস্থস্য—"? সে ভাবিতে পারে কাহারা? হরিদাসকে কাজী, যবন ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া অন্য ধর্ম্ম লইয়াছে বলিয়া, বাইশ হাজারে বেত মারিবার হুকুম দিলেন। বেতের আঘাতে গাত্রের চর্ম্ম মাংস সব বিচ্ছিন্ন হইল, সর্ব্বাঙ্গ রক্তে সিক্ত হইতেছে, আর হরিদাস বলিতেছেন, দয়াময়,—ইহাদিগকে ক্ষমা করুন, ইহাদিগের অপরাধ লইবেন না। আর বাইবেলে শুনিয়াছি, বলিয়াছিলেন পবিত্রাত্মা ক্রুশো বদ্ধ যিশু "O father, forgive them, for they do not know, what they do." এরূপ কয়জন বলিতে পারে? দেহে অনাস্থা বুদ্ধি অনাসক্তি অতি কঠিন বলিয়াই ভগবান্‌ ঋষভদেব "দেহগেহে আসক্তি ত্যাগের বাসনা" বলিয়াছেন। ইচ্ছাতে আত্মশক্তি অনুসারে বল প্রয়োগ কর, দেখিতে দেখিতে ইহা কার্য্যে পরিণত হইবে। অহঙ্কার পলাইবে।

১১ ব্রহ্মচর্য্য ;—

ইহারই অভাবে আজ আমরা রাজাধিরাজের পুত্র হইয়া পথের ভিখারী, কত বিদেশী বিজাতির দ্বারে প্রার্থী। যাহা আমাদের বাল্যের ক্রীড়া ছিল, যাহা আপামরের সাধ্যায়ত্ত ছিল, তাহাই আমাদের অলৌকিক ঘটনা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রাচীন আচার পদ্ধতি উঠাইয়া দিয়াছি— সেই বাল্যে গুরুগৃহে শাস্ত্রশিক্ষা, শিক্ষাপ্রাপ্ত প্রকৃত অধিকারী হইয়া উপনয়ন, উপনীতের ব্রহ্মচর্য্য, সত্ত্বগুণবর্দ্ধক আহারে ওজোবৃদ্ধি ও

সমুদয় ইন্দ্রিয়ের জয়, পরে গুরুর অনুমত গৃহস্থ আশ্রমে প্রবেশ, আর সেই জিতেন্দ্রিয় ও তেজস্বী হইয়া গার্হস্থ্যের শত শত বাধা বিপত্তির প্রতিকূলে দাঁড়াইয়া যুদ্ধে নিশ্চিন্ত জয়, জ্বালাময় সংসারেও পরম শান্তিতে অবস্থান—এ সমুদয় অতীতের ঘন অন্ধকারে বিলীন হইয়াছে। কেবল প্রাচীন এক আধটী গল্পে পূর্ব্বজন্মের স্মৃতির মত, অথবা অর্দ্ধস্বপ্নের দুরাগত বংশীরবের ন্যায় কখন কখন মনকে আনন্দে মাতাইয়া তুলে; সে আনন্দের মূল্য নাই। অতীতের স্মৃতিসুখে সুখী—সুখী নহে। অন্ধকারে বিদ্যুৎ আঁধার বাড়াইয়া বিপথেই ফেলিয়া থাকে। চিন্তার সে সুখে কাজ নাই। ব্রহ্মচর্য্য অহঙ্কারের মুদ্গর, অহঙ্কার চূর্ণ করিবার যন্ত্র। যে আমাদিগের, শয্যাতে জাগরিত হইয়া পুনঃ শয়ন পর্য্যন্ত সুন্দর শান্তিপ্রদ সদাচারের বিধি, তাহাদের এই দুর্দ্দশা ইহারই অভাবে।

১২। কর্ত্তব্যের অপরিত্যাগ ;—

তুমি সংসারে কি জন্য আসিয়াছে? তোমার কর্ত্তব্য কি? আগে তাহা স্থির কর। শাস্ত্রজ্ঞের অথবা সদ্গুরুর নিকট কর্ত্তব্য স্থির করিয়া সেই কর্ত্তব্যের প্রতি দৃঢ় লক্ষ্য রাখিয়া, কিছুদিন চলিলেই দেখিবে—তোমায় আত্মসংযম আত্মসংযম করিয়া দৌড়াইয়া বেড়াইতে হইবে না—আত্মসংযম—কাম, ক্রোধ, অহঙ্কার, সমুদয় আপনি গুটাইয়া আসিয়াছে।

১৩। বাক্‌সংযম ;—

বাক্যই অহঙ্কারের পিতা। মনের গর্ভে বাক্যের ঔরসে অহঙ্কারের উৎপত্তি। আমায় মূর্খ অভদ্র বলিলে, আপাদ মস্তক জ্বলিয়া উঠে। যে বলায় এত জ্বালা, সে বলা বা বাক্য কি? জিহ্বা তালু আদি দ্বারা আকাশে অভিঘাত। বাঁশের মধ্যে বায়ু প্রবেশ করিলে শব্দ হয়। আর ইহাও মুখ গহ্বরে বায়ুর খেলা। এই খেলাইতেই যখন অহঙ্কার উৎপত্তি, তখন সযত্নে ইহার সংযমে বদ্ধপরিকর হওয়া উচিত। বাক্‌সংযমের অন্য কারণও আছে। প্রবাদ—

"সে বলে অধিক মিথ্যা, যে বলে অধিক।"

সে দিন বহরমপুরে একটী সাধু দেখিলাম, তিনি আট বৎসর কথা কহেন নাই; কেবল লোক দ্বারে আঘাত করায়, রাত্রে ঘুমের ঘোরে দুই দিন "কে"

বলিয়াছিলেন। কথাতেই যখন উৎপত্তি ও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি তখন তাহার সংযমে অহঙ্কার আপনি সংযত হইবে।

১৪। সর্ব্বদা আমার চিন্তা;—

কাচ পোকায় আর্‌সোলা (তেলাপোকা) ধরিলে আরসোলা শীঘ্র কাচপোকার রং প্রাপ্ত হয়। অনুধ্যানের এমনই প্রভাব! যদি সেই অনুধ্যান সেই গুণাতীত বা নিখিল গুণাধারে প্রযুক্ত হয়, তাহা হইলে আর অহঙ্কার কিরূপে আসিবে? এই জন্য চতুরচূড়ামণি বৈষ্ণবগণ অষ্টকালীন মানস ভজনের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

১৫ অনুভব পর্য্যন্ত জ্ঞান;—

জ্ঞানের মাত্রা বাড়িলে অনুভব পর্য্যন্ত ধাবিত হয়। জ্ঞান অনুভবে আসিলেই সমাধির পূর্ব্ব অবস্থা। বৈষ্ণবদিগের ইহাই ভাব। শ্রীচৈতন্যদেব মেঘ দেখিয়া মূর্চ্ছিত হইতেন। মেঘের বর্ণ দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণরূপের জ্ঞান (প্রত্যভিজ্ঞান) পরে অনুভব, সেই হৃদয়ে স্ফুর্ত্তির আধিক্যই মূর্চ্ছা। ইহা স্বর্গীয় ভাব। ইহাতে অহঙ্কারের গন্ধও থাকিতে পায় না।

ভগবান্ ঋষভদেব কথিত ২৫টী উপায় মধ্যে ১৫টী বলিলাম। অপর কয়টীর এইরূপে দেওয়া কেবল প্রবন্ধ-কলেবর বৃদ্ধি করামাত্র। সেইজন্য অপরগুলির কেবল নামমাত্র দিলাম;—

১৬ কাম্য কর্ম্মত্যাগ,—

১৭ নির্বৈরতা,—

১৮ ক্রোধ শোকাদির উপশম,—

১৯ অধ্যাত্ম শাস্ত্রের অভ্যাস,—

২০ নির্জ্জন বাস,—

২১ সমতা,—

২২ আমার গুণ কীর্ত্তন,—

২৩ প্রাণ ইন্দ্রিয় ও মনের সম্যক্ জয়,—

২৪ সৎশ্রদ্ধা,—

২৫ সমাধি,—

যখন অহঙ্কার নষ্ট না করিলে শ্রেয়ঃ নাই, তখন অগ্রে তাহার নির্ম্মূল

করণে চেষ্টা করা উচিত। এখন আমাদের পূর্ব্ব কথিত উপায় কয়টীর মধ্যে যাহা আমাদিগের দ্বারা হইতে পারে, সেইরূপ ২।১টী অবলম্বন করাই সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। আমার মতে ১১।১২।১৩।১৪ চিহ্নিতের যে কোনটী আমরা একটু চেষ্টা করিলেই করিতে পারি। আর তাহা হইতেই যদি বিপুল শত্রু অহঙ্কারের হস্ত হইতে উদ্ধার পাওয়া যায়, তবে কেন চির অন্ধকারে থাকিব? সংসারে যাহাদিগের জন্য এই অমূল্য জীবন কাচমূল্যে বিক্রয় করিতেছি, তাহাদিগের জন্য বাস্তবিক ততদূর জীবন বিক্রয় উপযুক্ত নহে। সংসারের মায়াপাশ যিনি ছিন্ন করিয়া দেন, হৃদয়ের অন্ধকার যিনি নষ্ট করেন, তিনিই গুরু, তিনিই পিতা, তিনিই মাতা এই কথাই শাস্ত্র জলদ্ গম্ভীর রবে বলিতেছেন,—

"গুরুর্ণ স স্যাৎ স্বজনো ন স স্যাৎ
পিতা ন স স্যাৎ জননী ন সা স্যাৎ।
দৈবং ন তৎ স্যাৎ ন পতিশ্চ স স্যাৎ
ন মোচয়েৎ যঃ সমুপেত মৃত্যুম্"।

শ্রীরামগতি বিদ্যাবিনোদ।

পঞ্চীকরণ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

সোহেয় মীক্ষাঞ্চক্রে কথংন্বমাত্মন এব জনয়িত্বা সংভবতি। হন্ততিরো সানীতি। সা গৌরভবৃষভ ইতরস্তাং সমেবা, ভবত্ততো গাবেজোয়ন্ত। বড়বেতরা ভবদশ্ববৃষইতরো, গর্দ্দভীতরা গর্দ্দভ ইতরস্তাং সমে বা ভবত্তত একশফ, মজায়তা জেতরা ভবদস্ত ইতরো বিরিতরা মেষ ইতরস্তাং সমেবা ভবত্ততো জাবয়ো জায়ন্তৈব মেবয়াদিদং কিঞ্চ মিথুন মাপিপীলিকা ভ্যস্তৎ সর্ব্বমস্থতা। ৪।—বৃহদারণ্যকং।

সা শতরূপা উহইয়ং দুহিতৃ গমনেস্মাৎ প্রতিষেধ মনুস্মরন্তীক্ষাঞ্চক্রে

কথঞ্চিদ মকৃত্যং যন্মামাত্মন এব জনয়িত্বোৎপাত্ত সম্ভবত্যুপ গচ্ছতি যত্তপ্যয়ং নির্ঘৃণঃ অহং হন্ত ইদানীং তিরোসানি জাত্যন্তরেণ। তিরস্কৃতাহ্ স্ববানীত্যেব মীক্ষিত্বা সাগৌরভবদিত্যাদি।—শাঙ্করভাষ্যং।

স্বায়ম্ভুব মনু শতরূপাকে গ্রহণ করাতে শতরূপা মনুকে প্রতিষেধ করিতে অনুস্মরণ করিলেন, কি আশ্চর্য্য! জনক হইয়া কন্যাভিগমনে মতি উৎপন্না হইল, যাহা কোন মতে করণীয় নহে; ইহাতে আমিই বা কিরূপে প্রত্যুপস্থিতা হই। যত্তপি ইহঁার নির্ঘৃণত্ব দৃষ্ট হইতেছে, তবে আমি এতদ্রূপের তিরস্কার করতঃ জাত্যন্তর প্রাপ্ত হইব। এতদালোচনা করতঃ শতরূপা গোরূপ ধারণ করিলেন, মনু বৃষভরূপে উপগত হওয়াতে গোজাতি উৎপন্ন হইল। অনন্তর গোরূপ ত্যাগ করতঃ অশ্বিনী হইলেন, মনুও অশ্বরূপে সঙ্গ করাতে অশ্বজাতির উৎপত্তি হইল, পুনর্গর্দ্দভী হওয়াতে গর্দ্দভরূপে তজ্জাতির উৎপত্তি করিলেন। এইরূপে একশফ অর্থাৎ একখুর যাবদীয় পশু জন্মিল। অতঃপর ছাগরূপে ছাগোৎপত্তি, মেষরূপে মেষোৎপত্তি করিলেন; অপর কি কহিব, মৈথুন সম্ভূত ও পিপীলিকাদি পর্য্যন্ত যুগ্মরূপে সব্বজাতির উৎপত্তি হইল।

এক্ষণে সর্ব্বসাধারণ সুধীজন সন্নিধানে বিজ্ঞাপন করা হইতেছে যে, বেদ পুরাণের বিভিন্নতা কি! যদ্রূপ পুরাণে বর্ণনা করিয়াছেন, তদ্রূপ বেদেও দৃষ্ট হইতেছে; তবে আধুনিক নব্য তত্ত্বজ্ঞান প্রকাশকেরা যে কুযুক্তি দ্বারা লোকের চিত্তভেদ জন্মাইতেছেন, ইহাতে বেদনিন্দক বলিয়া তাঁহাদিগকে অঙ্গীকার করিতে হয় কি না? বেদ এবং বেদবেদ্য পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের নিন্দাকারী ব্যক্তি হইতে আত্মঘাতী কৃতঘ্ন দুষ্কৃতকারী কেহই নহে; সুবুদ্ধিমান মহোদয়েরা এতদ্বিষয়ের অবশ্যই বিচার করিবেন, যেহেতু পিতৃ-পিতামহাদির উপাস্য বস্তুকে নিরূপাস্যরূপে ত্যাগ করা হয় না।

এতজ্জগৎ স্রষ্টা প্রজাপতি মন্বাদি সৃষ্টির পূর্ব্বেই অগ্নি এবং ব্রাহ্মণাদিকে সৃষ্টি করেন। যথা শ্রুতিঃ—

"মুখতো ব্রাহ্মণে বাহ্বোঃ ক্ষত্রিয় উর্ব্বোর্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রোঽজায়ত" ইতি। মুখবাহূরুপাদ হইতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, এই বর্ণ চতুষ্টয় উৎপত্তি করিয়াছিলেন, তদনুক্রমে ব্যাখ্যা করিতেছি, যথা।—

সোবেদহং বাবসৃষ্টিরস্ম্যহংহীদং সর্ব্বমসৃক্ষীতি
ততঃ সৃষ্টিরভবৎ সৃষ্ট্যাং হাস্যৈতস্যাং ভবতি য এবং বেদ। ৫।—

বৃহদারণ্যকং।

স প্রজাপতিঃ সর্ব্বমিদং জগৎসৃষ্ট্বা অবেৎ। কথমহং বাব অহমেব সৃষ্টিঃ সৃজ্যতে ইতি সৃষ্টঃ জগৎ উচ্যতে। সৃষ্টিরিতি যন্ময়া সৃষ্টংজগৎ সৎ মদভেদত্বা-দহমেবাস্মি। ন। মত্তো ব্যতিরিচ্যতে। কুতএতদহং হি যস্মাদিদং সর্ব্বং জগদসৃক্ষি সৃষ্টবানস্মি তস্মাদিত্যর্থঃ। যস্মাৎ সৃষ্টিশব্দে নাত্মান মেবোক্তবান্ প্রজাপতিস্তত স্তস্মাৎ সৃষ্টিনামাভবৎ। সৃষ্ট্যাং জগতিহ অস্য প্রজাপতে রেতস্যা মেতস্মিন্ জগতি প্রজাবতিবৎ স্রষ্টা ভবতি স্বাত্মনো নন্যভূতস্য জগতো য এবং প্রজাপতিবৎ যথোক্তং স্বাত্মনো নন্যভূতং জগৎ সাধ্যাত্মাধিভূতাধিদৈবং জগদহমস্মীতি বেদ॥ ৫॥

এবং স প্রজাপতি র্জগদিদং মিথুনাত্মকং সৃষ্ট্বা ব্রাহ্মণাদিবর্ণ নিয়ন্ত্রীঃ দেবতাঃ সিসৃক্ষুরাদৌ।—শাঙ্করভাষ্যং।

সেই প্রজাপতি পুরুষ জগৎ সৃষ্টি করতঃ প্রশ্নপূর্ব্বক আপনাতে চিন্তা করিলেন, আমি কি প্রকারে সৃষ্টি করিব; আমা কর্ত্তৃক সৃষ্ট যে জগৎ তাহাকেই সৃষ্টি কহিতে হয়, কিন্তু বিদ্যমান জগৎ আমাতে অভিন্ন; অতএব আমিই এতজ্জগৎ ব্যপ্তময়, আমা ব্যতিরিক্ত দ্বিতীয় বস্তু নাই। তবে আমি এই জগৎ কি প্রকারে সৃষ্টি করিলাম, যেহেতু প্রজাপতি সৃষ্টিশব্দে আত্মাকে উক্ত করিয়াছিলেন, তদ্ধেতু সৃষ্টি নামে প্রজাপতি উক্ত হইয়াছেন; অর্থাৎ বিরাট সংজ্ঞালাভ করিয়াছেন। তদ্রূপ যে কোন ব্যক্তি আধ্যাত্ম অধিভূত অধিদৈব্যাদি জগৎকে আত্মার অনন্যভূত অর্থাৎ অভিন্নরূপে এই জগৎ আমি ইহা নিশ্চয় জানিবে, সেই মুক্ত, সেই জ্ঞানী, সেই বেদবিৎ। এবঞ্চ প্রজাপতি ব্রহ্মা মিথুনাত্মক অর্থাৎ স্ত্রী পুরুষ সংসক্ত এতৎ জগৎ সৃষ্টি করতঃ প্রথমতঃ জগন্নিয়ন্তা দেবতা ব্রাহ্মণাদি বর্ণ সৃষ্টি করিলেন।

যদ্যপিও মন্বাদির সৃষ্টি উক্ত হইয়াছে, তথাপি ব্রাহ্মণাদির পূর্ব্ব সৃষ্টির বিশেষ আছে, তাহার সমন্বয় শাখান্তরে উক্ত হইয়াছে। কিন্তু সুধী পাঠক মহাশয়েরা বিবেচনা করিবেন, আত্মাতে অভিন্ন এই জগৎ, অর্থাৎ আত্মাই জগদ্রূপে প্রকাশমান যে, বেদান্তসূত্রে উক্ত করিয়াছেন তাহা উপনিষৎ দৃষ্টে

সপ্রমাণ হইল। আধুনিক নব্য তত্ত্বজ্ঞান প্রকাশকেরা বলেন যে, আত্মারূপ রূপান্তর হইতে পারেন না, এবং আত্মা হইতে জগৎ সৃষ্ট, আত্মা যে জগৎ এমত নহে, সে কুযুক্তির খণ্ডন হইল কি না? পুনরপি—

অথেত্যভ্যমন্থৎ সমুখাচ্চ যোনের্হস্তাভ্যাঞ্চাগ্নিমসৃজত তস্মাদে তদুভয় মলোমকথন্তরতো লোকাহিযোনিরন্তরতঃ।—বৃহদারণ্যকং।

অথেতি শব্দদ্বয় মভিনয়প্রদর্শনার্থং অনেন প্রকারেণ মুখে হস্তৌ প্রক্ষিপ্য মভ্যমন্থদাভি মুখ্যেন মন্থন মকরোৎ। সমুখং হস্তাভ্যাং মথিত্বা মুখাচ্চ যোনের্হস্তাভ্যাং অগ্নিং ব্রাহ্মণ জাতেরনুগ্রহ কর্ত্তার মসৃজৎ সৃষ্টবান্ যস্মাদ্দাহকস্যাগ্নে র্যোনিরেতদুভয়ং হস্তৌ মুখঞ্চ তস্মাৎ উভয় মপ্যেত দলোমকং লোম বর্জিতং কিং সর্ব্বমেবন অন্তরতোঽভ্যন্তরেতোঽস্তিহি যোন্যাসামান্য মুভয়স্যাস্তি কিমলোমকাহি যোনিরন্তরতঃ স্ত্রীনাং॥ তথা ব্রাহ্মণোপি মুখাদেব জজ্ঞে প্রজাপতে স্তস্মাদেক যোনিত্বা র্জ্জ্যেষ্ঠেনৈবানুজোঽনুগৃহ্যতেগ্নিনা ব্রাহ্মণ স্তস্মাৎ ব্রাহ্মণোঽগ্নিদৈবত্যো মুখবীর্য্যশ্চেতি।—শাঙ্করভাষ্যং।

শব্দদ্বয়ের অভিনয়ার্থ ঐক্যতা প্রদর্শন জন্য "অথ" শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। অনন্তর প্রজাপতি ব্রহ্মা হস্তদ্বয় স্বমুখে প্রক্ষেপ করিয়া মর্দ্দন করাতে ব্রাহ্মণের অনুগ্রহকারী অগ্নির উৎপত্তি হয়, এতন্নিমিত্ত মুখযোনি অগ্নি সর্ব্বশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। যদি বল, ব্রহ্মার মুখ হইতে উৎপন্ন অগ্নির ব্রাহ্মণের প্রতি অনুগ্রহের কারণ কি? উত্তর,—অগ্নির উৎপত্তির অনন্তর প্রজাপতির মুখ হইতে ব্রাহ্মণেরও উৎপত্তি হয়; জ্যেষ্ঠত্ব প্রযুক্ত অগ্নির গুরুত্ব স্বীকার হইয়াছে, তদনুজরূপে ব্রাহ্মণের লঘুত্ব হয়; অর্থাৎ অনুজ ভ্রাতার প্রতি জ্যেষ্ঠভ্রাতার পুত্রবৎ স্নেহ অবশ্যই হয়। অনুজ কর্ত্তৃক জ্যেষ্ঠ পিতৃবৎ পূজনীয়, এ কারণ ব্রাহ্মণের গুরু অগ্নি, যথা শ্রুতিঃ— "অগ্নেয়োবৈ ব্রাহ্মণ ইতি" তথাচ স্মৃতিঃ—"গুরুরগ্নির্দ্বিজাতীনামিতি।" তথাহি "ব্রাহ্মণোঽগ্নি দৈবত্য" ইত্যাদি শ্রুতি স্মৃতি প্রসিদ্ধ সর্ব্ববর্ণের গুরু ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণের গুরু অগ্নি, যদ্রূপ ব্রহ্মমুখোৎপন্ন জন্য দেবতা কি মনুষ্য সকলেরই আরাধনীয় অগ্নি, তদ্রূপ ব্রাহ্মণও ব্রহ্মার মুখে হইতে উৎপন্ন হয়েন, একযোনিত্ব প্রযুক্ত অগ্নিবৎ সর্ব্বোপাস্য ব্রাহ্মণ; কিন্তু বিশেষ ব্রাহ্মণের আরাধ্য অগ্নি, যেহেতুক জ্যেষ্ঠত্ব প্রযুক্ত শ্রেষ্ঠত্বরূপে মান্য হইয়াছেন।

আধুনিক নব্য জ্ঞান প্রকাশকেরা কহিয়া থাকেন যে, বেদ পাঠ করিয়া ব্রহ্মবিচারে যে প্রবর্ত্ত হয়, সেই ব্রাহ্মণ। এই শ্রুতি দৃষ্টে তাঁহাদিগের সে আপত্তির বিশেষরূপে খণ্ডন হইল কি না, সুধী মহাশয়েরা তাহার বিশিষ্টরূপ বিচার করিবেন। এতদ্বিষয়ে পূর্ব্বাপর যদ্রূপ লিপি প্রয়োগ করা হইয়াছে; তাহা যথাশাস্ত্র সঙ্গত বটে কি না; এবং ব্রহ্মার শরীরও রূপক নহে, যেহেতু শ্রুতি দৃষ্টে ব্রহ্মার মুখ ও হস্তের প্রমাণ হইয়া যথার্থ শরীরী প্রতিপন্ন হইতেছে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ শর্ম্মা।

চন্দ্রালোকে।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

প্রফুল্ল ও বিমল কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ়ের ন্যায় তথায় দাঁড়াইয়া আছে, এমন সময়ে সেই আকস্মিক বিকট শব্দে জাগরিত হইয়া পাচক ও ভৃত্যদ্বয় তাড়াতাড়ি গৃহের বাহির হইল এবং তাহাদিগকে প্রাঙ্গণে দেখিতে পাইয়া ভয়বিকলিত চিত্তে জিজ্ঞাসা করিল, "দাদাবাবু! ও কিসের শব্দ হইল?"

"ঠাকুরবাড়ী পড়িয়া গিয়াছে।"

"এঁ্যা, আপনারা কোন আঘাত পান নাই ত?"

"না; আমরা পূর্ব্ব হইতেই জানিতে পারিয়াছিলাম।"

"কি রকমে বুঝিতে পারিয়াছিলেন?"

তখন বিমল যাহা যাহা ঘটিয়াছে আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিল।

"ও বাবা! ঠিক্ এ বাড়ীতে ভূত আছে—আর এখানে থাকা হবে না; বরং আজ রাত্তির ঐ ঘাটে শুয়ে কাটাব। আপনাদের আচ্ছা ভরসা! সত্যি দাদা বাবু! আমরা হোলে মোরে যেতুম।"

তাহারা উপায়ান্তর না দেখিয়া অতি কষ্টে সে রাত্রি যমুনার ঘাটে অতিবাহিত করিল। পরদিন প্রভাতে পূজারী মহাশয় আসিয়া দেখেন যে, ঠাকুরবাড়ী পড়িয়া গিয়াছে। অমনি তাঁহার মস্তকে যেন বজ্রপাত হইল। দৌড়াইয়া বাটীর ভিতর প্রবেশ করিলেন। সেখানে কাহাকেও দেখিতে

না পাইয়া যেমনি বাহিরে আসিবেন, অমনি দেখিলেন একটী ভৃত্য তাঁহার দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। তৎপরে তিনি রাত্রির সেই অদ্ভুত ঘটনা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন এবং তখনও প্রফুল্লের সম্পূর্ণরূপে বিপদাশঙ্কা বিদূরিত হয় নাই বুঝিয়া বাটী ফিরিয়া যাইতে পরামর্শ দিলেন।

অতি প্রত্যূষে এক বৃদ্ধ গুন্‌গুন্ স্বরে হরিনাম গান করিতে করিতে স্নানোদ্দেশে সেই ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং ঐরূপ অবস্থায় দুই জন ভদ্র যুবক রাত্রিযাপন করিতেছে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনারা এরূপ স্থানে রাত্রি অতিবাহিত করিতেছেন কেন? আপনারা কি বাসা পান নাই?"

বিমল অতি বিনয়নম্র বচনে উত্তর করিল, "মহাশয়! বাসা পাইয়াছিলাম; কিন্তু রাত্রিতে এক অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়াছে এবং সেই কারণে বাধ্য হইয়া এরূপ অসহায় অবস্থায় রাত্রি যাপন করিতে হইয়াছে।"

তচ্ছ্রবণে বৃদ্ধ তাহাদের পার্শ্বে উপবেশন করিয়া কৌতূহলাক্রান্ত হৃদয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঘটনাটী কি একবার শুনিতে পাই না?"

বিমল ঘটনাটী আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিলে বৃদ্ধের কৌতূহল যেন আরও বাড়িয়া উঠিল। তিনি উভয়ের পরিচয় লইয়া বলিতে লাগিলেন, "এরূপ ঘটনা অতি বিরল হইলেও ইহা যে নিতান্ত অসম্ভব তাহা নহে। এরূপ ঘটনা অনেক কারণে ঘটিতে পারে। বোধ হয় আপনার কোন পূর্ব্ব পুরুষ উচ্চ অঙ্গের সাধক ছিলেন; তিনি তাঁহার বংশধরগণের মঙ্গলের জন্য এমন একটী শক্তি সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, যাহার বশে এবম্বিধ ঘটনা সম্ভবপর। এমনও শুনা গিয়াছে মৃত্যু কালে কেহ কেহ বলিয়া যান, আমার হৃৎপিণ্ড জলে নিক্ষেপ না করিয়া বাটীর মধ্যে কোন স্থানে পুতিয়া রাখিও, তোমাদের মঙ্গল হইবে।" এ কথাটীর মর্ম্ম আমরা ধারণা করিতে অক্ষম হইলেও, ইহা যে নিতান্ত প্রলাপ বলিয়া মনে করিব, তাহার কোন কারণ দেখি না; কারণ যখন তাহার একটী কার্য্য দেখিতে পাইতেছি, তখন নিশ্চয় ইহার ভিতর কোন রহস্য আছে। আবার কখন কখন এক শ্রেণীর দেবতাগণ, সাধনামার্গে উন্নত মানবগণ কিম্বা যাঁহারা অল্পকাল পরলোক গমন করিয়াছেন, তাঁহারাও মধ্যে মধ্যে পুত্রাদির প্রতি স্নেহবশতঃ এরূপ কার্য্য করিয়া

থাকেন। তাঁহারা দৃশ্য ও অদৃশ্য উভয় ভাবে থাকিয়া বিপদ্ সময়ে মানবগণকে সহায়তা করেন। অধিকাংশ সময়ে বিপন্ন ব্যক্তি পাছে ভয় পায়, এই কারণে তাঁহারা পরিচিত রূপ ধারণ করিয়া তাঁহাদের কার্য্য সম্পন্ন করিয়া যান। তাঁহারা যখন অদৃশ্য ভাবে সহায়তা করেন, তখন আমরা সহজে বুঝিতে পারি না। মনে করুন আমি একস্থানে ঘোর বিপদে পড়িয়াছি, উদ্ধারের উপায় দেখিতেছি না, জীবন যায় যায় হইয়াছে, চকিতের মধ্যে কে যেন উপায় বলিয়া দিল। এই প্রকারে তাঁহারা আমাদিগকে অহরহঃ সাহায্য করিতেছেন, কিন্তু আমারা এমনই অকৃতজ্ঞ—অহঙ্কারে মত্ত যে, তাহা একবার ভুলেও স্বীকার করি না।”

“আপনি যুক্তিপূর্ণ কারণ দর্শাইয়া আমাদের এত দিনের ভ্রম দূর করিলেন। আপনাকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিতেছি।

এদিকে রাত্রি দ্বিপ্রহরে সহসা ঘণ্টার ধ্বনি শ্রবণ করিয়া শশিশেখর বাবুর অন্তঃপুরে একটা খুব গণ্ডগোল পড়িয়া গেল। নানা জনে নানা প্রকার বিপদাশঙ্কা লইয়া আন্দোলন করিতে লাগিলেন। প্রাণাধিক পুত্র প্রবাসে থাকিলে স্বভাবতঃ পিতামাতার মনে অগ্রে সেই চিন্তা আসিয়া উদিত হয়। শশিশেখর বাবু ও তাঁহার পত্নী প্রফুল্লের চিন্তায় অত্যন্ত অধীর হইলেন। তৎক্ষণাৎ বৃন্দাবনে টেলিগ্রাম করা হইল। পরদিন উত্তর আসিল, “আমরা ভাল আছি—অদ্যই ফিরিয়া যাইতেছি।” সংবাদ প্রাপ্তে তাঁহারা আপাততঃ একটু সুস্থির হইলেন।

যথাসময়ে প্রফুল্ল ও বিমল বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাগত হইলে, সেই অলৌকিক ঘটনা শ্রবণ করিয়া সকলে বিস্মিত হইলেন এবং পরম করুণাময় জগৎপিতার চরণে প্রণাম করিয়া বলিতে লাগিলেন, “মঙ্গলময়! ক্ষুদ্রবুদ্ধি মানব আমরা, তোমার লীলা কিরূপে বুঝিব? তুমি কাহাকে কখন কি ভাবে রক্ষা কর, তুমিই জান!”

সেই দিন হইতে কমলাকে প্রকৃত সুলক্ষণা জানিয়া সকলে তাহাকে প্রাণ ভরিয়া ভাল বাসিতে লাগিলেন। অনন্তর শুভদিনে মহাসমারোহে প্রফুল্ল ও কমলার শুভ পরিণয় সম্পন্ন হইয়া গেল।

শ্রীবিরাজমোহন দে।

আমার মালা গাঁথা।

(বঙ্গদর্শন—১২৮৬ সাল, আষাঢ় সংখ্যা হইতে উদ্ধৃত।)

এক ছড়া মালা গাঁথিতে বড়ই সাধ হ'লো। সূর্য্যমুখী এতক্ষণ মুখ তুলিয়া আকাশ পানে চাহিয়াছিল, সন্ধ্যা হইল দেখিয়া আস্তে আস্তে মস্তক অবনত করিল; আমিও মালা গাঁথিবার জন্য একগাছি সূতা লইয়া মুক্ত দ্বার দিয়া কাননে প্রবেশ করিলাম। এই কানন ভ্রমণে কাহারও নিষেধ নাই; সাধারণের জন্যই বাগানটি প্রস্তুত হইয়াছে। সন্ধ্যার মন্দ সমীরণে উদ্যানস্থ পুষ্পের গন্ধ চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল, গাছের পাতাগুলি অল্পে অল্পে দুলিতে লাগিল, আর কেমন এক প্রকার চিত্তসন্তোষজনক শব্দ হইতে লাগিল। সমীরণভরে দোদুল্যমান বৃক্ষপত্রের সঙ্গে সঙ্গে আমারও মন দুলিতে লাগিল; ঝিল্লীগণের ঝিঁ ঝিঁ রব বড় মধুর বোধ হইল, আর সেই সঙ্গে আমারও হৃদয়যন্ত্র বাজিয়া উঠিল। আমি যেন কি অন্বেষণ করিতে লাগিলাম, যেন কোন দ্রব্য হারাইয়াছি কিন্তু কি যে সে দ্রব্য তাহা স্মরণ করিতে পারিলাম না। অনেক প্রকার অসম্ভব চিন্তার উদয় হইল। ভাবিলাম কিংশুকে যদি গন্ধ থাকিত, সুপক্ক ফল যদি না পচিত, বিদ্যুতের আলোক যদি নয়নস্নিগ্ধকর হইত, আর আমার যদি এই সকল পুষ্পের ন্যায় ভুবনমোহিনী শক্তি থাকিত, তাহা হইলে বেশ হইত। এইরূপ ভাবিতেছি এমন সময় দেখি কতকগুলি শুষ্ক ফুল ভূপতিত হইল। পতনকালীন সরসর শব্দে যেন বলিতে লাগিল—Memento horæ novissimæ. (Remember the last lover) এই উপদেশবাক্য আমার অন্তরে লাগিল, আমি আমার শেষের দিন স্মরণ করিলাম; তখন বুঝিলাম যে আমার এই ক্ষণভঙ্গুর দেহ আজি হউক—কালি হউক—দুদিন পরে হউক, এই বৃন্তচ্যুত পুষ্পের ন্যায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। পতন কালে ফুলটি যেন হাসিতেছিল; যতক্ষণ বৃক্ষে ছিল ততক্ষণ বৃক্ষের শোভাবর্দ্ধন করিয়াছে, সদ্‌গন্ধ দানে কত লোকের চিত্তসন্তোষ করিয়াছে, আপনার কর্ত্তব্যকর্ম্ম সাধন করিয়া ধ্বংস হইল, এ ধ্বংসে দুঃখ নাই। কিন্তু আমি—

আমি সদ্‌গন্ধ বিতরণে কয় জনের চিত্ত সন্তোষ করিয়াছি, কাহার শোভা বৃদ্ধি করিয়াছি? কাহারও নয়। তবে এ পৃথিবীতে আসিয়া কি করিলাম? যখন আমার এই জীবন বুদ্বুদ্‌ কালস্রোতে মিশাইবে তখন কি হাসিতে পাইব না? যাহা হউক আর ভাবিব না, মিছা ভাবনায় সব ভুলিয়া গিয়াছি। হাতের সুতা হাতেই রহিয়াছে; মালা ত গাঁথা হয় নাই।

মালার জন্য ফুল তুলিতে চলিলাম। দেখিলাম অনেকগুলি ফুল ফুটিয়াছে, আর কতকগুলি ঈষৎ হেলিয়া দুলিয়া ফোটে ফোটে হইয়াছে। মল্লিকাসুন্দরী দেখিল যে ভূমণ্ডল ক্রমে ক্রমে অন্ধকারাবৃত হইতে লাগিল এখন আর লজ্জা কেন? এই ভাবিয়া ধীরে ধীরে অবগুণ্ঠনমোচন করিল— আপনার গন্ধে আপনি ঢলিয়া পড়িল। ঐ ঢলে পড়া ভাব আমি বড় ভালবাসি। নিজের গুণ মনে মনে জেনে যে নম্রভাব ধরে, তারে বড় ভালবাসি। মল্লিকে! ক্ষুদ্র বৃক্ষে তোমার জন্ম, ঐ বিদেশী আরোকেরিয়া, উহার পাতার ন্যায় তোমার পাতার সৌন্দর্য্য নাই—সুন্দর পলাশের ন্যায় বর্ণও নাই, কিন্তু তবু আমি তোমাবে বড় ভালবাসি—তোমার ঐ সাদা রং ও সদ্‌গন্ধ আর ঐ ঢলে পড়া ভাব আমার অন্তরে লাগিয়াছে। শুনিতে পাই সরল মনের সহিত সরল মনের বিনিময় সহজেই হয়:—তোমার নিজের মন আমি চিনিতে পারিলাম না—জানি না সরল কি গরলময়, কিন্তু বোধ হয় তোমার উপর যেরূপ সাদা, অন্তরও সেইরূপ, নহিলে তোমার ঐ ঢলে পড়া ভাব থাকিত না। তুমি গর্ব্বিতা হ'লে তোমার সহিত আলাপ করিতাম না, তোমার নিকট এতক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিতাম না; কিন্তু আমি বুঝিয়াছি তুমি সেইরূপ নও, সেই জন্যই তোমাকে একটি বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিতেছি। মল্লিকে! আজি আমার কৌতুহল নিবারণ করিতে হইবে। মল্লিকে! বল দেখি, জগজ্জন মনোহর ঐ সদ্‌গন্ধ তুমি কেন বিতরণ করিতেছ? ঐ গন্ধে বিভোর হইয়া মানবগণ নন্দন-কাননের সুখ এই ভূমণ্ডলে ভোগ করিবে এই জন্যই কি তুমি তোমার গন্ধ ইতস্ততঃ বিক্ষেপ করিতেছে? কিন্তু তাহাতে তোমার লাভ কি? যথার্থ স্বার্থপরতা শূন্য হইয়া পরের সুখ বর্দ্ধন করাই কি তোমার উদ্দেশ্য?

মনে ভাবিলাম মধুর হাসি হাসিয়া মল্লিকা বলিল—আমার উদ্দেশ্য

নিঃস্বার্থপর নহে। গন্ধ বিতরণে আমার নিজের লাভ কি? তবে বলি শুন—এ সংসারে তুমি একা—সংসার বন্ধনে বদ্ধ না হয়ে উদাসীনের ন্যায় বিচরণ করিতেছ। তুমি কি বুঝিবে? আমাদের ন্যায় কামিনীগণের মনের ভাব তোমায় কিরূপে বুঝাইব? আমরা চাই জগৎশুদ্ধ সকলে আমাদের ভালবাসিবে, মানবগণ নিজ নিজ হৃদয়কাননে আমাদের যত্ন সহকারে রোপণ করিবে, তাহাদের জলসেচনে পরিবর্দ্ধিত হইব; এখন বল দেখি আমার ঐ গন্ধটুকু না থাকিলে কে আমায় আদর করিত, কে আমায় ভাল বাসিত? সকলে ভাল বাসিবে—এই সুখের আশা যদি না থাকিত তাহা হইলে কি আমি এরূপ গন্ধ বিতরণ করিতাম? আমার অভিপ্রায় স্বার্থশূন্য নহে। স্বার্থশূন্য এ জগতে কেহই নহে।

স্বার্থশূন্য কি কেহই নাই—হতেও পারে। গ্রামের মধ্যে বড়লোক—বড় পরোপকারী শশীবাবু অতিথি প্রতিপালন করিতেছেন—কেন? নিজে প্রশংসা পাবেন বলে, আর নিজের মনের সুখ সাধনের জন্য। এই যে পাঁচটি অঙ্গুলিযুক্ত আমার দক্ষিণ হস্ত অন্নের গ্রাসটি আদর করিয়া মুখমধ্যে দিয়া থাকে ইহা শুধু মুখের কি উদরের উপকারের জন্য নয়। যদি অন্যরূপে হাতের পুষ্টি সাধন হইতে পারিত, তাহা হইলে এই দক্ষিণ হস্তের সহিত সুচিকণ দন্তাবলী পরিবেষ্টিত মুখের প্রণয় থাকিত কি না বলিতে পারি না।

যেখানে যাই সেইখানে দেখি সকলেই নিজের জন্য ব্যস্ত; আমিও নিজের তুষ্টি সাধনের জন্য মালাটী গাঁথিয়া শেষ করিলাম। এখন মালাটী নিজে পরিব অথবা অন্য কাহাকেও পরাইব ইহাই ভাবিতে লাগিলাম। নিজের গাঁথা মালা নিজে পরিতে ইচ্ছা হইল না। আমার গাঁথা মালা আর এক জনের গলে দিয়া নয়ন ভরিয়া তাহার শোভা দেখিব—মনে মনে এই বাসনাই প্রবল হইল। কিন্তু এ মালা কার গলে পরাইব, এ মালা গলে পরিলে কার শোভা বাড়িবে? অন্ধকারে বসিয়া মোটা সূতায়, কি ফুল তুলিতে কি ফুল তুলিয়া, এই যে মালা গাঁথিলাম এ মালায় ত কাহারও সৌন্দর্য্য বাড়িবে না। তবে পরের গলে মালা দিয়া কি লাভ হইবে? আর পরেই বা আদর করিয়া আমার এ মালা কেন পরিবে? আদর—আদর এই

কথাটি বড় মিষ্ট; আমি যে আদর বড় ভাল বাসি। যে আদরে অপ্রাপ্ত-বয়স্ক সন্তান মায়ের গলা জড়াইয়া ঝুলিতে থাকে, স্বামীর যে আদরে প্রণয়িনীর মুখমণ্ডল আরক্তিম হয়—আর মুখে মধুর হাসি দেখা দেয়—বন্ধুর দোষ দেখিলে লোকে যে আদর মাখান তিরস্কার করিয়া থাকে।—সেই আদর ভরা হাতে কে আমার হাত হইতে মালাটী লইবে? সেই আদর মাখা বচনে কে আমায় বলিবে ও ফুলটীর বদলে আর একটি ফুল বসাও—ও ফুলটী ছিঁড়িয়া ফেল—এই স্থানটী বেশ হইয়াছে—ওখানটি ভাল হয় নাই, কে ঐরূপ আদর করিয়া আমায় পরিশ্রম সফল করিবে? আমার মালাকে আদর করে এমন কি কেহই নাই? থাকিতেও পারে। যখন তেমন লোক পাইব, তখন তাহাকে মনের মত মালা গাঁথিয়া পরাইব—এখন, এই সূত্র নিবদ্ধ কানন কুসুমনিচয়কে মাতা বসুমতীর করে সমর্পণ করিব। ফুলগুলি খুলিয়া মাটিতে ছড়াইলাম।

২৬ বৎসর পূর্ব্বে এই প্রবন্ধটি বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছিল। এইটি আমার প্রথম লেখা; উহা কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিয়া পন্থা পত্রিকাতে পুনরায় প্রকাশ করিলাম।

এই সংসারকাননে; কর্ম্মসূত্র হাতে করিয়া কর্ম্মের মালা গাঁথিতে আসিয়াছি; কিন্তু এই কর্ম্মের মালা নিজে পরিবার সাধ নাই। আমার গাঁথা মালা আর এক জনের গলে দিব, তিনি উহা আদর করিয়া লইবেন, তাঁহার সন্তোষ দেখিয়া আমি আনন্দিত হইব; এই টুকুই আমার মালা গাঁথার স্বার্থ। যাঁহার গলে আমি আমার কর্ম্মের মালা পরাইতে চাই, তিনি আমার ইষ্টদেবতা, তিনি আমার আনন্দময় কোষের অধিষ্ঠাতা। তিনি আমার অন্তরে বাস করিতেছেন কিন্তু আমি তাঁহাকে চিনি না। তাঁহাকে খুঁজিয়া মালা পরাইব ইহাই এবারে সংকল্প করিয়াছি; মালা আর ছিঁড়িব না, ছিঁড়িতে গেলেও ছিঁড়িতে পারিব না। এবারে যে মালার কথা লিখিতেছি এ মালা যে একবার গাঁথিলে আর ছেঁড়া যায় না। বুদ্ধিস্বরূপ ইষ্টদেবতার সাক্ষাৎলাভ করিয়া, কর্ম্মের মালা ইষ্টদেবতার হাতে সমর্পণ করিয়া, সেই দ্যুতিময়ের দ্যুতি দর্শনে সাধকের যে আনন্দ উহাই সাধকের প্রকৃত স্বার্থ। এই স্বার্থসাধনই মনের জীবনের চরম উদ্দেশ্য।

শ্রীকৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল।

বিজ্ঞান, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য।

—শ্রীরামচন্দ্রের সমসাময়িক কালে ও এমন কি তৎপূর্ব্ব যুগে, পৃথিবীর আকার ও জলস্থল সন্নিবেশ কিরূপ ছিল, এতদ্বিষয়ে ইউরোপে বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে আন্দোলন চলিতেছে। সূক্ষ্মদর্শীদিগের মত এই যে, বর্ত্তমান ভূখণ্ডসকল পূর্ব্বে ছিল না। অষ্ট্রেলিয়া হইতে আফ্রিকা মহাপ্রদেশের সাহারাগণ্ড লইয়া আমেরিকার সন্নিকটবর্ত্তি এক মহাদেশ ছিল। আধুনিক থিয়সফিষ্ট নামকরণে উহার নাম Lemuria। উহাই আমাদের পুরাণে বর্ণিত বলি ও হিরণ্যকশিপুর রাজত্ব। উহার কতক অংশ দক্ষিণ আমেরিকার অন্তর্গত ব্রেজিল প্রভৃতি স্থান। উক্ত মহাদেশ প্রলয়জলে নিমজ্জিত হইলে, আমেরিকা ও আফ্রিকার মধ্যবর্ত্তী স্থানে Altantis নামে একটী মহাদেশ আবির্ভূত হয়। Cape Varde নিকটবর্ত্তী স্থান ও Easter Island প্রভৃতি দেশ সকল এই মহাদেশের অন্তর্গত ছিল, এবং তথায় এখনও পর্য্যন্ত এক প্রাচীনতম সভ্যতাব নিদর্শন দৃষ্ট হয়। তৎকালে এসিয়ার মধ্যস্থিত Gobi dessert এর সন্নিবর্ত্তী স্থানকে ভারতবর্ষ বলা হইত। এই Atlantisই রাবণের লঙ্কা।

*　　　　*　　　　*

—দার্শনিকগণ বর্ত্তমান অষ্ট্রেলিয়া, কেপ কলোনি, ও দক্ষিণ আমেরিকার বিশিষ্ট উদ্ভিদ ও প্রাণীজগতের অভিনব ঐক্যতা দেখিতে পান, এবং এতদিন পর্য্যন্ত তাহার কারণানুসন্ধানে বিস্ময়ান্বিত হইতেন। এক্ষণে Transactions of the South African Philosophical Society নামক প্রবন্ধাবলীতে E H. L. Schwarz এতৎ সম্বন্ধীয় প্রমাণগুলি সংগৃহীত করিয়া জলনিমজ্জিত মহাদেশ সকলের অস্তিত্ব প্রমাণ করিয়াছেন। এদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় পুরাণ বর্ণিত ব্যাপারগুলি কবি কল্পনা বলিয়া উড়াইয়া দেন। রামায়ণে বর্ণিত দীর্ঘকায় রাক্ষস অভিধেয় জাতির কথা শুনিয়া তাহারা হাসিয়া উঠেন; কিন্তু সম্প্রতি দক্ষিণ আমেরিকায় ভূ-প্রথিত কতকগুলি নরকঙ্কাল আবিষ্কৃত হইয়াছিল। তদ্দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তখনকার মানবদেহ ২০ হস্ত বা তদধিক পরিমিত ছিল।

*　　　　*　　　　*

—ফরাসী রাজদূত Count de Lesdain, সস্ত্রীক তিব্বত ও মধ্য এসিয়াখণ্ড পরিভ্রমণ করিয়া গত নভেম্বর মাসে কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। তাঁহারা গোবি মরুভূমির নিকটবর্ত্তী স্থানে দুইটী ভূ-প্রথিত নগর আবিষ্কার করেন। তাঁহাদের ভ্রমণবৃত্তান্ত প্রকাশিত হইলে সভ্যজগৎ আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন।

*　　　　*　　　　*

—মহোদয়া শ্রীমতী আনি বেশান্ত, শ্রীমান মি লেডবিটার, কলিকাতায় কতকগুলি বক্তৃতা দেন। এই বিষম দুর্দ্দিনে, সকলেই বিক্ষিপ্তচিত্ত হইয়া রহিয়াছেন। তাঁহাদের বক্তৃতার ফলে যদি কয়েকজনও প্রশমিতচিত্ত হন, তাহা হইলেই মঙ্গল। সেই জন্ম সকলকেই বলিঃ—

নাস্তিবুদ্ধি রযুক্তস্য নচাযুক্তস্য ভাবনা।
নচা ভাবয়তঃ শান্তি রশান্তস্য কতঃসুখম্‌॥
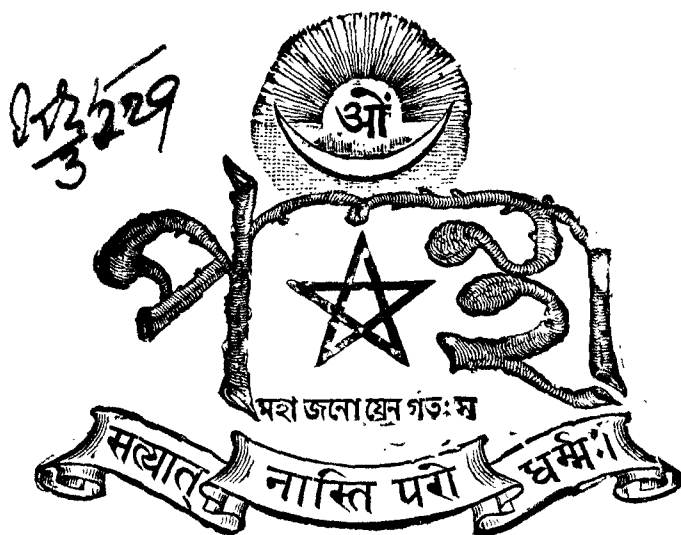
৯ম ভাগ { ফাল্গুন, ১৩১২ সাল। } ১১শ সংখ্যা।

কর্ম্মচক্র।

(১)

খেলে মায়া রচি' কারাগার
কভু বা কঠিন লোহে কভু বা কোমল পুষ্পে
কভু স্বর্ণে—চির অন্ধকার।

(২)

মাতৃগর্ভ যন্ত্রণা-নিগড়,
নাহিক শকতি নিজ, পরের শোণিত পানে
পুষ্টিলাভ পিষ্ঠ কলেবর।

(৩)

মাতৃ-গর্ভ করি পরিহার
নব বিশ্ব কারাগারে লভে স্থান নব নব
হর্ষ শোক চিন্তার মাঝার।

(৪)

কোথা হতে মায়াবিনী নারী
বাঁধি বাহু ফুলহারে রাখে বদ্ধ কারাগারে,
পলায়ন—অসম্ভব তারি।

(৫)

হের পুন বিচিত্র বিকার!
মায়ার উপরে মায়া! নিজ নিজ কণ্ঠপাশ
সৃজে জীব স্বেচ্ছায় আবার।

(৬)

দারা পুত্র পরিজন সহ
করি' কর্ম্ম নানামত কর্ম্মচক্র অবিহত
সৃজে জীব বৃথা অহরহ।

(৭)

কর্ম্ম-সূত্র বাড়ে যত টানে,
জন্ম হ'তে জন্মান্তরে না ফুরায় আয়তন
বপিত যা মায়ার বিধানে।

(৮)

সুখ-আশে ধায় জীবগণ,
মায়ার কারার মাঝে কোথা সুখ পাবে বল
না টুটিলে মায়ার বন্ধন?

(৯)

ভ্রান্ত জীব! ভ্রান্তি পরিহর,
কামনায় বিরচিত কর্ম্ম নহে সুখমূল,
বিসর্জ্জনে সুখ মনোহর।

(১০)

কর্ম্ম হতে নব কর্ম্মোদয়,
জনমে জনম নব, কামনায় অভিভব,
মোহ যাবে কর্ম্ম কর লয়।

-শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী।

শক্তিবল ও কর্ম্মরহস্য।

(বাঁকিপুর পূর্ণিমা সম্মিলনীর চতুর্থ অধিবেশনে পঠিত।)

(১)

ভারতের পুণ্যধাম, তার এই পরিণাম ;
কোন্ দোষে হেন ফল বুঝা নাহি যায়।
শাস্ত্রজ্ঞান ধর্ম্মনীতি কোথা গেল হায় ॥

(২)

নাহি অতীতের সুখ, দেখি দশা ফাটে বুক।
মারীভয় থরা দৈন্যে ভরা এই দেশ !
অপমানে অনশনে নাহি তেজ লেশ ॥

(৩)

হীনতাপ অবর্ষণ, দিবা নিশি ত্রাস্ত মন ;
ব্রাহ্মণের দেবভাব, ক্ষত্রিয়ের বল।
বৈশ্যের বাণিজ্য লাভ গেছে রসাতল ॥

(৪)

নিদারুণ অবসাদে, সকাতরে সদা কাঁদে ;
বঙ্গমাতা ক্রোড়ে বসি অবোধ সন্তান।
আঁখি তমে অন্ধ মুখে শ্যামা নামগান ॥

(৫)

তুমি মা গো আদ্যাশক্তি ! দেহ তব পদে ভক্তি,
সর্ব্বভূত হেতু তুমি তোমাতেই লয়।
সর্ব্ব বর্ণ কালরূপে অবসিত হয় ॥

(৬)

শশী অর্ক বহ্নিনেত্র, ললাট অমৃত ক্ষেত্র ;
ত্রিনয়নী জগজন পালন কারিণী।
রক্তবাস ছলে মাতঃ ! পাপ নিবারিণী ॥

(৭)

বরাভয় করযোগে, ডাক জীবে বিশ্বভোগে,
রজোময় ভূ-কমল তোমার আসন।
সংসার নিয়ন্তৃ তাই নৃমুণ্ড ধারণ॥

(৮)

পান ক'রে মোহ সুরা, ভব মাঝে তব ক্রীড়া,
ভীত শ্রান্ত ভ্রান্ত পাপী তারণ কারিণী!
অমঙ্গল বিনাশিনী জ্ঞানাসিধারিণী॥

(৯)

চৈতন্য সূত্রের দ্বারা, গেঁথেছ মানবে, তারা!
দিয়েছ তাদের তব কণ্ঠেতে আশ্রয়।
কাতরে বিপন্নে দীনে দেহ মা অভয়॥

(১০)

টলিল অজ্ঞান ক্ষেত্র, খুলিল জ্ঞানের নেত্র;
অনন্ত সাহসে তেজে ভারত জাগিল।
শূন্যমার্গে মাতৃবাক্য সকলে শুনিল॥

(১১)

"যবে সৃষ্টি নাশ হয়, জগৎ আঁধারময়;
একসত্য পরব্রহ্ম বিরাজে তখন।
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব শক্তি তাহাতে মগন॥

(১২)

"এক আছি বহু হ'ব", ইচ্ছামাত্রে জাগে সব;
একাধারে তিন ভাব সৃষ্টি স্থিতি লয়।
ঈশ শক্তি মহামায়া ভূত সমুদয়॥

(১৩)

"আত্মা যিনি ব্রহ্ম তিনি, সর্ব্বশক্তিস্বরূপিণী
জগতের মাতা পিতা ভূত হৃদে স্থিত।
প্রকৃতি পুরুষ এক ভিন্ন বিরচিত॥

(১৪)

"অন্তরে প্রতিজ্ঞা কর, শক্তিকে আশ্রয় কর,
ভারতের ভার দূর হ'বে শস্য জল।
ভয় শোক যাবে চলি পাবে কার্য্যফল॥

(১৫)

"জ্ঞানকর্ম্ম দেবভক্তি, কর্ত্তব্যেতে অনুরক্তি;
উদ্ধারের এই পথ মহামূল্য ধন।
চারিবর্গ লাভ হয় মন্ত্রের সাধন॥

(১৬)

"এক জ্যোতি আত্মভাবে, বিশ্বপ্রাণী হৃদে জাগে;
অকপটে ভ্রাতৃভাব করি আলিঙ্গন।
হিংসা দ্বেষ ক্রোধ দ্বন্দ্ব দাও বিসর্জ্জন॥

(১৭)

"বিবিধ কর্ম্মের গুণে, ভারত বিদেশী সনে;
পরস্পর হিত জন্য হ'য়েছে মিলিত।
বিজ্ঞান অধ্যাত্ম দ্বারা হ'বে বিভূষিত॥

(১৮)

"পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ল'য়ে, জন্মভূমি হিত চেয়ে;
শিল্প বাণিজ্যের কর উন্নতি সাধন।
আলস্য ছাড়িয়া হও কর্ত্তব্যে মগন॥

(১৯)

"দেহের উন্নতি করি, নীতিমার্গ অনুসরি;
পবিত্র বীরের ভাব করিতে অর্জ্জন।
কপটতা বাচালতা করহ বর্জ্জন॥

(২০)

"শৈশব বিবাহ কথা, যা'ক উঠে এই প্রথা;
বেদমন্ত্রে কর দৃঢ় বালক শরীর।
ব্রহ্মচর্য্যে দেশহিতে হ'ক তারা স্থির॥

(২১)

"কোমলা বঙ্গের বালা, সহিছে বিষম জ্বালা ;
ঘৃণিত হয়েছে তারা ছার অর্থ তরে।
এ হেন অনার্য্যভাব যায় কোন্ বয়ে॥

(২২)

"ত্যজ বৃথা অভিমান, যায় তাতে যা'ক প্রাণ ;
শিখাও কামিনীকুলে হ'তে দৃঢ় স্থির।
বীরমাতা বীরজায়া বীরভগ্নী ধীর॥

(২৩)

"ঘুচাও সরমকালি, আত্মস্বার্থ দিয়ে বলি ;
ছিন্ন করি পরবশ দুঃখের নিদান।
আত্মগত কর সবে নিজ মন প্রাণ॥

(২৪)

"ভজ পূর্ব্ব ঋষিগণে, যাঁহারা সরল মনে ;
শাস্ত্রালোকে নিত্যপথ করেছে প্রচার।
জ্যেষ্ঠপুত্র তারা মোর আদর্শের সার॥

(২৫)

"জাতীয় কর্ম্মের দোষে, লোকে অপযশ ঘোষে ;
মুর্খ বলে নরগণ নিয়তি অধীন।
অসারেতে মত্ত হ'য়ে বাঙ্গালীরা হীন॥

(২৬)

"অসত্য তাদের বাণী, পুরুষার্থ শ্রেষ্ঠ মানি ;
কর্ম্মদ্বারা প্রাক্তনেরে করহ বিনাশ।
অটল সঙ্কল্প কর, যা'ক উপহাস॥

(২৭)

"হও দয়া ধর্ম্মকেন্দ্র, সাহসেতে সম ইন্দ্র ;
জ্ঞানানলে অহঙ্কার হ'ক ভস্মীভূত।
এক হ'য়ে সত্যপথে চল সবে দ্রুত॥

(২৮)

"কিবা হিন্দু কি যবন, প্রাণ সঁপি কর পণ ;
সাধিতে পরম সত্য বিহিত বিধানে।
কর্ম্মফল সমুদয় দাও ভগবানে॥

(২৯)

"বিবিধ পথেরে ধরি, জগতের নরনারী ;
চলিয়াছে ঈশ্বরের অমল ধামেতে।
সব ধর্ম্ম সুধু এক বিভিন্ন নামেতে॥

(৩০)

"আমার আঁধার পরে, হিম জ্যোতি করে ক'রে ;
চন্দ্রদেব নভোপরে হয়েন প্রকাশ।
সৌভাগ্য আলোকে হবে বঙ্গদুঃখ নাশ॥

(৩১)

"হ'লে দুঃখ পূর্ণ ধরা, দেবঋষি করি ত্বরা ;
নিবেদিয়া নারায়ণে সেবিত চরণ।
তাঁর বরে দুর্ব্বিপাক করিত দমন॥

(৩২)

"কর্ম্মভুমি এ ভারত কার্য্য কর অবিরত ;
শক্তি সিদ্ধি দিব আমি প্রভূত সাহস।
কুতনয়ে হেরি মাতা না হ'ন অলস॥"

(৩৩)

হাসিলেন অট্টহাসি, ব্রহ্মতেজ পরকাশি ;
ভাতিল পরমাশান্তি সবার বদনে।
উঠিল তেজের প্রভা পুরব গগনে।

(৩৪)

ছুটেছে সেথর স্রোত, ভাবে যেন ওতপ্রোত
ভারতের সর্ব্বদেশে নরনারী প্রাণে।
জাতি সব বদ্ধ হল ঋত সত্যটানে॥

শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়।

ভক্তজীবন।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর।)

(৩)

সাধনমার্গে দৃঢ়নিষ্ঠ শিষ্য নৈরাশ্যকে হৃদয়ে স্থান দিবেন না, যেহেতু তাহাতে ভক্তি ও বিশ্বাস শিথিলতা প্রাপ্ত হয়, এবং প্রকৃত জ্ঞানের প্রতিরোধক অশরীরী প্রাণী সমূহ অবকাশ পাইয়া তাহাদের স্বাভিলাষ পূর্ণ করিতে চেষ্টা করে। তাহারাই শিষ্যকে নৈরাশ্যে ফেলিয়া উদ্ভ্রান্ত করিয়া থাকে। সুতরাং এরূপ অবস্থায় আত্মনির্ভরে কোনও ফল নাই; বরং তাহাতে অনেক অনিষ্ট উৎপাদন করে। এই সঙ্কট সময়ে মহাপুরুষদিগের চরণে সম্পূর্ণরূপে আত্মোৎসর্গ করাই শ্রেয়ঃ। শক্রকে পরাস্ত করিতে হইলে, যেরূপ ক্ষেত্র হইতে সে আক্রমণ করে, সেইরূপ ক্ষেত্রযোগ্য বল সংগ্রহ করিয়া তাহার সম্মুখীন হওয়াই প্রয়োজন। এই সকল বিপদ্ জীব হইতে উদ্ভূত নয়, সুতরাং জীব ইহার প্রতীকারে সম্পূর্ণ অসমর্থ। উক্ত প্রাণীসমূহ স্থূল শরীর হইতে মুক্ত, এবং উন্নত শক্তিতে বলীয়ান্। সেইরূপ দৈববল আশ্রয় করিয়া এই দানববলকে পরাভূত করিতে হইবে। অতএব যাহাতে এই ভীষণ বিপদ হইতে মুক্ত হইতে পারি, তজ্জন্য সর্ব্বপ্রথম আমাদের অহং জ্ঞান দূর করিতে হইবে; এবং কায়মনোবাক্যে তাঁহাদের শরণাপন্ন হইতে হইবে।

(৪)

আমাদিগের এই পরাবিদ্যা সভাই হউক, অথবা মহদুদ্দেশ্যে চালিত অন্য কোন সমবেত চেষ্টাই হউক, তাহাদের পরিদর্শন ও পরিচালন ভার আমাদের হইতে জ্ঞানে ও শক্তিতে অত্যুন্নত মহাপুরুষগণ গ্রহণ করিয়া থাকেন। সুতরাং তাহাদের পরিণাম সম্বন্ধে চিন্তা করিবার আমাদের আবশ্যকতা নাই, আমাদিগের ক্ষমতা ও সাধ্যানুযায়ী, যদি আমরা নিরলসভাবে ও মনঃপূত করিয়া স্ব স্ব কর্ত্তব্য পালন করিতে পারি, তাহা হইলেই যথেষ্ট। প্রকৃতির রাজ্যে যেমন প্রত্যেক বস্তুরই এক একটা বিশেষ বিশেষ কার্য্য আছে, প্রত্যেক যন্ত্রেরও প্রত্যেক আগ্রহেরও এই বিশ্বরাজ্যে সেইরূপ এক একটী নির্দ্দিষ্ট কার্য্য আছে। সাধারণতঃ ইহা দ্বারা লোকের মস্তিষ্ক ও মাংসপেশী চালিত হয়। এ পর্য্যন্ত এই পৃথিবীতে যে সমস্ত শারীরিক ও মানসিক উন্নতি

সাধিত হইয়াছে, তাহার মূল কারণ এই যত্ন ও আগ্রহ। এতদুভয়ের সমন্বয়ই উক্ত বিবিধ উন্নতির হেতু। সোপানে আরোহণ করিতে করিতে মানব ক্রমে এরূপ অবস্থায় উপনীত হয় যে, তথায় কার্য্যনিষ্ঠা ও সত্যপ্রিয়তা, যত্ন ও আগ্রহের স্থান অধিকার করে। ইহা হইতে যে দূরদৃষ্টি ও কার্য্যোৎসাহ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা কোনরূপ বাহ্যশক্তি অথবা স্নায়বিক বলদ্বারা লাভ করা যায় না। অতএব সর্ব্বপ্রকার উদ্বেগ ও নৈরাশ্য ত্যাগ করিয়া, সেই সর্ব্ব-জ্যোতির আধারকে হৃদয়ে ধরিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়াই প্রত্যেক মনুষ্যের একমাত্র কর্ত্তব্য।* জগতের মানবকে আপনার করিয়া, ফলাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করিয়া এই শুভ উদ্দেশ্য পথে অগ্রসর হও। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই তুমি এখানে আসিয়াছ।

ঋষিগণ এই ভাবে উপদেশ দিয়াছেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জ্জুনকে এইরূপে প্রবুদ্ধ করিয়াছিলেন। আমরাও এইরূপে আমাদের শক্তির প্রয়োগ করিব। (ক্রমশঃ)

শ্রীমণিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

হিন্দু দর্শন।

দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে হি শব্দব্রহ্ম পরঞ্চ যৎ।

শব্দব্রহ্মণি নিষ্ণাতঃ পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি ॥ ব্রহ্মবিন্দূপনিষৎ। ১৭

শব্দময়ী শ্রুতিবিদ্যা এবং ব্রহ্মবিদ্যা, এই উভয় বিদ্যাকেই জানিতে হইবে। শ্রুতিতে কুশল না হইলে ব্রহ্মবিদ্যায় জ্ঞান সম্ভবে না।

অতঃপর ঋষি উপদেশ দিয়াছেন যে, গুরু ও শাস্ত্র হইতে জ্ঞানচক্ষু লাভ করিয়া তদ্দ্বারা ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার লাভ করিতে হইবে। ইহা কি সম্ভবপর? ঋষি আশার আলোক জ্বালিয়া দিয়াছেন; ঋষি বলেন—ধান্যার্থী মানবগণ তৃণ হইতে ধান্য সংগ্রহ করেন, ধান্য সংগৃহীত হইলে তৃণ পরিত্যক্ত হয়।

* কোন কবি বলিয়াছেন:—

"জগতের সুখমাত্র সুখ আপনার
"আমি জগতের অংশ এ নিঃস্বার্থ জ্ঞান
"যার কর্ম্মমূলে, কর্ম্মফলে কদাচন
"নাহি ক্ষুদ্র স্বার্থ যার, নির্লিপ্ত সে জন।"

শাস্ত্রাভ্যাস ও গুরূপদেশ ব্রহ্মবিদ্যা লাভের ভেলা স্বরূপ। দুগ্ধের অভ্যন্তরে ঘৃত নিগূঢ়ভাবে বিদ্যমান আছে, তদ্রূপ সর্ব্বভূতে বিজ্ঞানময় আত্মা বর্ত্তমান আছেন; মন্থনদণ্ড দ্বারা দুগ্ধকে মথিত না করিলে ঘৃত দেখা দেয় না, শাস্ত্রাভ্যাস ও গুরূপদেশ দ্বারা চিত্তকে মথিত করিয়া স্বচ্ছ না করিলে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হয়ে না।

শাস্ত্র বহুল। সব শাস্ত্র পাঠ করিলেই কি ব্রহ্মবিদ্যা লাভ হয়? এইস্থানে ঋষি একটি উদাহরণ দিয়াছেন। রাখালগণ বিবিধবর্ণের গাভী সকল হইতে যেমন একই শ্বেতবর্ণের দুগ্ধ দোহন করে, তদ্রূপ সর্ব্বশাস্ত্র হইতেই একই ব্রহ্মবিদ্যা নিষ্কাশিত হয়েন।

শাস্ত্র পাঠ করিয়াও যাঁহার ব্রহ্মবিদ্যা লাভ হয় নাই, জানিতে হইবে তাঁহার শাস্ত্রজ্ঞান জন্মে নাই। এইরূপ, হিন্দুদিগের দর্শনশাস্ত্র বিবিধ শাখায় বিভক্ত হইলেও, সকলের উদ্দেশ্যই ব্রহ্ম নিরূপণ। দর্শনশাস্ত্র অভ্যাস করিয়া যিনি ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করেন না, নাস্তিকতার দিকে অগ্রসর হয়েন, জানিতে হইবে তিনি শাস্ত্রবিহিত উপদেশ অনুসারে গুরূপদেশ না লইয়া ও ষট্‌সম্পত্তির অধিকারী না হইয়া অনধিকার চর্চ্চামাত্র করিয়াছেন, প্রকৃত শাস্ত্রাভ্যাস করেন নাই; তিনি বিমানে ছাদ প্রস্তুত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। ৺বিজয়-কৃষ্ণ গোস্বামীকে এক সন্ন্যাসী বলিয়াছিলেন—আস্‌মান্‌মে ছাদ্ কিয়া।

পুরাকালে ব্রহ্মা অথর্ব্বকে ব্রহ্মবিদ্যা বলিয়াছিলেন, অথর্ব্বা সেই ব্রহ্মবিদ্যা অঙ্গির নিকট কীর্ত্তন করেন, অঙ্গি ভরদ্বাজ সত্যবহকে বলেন, ভরদ্বাজ গুরু পরম্পরাগত ব্রহ্মবিদ্যা অঙ্গিরসকে বলেন। মহাগৃহস্থ শৌনক অঙ্গিরসের নিকট শাস্ত্রবিহিত নিয়ম অনুসারে গমন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে ভগবন্! কি বিশেষ বস্তুকে জানিলে সমস্তই জানা হয়, আর কিছু জানিবার অবশিষ্ট থাকে না। যেমন মৃত্তিকাকে জানিতে পারিলে মৃত্তিকার বিকার মৃত্তিকা নির্ম্মিত সমুদয় পদার্থ জানা যায়। যেমন সুবর্ণকে জানিতে পারিলে সুবর্ণ নির্ম্মিত যাবতীয় অলঙ্কারাদি জানা যায়, সেইরূপ কোন্ বিদ্যা জানিলে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি?" অঙ্গিরস শৌনককে বলিলেন—"দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে ইতি হস্ম যদ্‌ব্রহ্মবিদো বদন্তি, পরা চৈবাপরা চ।" মুণ্ডকোপনিষৎ।

বেদজ্ঞ অথবা ব্রহ্মজ্ঞানী (ব্রহ্মবিৎ) পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন দুইটী বিদ্যা শিক্ষনীয়া, একটী পরা ও অপরটী অপরা

অনন্তর ঋষি বিশদভাবে বুঝাইয়া দিতেছেন—ঋক্, যজুঃ, সাম, অথর্ব্ববেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ, জ্যোতিষ এই সকল অপরা বিদ্যা। যদ্দারা 'অক্ষরকে' অর্থাৎ অশব্দ, অস্পর্শ, অব্যয়, কূটস্থ, ধ্রুব, অবিনাশী ব্রহ্মকে জানা যায় তাহার নাম পরা বিদ্যা।

যেমন উর্ণনাভ কারণান্তরের সাহায্য না লইয়া স্বয়ংই স্বীয় দেহাভ্যন্তর হইতে স্বশরীরের অতিরিক্ত তন্তুসমূহকে সৃজন করে ও পুনরায় প্রতিসংহার করে, যেমন জীবিত পুরুষের দেহাভ্যন্তর হইতে কেশ লোমাদি বিনির্গত হয়, যেমন পৃথিবী হইতে ওষধি সকল সম্ভূত হয়, সেইরূপ 'অক্ষর' হইতে এই বিশ্ব উৎপন্ন হইয়াছে। সেই অক্ষরই এই বিশ্বের উপাদান কারণ, যেমন মৃত্তিকা ঘটের উপাদান কারণ। আবার সেই অক্ষরই এই বিশ্বের নিমিত্ত কারণ, যেমন কুম্ভকার ঘটের নিমিত্ত কারণ। এই জন্যই উপনিষদ্ বলেন, যাহা হইতে এই ভূতসমূহ জন্মিয়াছে, যাহাতে ভূতসমূহ জীবিত থাকে ও যাহাতে ভূতসমূহ বিলীন হয় তিনিই পরমাত্মা। (যতোবাইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যস্মিংশ্চ বিলয়ং যান্তি)। উর্ণনাভও তাহার তন্তুজালের উদাহরণ দ্বারা বিশ্বসৃষ্টি ও উপসংহারের প্রক্রিয়া কতক পরিমাণে হৃদ্বোধ হইতে পারে, কিন্তু এই বিশ্ব তাঁহা কর্ত্তৃক জীবিত থাকে কি প্রকারে? উর্ণনাভ ও তন্তুজাল পৃথক্ পদার্থ; একের জীবিতকাল অপরের জীবনকালের উপর, একের বিনাশ অপরের বিনাশের উপর নির্ভর করে না। কিন্তু 'অক্ষর' ও 'বিশ্বের' মধ্যে একটি অচিন্ত্য ঐক্য ভাব দৃষ্ট হয়। সেই ভাবটি কি? একের সত্তাতে অপরের সত্তা, একের অসত্তাতে অপরের অসত্তা। 'অক্ষর' আছেন, এই জন্য বলা যায় বিশ্বও আছে; যদি না থাকেন তাহা হইলে বিশ্বও থাকে না। ইহার নাম 'অন্বয় ব্যতিরেক ন্যায়'; যেমন কার্য্য কারণ,—কারণ সংঘটিত হইলেই কার্য্য সংঘটিত হয়। মহাপ্রভু চৈতন্যদেব, ব্রহ্মের সহিত জগতের এই ভাব বুঝাইতে যাইয়া দর্শনের অচিন্ত্যাভেদাভেদবাদ বুঝাইয়াছেন, অর্থাৎ ব্রহ্ম ও জগৎ অচিন্ত্যরূপে পৃথক্ (ভেদ), আবার অচিন্ত্যরূপে এক (অভেদ)। মহাপ্রভু বলিয়াছেন ব্রহ্ম তিনটী কারক, (১) অপাদান (২)

করণ (৩) অধিকরণ। ব্রহ্ম যখন অপাদান কারক হয়েন তখন জগৎ তাঁহা হইতে উদ্ভূত হয়; করণ কারক থাকা কালীন জগৎ জীবিত থাকে, ব্রহ্ম অধিকরণ কারক হইলে জগৎ তাঁহাতে বিলীন হয়। যদি ব্রহ্মের সত্তা না থাকিলে জগতের সত্তাই সম্ভবে না, তাহা হইলে ব্রহ্মই সব, জগৎ কিছুই নহে। এই সৃষ্টিপ্রপঞ্চ 'একমেবাদ্বিতীয়ং' যদি অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ, অব্যয় ব্রহ্মই সব হইলেন, তাহা হইলে জগৎ কি? জগৎ ব্রহ্মের মাত্রা (তস্য মাত্রা তন্মাত্রং), ব্রহ্ম যতদূর প্রকটীভূত হইলেন জগৎ তাহার সীমা; সুতরাং জগৎ মায়া (মীয়তে ব্রহ্ম অনয়া ইতি)। ব্রহ্ম কি বস্তু তাহা জানিতে হইলে জগৎ কি বস্তু তাহা জানিতে হয়। কারণ অসীম ও অনন্ত ব্রহ্ম, সসীম ও শান্ত হইয়া জগদ্রূপে প্রকটিত হইয়াছেন, সীমাবদ্ধ জগৎ অনন্তের এক কণামাত্র। তজ্জন্যই শ্রীভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন—এই সমগ্র জগৎকে আমি আমার একাংশের দ্বারা ধারণ করিয়া আছি। বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ—গীতা ১০।৪২। ব্রহ্ম কিরূপে প্রকটিত হইয়াছেন, তাহা জানিতে হইলে জগতের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। যেমন উপকথায় ক্ষুধার্ত্ত ব্রাহ্মণ স্নান করিয়া ব্রাহ্মণীদত্ত ঝুলি আগ্রহের সহিত খুলিয়া দেখিতে লাগিলেন "দেখি ব্রাহ্মণী আমার জন্য একটী সন্দেশ দিয়াছে কি না, ব্রাহ্মণী আমার জন্য চিপিটক দিয়াছে কি না ইত্যাদি" সেইরূপ তত্ত্বান্বেষী অনুসন্ধান করিতে থাকেন "দেখি আমার ভগবান্ সঙ্গীত জানেন কি না, চিত্রবিদ্যা জানেন কি না, তাঁহার প্রেম আছে কি না ইত্যাদি।

ব্রহ্ম কি, জগৎ কি, সৃষ্টি কি, সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও পরিণাম কি, পরমাত্মা ও জীবাত্মা কি, জীবাত্মার উদ্দেশ্য কি, আমরা কোথা হইতে আসিয়াছি, কেন আসিয়াছি, কোথায় যাইব, এই সকল বিষয় দর্শনশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়, ইহাই ব্রহ্মসূত্র, বেদান্তসূত্র, ব্রহ্মবিদ্যা ইত্যাদি নামে কথিত হইয়া থাকে। যে প্রণালী দ্বারা ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করা যায় তাহাকে ধর্ম্মশাস্ত্র বলাই সঙ্গত। যেমন উপনিষদের 'একমেবাদ্বিতীয়ং' ও বর্ত্তমান ব্রাহ্মধর্ম্মের 'একমেবাদ্বিতীয়ং' এক অর্থ প্রকাশ করে না, সেইরূপ পূর্ব্বোদ্ধৃত উপনিষদের 'ব্রহ্মবিদ্যা' ও থিওসফি সম্প্রদায়ের 'ব্রহ্মবিদ্যা' তুল্যার্থবাচক নহে।* হিন্দুদর্শনশাস্ত্রের এক নাম 'মোক্ষশাস্ত্র"।

---

* কি বিষয়ে পার্থক্য তাহা বুঝাইয়া দিলে আমরা বাধিত হইব। আমাদের রঙ্গিল চক্ষে পার্থক্য দৃষ্ট হয় না। পং সং।

হিন্দুদর্শনশাস্ত্র ভারতের গৌরব, এমন কি সমগ্র মনুষ্যমণ্ডলীর গৌরব ঘোষণা করিতেছেন। মনুষ্য যুক্তিবলে কতদূর ঊর্দ্ধে উঠিতে পারেন তাহা হিন্দুদর্শনশাস্ত্র দেখাইয়াছেন। ইহার ঊর্দ্ধেও অপর একটী শাস্ত্র আছেন, তাহা অপৌরুষের শাস্ত্র, তাহার নাম শ্রুতি। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম শ্লোকে বাদরায়ণ বলিয়াছেন—'তেনে ব্রহ্ম হৃদা আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ'—স্বপ্রকাশ পরব্রহ্ম আদিকবি ব্রহ্মার হৃদয়ে বেদ বিস্তৃত বা উদ্ভূত করিয়া দিয়াছিলেন, যে বেদ শুনিয়া জ্ঞানিগণ বা দেবগণও মুগ্ধ হয়েন। ধর্ম্ম দুই প্রকার, (১) ভগবান্ স্বয়ং অবতার বা অবতারীরূপে যাহা প্রকাশিত করেন তাহা ভগবৎ প্রকটিত ধর্ম্ম। (২) মানব যুক্তিবলে যে, ধর্ম্ম প্রকাশ করেন তাহা ভগবানের প্রকটিত নহে, সুতরাং অপ্রকাশিত ধর্ম্ম। বাইবেল, কোরাণ, গীতা, ভাগবত প্রভৃতি প্রকটিত ধর্ম্মশাস্ত্র। স্বপ্রকাশ পরব্রহ্ম আদিকবির হৃদয়র মাঝে যে শ্রুতি উদ্ভূত করিয়াছেন সেই শ্রুতি নিত্যা, প্রলয় কালে ব্রহ্মে লীনা থাকেন, প্রলয়াবসানে পুনরায় উদ্ভূতা হয়েন। যুগ-ধর্ম্ম স্থাপনের জন্য অবতারবৃন্দ যে ধর্ম্মশাস্ত্র প্রকটিত করেন তাহা অবিনাশিনী শ্রুতির ছায়ামাত্র। সুতরাং বাইবেল, কোরাণ, গীতা, ভাগবত প্রভৃতি প্রকটিত ধর্ম্মশাস্ত্র প্রকৃত অবতারের মুখ নিঃসৃত কি না তাহার পরীক্ষার স্থল শ্রুতি। কোন প্রকটিত ধর্ম্মশাস্ত্র শ্রুতি বাক্যের বিরোধী হইলে সেই ধর্ম্মশাস্ত্র ও তাহার বক্তা অবতার অপ্রকৃত (false prophet) ও অশ্রেদ্ধেয়। মানুষের যুক্তির ত কথাই নাই। শ্রুতির বিরোধিনী যুক্তি সর্ব্বথা পরিত্যক্তা। শ্রুতির গৌরব হিন্দুদর্শনশাস্ত্রে রক্ষিত হইয়াছে। হিন্দুর ষড়্দর্শনকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়, এক শাস্ত্রপ্রধান, অপর যুক্তি-প্রধান। পূর্ব্বমীমাংসা বা জৈমিনি মুনির মীমাংসা দর্শন এবং উত্তর মীমাংসা বা বেদব্যাসের বেদান্ত দর্শন শাস্ত্র অবতারণা করা হইয়াছে। গোতম ঋষির ন্যায় দর্শন, কণাদ ঋষির বৈশেষিক দর্শন, কপিল মুনির সাংখ্য দর্শন এবং পতঞ্জলি ঋষির যোগ দর্শন যুক্তি-প্রধান, অর্থাৎ যুক্তিবলে প্রতিপাদ্য বিষয় প্রতিপাদন করা হইয়াছে, শাস্ত্র বাক্যকে যুক্তির পোষকতার জন্য যুক্তির অবিরোধ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। কিন্তু কোন দর্শনেই শাস্ত্রকে অশ্রদ্ধা করা হয় নাই। এই জন্য হিন্দুর ষড় দর্শনের সহিত পাশ্চাত্য দেশের মনোবিজ্ঞানের

(Philosophy, Psychology) কোন সংস্রব নাই। হিন্দুর দর্শন, মোক্ষ শাস্ত্র, বা 'ধর্ম্ম শাস্ত্র', পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞান প্রায়শঃই ধর্ম্মশাস্ত্রের বিরোধী"।*

হিন্দুর ষড়্দশনকে সামঞ্জস্য করিয়া সমন্বয় করিতে হইলে এইরূপ দুই শ্রেণীতে বিভাগ করিলে সুফলের আশা করা যায় না। ষড়্দর্শনকে অন্য ভাবে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। তজ্জন্য প্রয়াস পাইবার পূর্ব্বে আমি একটী স্থূল তর্কের অবতারণা করিতেছি। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ মনে করেন যে, হিন্দু-আর্য্যজাতিই জগতের আদিম মানব জাতি, তাহারা 'চাষা' ছিল, শিশু মৃত্তিকায় পড়িয়া গেলে যেমন মৃত্তিকাকেই পদাঘাত করে, সেইরূপ আদ্য-শিশু মানব অগ্নিকে, বরুণকে, সূর্য্যকে, ঝটিকা পবন প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তিকে স্তব করিয়াছে, বেদ 'চাষার' গান। হিন্দু নামধারী মিষ্টার রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ও এই যুক্তির পোষকতা করিতে যাইয়াই বেদের অতি হাস্যজনক অনুবাদ করিয়াছেন, ইহা আমি পরে দেখাইতেছি। আমরা উপরে দেখাইয়াছি যে, হিন্দুর ষড়্দশন বেদের উপর সংস্থাপিত। বেদের অন্তভাগের নাম বেদান্ত বা উপনিষদ্। হা অবোধ মানবসন্তান! তোমরা কি বলিতে চাহ যে, 'চাষার' গানকে ভিত্তিরূপে গ্রহণ করিয়া ষড়্দর্শন রচিত হইতে পারে? তোমাদের যুক্তিই কি প্রকৃত (veritable) 'চাষার' যুক্তি নহে?

ষড়্দর্শনকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। মীমাংসা দর্শনের এক নাম কর্ম্মমীমাংসা, এবং বেদান্ত দশনের এক নাম ব্রহ্মমীমাংসা। মীমাংসা দর্শনের ভিত্তি বেদের কর্ম্মকাণ্ড, বেদান্ত দশনের ভিত্তি বেদের ব্রহ্মকাণ্ড বা জ্ঞানকাণ্ড। জৈমিনি ঋষির লক্ষ্য কর্ম্ম, বেদব্যাসের লক্ষ্য ব্রহ্ম; জৈমিনি কর্ম্মকে প্রাধান্য দিয়া ব্রহ্মপ্রতিপাদক বেদাংশকে অর্থবাদ বলিয়াছেন, বেদ-

---

* Theologies opposed to Theologies; Philosophies opposed to philosophies, and Theology and Philosophy at war with each other. Such is the anarchy in the higher regions. In France and Germany at least, great opposition between Theology and Philosophy openly pronounced. History of Philosophy

ব্যাস ব্রহ্মজ্ঞানকে প্রাধান্য দিয়া কর্ম্ম প্রতিপাদক বেদাংশকে ব্রহ্মপ্রতিপাদনের সহায়রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। জৈমিনি বলেন কর্ম্ম দ্বারাই মানব নিঃশ্রেয়স্ (পরম মঙ্গল বা মুক্তি) লাভ করিতে পারেন, বেদব্যাস বলেন ব্রহ্মজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান লাভ না হইলে শুধু কর্ম্ম দ্বারা নিঃশ্রেয়স্ লাভ করা যায় না। এই জন্য বলা যায় মীমাংসা দর্শন, বেদান্তদর্শন এক জাতীয়। দ্বিতীয় বিভাগ সাংখ্যদর্শন ও যোগদর্শন, এবং তৃতীয় বিভাগ ন্যায়দর্শন ও বৈশেষিক দর্শন। সাংখ্য এবং যোগের দার্শনিক অংশ আপাততঃ অবিরুদ্ধ. এবং ন্যায় ও বৈশেষিকের দার্শনিক অংশ আপাততঃ অবিরুদ্ধ। সাংখ্যদর্শন নিত্যেশ্বর মানেন না, যোগদর্শন নিত্যেশ্বর মানেন, কিন্তু উভয়ের তত্ত্ববাদ ও সাধন প্রণালী অবিরুদ্ধ। ন্যায়দর্শন জগৎকর্ত্তা ঈশ্বর স্বীকার করেন, বৈশেষিক দর্শন 'অদৃষ্ট' স্বীকার করিয়া তদূর্দ্ধে গমন করেন নাই। কিন্তু উভয়ের পরমাণুবাদ ও অন্যান্য অংশ অভিন্ন।

এই বিশ্বরচনার কারণ নির্ণয়ে বহুত্ব হইতে একত্বে উপনীত হওয়াই দর্শন শাস্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য। বেদান্ত দর্শন দেখাইয়াছেন যে জীবজগৎ ও জড়জগৎ একই সূত্রে গ্রথিত, ভেদ কেবল স্থূল দৃষ্টিতে আপাততঃ প্রতীয়মান, প্রকৃতপক্ষে নহে। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও প্রাচ্যদেশীয় হিন্দু পণ্ডিত অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র বসুর সাহায্যে এই মহা সত্য কিছু কিছু ধারণা করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞান ও জড় বিজ্ঞান বেদান্তে দর্শনেস্থ ভূত বিবেচকের অংশ মাত্র, প্রকৃতি পুরুষ বিবেক এখনও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের দৃষ্টির বাহিরেই আছে। উপনিষৎ তারস্বরে বলিতেছেন—

"কো মোহঃ কঃ শোক একত্ব মনুপশ্যতঃ"—এই আপাত প্রতীয়মান ভেদপূর্ণ জগতে যিনি একত্ব উপলব্ধি করিতে পারেন তাঁহার আবার মোহ ও শোক কি?

দর্শন শাস্ত্র সংক্ষিপ্ত সূত্রে বিরচিত। অতি গুরুতর তত্ত্ব সংক্ষিপ্ত ভাবে দুর্ব্বোধ্য সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। সূত্র বোধের জন্য নানাবিধ ভাষ্য অনুভাষ্য, টীকা ও টীপ্পনী আছে। বেদান্তদর্শন বা বেদান্ত সূত্র গুলি চারি অধ্যায়ে বিভক্ত, তাহার এক এক অধ্যায়ে কতকগুলি অধিকরণ আছে, এবং এক এক অধিকরণে কতক গুলি সূত্র আছে। বেদব্যাস বেদান্ত সূত্রের ভাষ্য রচনা করিয়াছেন. সেই ভাষ্যই ভুবন বিখ্যাত—ভক্তের প্রাণধন—শ্রীমদ্ভাগবত।

মীমাংসা দর্শন দ্বাদশ অধ্যায়ে বিভক্ত; তাহার এক এক অধ্যায় কয়েকটী পদে বা উপরি ভাগে বিভক্ত, এক এক পদে বহুবিধ অধিকরণ আছে, এক এক অধিকরণ বহু সূত্রে গ্রথিত। অধিকরণ কাহাকে কহে? সম্পূর্ণ বাক্য বা বিচারিত প্রস্তাব গঠন করিতে বিষয়, সংশয়, পূর্ব্বপক্ষ, উত্তর ও সঙ্গতি, এই পঞ্চ অবয়বের আবশ্যক, এই অবয়ব স্পষ্টই অধিকরণ। মীমাংসা দর্শনের প্রথম অধ্যায়ে প্রমাণ, দ্বিতীয় অধ্যায়ে কর্ম্মভেদ, তৃতীয়ে শেষত্ব, চতুর্থে প্রযুক্তি, পঞ্চমে ক্রম, ষষ্ঠে অধিকার, সপ্তমে সামান্যাতিদেশ, অষ্টমে বিশেষাতিদেশ, নবমে উহ, দশমে বাধ, একাদশে তন্ত্র ও দ্বাদশে প্রসঙ্গ নিরূপিত হইয়াছে। প্রথম অধ্যায় চারিটী পাদে, তন্মধ্যে প্রথম পাদে বিধি, দ্বিতীয়ে অর্থবাদ ও মন্ত্র, তৃতীয়ে বেদমূলক স্মৃতি, শিষ্টাচার এবং চতুর্থ পাদে বিধি বাক্যের 'নামধেয়' অংশের প্রামাণিকতা নিরূপিত হইয়াছে। এই দর্শনের তৃতীয়, ষষ্ঠ ও দশম অধ্যায়ের প্রত্যেকের অষ্ট পাদ এবং অবশিষ্ট অধ্যায় সমূহের প্রত্যেকের চারিটী পাদ আছে। মীমাংসা দর্শনের প্রথম অধ্যায়ে প্রমাণ আলোচিত হইয়াছে, বেদই স্বতঃ প্রমাণ। বেদ দুই ভাগে বিভক্ত, মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ। যজ্ঞাদিতে যাজ্ঞিক আচার্য্যগণ যাহা উচ্চারণ করেন তাহাই মন্ত্র। মন্ত্রভাগ ব্যতীত অপর ভাগের নাম ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণের মধ্যে বিধি, অর্থবাদ প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত। মীমাংসা দর্শন বিপুলগ্রন্থ।

বেদের স্বতঃ প্রামাণ্য হিন্দু ভিন্ন অপরে স্বীকার করেন না, সুতরাং হিন্দু ভিন্ন অপর জাতীয় লোকের দর্শন শাস্ত্রে বা মোক্ষ শাস্ত্রে অধিকার নাই।* হে মানব! যদি মুক্তি কামনা কর তাহা হইলে কর্ম্মভূমি ভারতবর্ষে হিন্দু হইয়া জন্মগ্রহণ কর। ব্রহ্ম পুরাণ বলেন—

"পৃথিব্যাং ভারতং বর্ষং কর্ম্মভূমিরুদাহৃতা।
ন অন্যত্র মর্ত্তানাং ভূমৌ কর্ম্ম বিধীয়তে॥

পৃথিবীর মধ্যে ভারতবর্ষই কর্ম্মভূমি, ভারত ভিন্ন অন্য কোন স্থানে কর্ম্মের বিধান নাই। (ক্রমশঃ)

শ্রীজানকীনাথ পাল শাস্ত্রী বি, এল।

---

* এত ভেদজ্ঞান আমরা অনুমোদন করি না। কর্ম্মভূমি ভারত কি Geographical India

পং সং।

আধ্যাত্মিক জীবনের নিয়ম।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

২। মহত্তর প্রজ্ঞা।

'নিয়ম' বলিতে কি বুঝি, তাহা আমরা পূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি। আধ্যাত্মিক জগতে যে নিয়ম আছে এবং তাহা জানিবার জন্য, জ্ঞানের আবশ্যক, তাহাও বলা হইয়াছে। এক্ষণে আমাদের দ্বিতীয় আলোচ্য বিষয়টী দেখা যাউক। স্থূল জাগ্রত চৈতন্য ব্যতিরেকে যে আরও মহত্তর প্রজ্ঞা আছে এবং উহা ধর্ম্মগ্রন্থের সাহায্য ব্যতিরেকে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের দ্বারা যে প্রমাণিত হইতে পারে, অধুনা তাহাই আমাদের আলোচ্য বিষয়।

এ বিষয় দুই প্রকার বিভিন্ন ভাবে দেখা যাইতে পারে (১) সনাতন প্রথা, যাহা আমাদের দেশে অতি প্রাচীন সময় হইতে চলিয়া আসিতেছে ও (২) পাশ্চাত্য প্রথা। প্রথমোক্ত ভাবে দেখিতে গেলে একই চৈতন্য বিভিন্ন উপাধিগত হইয়া বিকাশিত হইতেছে এবং যতই সূক্ষ্ম হইতে স্থূল উপাধিতে প্রকাশমান্ হইতেছে ততই উক্ত চৈতন্যের বিকাশ সীমাবদ্ধ ও ক্ষুদ্রায়তন বিশিষ্ট হইতে হইয়াছে। কিন্তু কেবল এই ভাবে দেখিলে চলিবে না; কারণ আজকাল পাশ্চাত্যবিজ্ঞান আমাদের দেশে এতই বিস্তৃতি ও প্রাধান্য লাভ করিয়াছে ও ইহার এমন কুহক আছে যে, আমাদের সনাতন প্রথা অনুসারে কোন বিষয়ের সরল ও প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা করিলেও আমাদের বোধগম্য হয় না; অথচ ঐ বিষয়টী পাশ্চত্য বৈজ্ঞানিক ভাষায় ব্যক্ত করিলে আমরা অনায়াসেই উপলব্ধি করিতে পারি। সুতরাং পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের আলোকে আমাদের উক্ত বিষয়টী অগ্রে আলোচনা করা আবশ্যক। তৎপরে সনাতন প্রথায় বিষয় বলিলে চলিবে।

যদিও প্রাশ্চাত্য প্রদেশে জড়বাদীর সংখ্যাই বেশী ও জড়বিজ্ঞানের চর্চ্চাই অধিক, তথাপি তাহাদিগের মধ্যে আজকাল একটা পরিবর্ত্তন দেখা যাইতেছে; তাহারা ক্রমশঃ স্থূলমস্তিষ্ক দ্বারা বিকশিত প্রজ্ঞা ব্যতিরেকে আরও যে একটা স্থূলের বহির্ভূত মহত্তর প্রজ্ঞা আছে তাহা বিস্ময়সহকারে মানিয়া

লইতে বাধ্য হইতেছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে এ বিষয় লইয়া ঘোর আন্দোলন ও বাদানুবাদ চলিতেছে; বৈজ্ঞানিকগণও এ বিষয়ে গবেষণা করিতেছেন এবং একটা স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার জন্য ও ইহাকে কোন পরিচিত নিয়মান্তর্গত করিবার জন্য যন্ত্রাদির দ্বারা পরীক্ষা করিতেও ত্রুটী করিতেছেন না। তাঁহারা জড়বিজ্ঞানের সাহায্যে যে সকল পরীক্ষা Experiment করিতেছেন, তাহার ফলে আমাদের দেশে চিরপ্রচলিত যোগাভ্যাসের দ্বারা মহত্তর প্রজ্ঞার উপলব্ধিরূপ ফলে উপনীত হইতেছেন। এ স্থলে আমাদের দেশের ও প্রাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞানের আলোচনা প্রণালী সম্বন্ধে যে কি প্রভেদ তাহা বলা আবশ্যক। আমাদের দেশে 'আত্মা'কে অবলম্বন করিয়া তৎপরে ভিন্ন ভিন্ন সূক্ষ্ম কোষসমূহে তাহার ক্রিয়া অবলোকন করতঃ স্থূল শরীরের ক্রিয়া তাহা হইতে নির্ণয় Deduce করা হইয়াছে। পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞানের প্রণালী ঠিক ইহার বিপরীত। ইহা প্রথমে সর্ব্ব-নিম্নস্থিত উপাধিকে অর্থাৎ স্থূল শরীরকে, তৎপরে ইহার চৈতন্যকে উপলব্ধি করতঃ ধীরে ধীরে উচ্চস্তরে আরোহণ করিতেছে। এই প্রকার স্থূল আলোচনা করিতে করিতে তাঁহারা স্থূল শরীরের সাধারণ অবস্থা অতিক্রম করিতে বাধ্য হইয়াছেন। তাঁহারা অবশেষে কৃত্রিম উপায়ে, এ দেশের বহুদিন হইতে পরিচিত বিভিন্ন একপ্রকার প্রজ্ঞাশক্তি প্রকাশ করিয়াছেন; এবং যদ্দ্বারা এ সমুদয় নূতন বিস্ময়কর ঘটনাবলীর কারণ নির্ণয় করা যায়, এমন একটা মত Theory বাহির করিবার জন্য অতিশয় ব্যগ্র হইয়া ইতস্ততঃ অন্ধকারে ধাবমান্ হইতেছেন বা ঢিল মারিতেছেন ও অপরিস্ফুট ভাষায় ব্যক্ত করিতে প্রয়াস পাইতেছেন। যদ্যপিও পাশ্চাত্যবিজ্ঞানবিদ্‌গণের এ সুদীর্ঘ পন্থা অতীব বিচিত্র এবং বিশেষ আশাপ্রদ নহে, তথাপি উহা সেই পুরাতন ঋষিপ্রদর্শিত লক্ষ্য স্থলের দিকেই অগ্রসর হইতেছে, ইহা সৌভাগ্যের বিষয়।

সুতরাং পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকদিগের মত সর্ব্বাগ্রে আলোচনা করা আবশ্যক। জাগ্রত চেতনা সম্বন্ধে বোধ হয় অধিক বলা বাহুল্য, কারণ আমরা নিত্য দৈনিক জীবনে যে সকল ঘটনা—অর্থাৎ মনোবৃত্তির পরিচালনা ও মানসিক ভাবের বা বাসনা প্রভৃতির পরিচালনা—যাহা আমরা সর্ব্বদাই দেখিতে থাকি, এই গুলির সমষ্টি জাগ্রত প্রজ্ঞার ক্রিয়া।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা উপরোক্ত মানসিক ক্রিয়ার ঘটনাগুলি মস্তিষ্ক ও স্নায়ুমণ্ডলীর সাহায্যে আলোচনা করিতে লাগিলেন। মনের সহিত শরীরের কি সম্বন্ধ তাহার প্রতি তাঁহারা বিশেষ লক্ষ্য রাখিলেন। পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে শরীর তত্ত্ব ব্যতিরেকে যে যথার্থ মনোবিজ্ঞান হইতে পারে এ বিষয় ধারণা ছিল না। তাঁহাদের মতে সর্ব্বপ্রথমে শরীরের তত্ত্ব জানা আবশ্যক; মস্তিষ্ক ও স্নায়ুমণ্ডলীর কার্য্য প্রণালী লক্ষ্য করতঃ তাহার নিয়ম ও ক্রিয়ার হেতু নির্ণয় করা আবশ্যক। ক্রমশঃ এগুলি অবগত হইলে মানসিক ক্রিয়াসমূহের, চিন্তাশক্তি প্রভৃতির, কার্য্যকলাপ বুঝিতে পারা যাইবে। সুতরাং শরীরতত্ত্ব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অবগত না হইলে যথার্থ মনোবিজ্ঞান সম্ভবপর নহে। কিন্তু অধুনা শীর্ষস্থানীয় পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বোধ হয় এই মত সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করেন না। যাহা হউক এই শারীরবিজ্ঞানের পন্থা অবলম্বন করা সত্ত্বেও তাঁহারা অতীব বিস্ময়কর ফল লাভ করিয়াছিলেন। কেহ যদি যথার্থ জিজ্ঞাসু হইয়া কোন বিষয় জানিতে চাহে প্রকৃতি তাহাকে বিফলমনোরথ করেন না; প্রকৃতির নিয়মই এই।

জাগ্রত চেতনা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে করিতে পণ্ডিতগণ দেখিলেন যে, মনুষ্যে প্রজ্ঞা কেবলমাত্র জাগ্রত অবস্থাতেই আবদ্ধ নহে। নিদ্রিত অবস্থাতেও চেতনার বিলোপ হয় না। সুতরাং তাঁহারা স্বপ্নাবস্থার লক্ষণ বিশ্লেষণ ও বিভাগ দ্বারা এ প্রকার কার্য্যপ্রাণালী অবলোকন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বহুসংখ্যক ঘটনা একত্রীকরতঃ শৃঙ্খলাবদ্ধ করিতে প্রয়াস পাইলেন। আলোচ্য বিষয়ের বহির্ভূত অনেক ঘটনা তাঁহারা বর্জ্জন করিতে না পারায়,এতাদৃশ প্রয়াস সত্ত্বেও তাদৃশ সন্তোষজনক ফল লাভ করিতে সমর্থ হন নাই। কখন কখন শারীরিক কোন যন্ত্রের বিশৃঙ্খলতা বশতঃ স্বপ্নের উৎপত্তি হইতে লাগিল, কখনও বা অতিভোজন হেতু বা অজীর্ণতা বশতঃ স্বপ্নের সৃষ্টি হইতে লাগিল। সুতরাং তাঁহারা এ গুলিকে পৃথক্ করিতে চেষ্টা করিলেন। ক্রমশঃ তাঁহারা একটী নূতন উপায় উদ্ভাবন করিলেন। স্বপ্নের লক্ষণ সমূহ বিষদ্রূপে আলোচনা করিবার জন্য তাঁহাবা স্বেচ্ছাক্রমে উদ্ভব কৃত্রিম নিদ্রায় বা Trance বা মোহ বা সমাধির সৃষ্টি করিলেন। এ উপায়ে বিশিষ্টরূপে নির্দ্দিষ্ট ঘটনা ক্ষেত্রে (Test Condition) স্বপ্নের সৃষ্টি

করিলেন। উহা কোন প্রকার শারীরিক যন্ত্রের বিকৃতি প্রসূত নহে এবং স্বেচ্ছানুসারে উৎপন্ন করা সম্ভবপর, সুতরাং একই প্রকার অবস্থায় কেহ নিদ্রার সৃষ্টি হইলে সূক্ষ্মচৈতন্যের আলোচনার বিশেষ সুবিধা হইল।

সম্মোহন বিদ্যা (Hypnotism) দ্বারা কি প্রকারে কৃত্রিম নিদ্রাবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং নিদ্রাভিভূত ব্যক্তি স্বপ্নাবস্থায় স্থূল বিষয়ের বহির্ভূত অনেক ঘটনা বর্ণনা করে, এ সমুদয় ঘটনা পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা করতঃ গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। যদ্যপি কেহ এ সকল বিষয়ে বিশেষ বিশেষ ঘটনাগুলি জানিবার জন্য কৌতূহল পরবশ হয়েন, তবে তিনি এ সকল বিষয়ে যে গ্রন্থ আছে সে গুলি পাঠ করিলেই বিষদ্‌রূপে জানিতে পারিবেন।

এই সব পুনঃ পুনঃ পরীক্ষিত ও দৃষ্ট ঘটনাবলীর দ্বারা কি তত্ত্ব নির্ণীত হইয়াছিল তাহা দেখা যাউক। তাঁহারা পরীক্ষার ফলে দেখিলেন যে, এ প্রকার শারীরিক অবস্থায় স্বাভাবিক চিন্তাশক্তির পরিচালনা অসম্ভব অর্থাৎ যখন মস্তিষ্ক আলস্যপূর্ণ ও জড়ভাবাপন্ন, রক্তের সঞ্চালনও অল্প এবং রক্তও দূষিত হয় এবং এরূপ অবস্থায় সাধারণতঃ চৈতন্যের জড়ত্ব প্রাপ্তি হয়, সে অবস্থায় তাঁহারা এক অভাবনীয় ফলে উপনীত হইলেন। তাঁহারা দেখিলেন যে, মস্তিষ্কে দূষিতরক্ত সঞ্চয়হেতু জড়তার সহিত মনোবৃত্তি সমূহের ক্ষমতা হীনপ্রভ হওয়া দূরে থাকুক বরং তাহারা অতিশয় প্রখর, প্রবলতর, সূক্ষ্মতর এবং সর্ব্বতোভাবে সজীব হইয়া উঠে। তাঁহারা আরও আশ্চর্য্যজনক বিষয় দেখিলেন যে, এরূপ কৃত্রিম নিদ্রাবস্থায় (trance) স্মৃতিশক্তি অত্যন্ত পরিবর্দ্ধিত হয়; এমন কি অতি শৈশব কালের বিস্মৃত ঘটনা সকলও স্মৃতিপটে জাগরূক হয়। কেবলমাত্র স্মৃতি শক্তি নহে; বিবেক, তর্কশক্তি ও বিচারশক্তি প্রভৃতি মানসিক বৃত্তিসমূহ অতিশয় প্রবল হইয়া উঠে; শুধু তাহা নহে তাহাদের পরিচালনা অপেক্ষাকৃত সহজেই সম্পাদিত হয় এবং বিশেষ ফলদায়ক হয়। যখন আমাদের বাহ্যেন্দ্রিয় গভীর নিদ্রাহেতু নিষ্ক্রিয় থাকে, তখন তাহাদের ক্রিয়া অতি সুচারুরূপে সাধারণ ইন্দ্রিয় ব্যতীত অন্য কোন সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ের দ্বারা হইতে থাকে। এই প্রকার মোহাবস্থায় তীব্র বৈদ্যুতিক আলোক প্রভাবেও চক্ষু উন্মীলন হয় না বটে, কিন্তু তখন সেই চক্ষু জাগ্রত অবস্থার দৃষ্টির সীমার বহির্ভূত অতিশয় দূরবর্ত্তী পদার্থ সমূহ অবলোকন করে এবং

পুস্তক বন্ধ রাখিলেও তাহা অনায়াসে পাঠ করে এবং এমন কি মাংস ভেদ করিয়া শরীরাভ্যন্তরে দৃষ্টিক্ষেপ করতঃ অস্থিমজ্জাগত দুরারোগ্য রোগ সমূহের যথাযথ বর্ণন করে। শ্রবণেন্দ্রিয় সম্বন্ধেও এই প্রকার। জাগ্রতাবস্থায় যে সমুদয় শব্দ সূক্ষ্মতা ও দূরতাহেতু আমাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করে না, তন্ময়াবস্থায় সে সকল ধ্বনি অতিশয় নিকটস্থ প্রতীয়মান হয় এবং সুদূরে জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন শুনিতে পারা যায়। এই প্রকার সকল ইন্দ্রিয়ই প্রখরতা ও আপেক্ষিক অধিকতর নিপুণতা লাভ করে।

উপরোক্ত ঘটনানিচয় মনুষ্যকে বিস্ময়াভিভূত করে এবং স্বতঃই প্রশ্ন-সকল হৃদয়ে উত্থিত হয়। চক্ষুরিন্দ্রিয় ব্যতীত দর্শন হয়, শ্রবণেন্দ্রিয় ব্যতীত শ্রবণ হয় এবং স্মৃতিশক্তির জড়াবস্থায় স্মরণ পথ খুলিয়া যায় এবং বিচারশক্তির যন্ত্রের (মস্তিষ্ক) অবসাদ সত্বেও উহা সম্যক্ কার্য্যকরী হয়—এ কোন চেতনাশক্তি? ইহার স্বরূপ কি? ইহা কোন্ উপাধিগত হইয়া উপরোক্ত বিস্ময়কর কার্য্য করিতে সক্ষম হয়?

তৎপরে তাঁহারা আর একটা নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করিলেন। কেবল-মাত্র এই প্রকার মোহাবস্থায় (trance) যে এরূপ বিস্ময়কর ঘটনা হয়, তাহা নহে; তাহারা দেখিলেন যে, তন্ময়তা বা সমাধি যতই গভীর হয় চেতনাও সেই পরিমাণে উন্নত হয়। অগভীর সামান্য (trance) তন্ময়তা, কেবল মানসিক বৃত্তিগুলির প্রখরতা বৃদ্ধি করে। সমাধি যত গভীর হয়, চেতনার বিকাশও তদনুরূপ পরিস্ফুট হইয়া থাকে। এই প্রকার পৃথক পৃথক ঘটনার সমষ্টিদ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, মানবের কেবলমাত্র এক প্রকার প্রজ্ঞা আছে তাহা নহে; তাহার চেতনাশক্তির বিভিন্ন কার্য্যহেতু চেতনাও বিবিধ। তাঁহারা একটী মূঢ়া কৃষক রমণীকে লইয়া ঐ বিষয় পরীক্ষা করেন। জাগ্রতাবস্থায় সে অতিশয় স্থূলবুদ্ধি ও নির্বোধ ছিল। সম্মোহন বিদ্যাদ্বারা তাহাকে নিদ্রাভিভূত করিয়া দেখা গেল যে, সেই অবস্থায় তাহার বুদ্ধি প্রাখর্য্য লাভ করিয়াছে; এবং আরও আশ্চর্য্যের বিষয় ইহা দেখা গেল যে, সে তাহার জাগ্রত অবস্থার প্রজ্ঞাকে ঘৃণাসহকারে দেখিতে লাগিল; এবং তাহার দৈনিক কার্য্যা-বলীর সমালোচনা করিতে লাগিল; এবং উহার পরিচ্ছিন্নতা ও সঙ্কীর্ণতার বিষয় ঘৃণার সহিত বর্ণনা করিতে লাগিল এবং জাগ্রত জীবকে "সে মূঢ়-জীব"

(That creature) প্রভৃতি রূঢ় বাক্য প্রয়োগ করিতেও কুণ্ঠিত হইল না।

সমাধি যতই গভীরতা লাভ করিল, যতই সুষুপ্তাবস্থা প্রাপ্ত হইতে লাগিল ততই একটী উচ্চতর প্রজ্ঞা দেখা গেল। সেই ধীর, গম্ভীর ও গরীয়সী প্রজ্ঞা পূর্ব্ববিকশিত উভয় প্রকার অসম্পূর্ণ ("জাগ্রত" ও "স্বপ্ন") প্রজ্ঞার ক্রিয়াসমূহ সমালোচনা করতঃ তাহার দোষাবলী আলোচনা করিতে লাগিল। এইরূপ ঐ কৃষক রমণীর ভিতর প্রজ্ঞার ত্রিবিধ অবস্থা দেখা গিয়াছিল এবং সমাধি যতই গভীর হইয়াছিল, প্রজ্ঞার বিকাশও তত উচ্চতর হইয়াছিল।

আরও একটী বিচিত্র ব্যাপার দেখা গেল। জাগ্রত অবস্থায় ঐ কৃষক রমণী তাহার দ্বিতীয় বা তৃতীয় প্রকার প্রজ্ঞার বিষয় কিছুই জানিত না। জাগ্রত অবস্থায় ঐ সকলের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত সে জানিত না। দ্বিতীয় প্রজ্ঞাটী (স্বপ্ন) জাগ্রত চেতনাকে জানিত, কিন্তু তদুপরিস্থিত উচ্চতর প্রজ্ঞাকে জানিত না। তৃতীয় প্রজ্ঞাটী (সুষুপ্তি) নিম্নস্থিত দুই প্রজ্ঞাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিত, কিন্তু তদুপরিস্থিত কোন উচ্চতর প্রজ্ঞা সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ ছিল।

এই ব্যাপার হইতে সিদ্ধান্ত হইল যে কেবলমাত্র জাগ্রত অবস্থার অতীত কোন উচ্চতর প্রজ্ঞা আছে এমন নহে, স্থূল উপাধিগত ও সীমাবদ্ধ প্রজ্ঞা মহত্তর প্রজ্ঞাকে নিজের অসম্পূর্ণতাহেতু উপলব্ধি করিতে পারে না। মহত্তর ও উচ্চতরস্থিত প্রজ্ঞা তদপেক্ষা নিম্নতরস্থিত প্রজ্ঞাকে জানিতে পারে, কিন্তু নিম্নস্তরস্থিত প্রজ্ঞা উচ্চতরস্থিত প্রজ্ঞাকে কোনমতে উপলব্ধি করিতে পারে না। সুতরাং নিম্নপ্রজ্ঞা উচ্চের অস্তিত্ব না জানিলে উচ্চের অস্তিত্ব হানি প্রমাণ হয় না। উচ্চ প্রজ্ঞার অস্তিত্বের বিরুদ্ধে নিম্ন প্রজ্ঞার স্থূল উপাধিগত দোষসমূহ আপত্তি স্বরূপ ব্যবহৃত হইতে পারে না। কারণ নিম্ন প্রজ্ঞা নিজের স্থূল উপাধিবশতঃ উচ্চের অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারে না। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের অনুসন্ধানের ফলে যে সমুদয় বিষয় সিদ্ধান্ত হইয়াছে তন্মধ্যে উপরে কয়েকটী বিষয় লিখিত হইল।

এক্ষণে আমরা এই বিষয়ই অন্য ভাবে আলোচনা করিব। জড়বাদীদের মধ্যে কেহ কেহ মস্তিষ্কের গঠনপ্রণালী যত্নসহকারে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিয়া ইহা নির্ণয় করিয়াছেন যে, কোন প্রকার মস্তিষ্কবিশেষে

অসাধারণ ক্ষমতার বিকাশ সম্ভবপর হয়। তাঁহাদের মতে নিদ্রা বা trance মস্তিষ্কের গঠন বা অবস্থা প্রসূত। এ প্রকার জড়বাদীদের মত ও Lombroso লম্ব্রোসো নামক জনৈক খ্যাতনামা ইটালী নিবাসী বৈজ্ঞানিক এক কথায় যে মত দিয়াছেন তাহা একই প্রকার। লম্ব্রোসোর মতে প্রতিভাশালী ব্যক্তির মস্তিষ্ক বিকৃত ও অস্বাভাবিক। তাঁহার মতে প্রতিভা ও উন্মত্ততার নৈকট্য সম্বন্ধ আছে; যে মস্তিষ্ক অসাধারণ শক্তির উপাদান, সে স্থলে উহা বিকৃত এবং উহার স্বাভাবিক পরিণাম উন্মত্ততা। লম্ব্রোসোর মতাবলম্বীদের পূর্ব্বেও এ প্রকার ভাব যে প্রচলিত ছিল তাহা আমরা কবিবর সেক্ষপীয়রের (Shakespeare) গ্রন্থে দেখিতে পাই, যথা—

"Great wits to madness near allied"

অর্থাৎ অতিশয় ধীসম্পন্ন ব্যক্তিগণের উন্মাদের সহিত বিশেষ সৌসাদৃশ্য আছে।" যদ্যপি লম্ব্রোসোর মতাবলম্বীরা এই উক্তিকে বেশী দূর টানিয়া লইয়া না যাইত, তবে কেবলমাত্র এই সামান্য উক্তি তত ক্ষতিজনক হইত না। তাহারা এই মতকে যেরূপ স্থূল ব্যবহার করিয়াছে তাহাতে সর্ব্বপ্রকার আধ্যাত্মিক জীবনের ঘটনাবলীর মূলে কুঠারাঘাত করা বা ভীষণ শাণিত অস্ত্রস্বরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। এই মতাবলম্বীরা তাহাদের সিদ্ধান্ত কেবল স্থূল শরীরতত্ত্বের উপর স্থাপন করিয়াছে। তাহারা বলেন যে, যখন মস্তিষ্ক সাধারণ মস্তিষ্কের বহির্ভূত কোন অসাধারণ বিষয়ের উপলব্ধি করে তখন উহা অসাধারণ ভাব (abnormal) ধারণ করে। এ মত প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে তাহারাও এক ধাপ উপরে উঠিল এবং বলিল "আধ্যাত্মিক জীবনে যে সব অলৌকিক ঘটনাবলী দৃষ্ট হয় তাহার কারণ নির্ণয় অতি সহজ। ধর্ম্মপুস্তকে উল্লিখিত বা আধ্যাত্মিক জীবনে সংঘটিত বিস্ময়কর ঘটনাবলী—যথা বিস্ময়কর স্বপ্ন, অতীন্দ্রিয় বিষয় দর্শন বা শ্রবণ প্রভৃতি সাধারণ মানবের অননুভূত বিষয় সম্বন্ধে ইহা বলা যাইতে পারে যে, যে কোন অলৌকিক দৃশ্য দেখে বা শুনে সে বিকৃতমস্তিষ্ক, সে অসুস্থ বা ব্যাধিগ্রস্ত; ঋষিই হউক আর মুনিই হউক সে বিকৃত মস্তিষ্ক। মুনিঋষিদিগের আধ্যাত্মিক জীবনের যে সমুদয় অভিজ্ঞতা, অতীন্দ্রিয় সূক্ষ্মজগতের অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রমাণ বা সাক্ষ্যতা এ সমুদয় স্বকপোলকল্পিত এবং বিকৃত ও অনিয়মিত পরিচালিত মস্তিষ্কহেতু বিকৃতমনঃপ্রসূত স্বপ্নমাত্র। ইহা অলীক ও অবিশ্বাস্য।"

ধার্ম্মিকগণ ও আস্থাবান্ ব্যক্তিরা এই প্রকার উক্তিতে চমকিত হইলেন এবং এ মতকে কি প্রকারে খণ্ডন করিবেন তাহা ভাবিয়া আকুল হইলেন। পূতমনা পূজ্যপাদ সিদ্ধ মহর্ষিগণের বিরুদ্ধে এই অপবাদ শ্রবণ করিয়া তাঁহারা স্তম্ভিত ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। যে ব্যক্তিরা পুণ্যাত্মা ঋষিদিগের জীবনের অতীন্দ্রিয় ঘটনাসমূহকে স্নায়ুবিকারের ফল বলিয়া এবং তাঁহাদিগকে স্নায়ুপীড়াক্রান্ত বলিয়া উড়াইয়া দেয়, এতাদৃশ মূঢ়গণের বিরুদ্ধে কি উত্তর করিবেন তাহা ভাবিয়া ঠিক্ করিতে পারিলেন না। এ কটূক্তি মানবের চিরপোষিত আশার মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছে বলিয়া প্রতীতি জন্মে এবং সর্ব্বজনবিদিত সূক্ষ্মজগতের অস্তিত্বের প্রমাণ স্বরূপ ঋষিদিগের উক্তি সমুদয় বাতুলতামাত্র বলিয়া একেবারে উড়াইয়া দিতেছে।

জড় বৈজ্ঞানিকদিগের এই নির্ভীক উক্তির বিরুদ্ধে যে কিছু বলিবার নাই, এমন নহে। ইহার প্রতিবাদ সহজেই করা যাইতে পারে। মোটামুটি একটী প্রত্যুত্তর এই দেওয়া যাইতে পারে যে, মানিয়া লওয়া যাউক যে ঐ মতই সম্পূর্ণ সত্য, স্বীকার করা যাউক যে, পৃথিবীর সমুদয় প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিগণ—কি ধর্ম্মে, কি বিজ্ঞানে, কি সাহিত্যে—সকল ক্ষেত্রেই বিকৃতমস্তিষ্ক ও স্নায়ুবিকারগ্রস্ত—তাহাতে ক্ষতি কি ?

যখন আমরা, কোন ব্যক্তি জগতের কি হিতসাধন করিয়াছেন বিচার করি, তখন তাঁহার মস্তিষ্কের অবস্থার দ্বারা নির্ণয় করি না; পরন্তু উক্ত ব্যক্তির ক্রিয়া কতটা মানবহৃদয়স্পর্শী, জনসাধারণের উপর কতটা প্রভাব বিস্তার করিয়াছে এবং কতদূর প্রজ্ঞাপ্রদ এবং মানবের ক্রিয়াকলাপের উপর কি সুফল প্রসব করিয়াছে এই সব বিষয়ের দ্বারা উক্ত ব্যক্তির মূল্য অবধারণ করিয়া থাকি। যদ্যপি প্রতিভাশালী ব্যক্তিতে ও উন্মাদে প্রভেদ না থাকে, যদ্যপি ঈশ্বর দর্শন বা দেবদেবী সন্দর্শন বা মহাত্মাদর্শন বিকৃতমস্তিষ্কধারা কোন বস্তু সংযোগে ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলেই বা ক্ষতি কি ?

তাঁহারা জগতকে যাহা দিয়াছেন তাহাই তাঁহাদের কর্ম্মের মূল্যের মানস্বরূপ। এমন দেখা গিয়াছে সাধুসঙ্গে অনেকের জীবনস্রোত সম্পূর্ণরূপে ফিরিয়া গিয়াছে। এই পরিবর্ত্তনের কারণ নির্ণয় করিতে গিয়া কি, ঐ সাধুর মস্তিষ্ক বিকৃত বলিয়া আমরা ক্ষান্ত হইয়াছি ? যদ্যপি তাহাই

হয়, তবে সাধুর বিকৃতি ভাব সাধারণ ব্যক্তির স্বাস্থ্য অপেক্ষা সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ; এবং প্রতিভাশালীর অতিশয় অনিয়মিতরূপে পরিশ্রান্ত মস্তিষ্ক জগৎসমক্ষে সাধারণ মানবের সুস্থ মস্তিষ্ক অপেক্ষা সহস্রগুণে মূল্যবান্। দেখা যাউক ইঁহারা জগৎকে কি প্রদান করিয়াছেন। যাহা কিছু ধ্রুবসত্য, যাহা মানবকে সদ্‌বিষয়ে প্রয়াস করিতে প্ররোচনা বা উত্তেজনা করে এবং যাহা কিছু ঈশ্বর হইতে মানব পর্য্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে, যাহা কিছু দুঃখের সময় মানবকে সান্ত্বনা প্রদান করে এবং যাহা মানবকে ভীষণ মৃত্যুভীতি বিভীষিকা হইতে রক্ষা করে ও যাহা আমাদের স্বরূপ অবস্থা, আমাদের অমরত্ব ও নিত্যমুক্ত স্বভাব অবগত করায়, এ সমুদয় এই প্রকার স্নায়ুপীড়াক্রান্ত ব্যক্তিসম্ভূত। তোমরা শারীরতত্ত্ব অধ্যয়ন করিতে এ প্রকার মস্তিষ্ক কি নামে অভিহিত কর, তাহাতে আমাদের কি যায় আসে? ফলতঃ যাহারা জগৎকে এই প্রকার ধ্রুবসত্য শিখাইয়াছেন যদ্দ্বারা।মানব সর্ব্বদা অনুপ্রাণিত হইতেছে তাঁহাদিগকে আমরা ভক্তিভাবে বন্দনা করি।

লম্‌ব্রসো মতাবলম্বীদিগের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় উত্তর—এই যে, উহাদিগের উক্তি কতদূর সত্য তাহা দেখা যাউক। শারীরিক অবস্থা সম্বন্ধে তিনি, Lombroso যাহা বলিয়াছেন তাহা কতকটা সত্য; সুতরাং তাহা মানিয়া লইতে হানি নাই, এবং উহা হওয়া কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নহে, পরন্তু উহা স্বাভাবিক। অধুনা মানব ক্রমোন্নতির স্তরে যেস্থানে উপনীত হইয়াছে তাহাতে সাধারণ মানবের মস্তিষ্ক সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ ব্যাপারেই বিশেষ পটু। ঘোর সংসারিক ব্যাপারে, ক্রয় ও বিক্রয়, শঠতা ও প্রবঞ্চনা করিতে,দুর্ব্বলের উপরে বল প্রয়োগ করিতে, নিঃসহায়কে পদদলিত করিতে, এ প্রকার মস্তিষ্ক বিশেষ উপযোগী। এ প্রকার জনসাধারণের মস্তিষ্ক স্থূল জীবন সংগ্রামে ও তুচ্ছ সাংসারিক ব্যাপারেই লিপ্ত থাকে। কিন্তু মহত্তর প্রজ্ঞার বিকাশ এরূপ অখাদ্য-পরিপুষ্ট, ইন্দ্রিয়ের-দাসভূত এবং স্বার্থপরতার ও নিষ্ঠুরতার কারণস্বরূপ মস্তিষ্কের দ্বারা হওয়ার আশা দুরাশা মাত্র। আধ্যাত্মিক জগতের সূক্ষ্ম স্পন্দনে যে এ প্রকার মস্তিষ্ক অবিচলিত থাকিবে, তাহা আর বিচিত্র কি? এ প্রকার মস্তিষ্ক ক্রমোন্নতি পথের অতীত অবস্থার পরিণামব্যঞ্জক, সুতরাং কেবলমাত্র অতীতের লব্ধ উন্নতি ইহাতে পরিস্ফুট হইয়া থাকে। ক্রমোন্নতিমার্গে স্থূল প্রজ্ঞার

বিকাশরূপ কার্য্য মাত্র এরূপ স্থূল মস্তিষ্ক দ্বারা সাধিত হয়। অতীতের ক্ষেত্রে মানব প্রজ্ঞা যে সকল স্থূল শক্তি সংগ্রহ করিয়াছে, এ মস্তিষ্ক কেবল সেই শক্তি সকলের প্রকাশ ক্ষেত্র। কিন্তু তাহা দ্বারা ভবিষ্যতের উন্নতি প্রকাশিত হইতে পারে না।

কিন্তু অন্য প্রকার যে সকল মস্তিষ্ক সূক্ষ্মতর স্পন্দন অনুভব করিতে পারে তাহাদের বিষয় কি? এ গুলি ভবিষ্যতের আশাস্থল এবং ক্রমোন্নতির সোপানে যাহা ক্রমশঃ হইবে তাহারই অভিব্যঞ্জক; কেবল অতীতের ফলস্বরূপ নহে। যাহারা ক্রমোন্নতির সোপানে অগ্রণী হইয়াছে তাহাদের সূক্ষ্মতর ও উন্নত স্বভাব সাধারণ স্থূল জগতের স্পন্দনে এতদুপযোগী মস্তিষ্কের তুলনায় অতি সহজেই সামঞ্জস্য বা সাম্যভাব হারাইয়া ফেলে। তাহাদের মস্তিষ্ক যে সূক্ষ্মতর বিষয় উপলব্ধি করিতে পারে এই কারণেই তাহারা যে স্থূল জগতের ব্যাপারে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িবে ইহাই যথেষ্ট কারণ।

এ বিষয় আলোচনা করিতে হইলে দুই প্রকার বিভিন্ন অবস্থা বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে—যথা (১) যাহাদের মস্তিষ্ক স্বভাবতঃই অত্যুন্নত এবং অতীন্দ্রিয় বিষয় উপলব্ধি করিতে সক্ষম। কিন্তু সামান্য কারণেই উহার সাম্য-চ্যুতি হয়। প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণের আধ্যাত্মিক জীবনে ব্যাপৃত বা শিল্প, সাহিত্যে কার্য্যকারী—মস্তিষ্ক এই উপাদানে গঠিত। (২) সাধারণ মস্তিষ্ক অতি তীব্র বাসনা বশে কখন কখন অস্বাভাবিকরূপে সূক্ষ্মানুভূতি করিতে সক্ষম হয়, সুতরাং অল্পাধিক অসামঞ্জস্য ভাব ধারণ করে। ঈদৃশ মস্তিষ্কযুক্ত ব্যক্তিরাই সাধারণ ধর্ম্মজীবনে সূক্ষ্ম দ্রষ্টা "mystic or seer." বলিয়া পরিচিত।

প্রথমোক্ত ব্যক্তিগণ স্বভাবতঃ সুস্থ ও তাহাদের মস্তিষ্ক কোন প্রকার ব্যাধিগ্রস্ত নহে, কিন্তু উহা নিম্ন সাংসারিক ব্যাপারোপযোগী নহে এবং সামান্য দৈনিক জীবনের কার্য্যে উদাসীন। কোন ভয়ানক ঘটনায় সহজেই তাহাদের মস্তিষ্কে গোলমাল উপস্থিত হয়, সুতরাং তাহারা প্রায়ই খিটখিটে স্বভাবাপন্ন ও অধীর হয় এবং অল্পাধিক কারণে তাহাদের সাম্যচ্যুতি ঘটিয়া থাকে। অপেক্ষাকৃত স্থূলতর উপাদানে গঠিত ও অল্প উন্নত এবং বিকার সত্বেও সহজে পুনঃ স্বকীয় অবস্থা গ্রহণে তৎপর সাধারণ মস্তিষ্ক অপেক্ষা এতাদৃশ সূক্ষ্ম এবং জটিল স্নায়ব জালযন্ত্রযুক্ত মস্তিষ্কের সহজেই সাম্যচ্যুতি হয়। এবম্বিধ মনুষ্যের মস্তিষ্ক ক্রমো-

ন্নতির সঙ্গে স্বীয়াবস্থাচ্যুত হইলে উহা পুনঃ প্রাপ্তির ক্ষমতা ও স্থৈর্য্য বা সাম্য লাভ করিতে সক্ষম হয়; কিন্তু অধুনা ইহা সহজেই সাম্য হারাইয়া ফেলে।

উপরোক্ত দ্বিতীয় প্রকার ব্যক্তিগণ স্বভাবতঃ সূক্ষ্ম স্পন্দন অনুভব করিতে অনুপযুক্ত। কিন্তু তাহাদের মস্তিষ্কও কেবল বল প্রয়োগপূর্ব্বক সূক্ষ্ম বিষয় অনুভব করার উপযোগী করা যাইতে পারে। বলপ্রয়োগ হেতু উহার প্রকাশ হেতুভূত যন্ত্রের বিশেষ বিপর্য্যয় হয় এবং তাহার ফলে স্নায়বিক পীড়া আনয়ন করে। প্রবল অনুরাগ বা আধ্যাত্মিক জীবন লাভ করিবার আত্যন্তিক ইচ্ছা, দীর্ঘকালব্যাপী উপবাস এবং ঈশ্বর প্রার্থনা বা বাস্তব পক্ষে যে কোন ক্রিয়া যাহাতে স্নায়ুসমূহের উপরে জোর পড়ে, এ সমুদয় ক্ষণকালের জন্ম স্থূল মস্তিষ্ককে সূক্ষ্ম জগতের স্পন্দনের অনুভূতির উপযোগী করে সন্দেহ নাই, এবং এরূপ অবস্থায় অনেক সূক্ষ্মাবস্থায় দর্শন হয় এবং অনেক অসাধারণ ঘটনা ঘটিয়া থাকে। স্থূলের অতীত যে এক সূক্ষ্ম চৈতন্য আছে তাহা ক্ষণকালের নিমিত্তও নিজেকে বিকাশ করিবার জন্ম অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্মতর উপাধি প্রাপ্ত হয়। কিন্তু ঐ প্রকার সূক্ষ্মস্নায়ুবিশিষ্ট মস্তিষ্ক হইতে পূর্ব্বোক্ত প্রকার সূক্ষ্ম দৃষ্টির সৃষ্টি হয় না। উহা সূক্ষ্ম জগৎ হইতে আসে। তবে এই প্রকার সূক্ষ্মোপাদানবিশিষ্ট মস্তিষ্ক স্থূল জগতে জাগ্রত চেতনাবস্থায় ঐ সূক্ষ্ম বিষয় স্থূল মস্তিষ্কে অঙ্কিত করিবার জন্য উপযোগী অবস্থা প্রাপ্ত হয় মাত্র। এরূপ স্থলে Hysteria বা মূর্চ্ছা প্রভৃতি বায়ু রোগ বা অন্যান্য স্নায়বিক পীড়া প্রায়ই এই সব অসাধারণ বলপ্রয়োগ বা ঘটনার আনুসঙ্গিকরূপে ঘটিয়া থাকে।

যে স্থলে ক্রমোন্নতির রহস্য যথার্থ হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে এবং উহা প্রকৃত জ্ঞানসহকারে পরিচালিত হয়, সে স্থলে এই প্রকার সূক্ষ্ম বা অতীন্দ্রিয় পদার্থ অনুভূতির জন্ম রোগগ্রস্ত হইতে হইবে, এমন কোন কথা নাই। কিন্তু প্রায়ই অধিকাংশ স্থলে যাহারা ক্রমোন্নতির স্তরে অতি নীচে অবস্থিত এবং প্রায়ই সাধনাবিহীন, অন্তর্দৃষ্টি ব্যবহারে অভ্যাসশূন্য বা আত্মজ্ঞানরহিত, জীবের চৈতন্য কি প্রণালীতে ক্রিয়া করিয়া থাকে সে-সকল তত্ত্বজ্ঞান রহিত, এবং সাধারণ সাংসারিকজীবনে নিমজ্জমান, তাহারা যে স্থূল জগতের অন্যান্য ব্যক্তি অপেক্ষা নির্ব্বোধ হইবে এবং তাহাদিগের উচ্চ জীবনের আস্থা

হেতু দৈনিক জীবনের প্রতি বিশেষ অমনোযোগী হইবে তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় বা অস্বাভাবিক নহে।

এ প্রকার বিপদ যে কেন ঘটে তাহার একটা স্থূল দৃষ্টান্ত লইয়া দেখা যাউক। একটা তন্ত্রী যখন শিথিল থাকে তখন বাজাইলে তাহা হইতে কোন প্রকার মধুর সংগীতধ্বনি নিঃসৃত হয় না, কিন্তু তারটী টানিয়া রাখিলে এবং বাজাইলে উহা হইতে সুমধুর আওয়াজ বাহির হইবে। যখন তার এই প্রকার টান থাকে তখনই কেবল ইহা হইতে এই প্রকার মধুর সুললিত তান নির্গত হইতে পারে। এরূপ উচ্চসুরে বাঁধিলে সুমধুর গীতধ্বনি নির্গত হইবে সত্য, কিন্তু তারগুলি ছিন্ন হইবার আশঙ্কাও আছে। আমাদের মস্তিষ্কও অনেকটা তারের যন্ত্র স্বরূপ। শিথিল অবস্থায় স্থূল জগতের মোটা ও নিম্ন গ্রামের সুর ব্যতীত অন্য কিছু নির্গত হয় না। ইহা স্বর্গীয় সুধামাখা সংগীতে বাজিয়া উঠে না, কারণ স্নায়ব উপাদানের শিথিলতাবশতঃ ইহার সুর নাই। সাধারণ মস্তিষ্কের স্নায়ব পদার্থ যখন কোন তীব্র বাসনা বা অনুরাগ বা অন্য কোন প্রকার বল প্রয়োগ হেতু উত্তেজিত হয় এবং উচ্চসুরে বাঁধা হয় তখনই ইহা সূক্ষ্ম জগতের দ্রুত স্পন্দনে ধ্বনিত হইতে থাকে। এই প্রকারে জোর করিয়া উচ্চ সুরে মস্তিষ্ক বাঁধিতে গেলে স্নায়বিক উত্তেজনা নিবন্ধন Hysteria প্রভৃতি স্নায়বিক রোগ প্রকাশ পায়। কিন্তু ইহা এই উচ্চ সুরে বাঁধা হেতু সূক্ষ্মজগতের দ্রুতস্পন্দনে ধ্বনিত হইবার উপযোগী হয়। মহত্তর প্রজ্ঞা বা আধ্যাত্মিক জীবনের বিকাশ জন্য স্নায়বিক পদার্থ উচ্চসুরে বাঁধা আবশ্যক ইহা একটা নিমিত্ত কারণ বা অবস্থা। ইহা না হইলে সূক্ষ্ম বিষয় স্থূল উপাধিতে ক্রিয়া করিতে পারে না। যদ্যপি এ বিষয়টী আমরা বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি তাহা হইলে ধর্ম্মজীবনের অনুভূত ঘটনাবলীর বিরুদ্ধে Lombroso মতাবলম্বীদের আক্রমণ একেবারে হীনবীর্য্য ও অন্তঃসারশূন্য বলিয়া বোধ হয়। সাধারণ লোকের মস্তিষ্ক সূক্ষ্মজগতের স্পন্দন অনুভবের উপযোগী নহে; সুতরাং উহার পক্ষে ব্যাধি বা স্নায়ুবিকৃতি খুবই সম্ভব; পরন্তু স্বাভাবিক বলিতে হইবে। উহাকে উচ্চসুরে বাঁধিতে হইবে, বিশুদ্ধ ও পরিমার্জ্জিত করিতে হইবে; তবে উহা সূক্ষ্ম জগতের সূক্ষ্ম স্পন্দনের উপযোগী হইবে, নতুবা নহে। আমাদের অধুনা যে প্রকার ক্রমোন্নতি হইয়াছে এবং যে প্রকার কলুষিত ব্যাপার সমূহে

পরিবেষ্টিত রহিয়াছি, যে প্রকার অপবিত্র সংস্পর্শে আছি এবং নানা প্রকার বিঘ্নকর শত্রুপুরীতে বাস করিতেছি ইহাতে আমাদের সূক্ষ্মজগতের স্পন্দন অনুভবের অনুপযোগী মস্তিষ্ক জোর করিয়া উচ্চ সুরে বাঁধিতে গিয়া স্থূল জগতের স্পন্দনের অনুপযোগী হইয়া নিয়ন্তাবাপন্ন হইবে; এবং পার্থিব মোটা সুরের মধ্যে যে একটু 'বে-সুরো' বাজিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

এতদূর পর্য্যন্ত আমরা মহত্তর প্রজ্ঞা সম্ভব কি না, তাহা পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের আলোকে আলোচনা করিয়াছি। পূর্ব্বে যে সনাতন প্রথার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে অধুনা সেই ঋষিপ্রদর্শিত প্রথা আলোচনা করা আবশ্যক।

আমাদের দেশে দূরদর্শী মনীষীগণ উক্ত বিপদাশঙ্কা বুঝিয়াই তাহার ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং কি প্রকারে ঐ বিপদ্‌কে বাঁচাইয়া চলিতে হইবে এবং উহা অতিক্রম করিতে হইবে তাহার উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। প্রাচীন দার্শনিকগণ এক অজ, অমর বা অবিনাশী আত্মা স্বীকার করিয়াছেন এবং কি প্রকারে ক্রমশঃ সূক্ষ্ম উপাধি হইতে স্থূল উপাধিতে আত্মা আবদ্ধ হন এবং কি প্রকারে যথাক্রমে নিজের কার্য্যোপযোগী কোষরূপ যন্ত্র গঠন করেন তাহা বিবৃত করিয়াছেন। আত্মা স্বীয় মনোময় ক্রিয়া বাহ্যজগতে পরিস্ফুট করিবার জন্য মনোময় কোষ নির্ম্মাণ করেন; যাহাতে কামনা বা বাসনা প্রভৃতি বাহ্যজগতে অভিব্যক্ত হইতে পারে—সে জন্য "কামরূপ" কোষ গ্রহণ করেন এবং স্থূল জগতের কার্য্য করিবার জন্য স্থূলশরীর বা অন্নময় কোষ গ্রহণ করেন। আমাদের দেশের মনোবিজ্ঞান একই চৈতন্য মানিয়া লইয়াছেন এবং ইহার আবশ্যকোপযোগী বিকাশহেতুভূত দেহ বা কোষ-নির্ম্মাণ করিবার ক্ষমতা ইহাতে আরোপ করিয়াছেন।

কি প্রকারে কোষ সমূহ গঠন করিলে উচ্চজীবনের বিকাশোপযোগী হয়, এক্ষণে তাহা দেখা যাউক। ধীরে ধীরে তাহাদিগকে সংস্কৃত ও পরিমার্জ্জিত করিতে হইবে এবং উচ্চ জীবনের আয়ত্তাধীন করিতে হইবে। সে জন্য ঋষিপ্রদর্শিত মার্গে ধ্যান একটী প্রকৃষ্ট উপায় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু যদি কেহ এক জীবনেই সমধিক উন্নতি লাভ করিতে আকাঙ্ক্ষা করিতেন, তবে তাঁহাকে অন্ততঃ কিয়দ্দিবস সংসারের কলুষিত বা দূষিত সংস্কার

হইতে নিভৃত অরণ্যে বাস করার বিধি ছিল এবং এই উপায়ের দ্বারা সহজেই অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। এই উপায়ের দ্বারা তিনি বাহ্য জগতের কলুষিত পঙ্কিল সংস্পর্শ হইতে দূরে অবস্থিতি হেতু উহার দূষিত ভাব তাঁহার নিকটে পৌঁছিত না; সুতরাং সংসারিক ব্যাপারের স্থূল ও তীব্র স্পন্দনের দ্বারা বিচলিত হওয়ার আশঙ্কা খুব কম ছিল। তিনি এই প্রকারে পবিত্র অরণ্যে বা পুণ্যভূমে ধ্যানযোগ অভ্যাস করিতেন। মনের ঐকান্তিক একাগ্রতার দ্বারা ও ক্রমশঃ ইন্দ্রিয়সমূহের ও নিম্নবৃত্তি সমূহের সংযম দ্বারা এবং উচ্চের সহিত স্থির ঐক্যরূপ ঐকান্তিক যোগাভ্যাস দ্বারা মস্তিষ্ককে উচ্চস্থুরে বাঁধিতেন এবং বিশুদ্ধ করিয়া লইতেন। ঐকান্তিক ইচ্ছা নিবন্ধন চেতনাশক্তি উপর হইতে স্থূল মস্তিষ্কের উপর ক্রিয়া করিত এবং ধীরে ধীরে নিরাপদে উহাকে আরও উচ্চতর স্থুরে বাঁধিয়া লইত। তৎপরে ঐ চেতনাশক্তি নিম্নস্থিত যন্ত্রকেও উপরে উঠাইয়া লইবার চেষ্টা করিত; ক্রমশঃ ইহা নিম্ন স্থূল জগতের স্পন্দন রহিত হইত। সম্মোহন বিদ্যা দ্বারা যেমন কৃত্রিম উপায়ে বহির্জগতের স্পন্দন অনুভব রহিত করা যায়, সেই প্রকার যোগাভ্যাসের ইন্দ্রিয়সমূহের ক্রিয়া হইতে চৈতন্যকে পৃথক্ করিতে পারিলে তদনুরূপ বহির্জগতের অনুভূতি লোপ হয়।

ইন্দ্রিয়ের কার্য্যসমূহ হইতে মনকে নির্মুক্ত করার পর, মনোবৃত্তি সমূহকে নিশ্চল করিতে হইত। মনঃস্থির হইলে নীচের স্থূলস্পন্দনে কম্পিত হইত না, সুতরাং স্থৈর্য্য হেতু সূক্ষ্ম জগতের স্পন্দন গ্রহণ করিতে সক্ষম হইত। মন যখন অচল ও স্থির শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিত, এবং কোন বাসনা মনের স্থৈর্য্য বিনাশ করিতে পারিত না এবং যেমন স্বচ্ছ সরোবর বাত্যাহত না হইলে প্রশান্ত মূর্ত্তি ধারণ করে সেইরূপ মনের প্রশান্ত অবস্থাতে আত্মার ছায়া মনের ক্ষেত্রে নিপতিত হইত। তখনই মনের এরূপ প্রশান্ত ও স্থির অবস্থাতে, ইন্দ্রিয়সমূহের নীরব অবস্থাতে মানুষ আত্মার স্বরূপ সেই মহীয়সী ও গরীয়সী শক্তি বুঝিতে পারিত। ইহা পূর্ব্বোক্ত সনাতন প্রথা। এক্ষণে ঐ বিষয় ঋষিপ্রদর্শিত মার্গে কি ভাবে দেখা হইয়াছে তাহা বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক। অতীন্দ্রিয় জ্ঞান লাভ বা উচ্চতর প্রজ্ঞার বিকাশ করিতে হইলে মস্তিষ্কে কিরূপ পরিবর্ত্তন আবশ্যক, কি রূপেই বা ইহাকে পরিশোধিত ও ইহার উন্নতি সাধন করিতে হইবে; এবং কিরূপে ইহার সহিত উপরস্থ

সূক্ষ্ম যন্ত্র সকলের সন্ধিস্থল গুলি গঠন করিতে হইবে তাহা অবগত হওয়া আবশ্যক। এ প্রকার যোগমার্গ বা আত্মতত্ত্বসাধন মার্গ অবলম্বন করিলে, মস্তিষ্কের উন্নতি সাধনের উপায় কি? (১)—শারীরিক পবিত্রতা (২)—শারীরিক সংস্কার ও স্থূল মস্তিষ্কের স্নায়বিক তন্তুরূপ উপাদানের বিস্তৃতি ও উন্নতি। এই দুইটী সর্ব্বপ্রথমে আবশ্যক। যতদিন পর্য্যন্ত আমরা ইন্দ্রিয়ের দাস থাকিব, ততদিন পর্য্যন্ত সাংসারিক সুখের বাসনা আমাদের মনকে বিচলিত করিবে, যতদিন পর্য্যন্ত দেহ অসংযমিত থাকিবে ততদিন পর্য্যন্ত আমাদের মানসপটে আত্মার ছায়া নিপতিত হইবার উপযোগী হইবে এ কথা যেন স্বপ্নেও ভাবি না। দেহকে নিয়ন্ত্রিত করিতে আমাদের শিক্ষা চাই; ইহাকে যথারীতি আহার নিদ্রা ব্যায়ামের দ্বারা আমাদের সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন করা চাই। শরীরকে সুস্থ রাখিতে হইলে যাহা কিছু ইহার স্বাস্থ্যের হেতুকর তাহা অবশ্য ইহাকে দিতে হইবে; কিন্তু তাই বলিয়া যেন আমরা শরীরের বশীভূত না হইয়া পড়ি। এ টুকু যেন আমরা বিস্মৃত না হই যে, শরীর আত্মার কার্য্যভূত, সুতরাং দেহ উহার বশীভূত ভৃত্যস্বরূপ হওয়া চাই। যোগাভ্যাসকারীর আহার বিহারের নিয়ম সম্বন্ধে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় ৬ষ্ঠ অধ্যায়, ১৬ শ্লোকে বলিয়াছেন;—

"—হে অর্জ্জুন! অতিভোজীর যোগ হয় না, একান্ত অনাহারীরও হয় না, অতি নিদ্রালু ব্যক্তিরও হয় না ও অতি জাগরণশীলেরও হয় না।" মাত্রা কোন দিকেই যেন অতিরিক্ত না হয়। "সর্ব্বং অত্যন্তং গর্হিতং" অতিরিক্ত কিছুই ভাল নহে। শরীরকে কষ্ট দেওয়া বা পীড়ন করা উচিত নহে, কারণ ইহা সাধনের প্রধান অঙ্গস্বরূপ "শরীরং আদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনং"। কিন্তু অপর পক্ষে শরীরের এমত বশ হওয়া উচিত নহে যে, সে আপনাকে প্রভু বলিয়া মনে করে। যদি কেহ এই মার্গ অবলম্বন করে তবে তাহার মস্তিষ্ক বিকৃত না হইয়াও সাম্যচ্যুত না হইয়াও সূক্ষ্ম বিষয় গ্রহণ বা অনুভূতি করিতে সক্ষম হয়; স্বাস্থ্যের হানি না করিয়াও সূক্ষ্ম বিষয় ও আধ্যাত্মিক ব্যাপার উপলব্ধি করিতে পারে। আমরা যেন বিস্মৃত না হই, যে সূক্ষ্ম বিষয় অনুভব করিতে যোগী অত্যন্ত সুদক্ষ, অথচ তাহার মস্তিষ্ক সর্ব্বতোভাবে সম্পূর্ণরূপে বিকারশূন্য।

শরীরকে এই প্রকারে বশীভূত এবং পরিশোধিত করিলে ইহাকে আমরা

উচ্চসুরে বাঁধিতে পারি এবং স্বর্গীয় সুমধুর সঙ্গীত শ্রবণ করায় উপযোগী করিতে পারি; কিন্তু এজন্য আমাদের নিম্ন বিষয়ে অনাস্থা হওয়া এবং বহির্জ্জগতের আকর্ষণের প্রতি বিমুখ ও উদাসীন হওয়া আবশ্যক। উচ্চতর প্রজ্ঞা স্থূল জগতে প্রকাশমান্ করিতে হইলে আমাদের বৈরাগ্যাভ্যাস বা অনাসক্তি এটী বিশেষ প্রয়োজন। যতদিন আমরা তুচ্ছ বহির্জ্জগতের পদার্থে আকৃষ্ট হইব ততদিন আমাদের উচ্চতর প্রজ্ঞা এ শরীরকে স্বীয় উপাধি-স্বরূপ বিবেচনা করিয়া এই ক্ষেত্রে কার্য্য করিতে পারিবে না। যদ্যপি আমরা উচ্চতর প্রজ্ঞাকে স্থূলজগতে প্রতিভাত করিতে ইচ্ছা করি, তবে আমাদের ভগবানে ঐকান্তিকী ভক্তি চাই এবং বিশিষ্ট জ্ঞানসহকারে মনের ও ইন্দ্রিয়-সমূহের উৎকর্ষতা সাধন করিতে হইবে; সুতরাং এই ঋষিপ্রদর্শিত মার্গে চলা চাই। আমাদের জীবন পবিত্র ও আচরণ শুদ্ধ হওয়া চাই; জীবে দয়া ও কোমলপ্রাণ হওয়া আবশ্যক; আমাদের চতুর্দ্দিকে সকল বস্তুতেই আত্মাকে দেখিতে শেখা চাই। কি সুন্দর, কি কুৎসিৎ, কি উচ্চ, কি নীচ, কি দেবতা, কি উদ্ভিদ সমুদয় বস্তুতেই একই আত্মার বিকাশ দেখিতে শেখা চাই। "যিনি সর্ব্বজীবে আত্মাকে দেখেন এবং আত্মাতে সর্ব্ববস্তু দেখেন তিনিই যথার্থদর্শী।" (ক্রমশঃ)

শ্রীশিশির কুমার ঘোষাল, এম, এ।

হিন্দুর শ্রাদ্ধতত্ত্ব।

হিন্দু চিরকালই ধর্ম্মপরায়ণ। হিন্দুর বিশ্বাস যে, ইহলোক ব্যতীত পরলোক আছে এবং ইহলোকে অনুষ্ঠিত কর্ম্মনিচয় পরলোকের গতি নিরূপিত করে। মানব সপ্ততত্বাত্মক। ইহ লোকের কর্ম্মের দ্বারাই, ক্রমে ক্রমে এই সপ্ত তত্ত্বের এবং সপ্ততত্বাত্মক মানবের জ্ঞান পরিস্ফুট হয় ও চরমে তত্বজ্ঞান লাভ করিয়া মানব মুক্ত হয়—জরা মরণের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করে এবং আত্মারাম হইয়া নিত্যসুখের অধিকারী হয়। হিন্দুর বিশ্বাস জড়দেহ নশ্বর, জড়দেহাতীত অতীন্দ্রিয় অন্তর্জ্জগতে বাসোপযোগী আরও কয়েকটী দেহ আছে। এই দেহ সকলের পরিশুদ্ধি সাধন করিতে পারিলে পরিশেষে সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরম দেবকে জানিতে পারা যায়। এই উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্যই হিন্দুর সকল

বিধানেই ধর্ম্মানুষ্ঠান—স্বপ্রীতির পরিবর্ত্তে পরপ্রীতিসাধন—অপার স্বার্থান্বেষণ স্থানে সংযম ও ব্রত-নিয়ম ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। এই জন্যই ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুর সর্ব্ব কর্ত্তব্যানুষ্ঠানই ধর্ম্মসংশ্লিষ্ট,—আহার, বিহার ইত্যাদি সমস্তই ধর্ম্মানুশাসিত। এই জন্যই হিন্দু আবহমানকাল এক নিয়মে, এক উদ্দেশ্যে অচল অটলভাবে শাস্ত্রোপদিষ্ট পথে চলিয়া আসিতেছে। ইহাই হিন্দুর হিন্দুত্ব। হিন্দুর বিশ্বাস যে, প্রত্যেক মানব একপ্রাণে অনুপ্রাণিত হইয়া প্রকৃতির হস্তে লালিত পালিত হইতেছে। বিশ্বমাতা প্রকৃতির ক্রোড়ে শায়িত থাকিয়া স্নেহবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া মায়ের অতুল সৌন্দর্য্য, অতুল সম্পদ সন্দর্শন করিয়া থাকে। জননী কখনও ক্রোধ বচনে, কখন বা মধুরভাবে সন্তানকে স্বধর্ম্মে রাখিয়া সন্তানের জ্ঞান বৃদ্ধি সাধন করিয়া থাকেন। সন্তান জ্ঞানবিকাশে, মায়ের অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইবার উপযোগী হয়। এই জন্যই হিন্দু চিরকালই মায়ের চরণে, প্রকৃতির নিকট, অশেষ বিধায়ে ঋণী। অপ্রস্ফুট-জ্ঞান হিন্দু-সন্তান প্রথমে যাহা অজ্ঞানবশে, কষ্টকর বোধ করে,—শৈশবে শাস্ত্রধর্ম্মানুবর্ত্তন তাহার পক্ষে যেরূপ দুর্ব্বিসহ বোধ হয়, জ্ঞানের সম্যক্ স্ফুরণে তাহাই আবার সুখকর হয়, এবং আহ্লাদ সহকারে তাহা অনুসরণ করে এবং ধর্ম্ম কর্ম্ম সমস্তই ভগবদুদ্দেশে উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত হয়। ভগবদুদ্দেশে সর্ব্ব কামনার উৎসর্গের নামই কামবিজয়। ইহাই নিষ্কাম ধর্ম্ম। এই জন্যই উক্ত হইয়াছে,—

"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে।

তুমি মদ্গতচিত্ত মদ্ভক্ত ও মদ্‌যজ্ঞানুষ্ঠায়ী হও এবং আমাকে নমস্কার কর, আমাকেই প্রাপ্ত হইবে। ইহা আমি তোমার নিকট সত্যপ্রতিজ্ঞা করিতেছি; কেন না তুমি আমার প্রিয়।"

* গৃহীর পাঁচটী উৎসর্গ বিহিত আছে। শাস্ত্রে যে পঞ্চ অথবা পঞ্চ যজ্ঞের কথা উল্লেখ আছে তাহাই উৎসর্গ। ভগবান্ মনু বলিয়াছেন;—

বৈবাহিকেঽগ্নৌ কুর্ব্বীত গৃহ্যং কর্ম্ম যথাবিধি।
পঞ্চযজ্ঞবিধানঞ্চ পক্তিঞ্চান্বাহিকীং গৃহী॥ (৩অ—৬৭)
পঞ্চসূনা গৃহস্থস্য চুল্লী পেষণ্যুপস্করঃ।
কণ্ডনী চোদকুম্ভশ্চ বধ্যতে যাস্তু বাহয়ন্॥ (৩অ—৬৮)

গৃহী, বিবাহাদিতে যথাবিধানে গৃহোক্ত ক্রিয়াকলাপ, পঞ্চযজ্ঞের বিধি অনুসারে বিশ্ব দেবাদির অনুষ্ঠান ও প্রাত্যহিক সম্পাদনীয় পাকক্রিয়া করিবেন।

চুল্লী, পেষণী, সম্মার্জ্জনী, উদূখল, (মূষল) ও জলকুম্ভ এই পঞ্চ সূনা আপন আপন কার্য্যে যোজিত হইলে তদ্দারা যে জীব হিংসা হয়, গৃহী সেই সমস্ত পাপে লিপ্ত হইবেন। এই পঞ্চ ঋণের মধ্যে—

> অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণং।
> হোমো দৈবো বলির্ভৌতো নৃযজ্ঞোঽতিথি পূজনং॥ (৩য়-৭০)
> পঞ্চৈতান্ যো মহাযজ্ঞান্ ন হাপয়তি শক্তিতঃ।
> স গৃহেঽপি বসন্নিত্যং সূনা দোষৈর্ন লিপ্যতে॥ (৩য়-৭১)
> দেবতাতিথিভৃত্যানাং পিতৃণামাত্মনশ্চ যঃ।
> ন নির্ব্বপতি পঞ্চনামুচ্ছ্বসন্ন স জীবতি॥ (৩য় ৭২)
> অহুতঞ্চ হুতঞ্চৈব তথা প্রহুতমেব চ।
> ব্রাহ্ম্যং হুতং প্রাশিতঞ্চ পঞ্চযজ্ঞান্ প্রচক্ষতে॥ (৩য়-৭৩)
> জপোঽহুতো হুতোহোমঃ প্রহুতো ভৌতিকোবলিঃ।
> ব্রাহ্ম্যং হুতং দ্বিজাগ্র্যার্চ্চা প্রাশিতং পিতৃতর্পণং॥ (৩য়-৭৪)

অধ্যাপনের নাম ব্রহ্মযজ্ঞ, তর্পণের নাম পিতৃযজ্ঞ, হোমের নাম দেবযজ্ঞ, বলির নাম ভূত যজ্ঞ ও আতিথ্যের নাম নৃযজ্ঞ। যে গৃহী প্রত্যহ যথাশক্ত্যনুসারে এই পঞ্চ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠানে বিরত নহেন, তিনি গৃহে বাস করিয়াও পঞ্চবিধ সূনা পাপে লিপ্ত হন না। দেবতা, অতিথি, ভৃত্য, পিতৃলোক ও ও আত্মা এই পঞ্চকে, যে অন্ন প্রদান না করে, সে শ্বাসপ্রশ্বাসাদিবিশিষ্ট হইলেও বাস্তবিক মৃত। ঐ পঞ্চ মহাযজ্ঞকে অহুত, হুত, প্রহুত, ব্রাহ্মহুত ও প্রাশিত-নামে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। জপের নাম অহুত, হোমের নাম হুত, ভূতবলির নাম প্রহুত, ব্রাহ্মণার্চ্চনার নাম ব্রাহ্মহুত ও পিতৃতর্পণের নাম প্রাশিত। এই পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান দ্বারাই মানব ঋণ মুক্ত হয়।

পিতৃযজ্ঞ ব্যতীত অপর চারিটী যজ্ঞের বিষয় আমরা অনুক্রমে আলোচনা করিব। প্রথমে দেবযজ্ঞের কথা বলি। এই দেবযজ্ঞের বিধান কেন? ভগবান্ মনু বলিতেছেন,—

"যথা বায়ুং সমাশ্রিত্য বর্ত্তন্তে সর্ব্ব জন্তবঃ।

তথা গৃহস্থমাশ্রিত্য বর্ত্তন্তে সর্ব্ব আশ্রমাঃ" ॥ (৩অ-৭৭)

যদ্রূপ বায়ুকে আশ্রয় করিয়া সমস্ত জীব জীবিত থাকে, তদ্রূপ গৃহস্থাশ্রম অবলম্বন করিয়া সমুদায় আশ্রমবাসীরা জীবিত থাকেন।

মানব জড়দেহের পোষণ-বিধায়ক উপাদান সামগ্রীর জন্য দেবতাদিগের নিকট ঋণী। দেবতা প্রদত্ত উপাদান সামগ্রীর বিনিময়ে দেব প্রীত্যর্থে প্রতিদান আবশ্যক। এই জন্য অগ্নিমুখেই বলির প্রয়োজন। কারণ অগ্নি দেবতাদিগের মুখ স্বরূপ। অগ্নিকে কেন দেবতাদিগের মুখ বলা হইল এই রহস্য উদ্‌ঘাটনের একটু চেষ্টা করিব। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে জড়দেহের পোষণের নিমিত্ত যে যে আহার্য্য আবশ্যক তৎসমস্তের জন্যই আমরা দেবতার নিকট ঋণী এবং সেই ঋণ পরিশোধের জন্যই দেবোদ্দেশে প্রতিদান আবশ্যক। ভগবান্ মনু বলিতেছেন,—

অগ্নৌ প্রাস্তাহুতিঃ সম্যগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে।

আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টির্বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজাঃ॥ (৩অ-৭৬)

অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিলে সূর্য্যের উপস্থান হয়। সূর্য্য হইতে বৃষ্টি, বৃষ্টি হইতে শস্য ও শস্য হইতে প্রজা সকল উৎপন্ন হয়। গীতায় ভগবান বলিতেছেন ;—

"দেবান ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।

পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরম বাপস্যথ॥"

কর্ম্মানুষ্ঠানের দ্বারা তোমরা ইন্দ্রাদি দেবতাদিগকে আপ্যায়িত কর, তাহা হইলে ঐ দেবতারাও তোমাদিগকে সম্বর্দ্ধিত করিবেন। এইরূপ পরস্পর সম্বর্দ্ধনের দ্বারা তোমরা পরম শ্রেয়ঃ অর্থাৎ মুক্তিলাভ করিতে পারিবে।

ইন্দ্রাদি দেবতা আমাদের শরীর ধারণোপযোগী সামগ্রী প্রদান করিয়া থাকেন। এই দেবতারা অতীন্দ্রিয় পুরুষ, এবং স্থূল জড় জগৎ অপেক্ষা সূক্ষ্মতর অন্তররাজ্যের অধীশ্বর। সুতরাং মনুষ্য প্রদত্ত স্থূল পদার্থ তদবস্থায় অন্তররাজ্যে দেবতাগ্রাহ্য হইতে পারে না। এই জন্যই অগ্নিমুখে বলির ব্যবস্থা। অগ্নি স্থূল পদার্থকে বিশ্লেষণ করিয়া সূক্ষ্ম উপাদানে পরিণত করে এবং বিশ্লেষিত সূক্ষ্ম উপাদানগুলি দেবতা কর্ত্তৃক ভোজ্যরূপে গৃহীত হয়। আর্য্যঋষি-

নির্দ্দেশিত এই গভীর রহস্য অদূরদর্শী বৃথাজ্ঞানাভিমানীর নিকট কুসংস্কার বলিয়া উপেক্ষিত হইতে পারে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় পাশ্চাত্য বিজ্ঞান আজ এই তত্ত্বের যাথার্থ্য প্রতিপন্ন করিতেছে।

অধ্যাপনার নাম ব্রহ্মযজ্ঞ। বেদাভ্যাসোহি বিপ্রাণাং পরমং তপ উচ্যতে।
ব্রহ্মযজ্ঞঃ স বিজ্ঞেয় ষড়ঙ্গসহিতস্তুযঃ॥

ষড়ঙ্গ বেদের অভ্যাসের নাম ব্রহ্মযজ্ঞ, ব্রাহ্মণগণের পক্ষে ইহা পরম তপস্যা স্বরূপ। বেদাভ্যাস দ্বারা অজ্ঞান বিদূরিত এবং তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়। অনুন্নত অজ্ঞান জীব যাহাতে মোহপাশ বিচ্ছিন্ন করিয়া তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারে, ইহা শিক্ষা দেওয়াই বেদপারগ জ্ঞানীর একান্ত কর্ত্তব্য। এই জন্যই এই যজ্ঞের ব্যবস্থা।

অতিথি পূজার নাম নৃযজ্ঞ। অন্নদ্বারা সমস্ত প্রাণীর সেবা করা কর্ত্তব্য। অতিথি অর্থে ভগবান্ মনু বলিয়াছেন ;—

একরাত্রন্তু নিবসন্নতিথি র্ব্রাহ্মণ স্মৃতঃ।
অনিত্যং হি স্থিতো যস্মাত্তস্মাদতিথিরুচ্যতে॥ (৩য়—১০২)

এক রাত্রে পরগৃহে বাস করেন বলিয়া ব্রাহ্মণকে অতিথি বলে। যে হেতু পরগৃহে এক তিথি ভিন্ন অপর তিথিতে অবস্থান না করায় তাহার নাম অতিথি। প্রতিবেশী, আত্মীয়, স্বজন, চাটুকর ব্রাহ্মণ প্রভৃতিকে শাস্ত্রে অতিথি বলে না। অতিথি সৎকার হিন্দুদিগের অত্যাবশ্যকীয় নিত্য কর্ত্তব্যানুষ্ঠান। পুরাকালে হিন্দু এই অনুষ্ঠান দ্বারা সর্ব্বজাতি মধ্যে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিল। পরিতাপের বিষয়, এই আদর্শ অনুষ্ঠান আজ ভারতে অনাদৃত। যে হিন্দু একদিন সর্ব্বজীবে দয়া, এই মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া বিশাল ভারত বিশ্বজনীন প্রেমে প্লাবিত করিয়াছিল, আজ সেই ভারতে অন্নকষ্টজনিত অসংখ্য জীবের অকালমৃত্যু প্রতিদিন সংঘটিত হইতেছে। আজ ভুমাস্থানে সঙ্কীর্ণতা, সার্ব্বজনীন্ প্রেমের পরিবর্ত্তে কি স্বার্থপরতা বিদ্যমান।

এই অতিথি সেবা হিন্দুর একটী অদ্ভুত ক্রিয়া। বিশেষ দূরদর্শিতার ফল। ব্যষ্টি অবলম্বনে সমষ্টির পূজা। একটী জীবের সেবা দ্বারা, সমস্ত জীবের সেবা। নিরাশ্রয় অভ্যাগত একটী প্রাণীকে যখন আশ্রয় দান ও তাহার ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য যথাশক্তি অন্ন প্রদান করা হয়, তখন মানবপটে যে ভাবের

উদয় হয় ও অন্তঃকরণে যে করুণরসের আবির্ভাব হয়, বিশ্বসংসার সেই ভাবে উদ্বেলিত ও সেই রসে দ্রবিত হইয়া থাকে। এই জন্য শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে ;—

সংপ্রাপ্তায় ত্বতিথয়ে প্রদদ্যাদাসনোদকে।
অন্নঞ্চৈব যথাশক্তি সংকৃত্য বিধিপূর্ব্বকং॥ (৩য়—৯৯)
তৃণানি ভূমিরুদকং বাক্‌চতুর্থী চ সুনৃতা।
এতন্যপি সতাং গেহে নোচ্ছিদ্যন্তে কদাচন॥ (৩য়—১০১)
অপ্রণোদ্যোঽতিথিঃ সায়ং সূর্য্যোঢ়ো গৃহমেধিনা।
কালে প্রাপ্তস্ত্বকালে বা নাস্যানশ্নন্ গৃহে বসেৎ॥ (৩য়—১০৫)
ন বৈ স্বয়ং তদশ্নীয়াদতিথিং যন্ন ভোজয়েৎ।
ধন্যং যশস্যমায়ুষ্যং স্বর্গ্যঞ্চাতিথি পূজনং॥ (৩য়—১০৬)

স্বয়মাগত অতিথিকে বিধানানুসারে সৎকার করিয়া আসন, পদপ্রক্ষালনার্থে জল ও যথাশক্তি অন্ন প্রদান করিবে। শয়নার্থে তৃণ, বিশ্রামার্থে ভূমি, পদপ্রক্ষালনার্থে জল ও প্রিয়বচন ইহা কখনই সদ্‌গৃহস্থের গৃহে অভাব হয় না। সূর্য্য অস্তমিত হইলে গৃহাগত অতিথিকে প্রত্যাখ্যান করিবে না। অতিথি যে কোনও সময়ে আসুন না কেন, তিনি কখনই উপবাসে অবস্থান করিবেন না। উত্তম বস্তু অতিথিকে প্রদান না করিয়া স্বয়ং ভোজন করিবে না ; যে হেতু অতিথি সেবা দ্বারা বিপুল সম্পত্তি, যশঃ, আয়ু ও স্বর্গলাভ হয়। এই জন্যই জীবে দয়া এই চরম শিক্ষার উপর হিন্দুধর্ম্ম দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত।

ইহার পর ভূতযজ্ঞ সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিয়া আমাদের মূল প্রবন্ধ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইব।

অধঃস্তন জীবের উন্নতিকল্পে মানবের একটী বিশেষ কর্ত্তব্য বিহিত আছে, এই কর্ত্তব্যানুষ্ঠানের নাম ভূতযজ্ঞ। পশ্বাদি প্রভৃতি নিম্ন প্রাণীদিগকে সাহায্য করা, আহার প্রদান করা ও তাহাদের ক্রমোন্নতির বিকাশ সাধন করা, তদপেক্ষা উন্নত জীবের একান্ত কর্ত্তব্য। ক্রমোন্নতি সোপানে ইতর প্রাণী অপেক্ষা মানব উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত। মানব তাহাদের সহৃদয় বন্ধু, দয়ালু প্রতিপালক ও তাহাদের উন্নতি-চক্রের সুনিপুণ পরিচালক। যখনই আমরা তাহাদের প্রতি কঠোর ব্যবহার করি—নৃসংশ অত্যাচারে তাহাদিগকে উৎপীড়িত করি—আমাদের দুর্দ্দমনীয় লালসার ভোগ্য বিষয়

ভাবিয়া অকরুণ হৃদয়ে তাহাদিগকে হনন করতঃ নিষ্ঠুরতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করি—তখনই আমরা হৃদয়স্থিত ভগবান্‌কে ভুলিয়া যাই, মনুষ্যদেহধারী মাত্র হইয়া পশ্বাদিঅপেক্ষা হীন যোনিজাত ইতর প্রাণীর ন্যায় আচরণ করি ও পরমপিতা পরমেশ্বরের নিকটে মহাপাপে লিপ্ত হই। ভগবান্ সর্ব্বজীবে অধিষ্ঠান করেন, পশ্বাদির ভিতরেও ভগবান আছেন, ইহা শিক্ষা দেওয়াই ভূতযজ্ঞের উদ্দেশ্য। ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন,—

মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।

ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণাইব॥ (৭ম—৭)

হে ধনঞ্জয়! আমার পরে আর কিছুই নাই, সূত্রে যেরূপ মণি মুক্তাদি গ্রথিত থাকে, আমাতেও সেইরূপ এই বিশ্ব গ্রথিত ভাবে রহিয়াছে।

নচ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগ মৈশ্বরং।

ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ॥ (৯ম—৫)

আমি ভূতের আধার, অথচ ভূতস্থিত নহি, আমি ভূতভাবন, অথচ ভূতের সহিত আমার বাস্তবিক কোন সম্বন্ধ নাই, মায়ার সহিতও আমার বিমিশ্রিত সম্বন্ধ নাই। এই আশ্চর্য্য ঘটনা আমারই মাহাত্ম্য প্রকাশ জানিবে।

তবে প্রভেদ এই মাত্র যে, অনুন্নত প্রাণীতে এই ভগবানভাব সুপ্ত, মানবে ইহা স্ফুরিত। সুতরাং মনুষ্য এই যজ্ঞ অনুসরণ কালে বহিরঙ্গের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া অন্তরে ভগবান্‌কে যে এই বলি উৎসর্গীত হইতেছে ইহাই লক্ষ্য করিবে। দয়া, মমতা, সদয় ব্যবহার, সাহায্য, শিক্ষা প্রভৃতির দ্বারা অধঃস্তন জীবের ক্রমোন্নতি সাধন করাই কর্ত্তব্য। কি পরিতাপের বিষয়, আজ আমরা এই দয়া মমতার পরিবর্ত্তে চতুর্দ্দিকে, অসহনীয় নির্য্যাতন ও অতুলনীয় নৃসংশতা অবলোকন করিতেছি। কোথায় দয়ারসে জীবজগৎ সুধাসিক্ত হইবে, না আজ তাহা মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদে বিক্ষুব্ধ। কোথায় ভালবাসা সূত্রে অসহায় জীবকুলকে আমাদের সহিত অচ্ছেদ্যভাবে গ্রথিত রাখিয়া, আমরা তাঁহাদের রক্ষক, পালক, ত্রাতা হইব; না আজ তাহারা আমাদের লালসার সামগ্রী হইয়া ক্রূর ভাবে উৎপীড়িত বিধ্বস্ত ও বিনষ্ট হইতেছে। অন্ধ মানব জানে না বুঝে না, যে কি মহাপাপেই লিপ্ত হইতেছে! কি লোভনীয় স্বর্গী-থিকায় হইতে বিচ্যুত হইয়া ভীষণ নরকাদি মুখে ধাবিত হইতেছে! মানব

হৃদয় ভগবানের বিমল জ্যোতিতে উদ্ভাসিত না হইয়া নরকের অন্ধ তমসে আচ্ছন্ন হইতেছে ও ঘৃণ্য পঙ্কিল ভাব ধারণ করিতেছে!

আমরা এখন পিতৃযজ্ঞের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। পিতৃযজ্ঞই উপস্থিত প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় এই রহস্যাত্মক বিষয় সুন্দররূপে প্রকৃষ্ট ভাবে যে আলোচনা করিতে পারিব সে শক্তি আমাদের নাই—বোধ হয় অধিকারও নাই; তবে গুরুদেবের পাদপদ্ম স্মরণ করিয়া এ কার্য্যে যথাশক্তি রত হইতেছি।

পূজনীয় পিতৃপুরুষগণের প্রীত্যর্থে ধর্ম্মানুষ্ঠানের নাম পিতৃযজ্ঞ। যথা তর্পণ, শ্রাদ্ধ। মানবের স্বপ্তরূপ আলোচনার সময় আমরা দেখিয়াছি যে, জীব জড়দেহে পৃথিবীতে যেরূপ ভাবে জীবন অতিবাহিত করে, সমস্ত পৃথিবী-জীবনকাল ব্যাপিয়া যে সকল কর্ম্মানুষ্ঠান করে, মৃত্যুর পর জড়দেহাবসানে কাম-লোকাদিতে ভোগদেহে তত্তৎ কর্ম্মের ফলস্বরূপ তাহাকে অশেষবিধ যাতনা অনুভব করিতে হয়। এ বিষয়ের পূর্ণ আলোচনা উপস্থিত প্রবন্ধে অপ্রাসঙ্গিক, অতএব অনাবশ্যক। তবে প্রসঙ্গক্রমে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, জড় জগতে নানা প্রকার কর্ম্মে রত থাকিয়া জীব মানবলীলা সম্বরণ করিলে পর, তাহাকে পিণ্ডদেহে প্রেতলোকে কিছুকাল অবস্থান করিতে হয়। পিণ্ডদেহের নাশ হইলে জীব বাসনা-দেহ অর্থাৎ কামরূপ ধারণ করিয়া কামলোকে বাস করে। তাহার পর এই বাসনা-দেহের তিরোধানে তাহার স্বর্গারোহণ ঘটিয়া থাকে। সৎকার অর্থাৎ অগ্নি সংযোগে জড় দেহের নাশ হইলে, পিণ্ডদেহেরও নাশ হয়; সম্পূর্ণ নাশ হয় না—সম্পূর্ণ বিশ্লেষণ কার্য্য অবস্থাভেদে এক বৎসর পরিমিত কাল অপেক্ষা করে। সূক্ষ্মোপাধি বিশিষ্ট হইয়া জীবের কামলোকে অবস্থান কালে তাহাকে নানাবিধ বর্ণনাতীত ভীষণ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। কামলোকে জীবের অবস্থান কাল তাহার পৃথিবী-জীবনব্যাপী সমস্ত কর্ম্মের দ্বারা পরিমিত। কর্ম্মানুসারে এই কাম-লোক কাহারও পক্ষে অতি ভীষণ যন্ত্রণাক্ষেত্র, কাহারও পক্ষে তদপেক্ষা অল্প যন্ত্রণার স্থল হইয়া থাকে। যন্ত্রণার তারতম্য অনুসারে এই কামলোক আমাদের শাস্ত্রে নানাপ্রকার ভীষণ নরকাদি রূপে বর্ণিত হইয়াছে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকৃষ্ণনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ।

বিজ্ঞান, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য।

—Canada প্রদেশে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মসমাজের বিভিন্ন সম্প্রদায়সকল পুনরায় একত্রীকরণের প্রয়াস হইতেছে। হিন্দুর ভিতরে যেরূপ শাক্ত, শৈব প্রভৃতি সম্প্রদায় আছে, সেইরূপ খ্রীষ্ট সমাজেও Protestant বিভাগের মধ্যে অনেকগুলি বিরোধী সম্প্রদায় আছে। ইঁহারা সকলেই আপনাকে ভগবান্ ও খ্রীষ্টের স্থাপিত অবিমিশ্রিত ধর্ম্মসমাজ বলিয়া গণ্য করেন। সুতরাং পরস্পরের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিয়া আসিতেছিল। এক্ষণে সুখের বিষয় যে, এই সকল সম্প্রদায়ের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ, এ প্রকার বিসম্বাদে অসন্তুষ্টচিত্ত হইয়া মিশ্রণ চেষ্টা করিতেছেন। সকল হৃদয়েই ভগবান্ একরূপে প্রকাশিত। "মমবর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ" সকল মনুষ্যই সেই এক পদার্থের জন্য পিপাসু। হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভিন্ন বিভাগগুলি কি পুনরায় এক করা যায় না? এ বিষয়ে চিন্তাশীল পাঠক মাত্রেরই চেষ্টা থাকা উচিত।

—Trinidad দ্বীপে সম্প্রতি ভূতের উপদ্রব হইয়াছে। অভিনয় স্থান একটী হোটেল। চারিদিক্ হইতে ইট পড়িতে আরম্ভ হইয়াছে এবং ঘরের জিনিষ পত্র সকল আপনা আপনি চলিয়া বেড়াইতে আরম্ভ করিয়াছে। কিছুতেই উপদ্রব থামিতেছে না।

—বায়ু যে কখনও বাণিজ্য পদার্থরূপে গণ্য হইবে, তাহা অনেকে কখন ভাবেন নাই। অনেকে জানেন না যে, ইউরোপে জলীয় আকারে বায়ুকে পরিণত করা হইয়াছে। এবং অনেক ব্যবসায়ে ব্যবহৃত হইতেছে। এক্ষণে বায়ু হইতে অম্লজান পৃথক্ করিয়া লইয়া ব্যবহৃত হইতেছে। ইহার সাহায্যে অগ্নির উত্তাপ এত বৃদ্ধি হয়, যে ধাতব পদার্থ সকল অতি শীঘ্র গলিয়া যায়। সম্প্রতি যবাক্ষরজান বা Nitrogenকে পৃথক্ করিয়া লইয়া মনুষ্যের ব্যবহারোপযোগী করিবার ব্যবস্থা হইতেছে।

—ধাতব পদার্থ সকল যে সজীব ইহা অনেকে জানেন। কিন্তু উহা যে চেতনাময়, উহাতে যে বিশিষ্ট প্রকারে চৈতন্য আছে, ইহা এতদিন প্রমাণিত হয় নাই। শুনা যাইতেছে যে, কোন খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক এই চৈতন্য প্রতিপাদন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এই সত্য অল্প দিন মধ্যেই বৈজ্ঞানিক জগতে প্রকাশিত হইবে। হিন্দু আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সমস্ত পদার্থকেই আত্মচৈতন্যের বিকাশ বলিয়া জানেন এবং সাধকেরা এই সত্য প্রত্যক্ষ করেন। এক্ষণে বিজ্ঞানের সাহায্যে জনসাধারণের নিকট এ বিষয়টী প্রমাণিত হইলে হিন্দু ধর্ম্মেরই খ্যাতি বৃদ্ধি। বিজ্ঞান যদি ধর্ম্মের সহিত মিলিত হইয়া ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত অদ্ভুত ব্যাপারগুলির রহস্য উদ্ঘাটন করিতে চেষ্টা করিত, তাহা হইলে অনেক সূক্ষ্ম তত্ত্ব এতদিনে আবিষ্কৃত হইয়া যাইত।

৯ম ভাগ। { চৈত্র, ১৩১২ সাল। } ১২শ সংখ্যা।

প্রণব, ছবি ও গান

সাধনা।

(১)

বিশ্ব একটি সঙ্গীতের মত। লয়াবস্থা তাহার শুদ্ধ চৈতন্য। বিন্দু, বিসর্গ, স্বর এবং ব্যঞ্জনাদি তাহার প্রথম আভাষ। কথা তাহার জীবভাব। ছোট ছোট তান তাহার সমাজ এবং ধর্ম্ম। ভাব তাহার সচ্চিদানন্দ মূর্ত্তি। ভাবের নাম সুর।

যে ভাবে লয় হয় তাহা নাম। আদি গায়ক শিব। বিশ্বগান তাঁহার মায়াশক্তি। মহামায়া চৈতন্য প্রসবিনী।

সেই গানের সহিত বিশ্বের প্রত্যেক অংশ যোগ দিতেছে। সকলেই গায়ক। সকলেই সে মহাভাবে মত্ত। প্রত্যেক অংশই সাধক। প্রত্যেক কথাই সাধনা।

সাধক ভক্তিপথে ভাবে মত্ত হন। জ্ঞানপথে ভাবের মূলকে ধরিয়া দেখেন। তাহার অনুকরণে বীণা, বংশী প্রভৃতি যন্ত্র সৃষ্টি হইল। সেই সঙ্গীতময় দেহে কত চক্র, কত বিভূতি, কত লয় স্থান, কত মাত্রা, কত খণ্ড সুর!

এই গানের মধ্যে "আমি" ও "আমার" ওস্তাদী। কবে এই ওস্তাদী ছুটিবে, মা? গানটাকে কাটিয়া কাটিয়া খণ্ড কর, প্রত্যেক অংশ পরীক্ষা কর, একই প্রণালী। কতকগুলি মাত্রা, লয় এবং সুর। ইহার নাম বিজ্ঞান। সুরে মত্ত হও, সুরে লয় পাও, উহাই জ্ঞান এবং আনন্দ। এমন সুন্দর গানকে তোমরা কাট কেন?

মায়াময়ীকে খণ্ড খণ্ড করিয়া শিব কাঁদিয়াছিলেন। কাটিলে তাঁহার অন্ত পাওয়া যায় না। তাঁহাকে একত্র কর, আবার একত্র কর, যুগ যুগ বাহিয়া একত্র কর। ইহাই সন্তানের কাজ। সুর মিলাও, সুর বাঁধ, যতক্ষণ লয় না পাও গাহিয়া যাও। সকল সন্তান একত্র হইলে মহেশ্বরের সহিত শক্তির লীলা দেখিতে পাইবে। খালি দেহটার দিকে তাকাইলে কি হইবে?

সচ্চিদানন্দময়ী চৈতন্যপ্রসবিনী। মহাচৈতন্যের প্রতিবিম্ব কোলে ধরিয়াছেন। তাঁহার ইচ্ছা, জ্ঞান এবং ক্রিয়ারূপ লইয়া মহেশ্বর, বিষ্ণু এবং ব্রহ্মা। স্থির হইয়া শুন, স্থাবর জঙ্গম গাহিতেছে। বৃক্ষের মর্ম্মর, নদীর কুল কুল ধ্বনি, ঝিল্লীর সন্ধ্যারব, পাপিয়ার গগনভেদী কূজন, আমার তোমার হাসি এবং অশ্রু, সকলই একতানে গাহিতেছে।

এক না হইলে ভীতি গান। শ্মশানের শৃগাল ধ্বনি, ভূতগণের নৃত্য, জগতের মহাকোলাহল এবং দ্বন্দ্ব, মরণের আর্ত্তনাদ। কোন্‌টা দেখিবে? চিতা না মাতৃক্রোড়?

বহু পুরাকালে তাঁহার বিদ্যা তন্ত্ররূপে প্রচারিত হইয়াছিল। মাতা সাধককে ক্রোড়ে লইয়া উভয় দিকের রূপ দেখাইয়াছিলেন। ক্রমে সেই বিদ্যা ভাঙ্গিয়া খণ্ড খণ্ড হইয়া গিয়াছে। তাহারই ফলে দর্শন, পুরাণ, বিজ্ঞান এবং কত কি কথা। আজ ব্রহ্মবিদ্যা সেই ভাঙ্গা কথাগুলি যোগ করিতেছে। বিজ্ঞান ভাব খুঁজিতেছে, ভাবুক বিজ্ঞান খুঁজিতেছে। এই যুগলক্ষণে কতই আনন্দের আভাষ! ওস্তাদী ছাড়িয়া যোগ দেও। প্রথম কলরব বেসুরা।

ভয় পাইও না। ব্রহ্মবিদ্যা সুর দেখাইতেছে। বিজ্ঞান যন্ত্র দেখাইতেছে। যন্ত্র বাঁধিয়া সুর মিলাও।

(২)

মায়া সাধনা। তাঁহার চৈতন্য উপাস্য। উভয়ের সন্তান সাধক। সাধকের ভাব বড় মধুর। একবার আছি, আর একবার নাই। ইহার নাম লয় ও বিকাশ।

বিজ্ঞান একটি যন্ত্র দিলেন। তাহার নাম বীণা। প্রত্যেক পর্দ্দায় আঘাত করিয়া সুর বাহির কর। একটি আঘাতের ফল একটি প্রতিবিম্ব। গণ্ডিবদ্ধ চৈতন্য। সাতটি সুর এক এক লোকের চৈতন্য। এক একটি সুর এক একটি শক্তিতরঙ্গ। স্পন্দনের পরিমাণ তাহার তন্মাত্রা। তরঙ্গের এক একটি মহা সূক্ষ্মাংশ মহামাত্রার অংশ। তরঙ্গ পর্দ্দায় লয় হইতেছে। সেই লয় স্থান হইতেই চৈতন্যের বিকাশ। আঘাতের কোলে তাহার জন্ম। আঘাতের কোলেই তাহার লয়। আঘাত শক্তি। প্রথম আঘাত তমোগুণ। তাহা হইতে মাত্রা। এক একটি সূক্ষ্ম মাত্রা সূক্ষ্মভূত। এক একটি বৃহৎ মাত্রা মহাভূত। ভেদমায়া মহাভূতকে খণ্ড খণ্ড করিয়া সূক্ষ্মভূত রূপে পরিণত করিতেছেন। বিজ্ঞান তাহাদিগকে পরমাণু কহিয়া থাকেন। এক একটি সপ্ত সুরে এক একটি লোকের বিকাশ এবং লয়। প্রত্যেক পর্দ্দার লয় স্থানে তাহার দেবাখ্য চৈতন্য ;—পৃথিবী, অগ্নি, জল, বায়ু, আকাশ।

সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভূতলোক পার হইয়া মহত্তত্ত্ব। তাহার মাত্রা অহঙ্কার।

মাত্রার পরে গতি। এক একটি লোকের পরিধি। গতি কোথায় মা ? চাহিয়া দেখ গতি লয় স্থানে। লয় স্থান শূন্য। তাহার চারিদিকে মহাসূক্ষ্ম পরমাণু অবিরাম ঘুরিতেছে। এই রাজসিক বৃত্তি হইতে ইন্দ্রিয়। ইন্দ্রিয় তাঁহাকে লয়স্থানে ধরিয়া রাখিয়াছে। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ।

ইন্দ্রিয় লইয়া যায় কোথায় ? ইন্দ্রিয় লয়স্থানে মন দিয়া লইয়া যায়। যেখানে এই গতি প্রতিবিম্বিত, হয় তাহা চিত্ত। ক্ষেত্রটি তাহার বৃত্তি। লয়স্থান কেন্দ্র। যে এই বৃত্তিকে লইয়া সমভাবে আনন্দে নৃত্য করে, তাহা সত্ত্বগুণজাত মন। তাহারই লয়মুখী ছিদ্র অন্তঃকরণ।

পঞ্চ ইন্দ্রিয় সূক্ষ্মভূত গুলিকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। অন্তরে এবং বাহিরে।

একটির সহিত আর একটির মাত্রাস্পর্শে কঠিনত্ব, তাপ, শীত, দ্বন্দ্ব এবং আমিত্ব। যোগমায়ার মধ্যেও ভেদজ্ঞান। ব্রহ্মতাল হইতে কাওয়ালীর চুট্‌কীর মধ্যেও একই লয়। তাই দেখাইবার জন্যই কি মাত্রাভেদ? দেখাও মা! দেখাও। যোগ করিয়া বড় কর। আবার যোগে ভেদ দেখাও। যোগে "আমার" ভেদে আমিত্ব। কিন্তু কত দিন?

সৌর জগৎ! তুমিও অবিরাম গাহিতেছ। তোমার গতিও দ্বাদশ স্বর্য্যে। লয়স্থান হইতে বাহির হইয়াছে। লয় স্থানে ধাইতেছে। তোমাকেও ভেদমায়া দূরে রাখিয়াছে। কল্পনা হইতে কল্পিত দূরে কেন?

পৃথিবি! তোমার মাত্রা ছোট। তাই ভার কেন্দ্র। তোমার মধ্যেও একটা বীণাদণ্ড। তাহারই চতুর্দ্দিকে তুমি ঘুরিয়া থাক। এই বীণার সহিত বিশ্বের বৃহৎ বীণার সম্বন্ধ কত কাল? তুমি কাল বাহিয়া দিন রাত্রি কর। বৃহৎ বীণা বর্ষ করে।

তোমার সূক্ষ্মভূতেও চৈতন্য আছে। ইন্দ্রিয় আছে। আদিত্যের অসংখ্য কণা লইয়া তোমার চৈতন্য। একই স্বরকে ধরিয়া তোমার গান। তোমার জীব, তোমার সমাজ, তোমার ধর্ম্ম, তোমার ভারতখণ্ড, সে গানের এখন কতটুকু গাহিতেছে?

জীবদেহ! তুমি জন্মমৃত্যু দেখিতেছ? জাননা কি এ বিশ্ব স্বপ্নের মত? কখন জন্মে না, কখনও মরে না। শক্তির বিরাট্ গর্ভে কেবল প্রতিবিম্ব দেখিয়া জন্মমৃত্যু অনুমান করিতেছ?

(৩)

জ্ঞান একটি যন্ত্র দিলেন তাহার নাম বাঁশী। জ্ঞানী বলেন বাঁশীটাকে দেখ। ভক্ত বলেন বাজাও। বাঁশীটি পদতলে দলিত করিয়া তিনি মহাকালী। বাঁশীটি অধরে ধরিয়া তিনি কৃষ্ণ। এক একটি রন্ধ্র এক একটি মায়াচক্র। প্রথম ধ্বনিতে স্বর। সাতটা ধ্বনিতে সপ্ত লোকে। বাঁশীর গহ্বর মহাসুষুম্না। এক একটী রন্ধ্র হইতে এক একটী বীজাক্ষর। স্বরের সহিত মিশিয়া তাহা মন্ত্র। বাসুদেব, অনিরুদ্ধ, মহাচৈতন্য। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, সকলেই সেই বাঁশীর মধ্যে তপস্যা করিয়াছিলেন। তাই নাকি যজ্ঞোদ্ভুত বিশ্বগান! তাই নাকি পূর্ব্বাপর গানগুলি ব্রহ্মার বাণীতে প্রচারিত

হইয়া বেদ। বেদমাতা বাঁশীর অনুকরণে বীণা ধরিয়াছিলেন। সপ্তস্বর এক করিতে সপ্তকুমার। তাঁহারা লয়স্থান দেখাইয়াছিলেন। দ্বাদশ মন্বাদি, নারদ, বশিষ্ঠ, অঙ্গিরা, কত গান গাহিলেন। সূর্য্যবংশে তাহা প্রচারিত হইল। রাজবিদ্যা একবার মুখ দেখাইয়া গুরু-মুখে বহিয়া গেল।

ক্রমে মর্ত্তে ওস্তাদী আরম্ভ। কত তানসেন, কত বৈজু বাওরা, কত গোপাল নায়ক!

একবার স্তম্ভিত হইয়া ওস্তাদী ছাড়। সেবক হও। লয়স্থানে যাও এবং সেখানে গুরুকে সঁপিয়া দেও। মাত্রাটার সংস্পর্শই ভেদমায়া, তাহাতে বদ্ধ হইয়া কেবল মাত্রা দেখিও না। সুরে নজর রাখ। সুরই আসল; মাত্রা তাহার পথ। সুর ও মাত্রাগুলি মনে বিন্যাস কর এবং বাঁশীতে ফুঁ দাও। কর্ম্ম কর, কিন্তু মন রাখ সুরে।

সাধক! আপনার দেহ আগে দেখ। তাহাই বিশ্বদেহের প্রতিরূপ। আপনার ওস্তাদী টুকু চাপিয়া ধর, তবে এই দেহস্থ চৈতন্য স্বরূপে প্রতিভাত হইবে। জন্মাবধি তুমি সম্পূর্ণ শক্তি, জ্ঞান ও আনন্দ চাহিয়াছ তাহা পাও নাই। তাহা চাহিয়াছিলেন কেন? সিদ্ধি চাহিতে নাই। সিদ্ধি খাইতে হয়। একবার সিদ্ধিটা ঘোঁট, ঘুঁটিয়া খাও। ঝুলিটা ঝাড়। ঝুলিতে যাহা সঞ্চয় করিয়াছ তাহাতে চৌরাশী লক্ষ ভূত লাগিয়া আছে। ঝুলি ঘাড়ে করিয়া সাধনা সম্পূর্ণ বিপদ!

(৪)

ভাবেই জীব বদ্ধ হয়, ভাবেই মুক্ত হয়। "আমার" ভাবে বদ্ধ হয়, "যার" ভাবে মুক্ত হয়। আমার আকারটা দর্পণ বুঝিয়া ছাড়। আকার ছাড়িলে যাহা থাকে তাহার নামই ভক্তি।

আমার ক্ষুধা লাগে। সাধক ভাবে কি খাই? না খাইলে গাহিব কেমন করিয়া? শক্তি কোথায়? গুরু বলেন খাও, কিন্তু খাইতে খাইতে গানটা ক্ষুধার গান হইয়া পড়ে। ক্ষুধার জন্য গান, না গানের জন্য ক্ষুধা?

গানের ক্ষুধার সহিত পেটের জ্বালা এক হইলে যেটা দাঁড়ায় তাই সাত্ত্বিকী ক্ষুধা। বাকী সব তামাসিকী ক্ষুধা। ভূতের ক্ষুধা।

আমার শরীরে চৌরাশী লক্ষ ভূত বসিয়া খায়। যখন তাহারা খায় আমি

মনে করি আমি খাইতেছি। যখন তাহারা খায় না তখন আমার অগ্নিমান্দ্য হয়। ভূতগণ গান চায়। গানের ক্ষুধায় তাহাদের ক্ষুধা লাগে। আমার মন একটা বাসা। তাহাতে মধুমক্ষিকার মত তাহারা চাক পাড়ে। পূর্ণিমার আগেই তাহারা মধু লইয়া পলায়। আমি শালা বসিয়া বেগার খাটি। একটা আধটা তান ছাড়িয়া দিলে হয় ত ভূতগণ থাকিত। মজা মারে তাহারা, আমার থাকে সংস্কার। আমার সুরের দিকে নজর নাই, আছে কেবল ক্ষুধার দিকে। পেট্‌টা শোচনীয় হইয়া পড়িলে ঔষধ খাইয়া ভূতগণের সেবা করি। অকৃতজ্ঞ ভূত! ভূত বলে এ কথা ভাবিয়াছিলেন কি? এত বড় বলিদানটা হইয়া গেল তাহা কি জ্ঞানচক্ষে দেখিয়াছিলে?

সাধক হইতে বসিলেই আগে খাওয়াটার দিকে নজর যায়। নিরামিষটা খাই কি আমিষটা খাই। মদ্যটা খাই কি মাংসটা খাই। গুরু বলেন, বাবা, আগে গান কর, তখন যাহা অভিরুচি হয় খাইও। খাওয়াটা আগে, না গানটা আগে?

সেকালে বর্ণাশ্রম ছিল। যাহারা লয় স্থানে যাইত; তাহারা ফলমূল খাইয়া থাকিত। যাহারা ভক্ত গৃহস্থ ছিল, দুগ্ধ, দধি, অন্ন খাইত। যাহারা বীরগান গাহিত, তাহারা বরাহ এবং হরিণ খাইত। যাহারা দাস, তাহারা পান্থা ভাত খাইত। কিন্তু আসল কথা তাহাদের গানের অনুশীলন। আমাদের আত্ম-গানটা বর্ণসঙ্করত্বজাত। ইহার শেষটা অগ্নিমান্দ্য। খাওয়াটাই বুঝিয়াছি। খাওয়ার শেষটা কি তাহা বুঝি নাই।

মহামায়া খান। সন্তান তাঁহাকে খাওয়ায়। মায়া অনাদি, দুর্জ্ঞেয়া, মহাশক্তি। তাঁহাকে না খাওয়াইলে খাইবার লোক চরাচরে থাকে না। তিনি ছলনা করেন? ছলনা করিলেও তাঁহাকে খাওয়াইতে হয়। তাঁহাকে খাওয়াইতে গেলে তাঁহার প্রত্যেক সন্তানকে খাওয়াইতে হয়। ভাবরাজ্যে তাঁর মুখে অন্ন দেও। মায়ারাজ্যে তোমারই দারাপুত্র, আত্মীয়, বন্ধু, এবং দরিদ্রের মুখে অন্ন পড়িবে। কেহ বলিবে না তুমি স্বার্থপর। যে তোমাকে আশ্রয় করিবে অন্নপূর্ণা তাহাকেই অন্ন দিবেন। তুমি মহামায়ার সাধক হইলে অপরের গুরুস্থানীয়। তুমি দারা, সুত, বন্ধু, সমাজ এবং ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ স্থান।

তিনি পরম বৈষ্ণবী। যাহা খাও তাহা দেখ এবং তাঁহাকে দেখ। তাঁর সোণার মুখে, মাতৃবৎসলতা এবং করুণাপূর্ণ মুখে, যাহা দিতে ইচ্ছা হয় দাও। আপনাকে ভুলিয়া যাও। কেবল তাঁহাকে ভাব এবং তাঁহার মুখে দেও। তখন তোমার হাতে যাহা উঠিবে তাহাই খাও। তখন যতটুকু ক্ষুধা লাগিবে সেইটুকু কেবল তাঁহারই গানের জন্য।

কে নাকি দরিদ্র সন্ন্যাসী ছিল। তাহার ইচ্ছা হইল মাকে বহুরস আস্বাদ পূর্ণ খাদ্য খাওয়াইতে। সে তপস্যা করিল। সিদ্ধি লাভ করিল। সে বহু খাদ্য পাইয়াছিল। কিন্তু মায়ার কি ছলনা! খাদ্য হাতে করিয়া তাহার ক্ষুধা লাগিল। সে মাকে ভুলিয়া মনে করিল আপনিই খাই। এক গ্রাস খাইয়াই তার অগ্নিমান্দ্য। সে বুঝিল যে, সিদ্ধির মহা উচ্চ স্থানেও অহঙ্কার থাকে।

যদি "আমার" পেটের জ্বালা হয়, তাঁহাকে ভাব। যাহারা তাঁহাকে এখনও জানে নাই তাহাদেরই জ্বালা ধরে বেশী। যাহারা তাঁহাকে ভুলিয়াছে তাহারা ইচ্ছা করে ক্ষুধা বাড়ুক।

ইহারই নাম যুক্তাহার। পেটুক উভয় দিক্ রক্ষা করিতে গিয়া তাহার নাম দিয়াছে পরিমিতাহার। মুখুর্য্যের পরিমিত আহার সাড়ে চারি সের; আমার এক ছটাক। অথচ মুখুর্য্যে সাধক। আমি ঘরে বসিয়া ঔষধ খাই।

ক্ষুধার সহিত যুদ্ধ। ক্ষুধা লাগিলেও খাইও না। উপবাস কর। দেখ কত ক্ষুধা তোমার জঠরে জমা হয়। তখন খাদ্য ভাবিও না। ক্ষুধার কারণ ভাব। মা! এ ক্ষুধা কার? এ ক্ষুধা কেন? তার পর দেখিবে কোথা হইতে যেন সুধা-ধার বহিতেছে।

এখনও অনেক দিন আমাদিগের রসাস্বাদনেই যাইবে। একদিন না খাইলে আমরা অন্ধকার দেখি, অথচ আমরা বেদান্তের চৈতন্যাভাষ বুঝিতে চাই। হায় রে হায়!

যখন তাঁহাকে আত্ম সমর্পণ করিবে তখন জানিবে ক্ষুধা থাকিয়াও নাই। উপবাস করিয়া খাদ্য দ্রব্য সম্মুখে রাখ এবং তাঁহাকে ভাব। নিমেষের মধ্যে জীবাত্মার সহিত তাঁহার সম্বন্ধটা বুঝিতে পারিবে।

তিনি ক্ষুধা আয়ত্তের মধ্যে আনিয়া দেন। তিনি যে কর্ম্মে যাহাকে প্রেরণ

করেন, তাহার ক্ষুধা এবং খাদ্য সেইরূপ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন। কিন্তু আমার "আমিত্বের" একটা রূপ-ক্ষুধা। সে ক্ষুধা নামের ক্ষুধা নয়, লয়ের ক্ষুধা নয়। সেটা মাত্রার ক্ষুধা। ভূতের ক্ষুধা। মাতৃস্তন ছাড়িয়া অবধি এই দশা। এই চিত্তবৃত্তি। (ক্রমশঃ)

হিন্দুর শ্রাদ্ধতত্ত্ব।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

কামলোক সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলা আবশ্যক। কামলোক অর্থাৎ কামনার ক্ষেত্র। এখানে জীব যে দেহ ধারণ করিয়া অবস্থান করে, সেই দেহকে শাস্ত্রে কামরূপ কহে। ভগবান্ অর্জ্জুনকে যে দুরাসদ মহাশত্রু কামরূপকে জয় করিতে বার বার আদেশ করিয়াছেন, ইহা জ্ঞানীদিগের নিত্য বৈরি, এবং মহাশন (অর্থাৎ যাহার কিছুতেই পরিতৃপ্তি হয় না) এবং মহাপাপ স্বরূপ। এই মহান্ কামের অংশ লইয়া জীবের কামদেহ রচিত হয়। জীব যতদিন কাম অর্থাৎ বাসনার অধীন থাকে, ততদিন সে তত্ত্বজ্ঞান লাভের অধিকারী হইতে পারে না এবং যে পর্য্যন্ত না কাম বিজয় হয় ততদিন জন্মান্তরের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পায় না। সংসার-সমুদ্রে বাসনা-তরঙ্গোত্থিত মনের সকল বিকল্পই কামরূপের এক উপাদান সামগ্রী এবং কামলোক এই কামরূপের ভোগপুরী। এই ভোগপুরী সপ্ত স্তর বা শ্রেণীতে বিভক্ত। সর্ব্ব নিম্নস্তর নরকাদি নামে অভিহিত। অবিদ্যার জন্য কামের পরিণাম স্বরূপ শাস্ত্রে নানাপ্রকার নরকের উল্লেখ আছে। ভাগবতে একবিংশতি প্রকার নরকের উল্লেখ আছে। তামিস্র, অন্ধতামিস্র, রৌরব, মহারৌরব, কুম্ভীপাক, কালসূত্র, অসিপত্রবন, শূকরমুখ, অন্ধকূপ, কৃমিভোজন, সন্দংশ, তপ্তশূর্ম্মি, বজ্রকণ্টক শাল্মলী, বৈতরণী, পূয়োদ, প্রাণরোধ, বিশসন, লালাভক্ষ, সারমেয়াদন, অবীচি ও অধঃপান, এই একবিংশতি নরক। ইহা ভিন্ন ক্ষারকর্দ্দম,

রক্ষোগণ ভোজন, শূলপ্রোত, দন্দশূক, অবট নিরোধন, পর্য্যাবর্ত্তন এবং সূচীমুখ নামে আরও সাতটী নরক আছে ; অতএব সমুদায় নরক অষ্টাবিংশতি। সকল নরকই বিবিধ ক্লেশের আকর ও স্থান। এখানে পিতৃরাজ ভগবান্ সূর্য্যতনয় যম মৃত লোকদিগের পাপ পুণ্য বিচার করিয়া দণ্ড বিধান করেন।

এই নরকাদির বিশদ বর্ণনার দ্বারা উপস্থিত প্রবন্ধ কলঙ্কিত করিতে ইচ্ছা করি না। আপনাদের অবগতির জন্য ভাগবত পুরাণ হইতে দুই একটী বর্ণনামাত্র উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

পৃথিবীতে যে ব্যক্তি পরস্ত্রী, পরধন ও পুত্রাদি অপহরণ করে.ও অতি ভয়ানক যমদূতেরা তাহাকে কালপাশে বন্ধন করিয়া উহার মধ্যে তামিস্র নামক নরকে বলপূর্ব্বক নিক্ষেপ করে। তামিস্র নরক অতি ভীষণ গাঢ় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। প্রাণিগণ যেমন এই নরকে পতিত হয়, তখনই ভোজ্যপানীয়ের অভাব, দণ্ডের তাড়না, তর্জ্জনাদি যন্ত্রণায় কাতর হইয়া তৎক্ষণাৎ মূর্চ্ছিত হয়। যে ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তিকে বঞ্চনা করিয়া তাহার কলত্রাদি সম্ভোগ করে, লোকে যেরূপ মূলচ্ছেদন করিয়া বৃক্ষাদি পাতিত করে, সেইরূপ যমদূতেরা তাহাকে অন্ধতামিস্র নামক নরকে নিক্ষেপ করে। দেহী এই নরকে নিক্ষিপ্ত হইবার পূর্ব্বে যখন যন্ত্রণা ভোগ করিতে আরম্ভ করে, তখন যন্ত্রণায় তাহার বুদ্ধি ও দৃষ্টিশক্তি বিলুপ্ত হইয়া যায় এবং সেই জন্য তাহার যন্ত্রণার বৃদ্ধি হয়। ইহলোকে যে ব্যক্তি "এই আমি" এবং "এই আমার" বলিয়া অপরের হিংসা করত প্রতিদিন কেবল আপনাকে এবং পরিজনদিগকে পোষণ করে, সে পরিশেষে তাহাদিগকে এই স্থানেই পরিত্যাগ করিয়া সেই পাপজন্য স্বয়ং রৌরব নামক নরকে পতিত হয়। এই ব্যক্তি ইহলোকে যে সকল ব্যক্তিকে যে প্রকারে হিংসা করিয়াছিল, সেই সকল ব্যক্তি, ইহার নরকপ্রাপ্তি হইলে পর, রুরু হইয়া ইহাকে সেই রূপেই হিংসা করে, এই হেতু এই নরকের নাম রৌরব হইয়াছে। রুরু সর্প হইতেও খল। মহারৌরব নামক নরকও এইরূপ। যে ব্যক্তি আপদ্‌কাল উপস্থিত না হইলেও, স্বকীয় বেদমার্গ পরিত্যাগ করিয়া পাষণ্ডমত অবলম্বন করে, যমদূতেরা তাহাকে অসিপত্রবন নামক নরকে প্রবেশ করাইয়া কশা দ্বারা প্রহার করে। প্রহারের জ্বালায় যেমন সে নরক মধ্যে

ইতস্ততঃ ধাবিত হয়, অমনি তালবৃক্ষ দ্বারা তাহার সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত হইতে থাকে। বনে যে সকল তালবৃক্ষ আছে, তাহাদিগের পত্রের উভয় পার্শ্বে ধার থাকে, সে তজ্জন্য বেদনায় "হা হতোঽস্মি" বলিয়া ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছিত হয়। স্বধর্ম্মত্যাগী পাষণ্ড মতাবলম্বীদিগের এইরূপ ফল ভোগ হইয়া থাকে।

ইহলোকে যে মনুষ্য নির্দ্দোষ জীবদিগকে পীড়া দেয়, সে সেই হিংসাদোষে পরকালে অন্ধকূপ নামক নরকে পতিত হয়। অন্ধকূপে পতিত হইলে পর সেই সকল পশু, পক্ষী, মৃগ, সরীসৃপ, মশক, উকুন, মৎকুণ, ও মক্ষিকাদি প্রাণী সকল অথবা অন্য যে কোন জীবকে সে উৎপীড়িত করিয়াছিল, তাহারা চতুর্দ্দিক্ হইতে তাহার হিংসা করিতে থাকে। ভয়ানক অন্ধকারে নিমগ্ন হওয়াতে তাহার নিদ্রাসুখ নষ্ট হইয়া যায়, সে কোন স্থানে অবস্থিতি করিতে পারে না। জীব যেরূপ জরাদেহ মধ্যে বসতি করিয়া কষ্ট পায়, সে সেইরূপ অন্ধকারে পতিত হইয়া যন্ত্রণা ভোগ করে।

যে ব্যক্তি খাদ্য পাঁচ জনকে না দিয়া আপনি ভক্ষণ করে, কিম্বা যে ব্যক্তি পঞ্চ যজ্ঞের অনুষ্ঠান না করে, সে কাকের সমান গতি প্রাপ্ত হয়। কৃমিভোজন নামে যে অতি অপকৃষ্ট নরক আছে, ঐ পাপী সেই নরকে পতিত হয়। পতিত হইয়া নরক মধ্যে যে লক্ষ যোজন বিস্তৃত কৃমিকুণ্ড আছে, সেই কুণ্ডের কৃমি হয়। ঐ কুণ্ডের যত পরিমাণ, তত বৎসর সেই স্থানে কৃমি ভোজন করে এবং অপরাপর কৃমি সকল উহাকে ভক্ষণ করিতে থাকে। পাঁচ জনকে না দিয়া এবং হোম না করিয়া খাদ্য দ্রব্য ভক্ষণ করত প্রায়শ্চিত্ত না করিলে পাপী উক্ত প্রকার যন্ত্রণা ভোগ করে।

যে পুরুষ ইহলোকে অগম্যা স্ত্রী, অথবা যে স্ত্রী অগম্য পুরুষ গমন করে, পরকালে সেই পুরুষ ও স্ত্রী তপ্তশূর্ম্মি নামক নরকে পতিত হয়। সেই নরকে যমকিঙ্করেরা কশা দ্বারা তাহাদিগকে আঘাত করে এবং পুরুষকে প্রতপ্ত লৌহময়ী স্ত্রীর এবং স্ত্রীকে লৌহময় পুরুষের "শূর্ম্মি" অর্থাৎ প্রতিমূর্ত্তি আলিঙ্গন করায়।

ইহলোকে জন্ম, তপস্যা, বিদ্যা, বুদ্ধি সকল বিষয়ে নীচ ব্যক্তি, "আমি বড়" এই বলিয়া অহঙ্কার করত, জন্ম, তপস্যা, বিদ্যা, আচার বর্ণ ও আশ্রমাদি সকল বিষয়ে শ্রেষ্ঠতর মানী ব্যক্তিকে মান্য না করে, সে মৃত্যুর পূর্ব্বেই মরিয়া

থাকে। অনন্তর যখন মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয়, তখন অধোমুণ্ডে ক্ষারকর্দ্দম নামক নরকে প্রবেশ করিয়া অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করে।

উপরোক্ত বর্ণনায় নরকাদি কিরূপ ভীষণ চিত্রে অঙ্কিত একবার স্থির চিত্তে অনুমান করুন। যাহার বর্ণনায় লোমহর্ষণ উপস্থিত হয়, তাহা আমাদের মতন দুষ্ক্রিয়ান্বিত মানবের বা আমাদের অতি আদরের ভালবাসার পাত্র প্রিয় পরিজনবর্গের বাসস্থানরূপে নির্দ্দিষ্ট, ইহা কল্পনা করিতেও মর্ম্মস্থান ভেদ হয়। ক্ষুদ্র মানব! অহঙ্কারদীপ্ত হইয়া কত কূটনীতিজাল বিস্তার করিয়া স্বার্থান্বেষণ, আধিপত্য বিস্তার, ধনাগমের চেষ্টা, বৈরনির্য্যাতন প্রভৃতি কত উদ্দেশ্য আশ্রয় করিয়া জীবনতরী সংসারস্রোতে ভাসাইতেছ, কিন্তু তোমার পরিণাম কি এই! ঐ শুন! আর্য্যঋষি জলদগম্ভীর স্বরে কি বলিতেছেন ;—

অসূর্য্যা নামতে লোকা, অন্ধেন তমসাবৃতাঃ।
তাং স্তে প্রত্যাভি গচ্ছন্তি, যে কে চাত্মহনো জনাঃ। (ঈশোপনিষৎ)

আত্মঘাতী (অর্থাৎ শাস্ত্রবর্ত্মানুবর্ত্তন করে 'না, কেবল বিষয় ভোগে মত্ত হইয়া বৃথা জীবন অতিবাহিত করে) এরূপ মনুষ্যেরা মৃত্যুর পর অসূর্য্য নামক অজ্ঞান তিমিরাবৃত লোক সকল গমন করিয়া থাকে। এরূপ আত্মঘাতী জীবের নরক যন্ত্রণার লাঘবের জন্য করুণহৃদয় ঋষিকুল তপঃ-প্রভাবে কতকগুলি ধর্ম্মানুষ্ঠানের ব্যবস্থা কবিয়া দিয়াছেন।

দেহত্যাগের অব্যবহিত পূর্ব্বে এই যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণের জন্য বৈতরণীর ব্যবস্থা আছে। এই বৈতরণী নরকগুলির পরিখা স্বরূপ। স্বচ্ছন্দে ইহার অতিক্রম জীব মাত্রেরই আবশ্যক।

মৃত্যুর পর অগ্নিক্রিয়াকালে আর কতকগুলি অনুষ্ঠান করিতে হয়। পিণ্ডদান, প্রেতের আবাহন প্রভৃতি কেবলমাত্র মৃত ব্যক্তির দিব্যলোক প্রাপ্তির ইচ্ছায় সাধিত হয়।

"দেবাশ্চাগ্নিমুখা এনং দহন্তু" মন্ত্রে অগ্নি লইয়া চিতা প্রদক্ষিণ করিতে করিতে ;—

"কৃত্বা তু দুষ্করং কর্ম্ম জানতা বাপ্যজানতা।
মৃত্যুকালং বশং প্রাপ্য নরং পঞ্চত্বমাগতং ॥

ধর্ম্মাধর্ম্ম সমাযুক্তং লোভ মোহ সমাবৃতং।
দহেহয়ং সর্ব্বগাত্রানি, দিব্যান্ লোকান্ স গচ্ছতু ॥"

প্রভৃতি মন্ত্রে অগ্নিদেবতার আবাহন, দাহশেষে সপ্তকাষ্টিকা প্রদান ইত্যাদি মৃত ব্যক্তির সদ্‌গতি প্রাপ্তির জন্য মঙ্গল কামনাবিধায়ক অনেকগুলি অনুষ্ঠান বিহিত আছে। ইহাদের বিশদ আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন। তবে প্রেত ও কামলোক মৃত ব্যক্তির যন্ত্রণার হ্রাস নিবন্ধন যে এই সকল কর্ম্ম বিহিত হইয়াছে তাহার আর সন্দেহ নাই। শাস্ত্রানুসারে পুত্রই এই কার্য্যের জন্য নির্দ্দিষ্ট। পিতার পিণ্ডদেহের সহিত পুত্রের পিণ্ডদেহের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ থাকা নিবন্ধন পুত্র পিতৃকার্য্যে প্রকৃষ্ট অধিকারী।

"পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা পুত্র পিণ্ড প্রয়োজনাৎ।" পুত্রের জন্য দার পরিগ্রহ করিবে, কারণ পুত্র পিত্রোদ্দেশে শ্রাদ্ধ তর্পণাদি করিবে। আর্য্য ঋষিরা শ্রাদ্ধের প্রয়োজনীয়তা বিশেষ ভাবে বুঝিতেন বলিয়া সেই জন্য পুত্রকামনায় দার পরিগ্রহের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। উচ্ছৃঙ্খল কাম বৃত্তির চরিতার্থতার জন্য স্ত্রী-সঙ্গতার ব্যবস্থা করেন নাই। পরিণীতা স্ত্রী সহধর্ম্মিণী। আপনারা ভাগবতে মুনিবর কর্দ্দম ও তাঁহার লোক-বিশ্রুতা পত্নী দেবহূতির উপাখ্যান পাঠে অবগত আছেন যে, কিরূপে মহাযোগী কর্দ্দম স্বীয় অনুরূপা পত্নীতে বীর্য্যসেক করিয়া সন্তানোৎপাদন করিয়াছিলেন। ব্রহ্মা কর্ত্তৃক প্রজা সৃষ্টি করিতে আদিষ্ট হইয়া কর্দ্দম ভক্তিপূতচিত্তে বহুকাল ভগবানের তপস্যা করেন। তৎপরে মনুকন্যা দেবহূতির পাণিগ্রহণ করেন। সাধ্বী পত্নী আত্মশুদ্ধি, ইন্দ্রিয় সংযম, শুশ্রূষা ও মিষ্টবচন দ্বারা অমিততেজা ভর্ত্তার মনস্তুষ্টি করিতে লাগিলেন। এইরূপ পতিসেবায় তাঁহার শরীর শীর্ণ ও দুর্ব্বল হইয়াছিল। পরে পতি প্রসন্ন হইলে সতী কামশাস্ত্রানুযায়ী সম্ভোগ ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলে মহর্ষি কর্দ্দম প্রসন্নচিত্তে কঠোর তপোজনিত রতিকার্য্যের অনুপযুক্ত পত্নীর দেহ তপঃ প্রভাবে রমন যোগ্য করিয়া পত্নীতে উপগত হন। এবং পত্নীগর্ভে বীর্য্যসেক করেন। সাধ্বী দেবহূতি মুনিবরের সহযোগে গর্ভবতী হইয়া একদিন মধ্যেই কতকগুলি কন্যা প্রসব করেন। এই সময়ে ঋষিবর পত্নী ও কন্যাদিগকে গৃহস্থাশ্রমে রাখিয়া পুনঃ সন্ন্যাস অবলম্বন করিতে ইচ্ছা করিলে পতিপরায়ণা সতী দেবহূতি কি ভাবে আত্ম-

নিবেদন করিয়াছিলেন, তাহা ভাগবত হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। সতী স্বামীকে বলিতেছেন,—

"স্বামিন্! আপনি আমার নিকট যে সকল প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, সে সমস্তই সুসম্পন্ন করিয়াছেন। এখন আমাকে অভয়দানকরুন, আমি মহাভীত হইয়াছি। হে ব্রহ্মন্! আপনি বনে গমন করিলে কন্যাগণ আপনারই অনুরূপ পতির অন্বেষণ করিবে। আর আমাকেই বা কে জ্ঞানগর্ভ উপদেশ প্রদান করিবে? আমি যে বহু বৎসর সাংসারিক সুখভোগে অতিবাহিত করিয়াছি, তাহাই যথেষ্ট হইয়াছে। এতদিন আমি পরমাত্মতত্ত্ব পরিত্যাগ করিয়াছিলাম। আমি ইন্দ্রিয়সুখে আসক্ত হইয়া আপনাকে ভজনা করিয়াছিলাম, আপনার যথার্থ তত্ত্ব বুঝিতে পারি নাই, এখন আমাকে অভয় দান করুন। যে বিষয় প্রবৃত্তি অজ্ঞানতা হেতু অসদ্ বিষয়ে নিয়োজিত হইলে সংসার বন্ধনের কারণ হয়, তাহাই আবার সদ্বিষয়ে প্রযুক্ত হইলে সুফলপ্রদ হইয়া থাকে। পৃথিবীতে যাহার কার্য্য, ধর্ম্ম ও বৈরাগ্য হরিসেবার জন্য কল্পিত না হয়, সে ব্যক্তি জীবিত থাকিয়াও মৃত। আমি মুক্তিফল দাতা আপনাকে প্রাপ্ত হইয়াও যখন সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারিলাম না, তখন আপনি নিশ্চয় জানিবেন যে, আমি ভগবানের মায়া দ্বারা নিতান্তই প্রতারিত হইয়াছি।" ইত্যাদি।

ইহাই সহধর্ম্মিণীর চিত্র। অধুনা এই স্বর্গীয়ভাব বিলুপ্ত হইয়াছে। স্বামী স্ত্রীতে ব্যভিচার দোষ:স্পর্শ করিয়াছে। প্রেমের স্থান কামপরতা অধিকার করিয়াছে।

পিত্রোদ্দেশে পুত্রের পিণ্ডদান মানব জীবনের অত্যাবশ্যকীয় কর্ত্তব্য। এই পিণ্ড কি উদ্দেশে দেওয়া হয়? প্রকৃতই কি মৃত ব্যক্তিরা ইহা আহার করেন? এ পিণ্ড প্রদানের আবশ্যকতা কি? এইরূপ প্রশ্ন সকল স্বতঃই মনে উদয় হয়; সুতরাং এই সকলের বিচার আমরা যথাশক্তি এই প্রবন্ধে করিতে চেষ্টা করিব। (ক্রমশঃ)

শ্রীভূতনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ।

আমি ও আমার দেহ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

মনে করুন আপনি আপনার অন্নময় কোষ পরিষ্কার করিবার জন্য কৃত-সংকল্প হইলেন। এক্ষণে দুইটি বিষয়ে আপনার মন দিতে হইবে—প্রথম, পুরাতন আবর্জ্জনা বিসর্জ্জন; দ্বিতীয়, নূতন শরীর গঠন। প্রথমটির জন্য আপনাকে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইবে না, কারণ প্রকৃতি আপনাকে এ বিষয়ে সাহায্য করিবে। সাত বৎসরের মধ্যে জঞ্জালগুলি আপনা আপনিই ঝরিয়া পড়িবে,—চেষ্টা করিলে আরও অল্প সময়ের মধ্যে এ কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিবেন। সুতরাং তাহার জন্য চিন্তায় সময়ক্ষেপ না করিয়া যে উপাদান-গুলি লইয়া নূতন দেহ গড়িতেছেন সেই দিকে অধিকতর মনোযোগী হইবেন। এই উপাদান নির্ব্বাচনে বিশেষ সতর্কতার প্রয়োজন; ইহার উপরেই আপনার সফলতা নির্ভর করিতেছি যাহাতে শরীর কলুষিত হয় এরূপ কোন দ্রব্য যাহাতে শরীরের মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারে সর্ব্বদা সেই চেষ্টা করিতে হইবে।

এই সকল দুষ্ট পদার্থের মধ্যে সুরা একটি। সুরা বহু অনিষ্টকারী জীবাণুর আশ্রয়স্থল। এই সকল জীবাণু বড়ই কুৎসিত—বড়ই ভয়ানক। ইহারা দেহের মধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়া শুদ্ধ নিজেরাই দেহের অনিষ্ট সাধন করিয়া ক্ষান্ত হয় না, পরন্তু পরলোক অধিবাসী স্থূল চক্ষের অগোচর কতক-গুলি অতি বীভৎস জীবকে দেহ সমীপে আকর্ষণ করিয়া থাকে। ইহলোকে যাহারা ঘোর মাতাল ছিল, পরলোকে গিয়াও তাহাদের মদ্যের পিপাসা নিবৃত্ত হয় না; অথচ স্থূলদেহ ব্যতীত এ জঘন্য পিপাসা শান্তির অন্য উপায় নাই। সুতরাং তাহারা অন্যের স্থূলদেহের সাহায্যে স্বীয় বাসনা চরিতার্থ করিতে প্রয়াস পায়। যেখানে কাহাকেও মদ্যপান করিতে দেখে সেই খানেই ইহারা ছুটিয়া যায় এবং মদ্যপায়ীর শরীরের ভিতর প্রবেশ করিয়া আপনাদের দারুণ তৃষ্ণা নিবারণ করিতে চেষ্টা করে। এইরূপে ইহারা মদ্যপের সর্ব্বনাশ করিয়া নিজের কার্য্য উদ্ধার করে। যাঁহারা সুরাপান করেন তাঁহারা যদি এই সকল ঘৃণ্য পিশাচদিগকে দেখিতে পাইতেন তাহা

হইলে তাঁহারা সুরা স্পর্শও করিতেন না। মনে করুন আপনি অন্নাহার করিতেছেন, এমন সময়ে দেখিতে পাইলেন যে, একটা ঘোর অপরিষ্কার মেথর আসিয়া আপনার সহিত একপাত্রে ভোজন করিতে আরম্ভ করিল —তখন আপনার কি মনে হয়? সুরাপান কালে যে সকল জীব আসিয়া সহচর হয় তাহারা আরও হেয়—আরও জঘন্য। ইহার উপর মদ্যপের কুৎসিত চিন্তাগুলি আকার ধারণ করিয়া তাহাকে চতুর্দ্দিকে ঘেরিয়া রাখে; এবং তাহার শরীর অন্য মদ্যপগণের শরীর হইতে পরিত্যক্ত কণাগুলি আপনার দিকে আকর্ষণ করিতে থাকে। এই সকল কণা শরীরের ভিতর প্রবেশ লাভ করিয়া শরীরকে ক্রমে কুৎসিত হইতে কুৎসিততর করিয়া তুলে। মাতালের কথা দূরে থাকুক, যাহারা সুরার ব্যবসা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তাহাদের আকৃতির দিকে লক্ষ্য করিলে ইহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। কুৎসিত উপাদানে গঠিত দেহ কুৎসিত ভিন্ন আর কি হইতে পারে?

সুরা সম্বন্ধে যে কথা বলা গেল গাঁজা, গুলি, চরস প্রভৃতি অন্যান্য নেসার দ্রব্য সম্বন্ধেও সেই কথা খাটে। কেবল নেসার দ্রব্য কেন ছাগ মৎস্য প্রভৃতি জীবমাংসও আমাদের শরীরের পক্ষে বিশেষ অনিষ্ট কর। সাধকের দেহ শুদ্ধ, পবিত্র, প্রবল অনুভবশক্তিবিশিষ্ট অথচ সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হওয়া চাই। যে দেহখানি বিশুদ্ধ ইস্পাত নির্ম্মিত শাণিত অস্ত্রের ন্যায়,—পরিষ্কার নির্ম্মল অথচ দৃঢ় ও কষ্টসহিষ্ণু,—তাহাই সাধনার উপযুক্ত যন্ত্র। রক্তমাংস-বিজড়িত তামসিক খাদ্যের সাহায্যে এইরূপ দেহের গঠন অসম্ভব। ভূচর, খেচর, জলচর, উভচর প্রভৃতি নানাবিধ জন্তুর মৃতদেহ যে সকল খাদ্যের উপাদান, সে সকলের দ্বারা বিকৃত অপবিত্র দেহ ভিন্ন আর কিরূপ দেহ নির্ম্মাণের আশা করা যাইতে পারে? অধিক প্রমানের আবশ্যক নাই, একবার মাংস বিক্রয়ী কসাইদিগের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন। তাহাদিগের দেহ কি উচ্চ, আধ্যাত্মিক চিন্তা করিবার উপযোগী যন্ত্র বলিয়া বোধ হয়? যাঁহারা মাংস ভোজন করেন তাঁহাদের দেহও কিয়ৎ পরিমাণে এইরূপ বিকৃতভাবাপন্ন হইয়া থাকে। এইরূপ দেহ লইয়া আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে অগ্রসর হওয়া সহজ নহে।

অবশ্য শুদ্ধ স্থূলদেহ পরিষ্কার করিলেই যে, আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন হয় তাহা নহে। যাহারা এরূপ মনে করেন তাহারা ভ্রান্ত। তুলসীদাস ঠিক্‌ই বলিয়াছেন, "তৃণ ভুখ্‌নেসে হরি মিলে ত বহুৎ মৃগ অজা।" নিরামিষ খাইলেই যদি ভগবান্‌কে পাওয়া যাইত তাহা হইলে হরিণ ছাগ প্রভৃতি দোষ করিল কি? কিন্তু অপরিষ্কার স্থূলদেহ যে সাধনার পথে একটা বিঘ্ন স্বরূপ সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে না। বিঘ্নমাত্রই পরিত্যাজ্য। বিশেষতঃ এই বিঘ্ন দূর করা আমাদের সকলেরই আয়ত্তাধীন। এইরূপ স্থলে ইহাকে আমরা থাকিতে দিই কেন? একটু চেষ্টা করিলেই যখন শাণ দিয়া লইতে পারা যায়, তখন মরিচাধরা ভোতা অস্ত্র ব্যবহার করা অলসতা ও নির্ব্বুদ্ধিতা ভিন্ন আর কিছুই নহে।

কিন্তু এই স্থলে আর একটি আপত্তি উঠিতে পারে। দূষিত পদার্থ আমাদের শরীর মধ্যে প্রবেশ করিতে দেওয়া না দেওয়া সকল সময়ে আমাদের ইচ্ছাধীন নহে। আমরা না হয় চেষ্টা করিয়া অখাদ্য ভোজন পরিত্যাগ করিলাম, কিন্তু এই যে আমাদের নিশ্বাসের সহিত কত ঘৃণিত অপবিত্র দ্রব্য আমাদের অজ্ঞাতসারে শরীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইতেছে ইহা আমরা কিরূপে নিবারণ করিব। কথায় বলে, "ঘ্রাণে অর্দ্ধ ভোজন হয়।" আমরা যখনই কোন শৌণ্ডিক বা মাংসিকের দোকানের পার্শ্ব দিয়া গমন করি তখনই যে মদ্য বা মাংসনিঃসৃত কণাসমূহ আমাদের ত্বক্‌, নাসারন্ধ্র প্রভৃতির সাহায্যে আমাদের শরীর মধ্যে প্রবেশ লাভ করে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। অবশ্য যে দিকে এই সকল দ্রব্যের সংস্পর্শ থাকে সে দিক্‌ পরিত্যাগ করা, ভাল; কিন্তু তাহা হইলে ত নগর ছাড়িয়া বনে যাইতে হয়। আজ কাল সহরের অলিতে গলিতে "হোটেল" শুঁড়িখানা, মাংসের দোকান; তাহার পর বর্ত্তমান সমাজে মদ্যপ প্রভৃতির সংখ্যা এত অধিক যে, তাহাদের সংস্পর্শ পরিত্যাগ করিয়া সমাজে বাস করা অসম্ভব। সুতরাং আমাদের শরীরকে নানাবিধ দূষিত কণার আক্রমণ সহ্য করিতেই হইবে। কিন্তু সুখের বিষয়, শরীর প্রস্তুত থাকিলে এই সকল আক্রমণের দ্বারা বিশেষ অনিষ্টের আশঙ্কা নাই। সকলেই জানেন আমাদের চতুর্দ্দিকেই বায়ুরাশি অসংখ্য সংক্রামক রোগের বীজাণু দ্বারা পরিপূরিত হইয়া আছে। তাহারা প্রতিনিয়ত আমাদের শরীরাভ্যন্তরে

প্রবেশ করিতেছে। সকল দেহে যদি তাহারা সমভাবে প্রভাব বিস্তার করিতে পারিত তাহা হইলে আমাদের কাহারও রক্ষা থাকিত না,—অচিরেই সমাজ শ্মশানে পরিণত হইত। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয়, উপযুক্ত ক্ষেত্র না পাইলে তাহারা পুষ্ট ও বর্দ্ধিত হইতে পারে না, সুতরাং যে দেহ তাহাদিগের পক্ষে অনুর্ব্বর, সে দেহে তাহাদরে আক্রমণ কার্য্যকরী হয় না। সেই জন্যই অনেকে দিবারাত্র বিসূচিকা প্রভৃতি রোগের সংস্পর্শে থাকিয়াও ঐ সকল ভীষণ রোগ হইতে অব্যাহতি পান। সেইরূপ নির্ম্মল দেহের ভিতর অপবিত্র কণা সমূহ প্রবেশ করিলেও কোনরূপ অনিষ্ট সাধন করিতে পারে না—পোষণোপ-যোগী ক্ষেত্রের অভাবে আপনারই বিনষ্ট হইয়া যায়। এতদ্ভিন্ন, শরীর-তত্ত্ববিৎ ব্যক্তিমাত্রই জানেন, আমাদের শরীর মধ্যে বহুসংখ্যক জীবাণু সর্ব্বদা রক্ত-পরিষ্কার কার্য্যে নিযুক্ত আছে। কোন বিষাক্ত পদার্থ শরীর মধ্যে প্রবেশ করিলেই, ইহারা তাহাকে সংহার করিবার জন্য ধাবিত হয় এবং শক্তিতে কুলাইলে তাহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলে। ইহাদের শক্তির পরিমাণের উপর রক্তের নির্ম্মলতা অনেকটা নির্ভর করে। পরিষ্কার দেহে ইহাদের সংখ্যা বল বিক্রম সমধিক বৃদ্ধি পায়, সুতরাং এরূপ দেহে কোন বিষাক্ত দূষিত দ্রব্য সহজে কোন ক্ষতি করিতে পারে না। ইহার উপর আবার আমাদের ইচ্ছাশক্তির প্রভাব আছে। আমরা যদি ইচ্ছা করি আমাদের দেহ পবিত্র রাখিব, তাহা হইলে যে সকল অপবিত্র জীব আমাদের শরীর মধ্যে প্রবেশ করিতে চায়, তাহারা ইহার ত্রিসীমায় আসিতে পারে না। এক কথায়, যাঁহার দেহ সুপবিত্র, সুনির্ম্মল, তাঁহার দেহ দুর্ভেদ্য দুর্গের ন্যায় নিরাপদ; তিনি নির্ভয়ে ইহ সংসারে বিচরণ করিতে পারেন।

অনেকে স্বাস্থ্যের দোহাই দিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন সুরাপানাদি সহসা পরিত্যাগ করিলে বা মাংস ভোজন না করিলে তাঁহাদের স্বাস্থ্য হানি হইবার সম্ভাবনা। বলা বাহুল্য এ আশঙ্কা অমূলক। লোকে কথায় বলে শরীরকে "যা সহাবে তাই সয়"। শরীর অভ্যাসের দাস। কিন্তু কোন অভ্যাস করা না করা আমার ইচ্ছা। আমি ইচ্ছা করিয়া শরীরকে যে দিকে চালাইব সেই দিকেই সে চলিবে। শরীর যদি অন্যায় আব্দার করে তবে তাহাকে শাসন করুন, বিভিন্ন দিকে তাহার গতি ফিরাইয়া

দিউন, কিছু দিন পরে দেখিবেন এই নূতন পথ তাহার অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে—সে আর পুরাতন পথের দিকে যাইতে চাইবে না। সকল সময়ে স্মরণ রাখিবেন দেহ আপনার প্রভু নয়, আপনি দেহের প্রভু। তাহার অন্যায় আব্দারে কর্ণপাত করিলে আপনাকে ঠকিতে হইবে,—সেই প্রভু হইয়া আপনাকে ঘুরাইয়া লইয়া বেড়াইবে; কাঁটা দিয়া যেমন কাঁটা তুলিয়া ফেলা যায়, তেমনই পুরাতন অভ্যাস গুলি নূতন অভ্যাস দিয়া নাশ করা যায়। আজ আপনি মাংস ভিন্ন খাইতে পারেন না, কিন্তু কিছু দিন মাংস ত্যাগ করিলেই দেখিতে পাইবেন যে, মাংসে আপনার অরুচি হইয়াছে। অভ্যাসের দোষে আপনার রুচি হইয়াছিল, আবার অভ্যাসের গুণে আপনার তাহাতে ঘৃণা বোধ হইবে। জাতিবিশেষ পরমানন্দে গলিত মৎস্যাদি ভক্ষণ করে বলিয়াই কি বলিতে হইবে যে, শরীর রক্ষার জন্য তাহা প্রয়োজন? মাংসে দেহের পুষ্টিকর নানাবিধ পদার্থ আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু এমন বহু নির্দ্দোষ সাত্ত্বিক আহার্য্য দ্রব্য আছে যাহাতে সে গুলি সমস্তই বহুল পরিমাণে পাওয়া যায়। মাংস ভোজনের উপকারিতা দেখাইবার জন্য যে যবক্ষার যুক্ত পদার্থের দোহাই দেওয়া হয়, দাউল ইত্যাদিতে তাহা প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়, সুতরাং তাহার জন্য সাধনার অন্তরায় আমিষ ভক্ষনের আবশ্যকতা কি আছে?

শিশু বা অল্পবয়স্ক বালক বালিকাদিগের মদ্যমাংসাদির জন্য একটা স্বাভাবিক স্পৃহা দৃষ্ট হয় না, বরং বিতৃষ্ণাই দেখা যায়। ক্রমে খাইতে যখন অভ্যাস হইয়া যায়, তখন দেহ এই সকল দ্রব্য পাইবার জন্য ব্যাকুল হয় এবং আমাদের মনে হয় যেন সত্য সত্যই দেহ রক্ষার জন্য সেগুলি প্রয়োজন। কিন্তু একটু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া এ অভ্যাস ত্যাগ করিলেই আমরা আমাদের ভ্রম স্পষ্টই দেখিতে পাই। আসল কথা এ বিষয়ে স্থূলদেহের বিশেষ দোষ নাই, ইহার জন্য আমাদের লোভই দায়ী। লোভই সংশোধনে বাধা দেয়—তাহার তাড়নাতেই আমাদের অভক্ষ্য ত্যাগ ঘটিয়া উঠে না। কোন কু অভ্যাস ত্যাগ করিতে আমাদের যদি বাস্তবিক ইচ্ছা থাকে তাহা হইলে আমরা নিশ্চয়ই তাহা ত্যাগ করিতে পারি। অনেকে সূক্ষ্ম দৃষ্টি পাইবার জন্য বড়ই ব্যাকুল, অথচ *আহারের লোভ ত্যাগ করিতে পারেন না।*

আজ যদি এরূপ পুরস্কার ঘোষণা করিয়া দেওয়া যায় যে, যিনি এক বৎসর কোন অপবিত্র দ্রব্য আহার করিবেন না তাঁহাকে দশলক্ষ টাকা পুরস্কার দেওয়া যাইবে, তাহা হইলে দেখিবেন আর স্বাস্থ্যের আপত্তি উঠিবে না—মদ্যমাংস ছাড়িয়া দেহ রক্ষার শত শত উপায় তৎক্ষণাৎ আবিষ্কৃত হইবে। দুঃখের বিষয় এই যে, দশ লক্ষ টাকার জন্য যাহা স্বচ্ছন্দে করিতে পারেন অমূল্য আধ্যাত্মিক জীবন লাভ করিবার জন্য তাহা করা অনেকে অসম্ভব মনে করেন। আন্তরিক ইচ্ছা থাকিলে কখন উপায়ের অভাব হয় না। আমরা ত ইচ্ছা করি না, ইচ্ছার ভাণমাত্র করিয়া থাকি, তাই আমরা সফল-কাম হইতে পারি না, তাই জীবনের পর জীবন যায়,অথচ কোন উন্নতি সাধন করিতে পারি না। কেবল কলুর বলদের মত সংসারচক্রে ঘুরিয়া বেড়ানই সার হয়, একপদও অগ্রগমন করিতে পারি না। আবার কখন কখন মনে হয়,"চেষ্টা করিয়াই বা ফল কি? আমাদের মত শক্তিহীন সাধারণ লোকের সূক্ষ্মদৃষ্টি লাভ এক প্রকার অসম্ভব।" এরূপ মনে করিয়া বসিয়া থাকিলে কোন কালেই অগ্রসর হইতে পারা যায় না। সকল সময়েই আমাদের খুব উচ্চ লক্ষ্য থাকা উচিত। যার লক্ষ্য যত উচ্চ তিনি তত উন্নতি লাভ করিয়া থাকেন এবং পরিশেষে সকল বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া পূর্ণকাম হন। হতাশ হইবার প্রয়োজন নাই, চেষ্টা করুন নিশ্চয় কৃতকার্য্য হইবেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীরূপ, সনাতন ও শ্রীজীব গোস্বামী।

মুখবন্ধ।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রধানতম আচার্য্য পূজ্যপাদ শ্রীরূপ গোস্বামী, শ্রীসনাতন গোস্বামী ও শ্রীজীব গোস্বামীকে অনেকেই নানা কারণে ব্রাহ্মণ বলিতে প্রস্তুত নহেন। কিন্তু শ্রীজীবগোস্বামী লঘুতোষণীর টীকার শেষভাগে আপনাদিগকে ব্রাহ্মণ বলিয়াই পরিচয় দিয়াছেন। আমরা এই মুখবন্ধে সাধারণের বিদিতার্থ শ্রীমদভাগবতের দশমস্কন্ধের লঘুতোষণী নাম্নী টীকার শেষভাগ হইতে কয়েকটি শ্লোকের অনুবাদ করিয়া দিলাম।

ভগবান্ চৈতন্যস্বরূপের প্রীতির নিমিত্ত রচিত এই বৈষ্ণবতোষণী নাম্নী দশস্কন্ধ টিপ্পনী সম্পূর্ণা হইলেন।

যিনি প্রথম বয়সেই স্বপ্নে কোন এক ব্রাহ্মণের নিকট হইতে একখানি শ্রীমদ্ভাগবত প্রাপ্ত হইলেন দেখিয়া, প্রাতঃকালে জাগরিত হইয়া ঐ স্বপ্নদৃষ্ট ব্রাহ্মণের নিকট হইতে বাস্তবিক একখানি শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ লাভ করিয়া শ্রীভগবানের প্রেমামৃত মহার্ণবে মগ্ন হইয়াছিলেন, এই টীকাখানি সেই শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামীরই লেখন।

আমার নাম জীব। আমি তাঁহারই পাদজীবী। উক্ত বিষয় নিবেদন করিয়া, আমি আরও কিছু বলিবার জন্য নিবেদন করিতেছি—

যাঁহার অমৃতস্রাবিণী জিহ্বাস্বরূপিণী কল্পলতায় অবস্থিতা ত্রয়ীরূপা মধুকরী মনোহর পদক্রম আশ্রয়পূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ নৃত্য করিয়া থাকেন, তিনিই পূর্ব্বকালে কর্ণাট দেশের রাজা ছিলেন। তাঁহার নাম সর্ব্বজ্ঞ জগদ্‌গুরু। তৎকালে সমস্ত রাজাই তাঁহার পূজা করিতেন। তিনি ভরদ্বাজ গোত্রোৎপন্ন ব্রাহ্মণ ছিলেন। সেই কশ্যপ-প্রজাপতি-সদৃশ সর্ব্বজ্ঞ জগদ্‌গুরুর অনিরুদ্ধ দেব নামে এক বিখ্যাত পুত্র জন্মে। তিনি চন্দ্রের ন্যায় যশস্বী, ইন্দ্রের ন্যায় প্রভাবশালী, সর্ব্বরাজপূজিত, যজুর্ব্বেদের একমাত্র বিশ্রাম স্থান ও লক্ষ্মীবান্ হয়েন। অনিরুদ্ধ দেবের দুইজন মহিষী ছিলেন। উক্ত মহিষীদ্বয়ের গর্ভে অনিরুদ্ধ দেবের দুইটি পুত্র হয়। ঐ দুইটি পুত্রের নাম রূপেশ্বর ও হরিহর। তন্মধ্যে রূপেশ্বর পূর্ব্বকর্ম্মবশে প্রেরিত হইয়া নানাশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হয়েন, এবং হরিহরও নিজ পূর্ব্বকর্ম্মবশে প্রেরিত হইয়া বিবিধশাস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী হয়েন। অনিরুদ্ধদেব যথাকালে বিষয়ে নির্ব্বিণ্ণ হইয়া মথুরামণ্ডলে যাইয়া বাস করেন। তিনি যাইবার সময় রূপেশ্বর ও হরিহর নামক পুত্রদ্বয়কে স্বীয় রাজ্য সমান দুইভাগে বিভাগ করিয়া দিয়া যান। কিছুদিন পরে হরিহর রূপেশ্বরকে হত্যা করিয়া তদীয় রাজ্যাংশ আত্মসাৎ করিবার ইচ্ছা করেন। রূপেশ্বর স্বভাবতঃ ধার্ম্মিক ও বিষয়বিরক্ত ছিলেন। তিনি কনিষ্ঠের দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া তীর্থযাত্রাচ্ছলে তাঁহাকে নিজ অংশের রক্ষণাবেক্ষণের ভার দেন। জ্যেষ্ঠের অংশ রক্ষণাবেক্ষণের ভার পাইয়া হরিহর উহা আত্মসাৎ করেন। এইরূপে শত্রু কর্ত্তৃক রাজ্য অপহৃত হইলে, রূপেশ্বর আটজন অশ্বারোহী ভৃত্য ও পত্নীর সহিত উৎকলাভিমুখে যাত্রা করেন। উৎকলে পুরুষোত্তমক্ষেত্রে তাঁহার বঙ্গদেশের

শিখরভূমির রাজার সহিত সাক্ষাৎ ও বন্ধুত্ব হয়। শিখরভূমিপতি মহেন্দ্র সিংহ বন্ধু রূপেশ্বরের অবস্থা সবিশেষ অবগত হইয়া স্বদেশগমনসময়ে সস্ত্রীক রূপেশ্বরকে সঙ্গে লইয়া আইসেন। তদবধি রূপেশ্বর শিখরভূমিতেই বাস করিতে থাকেন। ঐ স্থানে তাঁহার পদ্মনাভ নামে একটি সর্ব্বগুণান্বিত পুত্র জন্মে। পদ্মনাভ অল্প বয়সেই বিবিধ বিদ্যায় পারদর্শী হয়েন। কথিত আছে, সাঙ্গ যজুর্ব্বেদ ও উপনিষৎ সকল তাঁহার জিহ্বায় নৃত্য করিতেন। ঐ সময়ে যদুজীবন তর্কপঞ্চানন নামে একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত শিখরেশ্বরের সভাপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার একমাত্র কন্যা ভিন্ন অপর সন্তান ছিল না। ঐ কন্যাটির নাম রমা। রমা পরমাসুন্দরী ও বিবিধগুণবতী ছিলেন। শিখরেশ্বরের ইচ্ছানুসারে এই রমার সহিত পদ্মনাভের পরিণয়কার্য্য সমাহিত হয়। এই বিবাহের কিছুদিন পরেই যদুজীবন তর্কপঞ্চানন এবং রূপেশ্বর উভয়েই পরলোক প্রাপ্ত হয়েন। তাঁহাদিগের লোকান্তর প্রাপ্তির পর পদ্মনাভ বৃদ্ধা জননী, শাশুড়ী ও পত্নীর সহিত গঙ্গাতীরে বাস করিবার অভিলাষে শিখরভূমিতে বাসস্পৃহা পরিত্যাগপূর্ব্বক দনুজমর্দ্দন নামক রাজা কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া নবহট্ট অর্থাৎ নৈহাটী নামক স্থানে যাইয়া বাস করেন। ঐ স্থানে তিনি জগন্নাথদেবের শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহার সেবা প্রকাশ করেন। জগন্নাথদেবের অনুগ্রহে পদ্মনাভের আঠারটি কন্যা ও পাঁচটি পুত্র জন্মে। পুত্রগুলির নাম—পুরুষোত্তম, জগন্নাথ, নারায়ণ, মুরারি ও মুকুন্দ। কন্যাপুত্রোৎপত্তির পর পদ্মনাভ উত্তরাধিকারসূত্রে শ্বশুরের সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়া পূর্ব্ববঙ্গের বাকলা চন্দ্রদ্বীপ নামক স্থানে যাইয়া বাস করেন। মধ্যে মধ্যে নবহট্টেও আসিতেন এবং বাস করিতেন। যাতায়াতের সুবিধার নিমিত্ত যশোহরের অন্তর্গত ফতোয়াবাদ নামক গ্রামেও আর একটি বাসস্থান প্রস্তুত করেন। পদ্মনাভের কনিষ্ঠ পুত্র মুকুন্দের বিবাহের পর পদ্মনাভ গোলোকগত হয়েন। মুকুন্দের একটিমাত্র পুত্র হয়। ঐ পুত্রের নাম কুমারদেব। কুমারদেব পূর্ব্বপুরুষদিগের ন্যায় কৃতবিদ্য হয়েন। গৌড়নগরের উত্তরস্থা মহানন্দা নাম্নী স্রোতস্বতীর পূর্ব্বপারে মোর গ্রাম মাধাইপুরে (মটুক গ্রামে) কাশ্যপগোত্রীয় হরিনারায়ণ বিশারদের কন্যা রেবতীর সহিত কুমার দেবের বিবাহ হয়। কুমারদেব পিতার মৃত্যুর

পর সমৃদ্ধিসম্পন্ন বাঙ্গালার রাজধানী গৌড়নগরের নিকট বাসের অনুরোধে শ্বশুরালয়েই বাস করেন। ঐ স্থানে কুমারদেবের তিনটি পুত্র হয়। উক্ত পুত্রত্রয়ের নাম যথাক্রমে সনাতন, রূপ ও বল্লভ। ইঁহারা তিনজনেই পূজ্যতম বৈষ্ণবগণের প্রিয় হয়েন এবং ইঁহাদিগের হইতেই বংশ সুরপূজিত হয়। উক্ত ভ্রাতৃত্রয় সংসারে বিরক্ত হইয়া রাজ্যৈশ্বর্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপায় শ্রীকৃষ্ণপ্রেমভক্তিরাজ্যের রাজা হয়েন। যিনি সর্ব্বকনিষ্ঠ বল্লভ, তিনি আমার পিতা। তিনি অগ্রজ শ্রীরূপের সহিত নীলাচল গমনকালে গৌড়দেশে গঙ্গাতীরে তনুত্যাগপূর্ব্বক শ্রীরামচন্দ্রের চরণকমল লাভ করেন। পরে সনাতন ও রূপ শ্রীবৃন্দাবনে যাইয়া মথুরা-মণ্ডলের লুপ্ত তীর্থ সকল ব্যক্ত করেন এবং শ্রীব্রজরাজনন্দন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যে ভক্তি, তাহাই সর্ব্বত্র সুপ্রচারিত করেন। রঘুনাথ দাস ইঁহাদিগের প্রিয় মিত্র ছিলেন। এই রঘুনাথ দাস শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমরূপ সাগরের তরঙ্গমালায় সদাই বিচরণ করিতেন। অতীব আশ্চর্য্য এই যে, শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপের জগতে তুলনা না থাকিলেও, এই রঘুনাথ দাস ইঁহাদিগের তুল্যপদ লাভ করিয়াছিলেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দুগ্ধাহরণচ্ছলে গোপনবেশে শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপকে দর্শন দিয়াছিলেন। ইঁহারা মূলশ্লোকোক্ত গ্রন্থ সকল রচনা করিয়াছেন। এই বৈষ্ণবতোষণী শ্রীসনাতনের রচিত। তিনি যে বৈষ্ণব-তোষণী রচনা করেন, তাহা অত্যন্ত বৃহৎ হওয়ায়, সংক্ষিপ্ত করিবার নিমিত্ত আমাকে আদেশ করেন। আমি অতি ক্ষুদ্র জীব। ক্ষুদ্র হইলেও, তাঁহার আদেশানুসারে সংক্ষিপ্ত করিয়া বর্ত্তমান আকারে বৈষ্ণবতোষণী নাম দিয়া প্রকাশ করিতেছি। আমি এই গ্রন্থে বুদ্ধিপূর্ব্বক বা অবুদ্ধিপূর্ব্বক সাহস করিয়া যাহা লিখিয়াছি এবং যাহা পরিত্যাগ ও পরিবর্ত্তন করিয়াছি, তাহা জ্যেষ্ঠতাতপাদেরা ক্ষমা করিবেন। অথবা আশঙ্কার কোন কারণ নাই; কারণ, তাঁহারা যাহা আমার মনে স্ফুরিত করিয়াছেন, আমি তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়াছি। তাঁহারাই আমার বল। আমার আশ্রয়স্বরূপ গোপী-গণকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার। আমার আশ্রয়স্বরূপ গোপীজনবল্লভকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার।

পূর্ব্ববৃত্তান্ত।

পূর্ব্বকালে পদ্মানদীর তীরে আধুনিক মালদহ জেলায় গৌড়নামে এক অতি প্রসিদ্ধ নগর ছিল। প্রথমতঃ পালবংশীয়েরা পরে সেন বংশীয়েরা রাজত্ব করিয়া ঐ গৌড়নগরকে সমৃদ্ধিসম্পন্ন করেন। পরে যখন বঙ্গদেশ যবনগণের অধিকারভুক্ত হয়, তখন বিজয়ী আফগানগণও ঐ গৌড়কেই আপনাদিগের রাজধানী করেন। লোদীবংশীয়দিগের সাম্রাজ্যকালে, সৈয়দ্ হুসেন সা বা দ্বিতীয় আলা উদ্দীন গৌড়ের অধীশ্বর হয়েন। সৈয়দ হুসেন সা বা দ্বিতীয় আলা উদ্দীন ১৪৮৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৫১২ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। ইহার কয়েক বৎসর পরে অর্থাৎ ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দে যে মহামারী উপস্থিত হয়, তাহাতেই গৌড় জনশূন্য হইয়া যায়। গৌড় ধ্বংসের পর মুরর্শিদাবাদ বঙ্গের রাজধানী হয়। প্রাচীন গৌড়ের ভগ্নাবশেষ এখনও স্থানে স্থানে দৃষ্ট হইয়া থাকে।

কথিত আছে, গৌড়াধিপ হুসেন সা এক ফকিরের নিকট শুনিয়াছিলেন, সনাতন ও রূপ নামক দুইজন ব্রাহ্মণের মন্ত্রণায় গৌড়রাজ্য বিশেষ সমৃদ্ধি-সম্পন্ন হইবে, এবং চৈতন্য নামক কোন এক হিন্দুর অবতার গৌড়ে আগমন করিয়া তাঁহার ঐ দুই মন্ত্রীকে ফকির করিয়া দিলেই পুনশ্চ গৌড়রাজ্যের অবনতি আরম্ভ হইবে। এই ঘটনার কিছুদিন পরে গৌড়েশ্বর নিজ রাজধানীতে একশত কুড়ি ফুট উচ্চ একটি মুদারা (মনুমেণ্ট) প্রস্তুত করেন। যে মিস্ত্রী ঐ মুদারা প্রস্তুত করিতে থাকে, কোন কারণে গৌড়েশ্বর তাহার প্রাণদণ্ড করেন। ঐ মিস্ত্রীর প্রাণদণ্ড হওয়ায়, উক্ত মুদারা অসমাপ্ত অবস্থাতেই থাকিয়া যায়। পরে একদিন ঐ মুদারা দেখিয়া গৌড়েশ্বরের পুনশ্চ উহার নির্ম্মাণকার্য্য সমাধা করিবার ইচ্ছা হয়। তদনুসারে তিনি হিঙ্গা নামক একজন কর্ম্মচারীকে সনাতন ও রূপের বাসস্থান মোর গ্রাম মাধাইপুরে প্রেরণ করেন। মোর গ্রাম মাধাইপুরে ভাল ভাল মিস্ত্রী বাস করিত। গৌড়েশ্বর একজন ভাল মিস্ত্রী আনাইবার জন্যই হিঙ্গাকে ঐ স্থানে প্রেরণ করেন। কিন্তু অনবধানতা বশতঃ মোর গ্রামে যাইবার আদেশ করিয়াও হিঙ্গাকে যাইবার সময় মিস্ত্রী আনিবার কথা বলিয়া দিতে ভুলিয়া যান। হিঙ্গাও আদেশ পাইয়া ব্যস্ত সমস্ত হইয়া চলিয়া যায়, কি নিমিত্ত যাইতেছে, তাহা জিজ্ঞাসা করে নাই। পরে সে মাধাইপুরে উপস্থিত হইয়া, কি নিমিত্ত

আসিয়াছে, তাহা না জানিয়া, উৎকণ্ঠিতচিত্তে ইতস্তত: ভ্রমণ করিতে থাকে। সে যখন ঐ ভাবে ইতস্তত: ভ্রমণ করিতে থাকে, তখন সনাতন গোস্বামী নিজ গৃহে থাকিয়াই উহাকে দেখিতে পান। হিঙ্গাকে তদবস্থায় ভ্রমণ করিতে দেখিয়া, নিকটস্থ কনিষ্ঠ রূপ গোস্বামীকে উহার ইতস্তত: ভ্রমণের কারণ জিজ্ঞাসা করিতে বলিলেন। তদনুসারে রূপগোস্বামী হিঙ্গাকে নিকটে ডাকিয়া বলিলেন, "তুমি কে? কি নিমিত্তই বা উৎকণ্ঠিত ভাবে ইতস্তত: ভ্রমণ করিতেছ?" হিঙ্গা প্রত্যুত্তরে বলিল, "আমি গৌড়েশ্বরের পদাতিক, তাঁহারই আদেশে এই স্থানে আসিয়াছি, কিন্তু কি প্রয়োজনে আসিয়াছি জানি না; গৌড়েশ্বর আমাকে যখন মাধাইপুরে যাইতে আদেশ করেন, তখন আমি তাঁহাকে ঐরূপ আদেশের কারণ জিজ্ঞাসা করি নাই, তাড়াতাড়ি চলিয়া আসিয়াছি, এবং তিনিও বোধ হয় তদ্বিষয় বলিতে ভুলিয়া থাকিবেন।" তখন রূপ গোস্বামী বলিলেন, "গৌড়েশ্বর তোমাকে যে সময়ে মাধাইপুরে যাইতে আদেশ করেন, তখন তিনি কোন স্থানে অবস্থিতি করিতেছিলেন?" পদাতিক বলিল, তিনি তখন দুর্গের প্রান্তভাগস্থিত দূরবীক্ষণার্থ নির্ম্মিত একটি অত্যুচ্চ মুদারার পাদদেশে অবস্থান করিতেছিলেন। 'রূপ গোস্বামী পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন, ঐ মুদারার নির্ম্মাণকার্য্য কিছু অবশিষ্ট আছে কি?" পদাতিক উত্তর করিল, হাঁ, উহা যে মিস্ত্রী নির্ম্মাণ করিতেছিল, গৌড়েশ্বর কোন কারণে তাহার প্রাণদণ্ড করায়, উহা অসমাপ্ত অবস্থাতেই রহিয়াছে।" তখন রূপগোস্বামী বলিলেন, "আমিও উহাই অনুমান করিতেছিলাম। গৌড়েশ্বর তোমাকে রাজমিস্ত্রী লইয়া যাইবার নিমিত্ত এখানে প্রেরণ করিয়াছেন। এখানে উত্তমোত্তম রাজমিস্ত্রী বাস করে। তুমি একজন উত্তম রাজমিস্ত্রী লইয়া যাও।" পদাতিক রূপ গোস্বামীর কথার উপর নির্ভর করিয়া তাহাই করিল।

এ দিকে গৌড়েশ্বরও পদাতিককে রাজমিস্ত্রী লইয়া যাইবার কথা বলিতে বিস্মৃত হইয়াছেন মনে হওয়ায়, অপর একজন লোক পাঠাইবার ইচ্ছা করিতেছেন, এমন সময় পদাতিক রাজমিস্ত্রী সঙ্গে লইয়া গৌড়েশ্বরের সমীপে উপনীত হইল। গৌড়েশ্বর রাজমিস্ত্রী লইয়া আসিবার কারণ জিজ্ঞাসার পর পদাতিকের মুখে রূপগোস্বামীর বুদ্ধির পরিচয় পাইয়া এবং তাঁহাকেই ফকির

কথিত রূপ বুঝিয়া লোকদ্বারা উভয় ভ্রাতাকে রাজধানীতে আনাইলেন। পরে সাক্ষাতে ভ্রাতৃদ্বয়ের বিদ্যাবুদ্ধির বিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া জ্যেষ্ঠ সনাতনকে মন্ত্রিপদে এবং তৎকনিষ্ঠ রূপকে তৎসহকারিপদে নিযুক্ত করিলেন। গৌড়েশ্বর, সনাতনকে দবির খান্, রূপকে সাফর মল্লিক ও সর্ব্বকনিষ্ঠ বল্লভকে অনুপম মল্লিক উপাধি প্রদান করিলেন। তাঁহারা রাজপ্রাসাদের অনতিদূরে রামকেলি নামক গ্রামে বাসস্থান নির্ম্মাণ করাইয়া এবং ঐ স্থানে অপরাপর জ্ঞাতিগণকে আনাইয়া বাস করিতে লাগিলেন। ঐ স্থানে সনাতন গোস্বামী সনাতন-সাগর নামে একটি এবং রূপগোস্বামী রূপসাগর নামে অপর একটি বৃহৎ জলাশয় খনন করাইয়াছিলেন। ঐ দুই জলাশয় এখনও ঐ নামেই বিখ্যাত রহিয়াছে। এবং অদ্যাপি ঐ স্থানে বর্ষে বর্ষে বৈষ্ণবদিগের একটি মেলা হইয়া থাকে।

সনাতন গোস্বামী ও রূপগোস্বামী রাজকার্য্যের অনুরোধে যদিও বাহিরে অহিন্দু হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা অন্তরে অহিন্দু হয়েন নাই। লিখিত আছে, তাঁহারা রাজকার্য্যে ব্রতী হইবার পূর্ব্বেই সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের ভ্রাতা বিদ্যাবাচস্পতির নিকট অনেক শাস্ত্রগ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং রাজকার্য্যে ব্রতী হইয়াও অধ্যয়ন ত্যাগ করেন নাই, সময় পাইলেই শাস্ত্রচর্চ্চা করিতেন বলিয়া তাঁহাদিগের আলয়ে অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সমাগম হইত। তাঁহারা শাস্ত্রচর্চ্চার জন্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগকে বিশেষ সম্মান ও সাহায্য করিতেন। তাঁহাদিগের আচার ব্যবহারও বর্ণানুগত ছিল। তাঁহারা যবন-সংসর্গে আপনাদিগের বর্ণাশ্রমোচিত আচার ব্যবহার ত্যাগ করিয়া যবন-ভাবাপন্ন হয়েন নাই। সময়ে সময়ে তীর্থযাত্রার অভিলাষ হইত, কিন্তু অবসরাভাবে ঐ অভিলাষ পূর্ণ হইত না। অগত্যা তাঁহারা স্ব স্ব জলাশয়ে চতুর্দ্দিকে কানন প্রস্তুত করিয়া তন্মধ্যে শ্রীশ্রীরাধকৃষ্ণের বিগ্রহ স্থাপন করিয়া তাঁহারই পূজা করিতেন।

গৌড়েশ্বর, সনাতন ও রূপগোস্বামীর কার্য্যনৈপুণ্যে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে অনেক ভূসম্পত্তিও প্রদান করিয়াছিলেন। এইরূপে অতুল ঐশ্বর্য্যলাভ করিয়াও তাঁহারা মদমত্ত হইয়া ধর্ম্মানুশীলন ত্যাগ করেন নাই। অল্প সময়ের মধ্যেই জ্ঞানী ধার্ম্মিক ও দাতা বলিয়া তাঁহাদিগের যশঃসৌরভ

চারিদিকে বিস্তৃত হইয়াছিল। তন্নিমিত্ত বঙ্গদেশের নানাস্থান হইতে জ্ঞানী, ভক্ত ও কবি সকল আসিয়া তাঁহাদিগের সভা অলঙ্কৃত করিতেন। তাঁহারাও তাঁহাদিগের যথোচিত সমাদর করিতেন। প্রবাদ আছে, তাঁহারা গৃহাবস্থান কালেও দুই খানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী।

হিন্দুদর্শন।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(২)

আমরা প্রথম প্রবন্ধে ষড়দর্শনকে প্রথমতঃ শাস্ত্রমূলক ও যুক্তিমূলক দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া দেখাইয়াছি যে, হিন্দুর দর্শনশাস্ত্র মোক্ষশাস্ত্র, তাহা অপৌরুষেয়ী বেদবাণীর উপর সংস্থাপিত; সুতরাং যাঁহারা বেদের অপৌরুষেয়ত্ব ও জন্মান্তরবাদ স্বীকার করেন না, তাঁহারা হিন্দু নহেন ও হিন্দুর দর্শনশাস্ত্রে তাঁহাদের অধিকার নাই। তাঁহারা যাহাতে হিন্দুর দর্শন-শাস্ত্র পাঠ না করেন তজ্জন্য 'শপথোঽর্পিতঃ' হইয়াছে, তাঁহাদেরই আত্মার সদ্গতির জন্য।* অনন্তর আমরা ষড়দর্শনকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া প্রথম ভাগের, অর্থাৎ বেদান্তদর্শনের ও মীমাংসাদর্শনের প্রতিপাদ্য বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছি, কিন্তু এইরূপ বিভাগেও ষড়দর্শনের সমন্বয় হইতে পারে না; স্থূলভাবে ঐক্য অনৈক্য প্রদর্শিত হইতে পারে মাত্র। আমরা পাশ্চাত্যবিজ্ঞান ও হিন্দুদর্শনের একতা সম্পাদনের জন্য প্রয়াসী;

---

* Nor is it only from the garrulous and ignorant that foolish and unworthy criticisms proceed. There is the fatal habit of many minds to take up a celebrated writer under the bias of a foregone conclusion; and a Darwin, on a compte (we may add, a Gita or Bhagbat, Sreekrishna's Ras-Leela or Lord Gaurang's Philosophy) is read, not with the serious desire to understand a doctrine, but to find contradictions and absurdities which may justify the savage satis-faction of contemp.

সুতরাং আমাদের এমন কোন আলোকবর্ত্তিকা গ্রহণ করিতে হইবে, যাহার সাহায্যে 'অজ্ঞাত বিজ্ঞাত হয়, অশ্রুত শ্রুত হয়।' প্রথমে দেখা যাউক, এইরূপ কোন আলোক প্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে কি না? আমার সমালোচক হয় ত বলিবেন আমি আলেয়া দেখিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছি। আমি নিজেই বহুপূর্ব্বে লিখিয়াছি ;—

"ষড়দর্শনবেত্তা প্রসিদ্ধ পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয় হিন্দুশাস্ত্রের বৈজ্ঞানিক ও আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার দ্বারা নব্য হিন্দুগণের মনে নানা প্রকার নূতন তত্ত্ব প্রস্ফুরিত করেন। বঙ্গবাসী পত্রিকায় বহুকাল যাবৎ সপ্তাহে সপ্তাহে তাঁহার ঐ সমস্ত ব্যাখ্যা প্রকাশিত হয়। তখন একদল উচ্চ শিক্ষিত যুবক তাঁহার বিপক্ষে দাঁড়াইয়াছিলেন। আমরা উভয় পক্ষের নির্লিপ্ত বাদানুবাদের এক পংক্তিও পাঠ করিবার অবসর পাই নাই। তবে এক দিনের ঘটনা জানি। তর্কচূড়ামণি মহাশয় ষড়দর্শন সামঞ্জস্য করিয়া বক্তৃতা করিবেন বলিয়া বিজ্ঞাপন বিতরিত হইল। বক্তৃতাস্থল সংস্কৃত কলেজ। সভাপতি হইলেন স্বয়ং মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন। যথা সময়ে সভা বসিল। সভাপতি মহাশয় উঠিয়া বলিলেন—'প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ দার্শনিকগণ যাহা করিতে পারেন নাই, অদ্য তর্কচূড়ামণি মহাশয় তাহাই করিতে চাহিতেছেন' ইত্যাদি। আর কি চাও? উভয় দলের মধ্যে পরস্পরের প্রতি চেয়ার ফেলাফেলি—গোলমাল—সভাভঙ্গ !!"

বাস্তবিক ষড়দর্শন সমন্বয় করা সুসাধ্য ব্যাপার নহে। সাক্ষাৎ শঙ্করের অবতার শ্রীশঙ্করাচার্য্য বেদান্তদর্শনের (অপর নাম শারীরক সূত্রের) শারীরক ভাষ্যে সাংখ্যদর্শনকে তীব্রভাবে আক্রমণ করিয়াছেন, এবং বেদান্ত-দর্শনের অনেকাংশ সাংখ্যমত খণ্ডনে ব্যয়িত হইয়াছে। সাংখ্যসূত্রের ভাষ্যকার বিজ্ঞান ভিক্ষু ও সাংখ্যকারিকার ভূমিকায় শ্রীশঙ্করাচার্য্যের মায়াবাদকে অসৎ শাস্ত্র বলিয়া তাহার পোষকতায় পদ্মপুরাণ হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। মহাপ্রভু চৈতন্যদেবও বাসুদেব সার্ব্বভৌমের সহিত তর্ক করিবার সময় শ্রীশঙ্করাচার্য্যের মায়াবাদকে অসৎ শাস্ত্র বলিয়া ঐ দুই শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছিলেন। সেই দুইটী শ্লোক এই ;—

"স্বাগমৈঃ কল্পিতৈস্ত্বঞ্চ জনান্ মদ্বিমুখান্ কুরু।
মঞ্চ গোপয় যেন স্যাৎ সৃষ্টিরেষা উত্তরোত্তরা ॥" (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্য খণ্ডের ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদে পদ্মপুরাণ উত্তরখণ্ড ধৃত বচনং।)

শ্রীকৃষ্ণ শিবকে বলিয়াছেন,—তুমি কল্পিত তন্ত্রদ্বারা মনুষ্য সকলকে আমা হইতে বিমুখ কর, এবং আমাকে গোপন কর। তাহার দ্বারা উত্তরোত্তর এই সৃষ্টি হইবেক।

অপিচ—"মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছনং বৌদ্ধমুচ্যতে।
ময়ৈব বিহিতং দেবি! কলৌ ব্রাহ্মণমূর্ত্তিনা॥" (এই শ্লোকটী এখনকার বম্বে পুনার মুদ্রিত পদ্মপুরাণোত্তরখণ্ডের ২৬৪ অঃ পাওয়া যায়।)

অস্যার্থ—শ্রীশঙ্কর ভগবতীকে কহিতেছেন,—হে দেবি! মায়াবাদ অসৎ শাস্ত্র, যাহাকে সজ্জনেরা প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ শাস্ত্র কহেন। আমিই কলিকালে ব্রাহ্মণ শঙ্করাচার্য্যের মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ইহা বিধান করিয়াছি। সমগ্র দর্শন শাস্ত্রকে অদ্বৈতবাদ ও দ্বৈতবাদ এই দুই ভাগে বিভক্ত করিলে বিভিন্ন দার্শনিক মত ও ধর্ম্মমত কথঞ্চিৎ সমঞ্জস হইতে পারে।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে মহাত্মা অগস্তকোমৎ (Auguste compte) সর্ব্ব বিজ্ঞান সমন্বয়ের চেষ্টা করিয়াছিলেন। মহাত্মা হার্ব্বাট স্পেন্সার (Mr. Herbert Spencer) ঐ সমন্বয়ে দোষ প্রদর্শন করেন। ইংরাজী মনোবিজ্ঞানের ইতিবৃত্ত লেখক মিষ্টার লুইস্ বলেন—"হার্ব্বাট স্পেন্সার কোমৎ দর্শন উপরে উপরে পাঠ করিয়াছেন, ভাল করিয়া বুঝিতে পারে নাই, এই জন্য কোম্তের সমালোচনায় ভ্রমে পতিত হইয়াছেন।"* মিষ্টার হাম্বোল্ডের (Humboldt) ন্যায় সর্ব্ববিজ্ঞানশাস্ত্রে পারদর্শী মহাপণ্ডিত পাশ্চাত্য জগতে আর কেহই ছিলেন না; তিনিও সর্ব্ববিজ্ঞানশাস্ত্রের সামঞ্জস্য করিতে অগ্রসর হয়েন নাই।

হিন্দুদর্শনশাস্ত্রের ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সমন্বয় করিতে না পারিলেও পার্থক্য অনায়াসে প্রদর্শন করা যাইতে পারে, এবং এমন সার্ব্বভৌমিক যুক্তি

---

* I conceive this an immense mistake; and I regret to find Mr. Herbert Spencer countenancing it; though his avowedly superficial acquaintance with the system renders the error excusable.

প্রদর্শন করা যাইতে পারে যাহার সাহায্য সমগ্র দর্শনশাস্ত্র ও বিজ্ঞানশাস্ত্রই গ্রহণ করিয়াছেন। বিশেষতঃ এই পরিদৃশ্যমান্ জগতের আদিকারণ ও সৃষ্টিক্রিয়া প্রদর্শন করিতে হইলে প্রকৃতি ও পুরুষের সম্বন্ধ, প্রকৃতি ও সত্ত্ব-রজস্তম গুণের সম্বন্ধ, সত্ত্বরজস্তমগুণ পদার্থের সহিত বিজ্ঞানের (Atom) পরমাণুর কি সম্বন্ধ, জড়পদার্থ কি বাস্তবিকই জীবনহীন অথবা জীবিত, সমস্ত জড়পদার্থ এক কি না, সমগ্র শক্তি একশক্তি কি না, সমগ্র পদার্থ ও শক্তি এক কি না, সমগ্র সৃষ্টির উৎস এক কি না, সৃষ্টিকর্ত্তা ও সৃষ্ট পদার্থ এক কি না, কার্য্য ও কারণ এক কি না, অবশেষে 'একমেবাদ্বিতীয়ং' তত্ত্ব সত্য কি না, এই সকল বিষয়ের আলোচনা করা যাইতে প্যরে।

আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি পাশ্চাত্য বিজ্ঞান প্রাচ্যদর্শনশাস্ত্রের অংশ বিশেষ। পাশ্চাত্য দেশে ধর্ম্মশাস্ত্রের সহিত বিজ্ঞানের ঘোর শত্রুতা চলিয়াছে। যদি ধর্ম্মশাস্ত্র উত্তর দিকে যাইতে বলে, বিজ্ঞান তাহা অগ্রাহ্য করিয়া বিপরীত দিকে গমন করে কেন? যখন ইস্‌লাম ধর্ম্ম বিজ্ঞান লইয়া স্পেন্ দেশের দক্ষিণে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন, তখন খৃষ্টান ধর্ম্ম বলদর্পে গর্ব্বিত হইয়া শিশুবিজ্ঞানের কতই না অনিষ্ট করিয়াছেন! কোপারনিকাস্ (Copernicus) মৃত্যুশয্যায় শায়িত হইয়া তাঁহার বিজ্ঞান গ্রন্থের নিকট শেষ বিদায় লইয়াছিলেন। যখন গ্যালিলিও (Galileo) বধ্যভূমিতে নীত হইয়া অস্ফুট কম্পিত স্বরে তাঁহার আবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক সত্য অস্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, যখন জীবিত মনুষ্যকে বৈজ্ঞানিক সত্য প্রচারের জন্য অগ্নিতে দগ্ধ হইতে হইত, অথবা রাজ আজ্ঞায় কুঠারাঘাতে ঘাতকের হস্তে প্রাণ দিতে হইত, সেই সকল দিনের কথা একবার স্মরণ করিয়া দেখুন। এখন বিজ্ঞান আর শিশু নহেন, বলিষ্ঠ যুবক হইয়াছেন এবং বৃদ্ধ ধর্ম্মশাস্ত্রের উপর প্রতিশোধ লইতেছেন। কিন্তু হিন্দুদিগের বেদান্তদর্শন, জড়পদার্থকে প্রাণরূপ মহামূল্যবান্ মণিদ্বারা বিভূষিত করিয়াছেন। তজ্জন্যই আমাদের আশা আছে যে, হিন্দুদর্শনশাস্ত্র ও পাশ্চাত্যবিজ্ঞানকে এক সূত্রে গ্রথিত করা যাইতে পারিবে।

হিন্দুগণের সুপ্রসিদ্ধ ষড়দর্শন ব্যতীত আরও অনেক দর্শন আছে, তাহা শ্রীমাধবাচার্য্যের সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ নামক গ্রন্থে সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত আছে।

এতদ্ব্যতীত বৈষ্ণবদর্শনও আছে। বৈষ্ণবদর্শনে বর্ণিত সৃষ্টির মূলতত্ত্ব ও প্রতীচ্য বিজ্ঞানের সৃষ্টির মূলতত্ত্ব প্রায়ই কোলাকোলি করিয়াছেন। উভয়ই সৃষ্টির আদিকারণ সঙ্কর্ষণ দেবের অনুসন্ধান পাইয়াছেন, কিন্তু বৈষ্ণব দর্শন আরও উর্দ্ধদেশে বিরজার পরপারে গোকুলাখ্য পরব্যোমে গমন করিয়াছেন। ইহার উর্দ্ধে আর কেহ গমন করিতে পারেন নাই। সেই আনন্দময় ভুবনের এক কণ ত্রিভুবনকে আনন্দসাগরে ডুবাইয়া ফেলিয়াছে। সেই আনন্দময় শ্রীকৃষ্ণ "জ্যোতিরাভ্যন্তরে রূপং দ্বিভুজং শ্যামসুন্দরং" রূপে শক্তি ও পরিকরগণ লইয়া বিরাজ করিতেছেন। ইহার সাক্ষী কে? প্রমাণ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। তিনি গীতায় বলিয়াছেন ;—

"বিষ্ঠভ্যাহমিদং কৃৎস্ন মেকাংশেন স্থিতো জগৎ"। গীতা ১০।৪২।

"জন্মকর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোহর্জ্জুন॥" গীতা ৪।৯।

"অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতং।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥" গীতা ৯।১১।

আমি সর্ব্বভূতের মহেশ্বর, কিন্তু ইদানীং লীলাকরণার্থ নরবপু গ্রহণ করিয়াছি। মূর্খগণ আমার পরমতত্ত্ব না জানিয়া মানুষদেহধারী আমাকে অবজ্ঞা করিয়া থাকে।

বেদান্ত দর্শনের প্রথম সূত্র—"অথাতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা," এবং শেষ সূত্র "অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ," মোট সাড়ে পাঁচ শত সূত্র।

মীমাংসা দর্শনের প্রথম সূত্র—"অথাতো ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা।"

অথাতঃ = অথ + অতঃ।

'অথ' তিন প্রকার অর্থে প্রযুক্ত হয়, (১) মঙ্গলাচরণ (২) আনন্তর্য্য (৩) অধিকার। বেদান্তদর্শনের "অথাতো" এই অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে—অথ অনন্তর (চিত্তশুদ্ধির অনন্তর অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধি বিধান করিয়া) অতঃ—এই হেতু, মুমুক্ষু জীবের মুক্তিলাভার্থ, ব্রহ্মজিজ্ঞাসা, অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য যত্ন করা উচিত। চিত্তশুদ্ধির উপায়, তটস্থ লক্ষণ ও স্বরূপ লক্ষণ দ্বারা ব্রহ্মনিরূপণ, এবং ব্রহ্মজ্ঞান লাভের উপায় পরে আলোচিত হইবে।

মীমাংসা দর্শনের "অথাতো" এই অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে—অথ অনন্তর

(বেদাধ্যয়নের অনন্তর, বেদ অধ্যয়ন হইয়াছে তৎপর কি কর্ত্তব্য), অতঃ এই হেতু, অর্থাৎ বেদ অধ্যয়ন হইয়াছে, এক্ষণে বেদমন্ত্রের প্রকৃত অর্থ বুঝিয়া ধর্ম্মজিজ্ঞাসা, অর্থাৎ প্রকৃত ধর্ম্ম জ্ঞাত হইবার ইচ্ছা কর্ত্তব্য। এই দর্শনে জৈমিনি ঋষি বেদান্ত ক্রিয়াকলাপ অনুষ্ঠান করিবার উপদেশ করিয়াছেন। তিনি বলেন—"চোদনা লক্ষণোঽর্থো ধর্ম্মঃ।"

ক্রিয়াপ্রবর্ত্তক বেদবাক্য, যদ্দারা ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্ট পরিহার রূপ নিঃশ্রেয়স (পরম প্রয়োজন) সম্পাদিত হইয়া থাকে তাহাই ধর্ম্ম।

"তস্য নিমিত্তপরীষ্টিঃ—ধর্ম্মের নিমিত্ত পরীষ্টি (নিমিত্ত পরীক্ষা) অর্থাৎ প্রকৃত নিমিত্ত কি তাহা নির্ব্বাচিত হওয়া আবশ্যক।

বৈশেষিক দর্শনে কণাদ ঋষি বলেন,—"যতোঽভ্যুদয়ো নিঃশ্রেয়স সিদ্ধিঃ স ধর্ম্মঃ"—যাহা হইতে স্বর্গাদি সুখ জন্মে এবং দুঃখের আত্যন্তিকী নিবৃত্তি (অর্থাৎ মুক্তি) হয় তাহাকে ধর্ম্ম বলে। কণাদ ঋষি আরও বলেন :—

"ধর্ম্ম বিশেষ প্রসূতাৎ দ্রব্যগুণকর্ম্মসামান্যবিশেষসমবায়ানাং।
পদার্থানাং স্বাধর্ম্মবৈ ধর্ম্মাভ্যাং তত্ত্বজ্ঞানান্নিঃশ্রেয়সঃ॥"

ঐহিক বা জন্মান্তরীণ সুকৃতি বিশেষ থাকিলে পুরুষের দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায় এ সমস্ত পদার্থের স্বাধর্ম্ম বৈধর্ম্ম (স্বজাতীয় বিজাতীয়) ধর্ম্মের সহিত তত্ত্বজ্ঞান (যাথার্থ্য জ্ঞান) জন্মে, এবং ঐ যাথার্থ্যজ্ঞান হওয়াতে মিথ্যাজ্ঞানাদির নাশ হয় ও পুরুষ নিঃশ্রেয়স অর্থাৎ নিরতিশয় মঙ্গলরূপ মুক্তি লাভ করে।

বেদান্তদর্শন মতে ব্রহ্মজ্ঞান ভিন্ন মুক্তির অন্য পথ নাই—"নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়", এই দর্শনের মায়াবাদী ভাষ্যকার বলেন যে, কর্ম্ম ও ভক্তি উপায়, একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞানই উপেয়। সাংখ্যদর্শন মতে প্রকৃতিপুরুষ বিবেক না জন্মিলে মুক্তি হয় না। পাতঞ্জল দর্শনমতে যোগসাধন দ্বারা সর্ব্ব দুঃখ নিবারিত হইয়া মুক্তি লাভ হয়। মীমাংসা ও বৈশেষিক দর্শন মুক্তি ভুক্তি (সুখভোগ, স্বর্গভোগ) প্রদান করিতে অঙ্গীকার করেন। ন্যায়-শাস্ত্রানুসারে ঈশ্বর এক, তাঁহার ইচ্ছা নিত্য, তিনি জীবের কর্ম্মফলদাতা, এবং জীব বহুল, জীবও নিত্য; দিক্, কাল, আকাশ, পরমাণু নিত্য; জীব চিরকাল জ্ঞানফল বা কর্ম্মফল ভোগ করে।

বৈষ্ণবদর্শন মুক্তি ও ভুক্তিকে পিশাচী বলিয়া ঘৃণা করেন। এই দর্শন মতে পরাভক্তির বা প্রেমই উপেয় অর্থাৎ জীবের প্রয়োজন। সাধনাখ্যা ভক্তি প্রেম প্রাপ্তির উপায় অর্থাৎ অভিধেয়। ভগবান্ ও জীব উভয়ই নিত্য, সর্ব্বদাই পৃথক্, এবং ভগবানের সহিত জীবের একটী নিত্য সম্বন্ধ আছে, তাহা এই; জীব ভগবানের নিত্যদাস (দাসভূতো হরেরেব নান্যস্যৈব কদাচন—বেদান্তস্যমন্তক।

"ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে।
তাবদ্ ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ॥"

যতদিন পিশাচীস্বরূপা নিজেন্দ্রিয় সুখবাঞ্ছা ও আত্মপ্রীতি রূপা মুক্তির স্পৃহা হৃদয় অধিকার করিয়া বসিয়া থাকে, ততদিন ভক্তিসুখ কিরূপে উদয় হইতে পারে?

"সালোক্য সার্ষ্টি সামীপ্য সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥" শ্রীভাগবত ৩।২৯।১১।

ভগবান কহিলেন—সালোক্য (আমার সহিত এক লোকে বাস), সার্ষ্টি- (আমার সহিত সমান ঐশ্বর্য্য), সামীপ্য (পার্ষদত্ব), সারূপ্য (সমান রূপ), একত্ব (সাযুজ্য মুক্তি), এই পঞ্চবিধ মুক্তি আমি প্রদান করিলেও আমার নিজ জনেরা (শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তগণ) আমার ঐকান্তিকী সেবা ব্যতীত গ্রহণ করেন না।

ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শন মতে সর্ব্বপ্রকার সুখ দুঃখের অনুভূতি বর্জ্জনই মুক্তি। বৈষ্ণবদর্শন ইহাকে আত্মার স্থাণুবদবস্থা বলিয়া ধিক্কার দেন। এইরূপ মুক্তি জ্ঞানের পরিণাম এই জন্য ভক্তগণ জ্ঞানকে ভয় করেন। বৈষ্ণবদর্শন ভক্তিকামী; বৈষ্ণবগণ সর্ব্বদা পূর্ণানন্দে বিভোর থাকিতে বাঞ্ছা করেন। বৈষ্ণবের উক্তি এইরূপ;—

নির্ব্বাণ নিম্বফলমেব রসানভিজ্ঞাশ্চুষন্তু নাম রসতত্ত্ববিদা বয়ন্তু।
শ্যামামৃতং মদনমন্থর গোপরামা নেত্রাঞ্চল চুলকিতাবমিতং পিবামঃ॥
অরসজ্ঞ কাক চুষে জ্ঞাননিম্বফলে, রসজ্ঞ কোকিল খায় প্রেমাম্র মুকুলে॥
অভাগিয়া জ্ঞানী আস্বাদয়ে শুষ্কজ্ঞান, কৃষ্ণপ্রেমামৃত পান করে ভাগ্যবান্॥

অর্থাৎ মদনমন্থরগতি গোপরামাগণের নেত্রাঞ্চল দ্বারা পীতাবশিষ্ট

কৃষ্ণামৃতই আমাদের একমাত্র পেয়। গোপিকাগণ কে? তাঁহার প্রেমের বীজ রোপণ করেন।

"প্রেমকারিগর মোরা যত সখীজন।
ভাঙ্গিলে গড়িতে পারি পিরীতি রতন॥"

সখা সখীর অনুগত না হইলে ভক্তিলতার বীজ হৃদয়ক্ষেত্রে উপ্ত (রোপিত) হয় না, এবং কীর্ত্তনাদি বারি সেচন না করিলেও তাহা অঙ্কুরিত হয় না। এ বিষয় পরে আলোচনা করা যাইবে।

বৈষ্ণবদর্শন শাস্ত্র নামক স্বতন্ত্র কোন দর্শনশাস্ত্র নাই। বেদান্ত এবং শ্রীমদ্ভাগবত ভক্তিসাধন বিষয়ে যে প্রণালী বিধিবদ্ধ করিয়াছেন ও যাহা সুপ্রসিদ্ধ সাধক পদকর্ত্তাদের কীর্ত্তনে পরিস্ফুট হইয়াছে, তাহা হইতে ভগবদ্‌তত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব, জীবশক্তি, সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন প্রভৃতি সম্বন্ধে যে সকল তত্ত্ব নির্ণীত হইয়াছে তাহাই বৈষ্ণবদর্শন নামে অভিহিত হইয়া থাকে। মহাপ্রভু চৈতন্যদেব "অচিন্ত্য ভেদাভেদ" আলোচনা করিয়া এই দর্শনের পুষ্টিসাধন করিলেন। শ্রীল জীব গোস্বামী ষট্‌সন্দর্ভ প্রণয়ন করিয়া এই দর্শনের স্বতন্ত্রতা সংস্থাপন করিয়াছেন। বৈষ্ণব মতের পোষকতায় বেদান্তসূত্রের অনেক ভাষ্য রচিত হইয়াছে; তাহার অধিকাংশের উদ্দেশ্যই শ্রীশঙ্করাচার্য্যের শারীরক ভাষ্যের অদ্বৈতবাদ ও মায়াবাদ খণ্ডন করা। শ্রীরামানুজ স্বামী বিশিষ্ট অদ্বৈতবাদ সমর্থন করিয়া বেদান্তসূত্রের এক ভাষ্য লিখিয়াছেন, তাহার নাম শ্রীভাষ্য। শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ লিখিয়াছেন;—

"শ্রীমধ্বঃ প্রাহ বিষ্ণুং পরতম মখিলাম্নায় বেদ্যঞ্চ বিশ্বং।
সত্যং ভেদশ্চ জীবানাং হরিচরণজুষাস্তার তম্যঞ্চ তেষাং।
মোক্ষং বিষ্ণ্বঙ্ঘ্রিলাভং তদমলভজনং তস্য হেতুঃ প্রমাণং।
প্রত্যক্ষাদি ত্রয়ঞ্চেত্যুপাদিশতি হরিঃ কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রঃ॥"

শ্রীমধ্বচার্য্য বলেন—(১) একমাত্র হরিই পরতম বস্তু (২) অখিল বেদের প্রতিবাদ্য ও বেদ্য শ্রীহরি (৩) হরির এবং জীবগণের প্রভেদ সত্য (৪) জীব হরির নিত্যদাস (৫) বিষ্ণুপদলাভ অর্থাৎ হরির ঐকান্তিকী সেবার অধিকার লাভই জীবের মুক্তি (৬) অমলা ভক্তি অর্থাৎ অহৈতুকী ভক্তিই মুক্তির সাধন (৭) প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আপ্তবচন, এই তিন প্রকার প্রমাণ।

শ্রীরামানুজের মতে চিৎ, অচিৎ ও ঈশ্বর এই তিন প্রকার পদার্থ। জীব চিৎ-সংজ্ঞাভুক্ত। জড়পদার্থের সাধারণ নাম অচিৎ। জগতের নিয়ামক ঈশ্বর। এই তিন পদার্থই সত্য। ঈশ্বর চিৎ ও অচিতের সহিত অভিন্ন হইয়াও ভিন্ন।

শ্রীমধ্বাচার্য্য বলেন—"জীবেশ্বরৌ ভিন্নৌ সর্ব্বদেব বিলক্ষণৌ"—জীব ও ঈশ্বর ভিন্ন, সর্ব্বদা বিভিন্ন।

বেদ ও বেদান্তের (বেদের শিরোভাগ বা উপনিষৎ) অর্থ শ্রীশঙ্করাচার্য্য একরূপ করিয়াছেন; দ্বৈতবাদিগণ ও বিশিষ্ট অদ্বৈতবাদিগণ অন্যরূপ করিয়াছেন। এই জন্যই হিন্দুদর্শন প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে, (১) অদ্বৈতবাদ (২) দ্বৈতবাদ। বেদ তিন ভাগে বিভক্ত, (১) সংহিতা; (২) ব্রাহ্মণ (৩) আরণ্যক। বেদের ছন্দোময় স্তোত্রাবলির নাম সংহিতা, যজ্ঞাদি সম্পাদনের জন্য গদ্যময় নিয়মাবলি ও মন্ত্রের নাম ব্রাহ্মণ; অরণ্যবাসী সন্ন্যাসীদিগের জন্য ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশাবলি আরণ্যক বা উপনিষৎ। বৃহদারণ্যক উপনিষদের "অন্তর্য্যামী ব্রাহ্মণ" বা উদ্দালকযাজ্ঞবল্ক্য সংবাদ দ্বারা ও অন্যান্য বেদান্তের সাহায্যে দ্বৈতবাদিগণ তাঁহাদের মত স্থাপন করিয়াছেন। শ্রীজীব গোস্বামী ঘোর দ্বৈতবাদী। তিনি গোপাল উপনিষৎ সাহায্যে ও অন্যান্য বেদান্ত দিয়া দ্বৈতবাদ স্থাপন করিয়াছেন। গোপালতাপনী উপনিষৎ প্রামাণিক গ্রন্থ; এই উপনিষদে আছে—"কৃষ্ণ এব পরো দেব স্তং ধ্যায়েৎ, তং রসেৎ, তং ভজেৎ, তং যজেৎ।" অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র পরম দেবতা, তাঁহাকেই ধ্যান করিবে। তাঁহার প্রেম মাধুর্য্য আস্বাদন করিবে। তাঁহাকেই ভজন পূজনকরিবে।

শ্রীজীব গোস্বামী যেরূপ যুক্তিবলে মায়াবাদ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহার আভাস পরে দেওয়া যাইবে।

অনেক সরলমতি মহাত্মারা মনে করেন যে, গোপালতাপনী উপনিষদে বৈদিক শ্রীকৃষ্ণের কথাই আছে, এই বৈদিক শ্রীকৃষ্ণ ব্রজগোপিকাদের "বসন চোরা" নহে, এ কথা বোধ হয় দর্শনশাস্ত্রে নাই। আমি তাঁহাদের তৃপ্তির জন্য প্রমাণপটু নৈয়ায়িকদের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ভাষাপরিচ্ছেদের মঙ্গলাচরণ শ্লোকটী উদ্ধৃত করিলাম;—"নূতন জলধররুচয়ে গোপবধূটী-দুকূলচৌরায়। তস্মৈ নমঃ কৃষ্ণায় সংসারমহীরুহস্য বীজায়॥"

নবনীরদকান্তি, ছোট ছোট গোপবধূদিগের বসনচোর, সংসারবৃক্ষের (ভবাটবী—ভাগবতে) বীজস্বরূপ, সেই কৃষ্ণকে (তস্মৈ—অর্থাৎ শ্রুতি, স্মৃতি পুরাণাদিতে) প্রসিদ্ধ নমস্কার করি।

শ্রীশঙ্করাচার্য্য অদ্বৈতবাদ বা মায়াবাদের সংস্থাপক। তাঁহার মতে পরমাত্মা ও জীবাত্মা অভেদ, অথবা জীবাত্মার স্বতন্ত্র কোন অস্তিত্ব নাই, পরমাত্মারই প্রতিবিম্ব বিশেষ। মায়া সম্মোহিত আত্মা জীব, মায়ামুক্ত আত্মা পরমাত্মা।

শ্রীরামানুজ স্বামী বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের প্রচারক। তাঁহার মতে জীব, ব্রহ্ম চিদ্রূপে অভেদ, কিন্তু উভয়ের স্বগত ভেদ আছে। ভেদ তিন প্রকার,—স্বজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত। এক মনুষ্যের সহিত অপর মনুষ্যের যে ভেদ তাহা স্বজাতীয় ভেদ; এক মনুষ্যের সহিত এক পশুর যে ভেদ তাহা বিজাতীয় ভেদ; এবং এক মনুষ্যের সহিত তাহার কেশ লোমাদির যে ভেদ, এক বৃক্ষের সহিত তাহার পল্লব পুষ্পাদির যে ভেদ তাহাই স্বগত ভেদ।

শ্রীমধ্বাচার্য্য স্বামী দ্বৈতবাদী। তাঁহার মতে জীব অণু এবং ভগবানের নিত্যদাস। ভগবান্ ও জীব অনাদিকাল হইতে পৃথক্। জীব বিষ্ণুকে সেবা করিয়া বৈকুণ্ঠলোকে গমন করিতে পারেন।

শ্রীবল্লভাচার্য্য বিশুদ্ধাদ্বৈতবাদী। তাঁহার মতে জীব শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস, গোলকধামে শ্রীকৃষ্ণের নিত্যপার্ষদত্ব লাভ করাই জীবের মোক্ষ। তিনি মধুর রসের ও রাগানুগা ভক্তির পক্ষপাতী।

মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদ এইরূপ—জীব ও ভগবানের সম্বন্ধ অচিন্ত্য। জীব ভগবান্ হইতে ভেদ (ভিন্নও) বটে, অভেদ (অভিন্নও) বটে। জীব ভগবানের নিত্যদাস।

"দাসভূতো হরেরেব নান্যস্যৈব কদাচন" (বেদান্তস্যমন্তক)। অনাদি-কাল হইতে জীব শ্রীহরির নিত্যদাস।

জীব ভগবান্ হইতে প্রসূত হইয়াছে বটে, এবং জীবকে প্রসব করিতে ভগবান্‌কে অপর কোন উপাদান গ্রহণ করিতে হয় নাই বটে, কিন্তু জীব ও ভগবান্ এক নহে। জীব ভগবান্ হইতে প্রসূত হইয়াছে এই অর্থে জীব ভগবানের সহিত অভেদ, যেমন পিতাই পুত্ররূপে জন্মগ্রহন করেন, এই অর্থে পুত্র পিতা হইতে তত্ত্বতঃ অভেদ, কিন্তু স্বরূপতঃ ভেদ। পিতা

চিরকাল পিতাই থাকেন, পুত্র পুত্রই থাকেন। এইরূপ জীব ও ভগবান্ সর্ব্বদাই বিলক্ষণ।

শ্রীশঙ্করাচার্য্য বলেন মহর্ষি বেদব্যাস বেদান্তদর্শন দ্বারা বিবর্ত্তবাদ স্থাপন করিয়াছেন, অর্থাৎ এক ব্রহ্ম মাত্র সত্য, তদ্ভিন্ন জগৎ, জীব, সৃষ্টি সমস্তই মিথ্যা মায়াকল্পিত। শ্রীচৈতন্যদেব বলেন মহর্ষি বেদব্যাস বেদান্তদর্শন দ্বারা পরিণামবাদ স্থাপন করিয়াছেন; ব্রহ্ম ও সত্য, ব্রহ্ম হইতে প্রসূত জীব ও জগৎ সত্য। সমস্ত জীবকে জীববৃত্তি বা জীবশক্তি কহা গিয়া থাকে। সেই জীবশক্তি পরমাত্মার অংশ, তাঁহাকে ব্রহ্মের তটস্থা শক্তি কহে। শ্রীকৃষ্ণের প্রধান তিন শক্তি—অন্তরঙ্গা, তটস্থা, ও বহিরঙ্গা। অন্তরঙ্গা শক্তি অর্থে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ শক্তি; এই শক্তিপ্রভাবে তিনি পূর্ণ স্বরূপে বৈকুণ্ঠাদিতে স্বরূপ-বিভবের সহিত বিরাজ করেন। বহিরঙ্গা শক্তি মায়াখ্যা শক্তি, তাঁহার বহিরঙ্গের বৈভব প্রকট করে, এই শক্তি জড়াত্ম-প্রধান রূপা। যে শক্তি অন্তরঙ্গাও নহে, বহিরঙ্গাও নহে, উদাসীনবৎ, তাহাই তটস্থা শক্তি। তটস্থা-শক্তি চিদাত্মক শুদ্ধ জীবশক্তি, এবং বহিরঙ্গা শক্তি—মায়াশক্তি। শ্রীকৃষ্ণের চিচ্ছক্তি ও জীবশক্তি অভেদ, আবার শ্রীকৃষ্ণের চিচ্ছক্তি ও মায়ামুগ্ধ জীবশক্তি ভেদ। ইহারই নাম অচিন্ত্য ভেদাভেদ বাদ।

শ্রীশঙ্করাচার্য্য বলেন যে, বেদ ও উপনিষদ ব্রহ্মকে অবিশেষ (নামরূপ বিবর্জ্জিত, স্বগত—স্বজাতীয়—বিজাতীয় ভেদরহিত একমেবাদ্বিতীয়ং) কহেন, শ্রীচৈতন্যদেব বলেন বেদ ও উপনিষদের ব্রহ্ম সম্বন্ধে নির্ব্বিশেষ উক্তি অপেক্ষা সবিশেষ (Personal God) উক্তিই প্রবল দৃষ্ট হয়; সুতরাং বেদব্যাসের বেদান্তসূত্রের প্রকৃত অর্থ বেদব্যাস প্রণীত ভাগবত পুরাণের সাহায্যেই করিতে হইবে। এই বিষয় পরে বিস্তৃতরূপে নিবেদন করিব।

শ্রীশঙ্করাচার্য্য কোন স্বতন্ত্র দর্শনশাস্ত্র লেখেন নাই, তিনি বেদান্তসূত্রের একজন ভাষ্যকারমাত্র। বেদান্তসূত্রের বহু বহু দ্বৈতবাদ সম্মত ও শ্রীভগবদ্-গীতার ভাষ্যও লিখিয়াছেন, কিন্তু সকলই এক মায়াবাদ সুরে নিয়ন্ত্রিত। তিনি জ্ঞানরাজ্যের তিমিঙ্গিল সদৃশ মহাপুরুষ হইলেও তাঁহার পরমগুরু তীক্ষ্ণ-মস্তিষ্ক গৌড়পাদাচার্য্যের বার্ত্তিক শ্লোকের সাহায্য লইয়াই বৌদ্ধদিগকে নিরাশ করেন। ইহা পঞ্চদশীতে আছে। বঙ্গদেশীয় শ্রীচৈতন্যদেবই অচিন্ত্য শক্তি-

বলে শ্রীশঙ্করের মায়াবাদ খণ্ডন করিয়া তাহা সাধনরাজ্য হইতে এক প্রকার দূরীভূত করেন; কিন্তু বেদ বেদান্ত ও গীতা পাঠ করিতে হইলে দুর্ব্বোধ্য সংস্কৃত সূত্রের অর্থ ভাষ্য বিনা করা সুকঠিন, এই জন্যই মহাত্মা রাজা রাম-মোহন রায় শ্রীশঙ্করাচার্য্যের ভাষ্য পাঠ করিয়া মায়াবাদী হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম স্থাপন করিয়াছিলেন (অবশ্য এ কথা স্বীকার্য্য যে, কালক্রমে ব্রাহ্মগণ মায়াবাদ একরূপ কাটাইয়া উঠিয়াছেন)। বর্ত্তমান থিওসফি সম্প্রদায়ের মনীষাসম্পন্ন সভ্যগণও শ্রীশঙ্করাচার্য্যের ভাষ্য পাঠ করিয়া প্রায় মায়াবাদী হইতেছিলেন। কিন্তু শ্রীভগবানের কৃপায় তাঁহারাও মায়াবাদের হস্ত হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহাদের মতের সহিত ও শ্রীচৈতন্যদেবের অচিন্ত্যভেদাভেদবাদের সহিত কোন বিশেষ পার্থক্য লক্ষিত হয় না। মিসেস্ আনি বেশান্ত তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক (A study in Consciousness), গ্রন্থে লিখিয়াছেন ;—

"But He (পরমাত্মা) will not be merged in His work ; for vast as that work seems to us, to Him it is but a little thing : "Having pervaded this whole Universe with a portion of Myself, I remain." (ভগবদ্গীতা—১০।৪২)।

"That marvellous Individuality is not lost, and only a portion thereof suffices for the life of a Kosmos. The Logos, the Oversoul, remains the God of His Universe."

পঞ্চদশীর চিত্তদীপের ১৫৮।২১২ শ্লোকে বর্ণিত আছে যে, আনন্দময় কোষই ঈশ্বর ও ঐ চিত্তদীপের ৭২।৭৩ শ্লোকে আছে যে, বিজ্ঞানময় কোষই জীবাত্মা। আনন্দময় কোষই চিত্তের বীজ, উহাই জীবের কারণ শরীর। কিন্তু মনোময় ও বিজ্ঞানময় কোষ জীবের সূক্ষ্ম শরীর। এইরূপ কারণশরীর ও সূক্ষ্ম শরীরের পার্থক্য জ্ঞান উপাসকগণ গ্রহণ করিতে চাহেন না। শ্রীচৈতন্য-দেব ভক্তিকে জ্ঞানের অনেক ঊর্দ্ধে স্থান দিয়াছেন ; এমন কি জ্ঞানচর্চ্চা করার জন্য তিনি শ্রীঅদ্বৈত প্রভুকে প্রহার করিয়াছিলেন, এবং সনাতন গোস্বামীকে উপদেশ দেওয়া কালীন জ্ঞানকে কালসর্পের সহিত তুলনা করিয়া জ্ঞানমার্গ ত্যাগ করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসও বলিয়াছেন—ভক্তিযোগই কলিযুগের ধর্ম্ম। ভক্ত ব্রহ্মজ্ঞান

চাহে না, ভক্ত ব্রহ্মের সাকার রূপ দেখিতে চাহে। ভক্ত যদি ব্রহ্মজ্ঞান পাইতে ইচ্ছা করে তাহা হইলে ব্রহ্মজ্ঞানও পাইতে পারে। যে একবার কলিকাতায় আসিয়াছে সে গড়ের মাঠ, চিড়িয়াখানা সমস্তই দেখিতে পায়। কিন্তু ফল কথা, আগে কলিকাতা আসা চাই। সেইরূপ ভক্ত, ব্রহ্মজ্ঞান ও নিষ্কাম কর্ম্ম সমস্তই পাইতে পারে, কিন্তু ফল কথা আগে ভক্তিযোগ অবলম্বন করিতে হইবে। পঞ্চকোষের বিষয় ও স্থূলদেহ, লিঙ্গদেহ, কারণ শরীর আলোচনা করা কালে ইহা বিস্তৃতরূপে কথিত হইবে।

শ্রীশঙ্করাচার্য্য বেদান্তসূত্রের মায়াবাদ ভাষ্য লিখিয়া বৌদ্ধমত নিরসন করেন। বৌদ্ধগণ (মাধ্যমিক সম্প্রদায়) বলেন সৃষ্টির পূর্ব্বে মহাশূন্য ছিল। বৌদ্ধগণ ব্রহ্মের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। শ্রীশঙ্করাচার্য্য বেদ বেদান্ত হইতে দেখাইলেন যে আদিতে মহাশূন্য ছিল না। ব্রহ্ম ছিলেন, ব্রহ্মই একমাত্র সৎ পদার্থ, আর সমস্ত মিথ্যা। ইহা প্রমাণ করিবার জন্য শ্রীশঙ্করাচার্য্যকে তাঁহার সুতীক্ষ্ণ মস্তিষ্ক বিলোড়িত করিয়া এক ব্রহ্মাস্ত্র আবিষ্কার করিতে হইয়াছে। সেই ব্রহ্মাস্ত্রের বলে তিনি বেদ, বেদান্ত, বেদান্তসূত্র ও ভগবদ্গীতার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু সর্ব্বস্থানে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। (ইহা আমি ক্রমশঃ দেখাইতেছি)। তাঁহার সেই অমোঘ ব্রহ্মাস্ত্র এই—শারীরক ভাষ্যের প্রথম কথা এই—"আহ কোঽয়মধ্যা সো নামেতি।" তার পরেই তিনি লিখিলেন—

"এবমবিরুদ্ধঃ প্রত্যগাত্মন্যপ্যনাত্মাধ্যাসঃ।
তমেতমেব লক্ষণঃ মধ্যাসং পণ্ডিতা অবিদ্যেতি মনস্তে।
তদ্বিবেকেন চ বস্তু স্বরূপাবধারণং বিদ্যামাহুঃ॥"

অনেকেই জানেন যে হিন্দু আইনের অর্থ করার জন্য একটী অস্ত্র ছিল—Factum valet বচনশতেনাপি বস্তুনোঽন্যথা কর্ত্তুমশক্যঃ। যাহা একবার সংঘটিত হইয়া যায় তাহাকে শত শাস্ত্র বচনও খণ্ডাইতে পারে না। পুরাণ ইতিহাসের সত্যতা পরীক্ষার জন্যও মহাত্মা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এক অস্ত্র আবিষ্কার করিয়াছিলেন "প্রক্ষিপ্ত"। যাহা তাঁহার মনোমত হয় নাই তাহাই প্রক্ষিপ্ত। শ্রীকৃষ্ণের যে বসন চুরী ভাষাপরিচ্ছেদে আছে, যে গোবর্দ্ধন ধারণ ও যমুনার কেলি শ্রীশঙ্করাচার্য্যের স্তবাবলীতে আছে তাহা

বঙ্কিম বাবুর মতে প্রক্ষিপ্ত। উপনিষৎ ও পুরাণের সত্যাসত্য পরীক্ষা সম্বন্ধে রাজা রামমোহন রায় এক অস্ত্র আবিষ্কার করিয়াছিলেন তাহা এই—কোন প্রসিদ্ধ সংগ্রহকারক সংগ্রহ করিয়াছেন কিনা, এবং কোন ভাষ্যকার তাহার আলোচনা করিয়াছেন কিনা। বলা বাহুল্য এই যে বেদব্যাস ভিন্ন অন্য কোন মহাপুরুষ পুরাণ সংগ্রহ করেন নাই, এবং ভাষ্যকারগণ স্বীয়মতের পোষকতার জন্যই নিজের আবশ্যকমত উপনিষদের বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। সে যাহা হউক, শ্রীশঙ্করাচার্য্যের অতি প্রবল ব্রহ্মাস্ত্র ছিল "কো হয় অধ্যাস" অধ্যাস কাহাকে কহে, অবিদ্যা, বিদ্যা বা মায়া কি ? শ্রীশঙ্করাচার্য্য অগ্রে এই অস্ত্র প্রস্তুত করিয়া তাহার সাহায্যেই তর্কযুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছেন। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় এই ব্রহ্মাস্ত্রকে কিরূপ ভাবে বুঝিয়া তাহার সাহায্যে মায়াবাদ ধর্ম্ম সংস্থাপন করিয়াছিলেন তাহা দেখাইয়া 'অধ্যাস, মায়া, অবিদ্যা' প্রভৃতির পর্য্যালোচনা করা যাইবে। (ক্রমশঃ)

শ্রীজানকীনাথ পাল, বি, এল, শাস্ত্রী।

বিজ্ঞান, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য।

—আমাদের মণ্ডলাধিপতি সূর্য্যের যে জীবন আছে, এবং তাহার হৃৎপিণ্ড মানবের ন্যায় সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হয়, তাহা এক্ষণে প্রায় প্রমাণিত হইয়াছে। বিভিন্ন সময়ে গৃহীত কতকগুলি ফটোগ্রাফ হইতে সূর্য্য মণ্ডলের আকুঞ্চন ও প্রসারণ অনেকটা সিদ্ধ হয়। বিজ্ঞান আর এক স্তর উপরে উঠিয়াছেন। সূর্য্যের আকুঞ্চনের সময় সমস্ত সৌরমণ্ডল ও গ্রহাদি ব্যাপিয়া যে প্রাণ শক্তির ক্রিয়া হয়, তাহার হ্রাস হইয়া যায়, এবং সূর্য্যমণ্ডলে কতকগুলি দাগ (Sunspots) দেখা দেয়। এই প্রকার জীবনী শক্তির হ্রাস হইলে, পৃথীবিতে দুর্ভিক্ষ মহামারী ও যুদ্ধ সংঘটিত হয়। হিন্দুরা আদিত্য মণ্ডল মধ্যবর্ত্তী সহস্রপাৎ, সহস্রাক্ষ পুরুষকে ঈশ্বর বলিয়া জ্ঞান করেন। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সঙ্গে এ মতটী আর তত গাঁজাখুরি বলিয়া বোধ হয় না। সূর্য্য হইতে যে প্রাণশক্তি নির্গত হয়, তাহা কুষ্ঠ প্রভৃতি ক্ষয়রোগে ব্যবহৃত হইলে রোগী আরোগ্য লাভ করে। এই প্রক্রিয়ার নাম সূর্য্যাঘাদান। জনসাধারণ এ বিষয়টী পরীক্ষা করিয়া দেখিলে ইহার তথ্য বুঝিতে পারিবেন। প্রাণশক্তি ও চেতনাশক্তির বিশেষ প্রভেদ নাই। একই শক্তি আধার বিশেষে ভিন্নরূপে পরিণত হয়। আমাদের আলোক প্রাপ্ত ভ্রাতারা এ বিষয়ে কি বলিবেন। বর্ত্তমান বিজ্ঞানদৌরাত্ম্যে বুদ্ধি স্থির রাখা বড়ই দুরূহ হইতেছে। যাহার দোহাই দিয়া হিন্দু ধর্ম্মের আদ্যকৃত্য সিদ্ধ হইতেছিল,

সেই বিজ্ঞানই আবার বলে কি ? জড় পদার্থ চেতন হইল, সূর্য্যও সজীব, "এখন বল মা তারা দাঁড়াই কোথা ?"

—একম সৎ বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি এই কথাটি সকলেরই মনে রাখিলে ভাল হয়। গল্পের ঢালের ন্যায় আমরা সত্যের এক দেশ মাত্র দর্শন করি। তাই বলিয়া কি অন্যের দর্শন ভুল ? বর্ত্তমান সংখ্যায় "হিন্দু দর্শন" শীর্ষ প্রবন্ধে থিয়সফিকে জানকী বাবু যাহা দেখিয়াছেন ইহা তাঁহারই দৃষ্টি। যদিও আমরা তাঁহার ভাব গ্রহণ করিতে অক্ষম তত্রাপি সেই "ভাবরূপী জনার্দ্দনকে" স্মরণ করিয়া আমরা জানকী বাবুর স্বমতের অনুমোদন প্রশংসা করি। কিন্তু "স্ব"-টা কি ?

সমালোচনা।

সনাতন ধর্ম্ম শিক্ষা, সনাতন ধর্ম্ম শিক্ষা প্রথম পাঠ —শ্রীগিরিশচন্দ্র দত্ত প্রকাশিত, বারাণসী সেণ্ট্রাল হিন্দু কলেজ ন্যাসী সমিতি কর্ত্তৃক হিন্দুধর্ম্মের মূল ও সর্ব্ববাদী সম্মত যে সকল তথ্য আছে, তাহা সহজ ভাষায় শিক্ষা দিবার উপযোগী যে কয়খানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে—এই পুস্তক তাহার অন্যতম। গিরিশ বাবু এই পুস্তক প্রকাশ করিয়া সমগ্র বাঙ্গালী জাতির কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। হিন্দুধর্ম্ম অতি বৃহৎ এবং ইহার শাখাও অনন্ত। এই "নানা মুনির নানামত" সমন্বিত শাস্ত্র-সমুদ্র মন্থন করা এক জীবনের কার্য্য নহে। যাহাতে সুকুমার মতি বালক বালিকাগণ হিন্দুধর্ম্ম অরণ্যে হারাইয়া না যান, যাহাতে অজ্ঞান অন্ধকারে স্বকপোল কল্পিত বস্তু বাস্তব বলিয়া না বোধ করেন, যাহাতে আপাত প্রতীয়মান ভেদের মধ্যে দেশীয়) ব্যক্তিগত ও সম্প্রদায়গত অনুষ্ঠিলনের মধ্যে একতা দেখিতে পাওয়া এবং হিন্দু জাতির আধ্যাত্মিক ঐক্য স্থাপিত হয় সেইজন্য এই পুস্তক প্রকাশিত। আমরা আশা করি যে প্রত্যেক স্কুল এবং কলেজে হিন্দু ছাত্রগণকে স্বধর্ম্ম নিষ্ঠা শিক্ষা দিবার জন্য এই পুস্তক ব্যবহৃত হইবে। এমন কি বয়োজ্যেষ্ঠরাও এ পুস্তক পাঠে উপকৃত হইবেন। ছাপা অতি সুন্দর, স্বদেশী কাগজে ২৬৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত ; মূল্য এক টাকা মাত্র। পন্থা কার্য্যালয়ে এবং ৫৬ নং পদ্মপুকুর রোড ভবানীপুরে পাওয়া যায়।

তন্ত্রকল্পদ্রুম—পণ্ডিত শ্রীনীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায় সংগৃহীত ও খণ্ডাকারে প্রকাশিত—হিন্দু ধর্ম্ম মধ্যে আগম বা তন্ত্র—অতি গুহ্য। শাস্ত্রে দর্শনভাগে যাহা জ্ঞানরূপে উপদিষ্ট, তন্ত্র সেই সকল মূল তথ্যের ব্যক্তিগত বা স্বভাবগত প্রয়োগ। প্রয়োগ না হইলে অনুশীলন হয় না। ধর্ম্মের অনুশীলন জন্য তন্ত্রশাস্ত্রের সৃষ্টি। এই শাস্ত্র এতই প্রচ্ছন্ন যে প্রায় লুপ্ত হইয়া আসিতে ছিল। তন্ত্রশাস্ত্র সম্বন্ধে সাধারণতঃ যে বিদ্বেষ দৃষ্ট হয় অজ্ঞান তাহার মূল। একদেশ মাত্র দর্শন করিয়া আমরা ভ্রান্তিদৃষ্টি হইয়াছি। আশা করি সমগ্র তন্ত্রশাস্ত্র প্রকাশ হইলে এই অন্ধ বিশ্বাস দূর হইবে। সুতরাং তন্ত্রকল্পদ্রুম সাধারণের উপকারী হইবে ইহাতে সন্দেহ নাই। ছাপা ও কাগজ ভাল। মূল্যও সামান্য মাত্র। (বিশদ সমালোচনা পরে প্রকাশ্য।